সাহিত্য-সংহিতা।

(নব পর্য্যায়)

পঞ্চম খণ্ড।

১৩২৩ সাল।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত।

সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত

১০৬।১নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৩ সালের সাহিত্য-সংহিতার

লেখকগণের নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

	লেখকের নাম ও বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।	
	বল্লাল কাহিনী	৪৩৮
২।	শ্রীঅমরচন্দ্র ঘোষ বি, এ,।	
	মাধবীকুঞ্জ (নাটকীয় চরিত্রাবলী)	৩৮৩
৩।	শ্রীআশুতোষ মিত্র বি, এ.।	
	বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা	১৭
৪।	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।	
	কৃত্তিবাস-স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন সভায় সভাপতির অভিভাষণ	১৮০
	উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ	১৯৫
৫।	(রায়সাহেব,) ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ,।	
	সুধা ভোজন জাতক	৩৯
৬।	শ্রীকৈলাশচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব।	
	"আর্য্য জ্যোতিষ"	৭৮
৭।	শ্রীগণপতি রায়।	
	মিথিলার প্রাচীন কাহিনী ...	১৪৩, ২২৯, ২৮৭
৮।	শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ,।	
	ইউরোপীয় সাহিত্যে দুঃখবাদ ও বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার প্রতিবাদ।	৫০৭
	শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।	
	মহাগীত (কবিতা) ...	১৬৭
	প্রেম-নিলয় ঐ ...	ঐ
	দ্রাবিড় উপমা ঐ	২০২

সুসঙ্গাধিপতির স্বর্গারোহণে (কবিতা) ... ৩২৪
যতিপঞ্চকম্ ৩৩৯
অমরা ও অমর ঐ ৪৪৬
দেয়ালা ঐ ৪৬০
স্মরণ ঐ ৪৯৮

১০। শ্রীজগদানন্দ রায়।
ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার ২৩
প্রকৃতির কৌশল ৩৯৭
প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি ৪৮৯

১১। শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়।
বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসারে মানবের স্বাভাবিক আহার বিচার। ৩২৫

১২। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
পূজার ছুটি ১১৪

১৩। শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।
৺দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের স্ত্রীবিয়োগের
কবিতা সম্বন্ধে ২৫৩

১৪। ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর।
প্রাচীন কবিতা ৭৭

১৫। শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য।
বৰ্দ্ধমান ভারতী ৪৬৫

১৬। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম বিদ্যালঙ্কার কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।
মহাকবি বাণভট্ট ১৭৫

১৭। কবিরাজ শ্রীবিনোদলাল দাস গুপ্ত।
বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষয়রোগের আধিক্য
ও তৎপ্রতিকারোপায় ... ২৪৩

১৮। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।
দুর্ভোগের অত্যাচার ৩১

১৯। শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

বিন্দু (গল্প) ১৬৮

পিতৃনারায়ণের প্রতি (কবিতা) ১৭৪

২০। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, কে, সি, আই, ই।

সভাপতির অভিভাষণ ১

২১। কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি।

সুশ্রুতের আদর্শ ৫৯

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের "চারুচর্য্যা" ... ৬৭, ১০৩, ১৫১,

প্রণয়-পারিজাত বা বসন্তসেনা। ... ২৯৩, ৩৪১, ৪২৫

পুরাণ-প্রসঙ্গ ৪২৯

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের সেব্যসেবকোপদেশ ... ৪৩৪

স্বাস্থ্যরক্ষায় রোগবিজ্ঞান ৪৯৯

২২। শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি ৩৩৫

২৩। শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়।

বৃন্দাবন দর্শনে (কবিতা) ৫১১

২৪। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

সমাজ ও সাহিত্য ১২১

২৫। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়।

পাঁচ ফুলের সাজি ১৬০

২৬। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

আমাদের জাতীয় উন্নতির একটু সূত্র ৩৬৪, ৪৫৭

২৭। শ্রীরামলাল সরকার।

চীন ও হিন্দু সভ্যতা ... ৩০১

২৮। শ্রীরামচন্দ্র কাব্যস্মৃতি মীমাংসাতীর্থ।

মণিভদ্র ... ৪৭৯

২৯। শ্রী :—

৺মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ, ... ৩১৫

৩০। শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায়।

মধুসূদনের নাট্য-সাহিত্য এবং বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে তাহার স্থান ২১১

৩১। শ্রীসাতকড়ি সিদ্ধান্ত ভূষণ।

পঞ্জিকা সংস্কার ২৭৮

৩২। শ্রীসারদারঞ্জন রায় এম, এ।

কালিদাস ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৫১৪

৩৩। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

পুনর্জ্জন্ম ২৫১

(ক)—বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ ... ৩৫৭

(খ)—৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির দুঃস্থা কন্যার সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ ৩৫৪

(গ)—সমালোচনা ৯৮, ৩০০, ৩৫৩, ৩৯৮, ৪৬১

(ঘ)—সাহিত্য-সভার অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী ৫৩৯-৫৪৬

(ঙ)—সাহিত্য-সভার ১৩২৩ সালের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি।

(জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার শেষভাগে অর্থাৎ ১০১ পৃষ্ঠার পর ক—ড পর্য্যন্ত)।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায়, ৫ম খণ্ড।] ১৩২৩ সাল, বৈশাখ। [১ম সংখ্যা।

সভাপতির অভিভাষণ। *

সমবেত সুধীমণ্ডলি—

আজ সাহিত্য-সভার পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সভার সভাপতি-রূপে আপনাদিগকে সম্ভাষণ করিবার সুযোগ পাইয়া আমি আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। আপনারা আমাদের জাতীয় সাহিত্যের রক্ষক ও পরিপোষক। যে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে পল্লী-সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইত, যাহার গতি পল্লীপ্রান্তবাহিনী ক্ষীণকায়া তটিনীর ন্যায় মন্থর ও তরঙ্গলীলাবিহীন ছিল, সেই সাহিত্য আজ বর্ষার উদ্দাম তরঙ্গিণীর ন্যায় কূল ছাপাইয়া ছুটিয়াছে; দরিদ্র পল্লীবাসী বঙ্গবাণীর পূজার জন্য যে ক্ষুদ্র দেউল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আজ তাহা গগনচুম্বী বিরাট্ মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। আপনারা সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবক। বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক, বঙ্গীয় সুধীবৃন্দ, সাহিত্য-সভার সভাপতিরূপে আজ আমি আপনাদের সাদর সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।

সাহিত্যসেবীদিগের সম্বর্দ্ধনা।

জীবনের 'গণা' দিন অলক্ষ্যে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে—আমরা ভ্রূক্ষেপও করি না। কিন্তু যেমনই একটি বর্ষ অতীত হইয়া নূতন বর্ষের সূত্রপাত হয়, অমনই যেন আমাদের চেতনা হয়; আমরা জাগিয়া উঠি, আর গত বর্ষের লাভালাভের হিসাব করিতে বসি। আমাদের সভাসমিতির বার্ষিক উৎসব, জন্মতিথির উৎসব, এই চেতনা, এই জাগরণ। হায়, এই আয় ব্যয়ের সমাধান করিয়া কয়জনের ওষ্ঠাধরে হাস্যের রেখা পরিস্ফুট হয়? কয়জনের আয়ের অঙ্ক ব্যয়ের অঙ্ক ছাপাইয়া উঠে? লাভের আনন্দ অপেক্ষা ক্ষতির

সাহিত্যসভার লাভ লোকসান।

* সাহিত্য-সভার পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সভাপতি মাননীয় মহারাজ সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই কর্ত্তৃক পঠিত।

দুঃখ ও লজ্জাতেই অনেকের মস্তক অবনত ও চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসে, সাফল্যের উৎসাহ অপেক্ষা বিফলতার অবসাদেই অনেকের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমরা বন্ধুবান্ধব লইয়া উৎসব করিয়া সেই দুঃখ ও অবসাদ ভুলিতে চাহি।

সাহিত্য-সভার ভাগ্যে ও অনাবিল আনন্দ ভগবান্ লিখেন নাই। আলোচ্য বর্ষে আমরা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অধ্যাপক কালীপদ বসু, সাহিত্যসংহিতার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, বাবু বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, রায় হরিচরণ চৌধুরী বাহাদুর ও বাবু বটকৃষ্ণ পাল, এই কয়জন সভ্যকে হারাইয়াছি। ইঁহা-দিগকে হারাইয়া সভা যে নিরতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন ও ৺বটকৃষ্ণ পালের ন্যায় কর্ম্মবীর আমাদের দেশে প্রকৃতই বিরল। ঢাকার সারস্বত সমাজ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি, আর বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের কর্ম্ম জীবনের নিদর্শন বঙ্গের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। কর্ম্মের দিনে প্রকৃত কর্ম্মীর সংখ্যার হ্রাস হইতে দেখিলে হৃদয়ে স্বতঃই নিরাশা ও আতঙ্কের উদয় হয়।

নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সভা তাহার চিরপোষিত আশাগুলি হৃদয়ে লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল। নূতন আবার পুরাতন হইয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিল; কিন্তু সেই আশার অধিকাংশই অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। অতীত আশার শেষ লইয়া নববর্ষে আবার নবীন উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বৎসরান্তে আবার তাহার হিসাব নিকাশের দিন আসিবে। ভগবান্ করুন তখন যেন আমরা লাভের কথা বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারি।

আমাদের বার্ষিক সাহিত্যিক সম্মিলনী সমূহ বর্ষব্যাপী সাহিত্যিক লাভ ক্ষতির বিবরণী। ব্যবসায়িগণ যেমন বৎসরান্তে লাভক্ষতির সমাধানের ফল দেখিয়া আগামী বর্ষের জন্য কার্য্য প্রণালী নিরূপণ করেন, সেইরূপ এই সকল সম্মিলনীতে অতীত বর্ষের সাহিত্যের নিরপেক্ষ সমালোচনা দেখিয়া সাহিত্যিকগণ ভবিষ্যতের জন্য স্ব স্ব কর্ত্তব্য নিরূপণ করিবেন এইরূপ আশা স্বতঃই মনে উদিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত কোন সম্মিলনেই বাঙ্গালা সাহিত্যের লাভ লোকসানের আলোচনা হয় নাই। হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইত যে, এই সকল সম্মিলন প্রকৃতই সাহিত্যের উন্নতির পরিচায়ক কি না। কিন্তু আমার

সন্দেহ এই যে, বোধ হয় সম্মিলনের সাহিত্যরথী সভাপতিগণ ইচ্ছা করিয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের লাভ লোকসানের আলোচনা করিতে বিরত হইয়া থাকেন। লাভের অপেক্ষা ক্ষতির ভাগ অধিক আশঙ্কা করিয়াই কি তাঁহারা এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেন না?

কিন্তু অপ্রীতিকর হইলেও ইহার আলোচনা করিতে হইবে। যদি প্রকৃতই দোষ থাকে তাহা ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে সংশোধনের সম্ভাবনা অল্প। একজন তীক্ষ্ণদর্শী, সুবিজ্ঞ সাহিত্য-সমালোচক বলিয়াছেন, সাহিত্যে যাহা দেখিব, বিনা বিচারে তাহাই ভাল বলিয়া করতালি দিলে সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি ত হইবেই না, বরং তাহার অবনতি হইবে।

"তোমরা সবাই ভাল,
কেউ দিব্যি গৌর বরণ, কেউ দিব্যি কাল—"

এ কথা অন্য যেখানেই সুসঙ্গত হউক, সাহিত্যে শোভনীয় নহে।

কিন্তু আমার শক্তি ক্ষুদ্র। সাহিত্যরথিগণ যে গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও আমি যে বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি, তাহার অনিষ্টকর কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখিলে বা তাহার উন্নতির পরিপন্থী কোন চেষ্টা বা প্রভাবের প্রাবল্য দেখিলে, যথাজ্ঞান যথামতি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নীরব থাকিতে পারি না। সে বিষয়ে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলে, আমার আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হইলে, আমার অপেক্ষা কেহই অধিকতর আনন্দিত হইবেন না।

দুই দিক্ হইতে আমি আজ বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। প্রথম, ভাষার দিক্; দ্বিতীয় ভাবের দিক্। আমার মনে হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন একটি প্রভাবের সূত্রপাত হইয়াছে যাহা অচিরে বিনষ্ট না হইলে, তদ্দ্বারা এই উভয় দিকেই সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা কিরূপ হইবে, এই লইয়া নানা জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। কলিকাতার এক দল লেখক স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা বাঙ্গালী জনসাধারণের বোধগম্য নহে; অতএব তাহাকে এমন ভাবে গড়িতে হইবে

উন্নতির প্রতিকূল প্রভাব।
সাহিত্যের ভাষা।

যাহাতে তাহা আপামর সাধারণের পক্ষে সুগম হয়। ইহা কিরূপে সম্ভব তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। যে দেশে শতকরা নব্বই জনেরও অধিক লোক নিরক্ষর বলিলে অত্যুক্তি হয় না; যে দেশে প্রধানতঃ হিন্দু মুসলমান জাতি-ভেদে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকৃতির মৌখিক ভাষাপ্রচলিত; আবার প্রদেশভেদে এই দুই শ্রেণীর ভাষার প্রত্যেকের মধ্যে নানা প্রাদেশিক বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই দেশে শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্বসাধারণের সুগম বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা কিরূপ হইবে, তাহা ভাবিয়া পাই না। এত দিন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষাকে এক আদর্শের অনুযায়ী করিয়া গঠন করা হইতেছিল। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র নির্ব্বিবাদে গৃহীত হইয়া আসিতেছিল। তাহার ফলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা সুদূর চট্টগ্রামের অধিবাসীদিগের যেরূপ বোধগম্য হইয়াছিল, সেইরূপ নবীনচন্দ্র সেনের ভাষাও কলিকাতায় আদৃত হইয়াছিল; এখন সাহিত্যের ভাষাকে সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিয়া প্রাদেশিকতাদুষ্ট করা হইতেছে। আমার মনে হয় ইহা হইতে উদ্দেশ্যের বিপরীত ফলই ফলিবে। সাহিত্যের সার্ব্বজনিকতা বিনষ্ট হইয়া এক বিরাট্ সাহিত্যের স্থলে এতগুলি প্রাদেশিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে যে এক প্রদেশের সাহিত্য অন্য প্রদেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে আদৌ সুগম হইবে না।

যাহা কোন দেশে কখনও হয় নাই, তাহা আমাদের দেশে হইবে, এরূপ মনে করা কতদূর সঙ্গত তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। কোন দেশে কোন কালে সাহিত্যের ভাষা আপামর সাধারণের সহজবোধ্য হয় নাই। Milton, Locke, Burke, Carlyle প্রভৃতির ভাষা ইংলণ্ডের এই অপূর্ব্ব শিক্ষা বিস্তারের দিনেও কি কর্ণওয়ালের শ্রমজীবীদিগের অনায়াসবোধ্য? কতকটা শিক্ষা না হইলে সাহিত্য আয়ত্ত করা যায় না। কেবল আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধারণের উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য সাহিত্যের সৃষ্টি নহে। তাহা হইলে, Milton, Shakespeare, Tennyson, কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কোনই প্রয়োজন ছিল না। সাধারণ কৃষককে আলু পটোলের চাষ শিক্ষা দিবার জন্য যদি গ্রন্থ লিখিতে হয়, তাহাতে প্রাদেশিক মৌখিক ভাষার ব্যবহার দূষণীয় নহে। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য আরও উচ্চ। স্থূলভাবে বলিতে গেলে

হৃদয়ে উচ্চভাব উদ্বুদ্ধ করা, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির বিকাশ করা, রসের সৃষ্টি করা প্রভৃতি সাহিত্যের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিবিধ Style বা রচনা পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে; যাহা সাধারণ তাহা কোথাও অসাধারণ ভাবে বর্ণিত হয়; যাহা এক কথায় বলা যায় তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বিবিধ শব্দবিন্যাস করা হয়; যাহা স্পষ্ট তাহা হয় ত অস্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন হয়। এই art বা লিপিকৌশল বহুকালব্যাপিনী একনিষ্ঠ শিক্ষা ও সাধনার ফল। শক্তিশালী লেখকদিগের প্রত্যেকেরই Style বা রচনা পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন না, ইতর লোকের ত কথাই নাই। আবার ভাষার অন্তরালে যে ভাব রহিয়াছে তাহা বুঝিতে হইলেও শিক্ষার প্রয়োজন। সাধারণ লোকের শিক্ষাদৈন্য হেতু যে বিশেষ ভাবদৈন্যও আছে, এ কথা কি কেহ অস্বীকার করিবেন? তার পর ভাষার কথা। ভাষা ভাবেরই বাহ্য আকৃতি। মানবের আকৃতির যেমন একটি standard বা সাধারণ আদর্শ আছে, যাহার ন্যূন হইলে আকৃতি নিন্দনীয় বা উপহসনীয় হয়, সাহিত্যের ভাষারও সেইরূপ একটি আদর্শ আছে, যাহা হইতে হীন হইলে ভাষা নিন্দনীয় ও উপহসনীয় হইয়া থাকে। স্বাভাবিক নিয়মে বাঙ্গালা ভাষার সেই আদর্শ ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মে সেই আদর্শে অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহা প্রকৃতির নিয়মে এমনি নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে হইয়াছে যে তাহা গ্রহণ করিতে কেহ আপত্তি করেন নাই।

মোট কথা, উপযুক্ত শিক্ষা ভিন্ন কেহ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং মৌখিক ভাষা ব্যবহার করিলেই যে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এরূপ মনে করা যায় না।

আমি দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার বক্তব্য বিশদ করিবার চেষ্টা করিব—

"দাবী করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্চে, বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রফাটাই সত্য। এই সত্যকে যে শিক্ষা মানতে দেয় না তাকেই আমরা বলি নীতি, এই জন্যেই নীতিকে আজ পর্য্যন্ত কিছুতেই মানুষ মেনে উঠতে পারছে না।

যারা কাড়তে জানে না, ধরতে পারে না, একটুতেই যাদের মুঠো আলগা হয়ে যায়, পৃথিবীতে সেই আধ-মরা একদল লোক আছে নীতি সেই বেচারাদের সান্ত্বনা দিক্। কিন্তু যারা সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে জানে, যাদের দ্বিধা নেই সঙ্কোচ নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র। তাদের জন্যই প্রকৃতি যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু দামী সাজিয়ে রেখেচে। তারাই নদী সাঁৎরে আস্‌বে, পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়বে, দরজা লাথিয়ে ভাঙবে, পাবার যোগ্য জিনিস ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। এতেই যথার্থ আনন্দ, এতেই দামী জিনিসের দাম। প্রকৃতি আত্মসমর্পণ কর্ব্বে,—কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেননা চাওয়ার জোর, নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ কর্‌তে ভালবাসে—তাই আধ-মরা তপস্বীর হাড়-বের-করা গলায় সে আপনার বসন্ত-ফুলের স্বয়ম্বরের মালা পরাতে চায় না। নহবৎখানায় রসনচৌকি বাজচে—লগ্ন বয়ে যায় যে, মন উদাস হয়ে গেল। বর কে? আমিই বর—যে মশাল জ্বালিয়ে এসে পড়তে পারে, বরের আসন তারই। প্রকৃতির বর আসে অনাহূত।"

উপরি উদ্ধৃত অংশে লেখক তাঁহার যথাসাধ্য সহজ ভাষা প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ ভাষার অন্তর্নিহিত ভাব চাষা মজুরেরা বুঝিতে পারে কি? তাহা যদি না পারিল, তবে সাহিত্যকে এরূপে প্রাদেশিকতা-দুষ্ট করা কেন? ঐ ভাষা ও ভাব লেখকের ভাষা ও ভাবদৈন্যের সূচক। অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা একটা ভাণ মাত্র।

ভাষা এত সহজ হইলেও ভাব সাধারণের বোধগম্য হইল না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণ আদরের সহিত কালীপ্রসন্ন সিংহের সাধুভাষায় অনূদিত মহাভারত পাঠ করিয়া থাকে। এখানে ভাষা সহজ নহে, কিন্তু ভাবের সহিত পাঠক বা শ্রোতার পূর্ব্ব পরিচয় আছে। তাই ভাষার কঠিন আবরণে ভাব সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিতে পারে নাই।

নব্যসম্প্রদায় এই কথার উত্তরে বলেন—

"মৌখিক ভাষার অনুসরণ করিলে সাহিত্যে প্রাদেশিকতা এসে পড়বে—এ ভয় অনেকেই পান; এবং সাহিত্যকে এ দোষ হতে মুক্ত রাখবার অভিপ্রায়ে তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, সমস্ত বঙ্গদেশের জন্য এমন একটি ভাষা রচনা করতে হবে, যা বাঙ্গলার কোন প্রদেশেরই ভাষা নয়। সাধুভাষার স্বপক্ষে এই হচ্ছে

সর্ব্বপ্রধান যুক্তি। সাহিত্যের রাজ্য অধিকার করবার জন্য নানা প্রাদেশিক ভাষার ভিতর প্রথমে লড়াই চলে। সে লড়াইয়ে যে প্রাদেশিক ভাষার রসনা বল সব চেয়ে বেশি, সেই ভাষা জয়লাভ করে—বাদবাকি সব উপভাষা হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সকল দেশেই সাহিত্যের ভাষা তার কোন একটি বিশেষ প্রদেশের মৌখিক ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সেই মৌখিক ভাষার সঙ্গে যোগ রক্ষা করেই সাহিত্যের ভাষা পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। যুগে যুগে মৌখিক ভাষার অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ভাষারও রূপান্তর ঘটে। বঙ্গদেশে সাহিত্যের ভাষা দক্ষিণ বঙ্গের মৌখিক ভাষা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং কালক্রমে দক্ষিণ বঙ্গের মুখের কথায় যে বদল হয়েছে, আমাদের নব সাহিত্যের ভাষাকেও সেই বদল অল্পাধিক পরিমাণে অঙ্গীকার করতে হবে—নইলে আমাদের সাহিত্য রসরক্তহীন হয়ে পড়বে।”

বেশ কথা। তাহা হইলে নব্যপন্থীরাও স্বীকার করিতেছেন যে, সাহিত্যের ভাষা প্রত্যেক প্রদেশের মৌখিক ভাষার অনুসরণ করে না, সেই সমস্ত উপভাষার মধ্যে যাহার রসনাবল বেশী, অর্থাৎ যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট ও ভাবপ্রকাশে সমর্থ, সেই ভাষার উপরই সাহিত্যের ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণবঙ্গের বা কলিকাতার ভাষার এ পরিপুষ্টি কোথা হইতে আসিল? একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে কলিকাতাবাসীরা বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত ও সভ্য বলিয়া তাঁহাদের ভাষাও সংস্কৃতশব্দবহুল ও বহু পরিমাণে গ্রাম্যশব্দবর্জ্জিত। ভাবপ্রকাশে অধিকতর সমর্থ বলিয়া সাহিত্যের ভাষা স্বভাবতঃ সেই ভাষাকেই আশ্রয় করিয়াছে এবং স্বাভাবিক নিয়মে নিজের পরিপুষ্টির জন্য নানা স্থান হইতে, বিশেষতঃ সংস্কৃতের অক্ষয় রত্নভাণ্ডার হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে। ইহাই বাঙ্গালা সাধুভাষা নামে পরিচিত। তার পর কথা হইতেছে যে, মৌখিক ভাষার পরিবর্ত্তনের সহিত সাহিত্যের ভাষার পরিবর্ত্তনের কতদূর সম্বন্ধ। আমরা সকল দেশেই দেখিতে পাই, সাহিত্যে উন্নতির স্রোতোবেগের সহিত মৌখিক ভাষা প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার মৌখিক ভাষা যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে; কিন্তু এই কালের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার অনেক পরি-

বর্জন হইয়াছে। সাহিত্যের সহিত জনসাধারণের পরিচয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক ভাষারও উন্নতি হইবে; কিন্তু সাহিত্যের ভাষাকে ছোট হইয়া মৌখিক ভাষার সঙ্গে মিশিতে হইবে এবং তাহা না করিলে সাহিত্য "রসরক্তহীন" হইয়া পড়িবে, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

যাহা হউক, প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী লেখকগণ আমাদের দেশের জনসাধারণকে সাধু ভাষায় যতটা অনভিজ্ঞ মনে করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা তত্দূর অনভিজ্ঞ নহে। ১৩২০ সালের মাঘ মাসের সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশিত "বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক যথার্থই বলিয়াছেন—"জীবনের ঊষাকাল হইতেই যে দেশের আপামর সাধারণের কর্ণে সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দ ধ্বনিত হইতে থাকে, যে দেশের পূজা ও উৎসবের ভাষা সংস্কৃত, যে দেশের গৃহে গৃহে ব্যাস বাল্মীকির সমাদর, যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যাত্রা ও কথকতায় সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষায় পুরাণের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করে, যে দেশে ভিখারীরা পর্য্যন্ত জয়দেব, বিদ্যাপতির সাধু ভাষায় রচিত পদাবলী গান করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, যে দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় পর্য্যন্ত চাণক্য শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে, সে দেশের লোক হঠাৎ কিরূপে এমন মূর্খ হইয়া পড়িল যে আর তাহারা সাধু ভাষা বুঝিতে পারে না?"

আর এক কথা, প্রাদেশিক ভাষার দৈন্য সর্ব্ববাদিসম্মত—সকল প্রকার ভাব প্রকাশে ইহার শক্তি নাই। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় গ্রন্থ লিখিব বলিয়া যাঁহারা লেখনী ধারণ করেন, তাঁহাদিগকেও বাধ্য হইয়া সাধু ভাষার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। কেবল "হচ্চে" "যাচ্চে" "হলুম" "গেলুম" এইরূপ কয়টি ক্রিয়া পদের প্রয়োগ করিয়াই তাঁহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় কোন লেখকের একটি রচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"জগতে সৎ চিৎ ও আনন্দের প্রকাশকে আমরা জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে পারি, কিন্তু তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। কাঠ বস্তু গাছ নয়, তার রস টানিবার ও প্রাণ ধরিবার শক্তিও গাছ নয়; বস্তু ও শক্তিকে একটি সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করিয়া যে একটি অখণ্ড প্রকাশ তাহাই গাছ—তাহা একই কালে বস্তুময়, শক্তিময়, সৌন্দর্য্যময়। গাছ আমাদিগকে যে আনন্দ দেয় সে এই

জন্যই। এই জন্যই গাছ বিশ্ব পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য। গাছের মধ্যে ছুটির সঙ্গে কাজের, কাজের সঙ্গে খেলার কোনো বিচ্ছেদ নাই। এই জন্যেই গাছ পালার মধ্যে চিত্ত এমন বিরাম পায়—ছুটির সত্য রূপটী দেখিতে পায়। সে রূপ কাজের বিরুদ্ধ রূপ নয়। বস্তুত তাহা কাজেরই সম্পূর্ণ রূপ। এই কাজের সম্পূর্ণ রূপটিই আনন্দরূপ সৌন্দর্য্যরূপ। তাহা কাজ বটে, কিন্তু তাহা লীলা, কারণ তাহার কাজ ও বিশ্রাম এক সঙ্গেই আছে।"

ইহা হইতে কি বুঝা যায় না যে, বিষয় ভেদে ভাষার তারতম্য হইয়া থাকে, এবং সমস্ত প্রকার ভাবপ্রকাশে প্রাদেশিক বা মৌখিক ভাষা অক্ষম ?

যাহা হউক, নবীন সম্প্রদায় তাঁহাদের এই সাধুভাষাবিদ্বেষের দ্বারা এক ভীষণ রাক্ষসের সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন তাহাকে নিবারণ করিবেন কিরূপে ? অথচ নিবারিত না হইলে সে ভীষণ অনর্থপাত করিবে। নবীন সম্প্রদায় প্রচলিত সাধুভাষাকে বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না ; দক্ষিণ বঙ্গের মৌখিক ভাষাকেই বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা বলিতেছেন। কিন্তু অন্য প্রদেশের লোকেরা দক্ষিণ বঙ্গের প্রাদেশিক ভাষাকে সে প্রাধান্য দিতে চাহিতেছেন না। তাহার উপায় কি ? আসাম ত অনেক দিন আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা বলিতেছেন, এতদিন আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচলিত ভাষাকে স্বীকার করিয়া চলিতাম—সেই ভাষায় গ্রন্থ লিখিতাম—কোনও আপত্তি করিতাম না, কারণ, তাহাতে সকল প্রদেশের সমান অধিকার ছিল। কিন্তু এক্ষণে তোমরাই যখন সেই সর্ব্ববাদিসম্মত ভাষাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া প্রাদেশিক মৌখিক ভাষাকে সেই সিংহাসনে বসাইতে চাহিতেছ, তখন আমাদের মৌখিক ভাষাকে উপেক্ষা করিবে কেন ? তোমরা যতদিন "হইতেছে" লিখিতে ততদিন আপত্তি করি নাই, কিন্তু এখন যদি "হচ্ছে" বা "হচ্চে" লেখ, তবে আমরাই বা "হবরি লাগছে" লিখিব না কেন ? ক্রমে প্রত্যেক প্রদেশের উপভাষাই এইরূপ এক একটী দাবি উপস্থিত করিবে। তখন তাহার কি উত্তর দিবে ?

আমার নিবেদন এই যে, যে সকল লেখক এইরূপ নূতন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা গড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের লেখনী সংযত করুন। আমি প্রবীণ, সুতরাং সংশয়াকুল ও বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে

শৃঙ্খলিত, "সবুজে"র লেশমাত্রহীন, "আধমরা", বিষম "পাকা" হইতে পারি, কিন্তু, হে নবীন, আমি যে অনেক নবীনের উচ্ছৃঙ্খলতার ফল মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। অতীতের অভিজ্ঞতা উন্নতির সোপানপংক্তি; তোমরা তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহ।

তোমরা "মনঃ" না লিখিয়া "মন" লেখ, কোনও আপত্তি করি নাই—করিবও না; "মনঃ কষ্ট" না লিখিয়া "মনকষ্ট" লেখ—সহ্য করিব; কিন্তু "মনো-কষ্ট" লিখিলে সহ্য করিব না। তখনই বিধিনিষেধের কথা তুলিব। সহজ সরল ভাষায় লেখ আপত্তি নাই, যদি অযথা গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার বা বিজাতীয় রচনা পদ্ধতি অবলম্বন না কর। যদি লেখ—"মাগো, আজ মনে পড়চে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লাল পেড়ে সাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোর-বেলাকার অরুণরাগরেখার মত। আমার জীবনের দিন যে সেই সোণার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালের মেঘ কি ডাকাতের মত ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখ্‌ল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সেই যে ঊষা সতীর দান, দুর্য্যোগে সে ঢাকা পড়ে তবু সে কি নষ্ট হবার? আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে যে নীল। আমার মায়ের বর্ণ ছিল শামলা, তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের।"—তবে এই রচনা পদ্ধতির নিন্দা করিব।

আর এক কথা, যেমন সম্মুখে অত্যুচ্চ আদর্শ না থাকিলে, মানুষ সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মোন্নতি করিতে পারে না, সেইরূপ লেখকের সম্মুখে ভাষারও একটি অত্যুচ্চ আদর্শ না থাকিলে ভাষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। সকল লেখকেরই ভাষা সেই আদর্শে উপনীত হইতে পারিবে, এমন আশা করা যায় না; তবে সেই আদর্শে উপস্থিত হইবার জন্য যদি সকলেই চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভাষার অধোগতি নিবারিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ঊর্দ্ধগতির টান আসিয়া পড়িবে। কিন্তু আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইলে অথবা এক আদর্শ ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইলে, সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত না হইয়া নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। হে নবীন, এই বিক্ষিপ্ত শক্তি লইয়া তুমি কি বঙ্গবাণীর বিরাট্ স্বর্ণমন্দির নির্ম্মাণে সমর্থ হইবে?

নবীন সম্প্রদায় আমাদের সাহিত্যে যে নূতন idea বা ভাব আনিতেছেন, এবার আমি তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব

সাহিত্যে নূতন ভাব।

তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বদেশবাসিগণকে স্বতঃ পরতঃ এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শাস্ত্রোক্ত বিধান সকল তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রধান অন্তরায়। শাস্ত্র তাঁহাদিগকে চিরকাল অপরিণত শিশুর ন্যায় রাখিতে ভাল বাসে ও "পল্‌তের করে ফোঁটা ফোঁটা পুঁথির বিধান খাইয়ে তাকে বাঁচ্‌য়ে রাখ্‌তে" চায়। এই জন্য তাঁরা উপদেশ দেন—শাস্ত্রের বিধি নিষেধ ও সেই সঙ্গে সেই বিধি-নিষেধ-শাসিত সমাজের বিধি নিষেধ চরণে দলিত করিয়া তোমরা উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মত্তভাবে চল। "যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মত একেবারে পাৎলা সাদা হ'য়ে গেছে, তাদের চীঁ—চীঁ—গলার ভৎর্সনা কাণে করিও না।" সমাজ পুরুষদিগকেই যখন এত উৎপীড়ন করে, তখন নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকদিগের উপর তাহার অত্যাচারের সীমা নাই! তাই তাঁহারা বলেন—"সমস্ত সমাজ চারিদিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে যেন ছোট করে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেল্‌ছে—দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে!" হায় সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী—শাস্ত্র ও সমাজের কি অযথা অত্যাচার ও উৎপীড়ন তোমরা সহ্য করিয়া বাঁকিয়া ছোট হইয়া গিয়াছ! যে পতি তোমাকে নিষ্কলঙ্ক জানিয়াও বনে দিয়াছিলেন, জনকনন্দিনি, তুমি তাঁহার প্রতি ক্রোধের লেশমাত্র না করিয়া অনন্যমনে তাঁহারই চরণ ধ্যান করিয়াছ! যখন সভাস্থলে বিশাল জনতার সমক্ষে নিজ পবিত্রতার প্রমাণ দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলে, তখন নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইয়াও বলিয়াছিলে—

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতু মর্হতি ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতু মর্হতি।

হা ধিক্! তুমি নিতান্ত নির্বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছিলে! তুমি বৃদ্ধ বাল্মীকির

তোমার নিন্দা করিবেন। তাঁহারা বলিবেন—"স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।" সুতরাং স্ত্রী স্বামীকে পূজা করিবে কেন? "তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্য কাড়াকাড়ি করে কেন না সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবী করে থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের এক শেষ।" সমাজ-স্থিতির প্রধান সহায় দাম্পত্যপ্রেম ও পতিভক্তির অত্যুন্নত আদর্শকে এইরূপে ক্ষুণ্ণ করার মার্জ্জনা আছে বলিয়া মনে হয় না। কেবলই কি পতিভক্তি? গুরুজন মাত্রেরই প্রতি ভক্তিকে এইরূপে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। যে আদর্শ সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কোটি কোটি লোকের জীবন পথের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইয়া আসিতেছে, স্তনন্ধয়ী হিন্দুবালিকা প্রত্যহ মাতৃস্তন্যের সহিত যে আদর্শকে গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, সেই আদর্শকে এইরূপে নষ্ট করিবার অধিকার নবীন প্রবীণ কাহারও নাই। এই আদর্শ দূরীভূত বা ক্ষুণ্ণ হইলে সমাজ পিশিতপিণ্ডপ্রিয়তার তাণ্ডবনৃত্যে টলটলায়মান হইবে। তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়াছ কি?

এই সকল মহান্ আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা আজই যে হইতেছে তাহা নহে। জগতের ইতিহাসে কখনও কালাপাহাড়ের অভাব হয় নাই। কালাপাহাড়-দিগের চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই বটে; কিন্তু তত্তৎ সমাজের অঙ্গে এমন কলঙ্কের রেখাপাত করিয়া গিয়াছে যে তাহা পরবর্ত্তী শত চেষ্টাতেও অপনীত হইতেছে না।

হে নবীন! বিধিনিষেধের উপর তোমার এত বিরাগ কেন? জগৎ একেবারেই প্রবীণ হইয়া উঠে নাই—সেও একদিন নবীন ছিল, সেও একদিন কোন বিধি নিষেধ না মানিয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ছুটাছুটি করিয়াছে। সংযমকে কাপুরুষতার নামান্তর ভাবিয়া পদদলিত করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে সুখ পায় নাই—শান্তি পায় নাই। তখন আপনি ইচ্ছা করিয়া বিধি নিষেধের লৌহশৃঙ্খল গঠন করিয়া পায়ে পরিয়াছে। সেই দিনই তাহার উন্নতির ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা।

বলিতে পার, বিধিনিষেধের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু তোমাদের অযথা উচ্ছৃঙ্খলতাবৃদ্ধিই ইহার প্রধান কারণ নহে কি? হস্তিপক দুর্ব্বিনীত হস্তীকে প্রয়োজনাতিরিক্ত শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া থাকে। হস্তী বিনীত

হইলে বন্ধনেরও প্রয়োজনাভাব হয়। যতই চেষ্টা কর না কেন, সংসারে প্রবীণের অত্যন্তাভাব কখনও ঘটিবে না। এই অকালমৃত্যুর দেশেও তোমাদিগকে প্রবীণের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে। কালে তোমরাই যে প্রবীণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। তখন যে মুখে "চেঙ্গমুড়ী-কাণী" বলিয়াছ, সেই মুখেই "জয় বিষহরি" বলিবে।

আমি অতিরিক্ত বিধিনিষেধের পক্ষপাতী নহি। এস নবীন প্রবীণ মিলিয়া, একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া, সমাজের মঙ্গলের পক্ষে কোন্‌টা প্রয়োজনীয়, কোন্‌টাই বা অপ্রয়োজনীয়, তাহার বিচার করি। দেশ কাল পাত্র ভেদে ব্যবস্থা প্রবীণই ত করিয়াছে। কিন্তু এ কার্য্যে পরস্পরের সহানুভূতি চাই—অসহিষ্ণুতা একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। তোমরা "টিকি-মঙ্গল" কাব্য লিখিলে আমরা "টেরি মঙ্গল" লিখিব। তাহাতে কলহ বাড়িবে—কাজ হইবে না। আমরা প্রবীণ স্বভাবতঃ কলহপ্রিয় নহি। যতদূর সম্ভব, মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারিলে আমরা অন্য পথ অবলম্বন করি না। শাস্ত্রে ইহার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। শাস্ত্র এক মহান্ উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়াছেন, বলিয়াছেন, যদি প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইতে চাহ, এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উঠিতে থাক। কিন্তু সকলেই সে আদর্শের অনুসরণ করিতে পারিবে না বা চাহিবে না; তাই শাস্ত্র অধিকারিভেদে উন্নতির অন্য বহু পথেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ; যে উঠিতে না চায়, তাহাকে নিশ্চয়ই পড়িতে হইবে, উন্নতি অবনতির মধ্যবর্ত্তী কোন পথ নাই। ভূয়োদর্শন ও গভীর চিন্তার ফলে শাস্ত্র দেখিয়াছেন যে—

প্রাচীন ও নূতন শিক্ষার মধ্যে প্রভেদ।

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

তাই শাস্ত্র ভোগের মধ্যেও সংযমের শিক্ষা দিয়াছেন। এই শিক্ষা ও নূতন শিক্ষার মধ্যে প্রভেদ আমি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সন্দীপচন্দ্র ও বিমল আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতে সুশিক্ষিত। বিমল প্রথমে প্রাচীন পদ্ধতিতেই শিক্ষিতা হইয়াছিল। তাই সে প্রথম প্রথম শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া স্বামী নিখিলেশের পদধূলি লইয়া শয্যাত্যাগ করিত। স্বামী বলিলেন—ছি ছি ও কাজও করে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পূজ্য পূজকের সম্বন্ধ নাই; উভয়েরই যে

সমান অধিকার। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন—তোমাকে বাহির হইতে হইবে, কারণ "তোমাকে বাইরের দরকার থাকৃতে পারে। এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে,—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েচ তাও জাননা।" স্বামীর নিকট এইরূপ শিক্ষা পাইয়া বিমলের চরিত্র গঠিত হইতে লাগিল। এমন সময় স্বামীর বন্ধু সন্দীপচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। সন্দীপচন্দ্রের শিক্ষাও আধুনিক—তাহা এইরূপ—"আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দল্‌ব। সমস্ত গায়ে তা মাখ্‌ব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই, পেতে আমার সঙ্কোচ নেই। যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মত একেবারে পাৎলা সাদা হয়ে গেছে তাদের চীঁ চীঁ গলার ভৎর্সনা আমার কানে পৌছবে না।" কি উৎকট ভোগলালসা। নিখিলেশ স্ত্রীর চরিত্ররক্ষার প্রধান সহায় পতি-ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাহাকে নিতান্ত অবলম্বনহীন করিয়াছিলেন। সন্দীপচন্দ্রের নীতির বালাই একেবারেই ছিল না। তাই পরস্পরের সাক্ষাৎ মাত্র উভয়েই মরিল। বন্ধুর স্ত্রীকে দেখিবামাত্র মাংসলোলুপ মার্জ্জারের ন্যায় সন্দীপ লাফাইয়া উঠিল। সে বলিল—"আমি যে স্পষ্ট দেখ্‌ছি ও আমাকে চায়—ওই ত আমার স্বকীয়া। গাছে ফল বোঁটায় ঝুলে আছে—সেই বোঁটার দাবীকেই চিরকালের বলে মান্‌তে হবে না কি? ওর যত রস, যত মাধুর্য্য সে যে আমার হাতে সম্পূর্ণ খসে পড়বার জন্যেই—সেই খানেই একেবারে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াই ওর সার্থকতা,—সেই ওর ধর্ম্ম, ওর নীতি। আমি সেইখানেই ওকে পেড়ে আনব, ওকে ব্যর্থ হতে দেব না।"

এই চিত্রের সহিত ব্যাধ কালকেতুর চিত্রের তুলনা করুন। অশিক্ষিত ব্যাধ হাটে মাংস বেচিয়া খায়, বনে বাস করে। পুরাণ পাঠ ও কথকতায় যে শিক্ষা সমাজের বাতাসে মিশিয়া আছে, নিশ্বাসের সহিত সেই শিক্ষাই তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার চরিত্র গঠন করিয়াছে। তাহার কুটীরে অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী আসিয়া অযাচিত ভাবে তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিল। মূর্খ ব্যাধ ত বলিল না—"ও আমাকে চায়—ওই ত আমার স্বকীয়া।" সে তাহার মজ্জাগত শিক্ষার প্রেরণায় বলিল—

"ত্যজিয়া ব্যাধের বাস,　　চল বন্ধুজন পাশ,
থাকিতে থাকিতে দিননাথে।
যদি হয় পাপনিশা,　　লোকে ঘোষিবে দুর্ভাষা,
রজনী বঞ্চিলে কার সাথে।"

তাহাতেও যখন কোন ফল ফলিল না, তখন সে মাতৃসম্বোধন. করিয়া নিতান্ত বিরক্তভাবে বলিল—

"বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার।
যে হোক সে হোক, মোর আগে নমস্কার॥
ছাড় এই স্থান মাতা, ছাড় এই স্থান।
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান॥"

এখানে সন্দীপ ও কালকেতু—কাহাকে উচ্চ আসন দিব?

এক শ্রদ্ধাস্পদ লেখক লিখিয়াছেন—"আজ পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্ম্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চল্‌তে থাকৃত তাহলে কি হত? পনেরো আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত।......বঙ্কিম আন্‌লেন সাত সমুদ্র পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমন ঠেকালেন সোণার কাঠি অমনি সেই বিজয়বসন্ত লয়লামজনুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর. রাজকন্যা নড়ে উঠ্‌লেন, চলতি কালের সঙ্গে তাঁর মালা বদল হ'য়ে গেল, তার পর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে?"

বিদেশ হইতে সোণার কাঠি আনিয়া রাজকন্যার চেতনা সঞ্চার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভালই করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেই সাত সমুদ্র পারের বিদেশী রাজপুত্রের সহিত রাজকন্যার যে বিবাহ দেওয়াইয়াছেন। স্ত্রী যে তাহার গোত্র হারাইয়া বিদেশীর সগোত্রা হইয়া গেল। যত গোল যে এই খানে। প্রাচীন শিক্ষার যত দোষই থাকুক, সে শিক্ষায় নারীজাতিকে কেবল মাত্র ভোগের বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয় না—সে শিক্ষায় নারীর মাতৃত্বকেই অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া তুলে। আধুনিক শিক্ষা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকন্যা চিরদিনই বিলাসপর্য্যঙ্কশায়িতা ভোগসন্ধুক্ষিত-হৃদয়া রাজকন্যাই রহি-

লেন—মাতৃত্বের স্বর্ণসিংহাসনে ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিতে সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া তাহার মুখে হৃদয়ক্ষীরোদের পীযূষধারা ঢালিয়া দিবার গৌরব অনুভব করিতে পারিলেন না!

উপসংহার।

আমি আর আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। এই প্রীতিসম্মিলনে বন্ধুবর্গকে লাভ করিয়া হৃদয়ের আবেগে অনেক কথা বলিয়াছি, বিদ্বেষবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া নহে, কেবল মাত্র মাতৃভাষার মঙ্গল কামনায়। যদি অন্যায় বলিয়া থাকি আপনারা ক্ষমা করিবেন। শক্তির দৈন্যে বিষয়গুরুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি নাই। যদি উপযুক্ত সাহিত্য-সমালোচকগণ এ বিষয়ে অসঙ্কোচে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা হইলে আমার এ নীরস শক্তিহীন অভিভাষণের উৎপীড়ন আপনাদিগকে সহ্য করিতে হইত না। আমি প্রবীণ হইলেও, অথবা প্রবীণ বলিয়াই, নবীনকে ভালবাসি—সে যে আমাদেরই পুত্র, কন্যা, জ্ঞাতি, বন্ধু। নবীনের উপরে কি আমার কোন বিদ্বেষ থাকিতে পারে? বিদ্বেষ নাই—দুঃখ আছে। তাই উপসংহারে তাঁহাদেরই কথায় তাঁহাদিগকে বলি—

"গড়ে তোল্‌বার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।"

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা।

বর্ত্তমান-অয়নাংশ-অয়নগতি।

রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় যেমন বলবান্ দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠেন; সে সময়ে রাজার দুর্ব্বলতা নিবন্ধন যেমন বৈধ ও অবৈধ ক্ষমতার প্রভেদ থাকে না; ইদানীং আমাদের বঙ্গদেশে জ্যোতিজ্ঞানাভাবান্ধকারে সেইরূপ যথার্থ বিদ্যা ও বিদ্যাভিমান মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। যে কেহ যদৃচ্ছা জ্যোতিষোপাধি-গ্রহণপূর্ব্বক প্রগল্‌ভতা সহকারে যে কোন কথা বলিতে সাহস করেন। সত্যা-সত্য বিচারের কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় না থাকাতে জনসাধারণের চক্ষে পণ্ডিত ও অভিমানীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, তাঁহারা অধিকারী ও অনধিকারীর কথা তুল্যমূল্য বিবেচনা করেন। সুতরাং সরল বিষয়েরও সমালোচনা, উপেক্ষণীয় কথারও প্রতিবাদ আবশ্যক হয়।

সম্প্রতি একজন লিখিয়াছেন (১) বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অয়নাংশ ভ্রমপূর্ণ ও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা এই পঞ্জিকার বর্ত্তমান, অয়নাংশ, ও অয়নগতি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমতঃ দেখুন, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার প্রত্যেক দিনের গ্রাহ্য যে অয়নাংশ তাহা সেই দিনের প্রত্যেক গ্রহের স্ফুটে যোগ করিলে সেই সেই গ্রহের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত সায়ন স্ফুট পাওয়া যায় (২)। বিজ্ঞান চাহে সত্য; সত্যই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। যেমন ভাবেই গ্রহস্ফুট প্রদান করা হউক না কেন, সেই গ্রহস্ফুট হইতে গগনমার্গস্থ প্রকৃতবস্তু পাওয়া গেলেই, সে গ্রহস্ফুট বিজ্ঞানসম্মত। পাশ্চত্য জ্যোতিষে সুবিধার জন্য সর্ব্বজ্যোতির্ব্বিদের সম্মতি-ক্রমে পাত (৩) বিন্দুকে আরম্ভ বিন্দুরূপে গ্রহণ করা হইলেও অন্য যে কোন্

---

(১) লেখকের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা পরে হইবে।

(২) যে কেহ এই সামান্য অঙ্কপাতের পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে পারেন।

(৩) "By universal agreement the origin on the equator is the first point of Aris," from which longitude is to be measured. R. S. Ball,

বিন্দুকে আরম্ভবিন্দু বলিবার অনুমতি অঙ্কশাস্ত্রে আছে। (১) কেবল এই-টুকু আবশ্যক যে, যে বিন্দুকে আরম্ভবিন্দু বলা হইতেছে তাহার সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকে। এরূপ নির্দ্দেশ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অয়নাংশ সংখ্যা ও বিন্দুর সচলত্ব উল্লেখে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাধৃত অয়নাংশ অনেক পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন। সর্ব্বজনসমাদৃত বেনারস্ কুইনস্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত ৺ বাপুদেব শাস্ত্রীর গণিত অয়নাংশ আমাদের সহিত অভিন্ন। মাননীয় রায় যোগেশ চন্দ্র রায় বাহাদুর তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন "আজ ১৮১৯ শকে প্রত্যক্ষায়নাংশ প্রায় ২২।১৪।" ইনি একজন অসাধারণ বৈজ্ঞানিক, F. R. A. S, অর্থাৎ বিলাতের জ্যোতিষ সভার সদস্য। ইনি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা কহিবেন এমন ধারণা যদি কাহারও থাকে তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়। আবার দেখুন, বম্বে পঞ্চাঙ্গ সংশোধন সভার গ্রাহ্য অয়নাংশ ২২ ও ২৩ শের মধ্যবর্ত্তী। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আহুত হইয়া এই মহতী সভা কয়েকটি প্রশ্ন মীমাংসা করেন। তন্মধ্যে তৃতীয় প্রশ্ন এই—"অয়নাংশ ভিন্ন ভিন্ন মতে ১৮ হইতে ২৩ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। গ্রন্থারম্ভ কালে অয়নাংশ কত স্বীকার করিতে হইবে?" উত্তর "আমাদের গ্রন্থারম্ভ (২) কাল ১৮২৬ শকাব্দ। ইহাতে ২২ অংশের অধিক ও ২৩ অংশের কম অয়নাংশ স্বীকার করিতে হইবে।" অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এই প্রশ্ন ও এই উত্তর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি শুক্রবারের হিতবাদী পত্রিকায় সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছিল; যে কেহ সেই কাগজখানি পাঠ করিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের অয়নাংশ সৌর পুস্তকের উপদিষ্ট দৃষ্টিমূলক। "প্রাক্‌চক্রং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করণাগতে অন্তরাংশৈঃ"। ছায়ার্কাৎ করণাগতে হীনে = when the longitude of the sun as ascertained by calculation, is less than that derived from the shadow. চক্রং অন্তরাংশৈঃ প্রাক্ চলিতং = the zodiac has turned eastward

(১) Transformation of co-ordinates implies this.

(২) বম্বে সভা যাবতীয় উত্থিত প্রশ্ন মীমাংসা করিয়া সেই মীমাংসা অনুযায়ী করণ গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার জন্য দুই সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন।

by the degrees of the difference. বিষয়টি দৃষ্টিমূলক, সুতরাং বিজ্ঞান সম্মত। আকাশে যাহা প্রতীয়মান তাহাই পঞ্জিকাসন্নিবিষ্ট অঙ্ক; দর্শনোৎপন্ন অয়নাংশ ১৩২৩ সালে ২২।৩৩; ইহাই পঞ্জিকার অয়নাংশ।

ভাস্করাচার্য্য, যাঁহার বৈজ্ঞানিকত্ব ইউরোপে স্বীকৃত ও আদৃত, তিনি লিখিয়াছেন "যদা যেঽংশা নিপুণৈরুপলভ্যন্তে তদা স এব ক্রান্তিপাতঃ" অর্থাৎ যখন যত অংশ সুজ্যোতির্ব্বিদ্ উপলব্ধি করিবেন, তখন তাহাই ক্রান্তিপাতের অবস্থান; দৃষ্টি দ্বারা পাত নিরূপণ করাই বিধি। কিরূপে দৃষ্টি করিতে হয়, সে কথাও জ্যোতির্ব্বিদ বিশদ রূপে বুঝাইয়াছেন। "অথ সমায়াং ভূমাবভীষ্টকর্কটকেন বৃত্তমালিখ্য তচ্চক্রকলাঙ্কিতং ধ্রুববিলোকনাদিনা সম্যগ্দিগঙ্কিতঞ্চ কৃত্বা দিঙ্মধ্যে ঋজুঃ সূক্ষ্মঃ কীলকশ্চ নিবেশ্যঃ। প্রাতঃ পশ্চিমভাগস্থো দ্রষ্টা করকলিতাবলম্বকসূত্রেণ তেন চ কীলকেন প্রত্যহং অর্দ্ধোদিতমাদিত্যং বিদ্ধা ত্রিজ্যাবৃত্তস্য প্রাগ্বিভাগে তত্র তত্র চিহ্নানি কুর্য্যাৎ। এবং বিধ্যতা যস্মিন্ দিনে সম্যক্ প্রাচ্যাং রবিরুদিতো দৃষ্টস্তৎ বিষুবদ্দিনম্। তস্মিন্ দিনে গণিতেন স্ফুটো রবিঃ কার্য্যঃ। তস্য রবেঃ মেষাদেশ্চ যদন্তরং তেঽয়নাংশা জ্ঞেয়াঃ।" On level ground draw a circle, cross it with the east-and-west and north-and-south lines, set up a straight thin pin at the centre, and graduate the circumference. Look at the half-risen sun from beyond the western part of the circle in such a manner that the pin may be projected right across the disc. Mark the point on the eastern part of the circumference of your circle, where it is cut by the diameter through your eye. Proceeding like this when you find the sun rising due east you know that he has attained the equinoctial point. Calculate the longitude of the sun of that day and that longitude is অয়নাংশ। (১) এইরূপে নির্দ্দিষ্ট অয়নাংশ ভাস্করের গ্রন্থরচনাকালে একাদশ অংশ ছিল। "যদা বিদৈকাদশ অয়নাংশস্তদা গোলসন্ধিঃ"। কিন্তু সূর্য্য-

(১) These lines are not a translation but a modernised and popularised version of the direction given by Bhaskara.

সিদ্ধান্তের গণনায় তাহা তখন হইত না। কারণ, ভাস্করের গ্রন্থকাল ১০৭২ শক ১০৭২৪২১ = ৬৫১ ; ৬৫১ × ৯ = ৫৮৫৯ ; ৫৮৫৯ ÷ ১০ = ৫৮৫.৯ কলা। অর্থাৎ ৯ অংশ ৪৫.৯ কলা। সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে ১০৭২ শকে ভাস্করের গ্রন্থকালে অয়নাংশ ৯।৪৬ হওয়া উচিত; কিন্তু চাক্ষুষ অয়নাংশ তখন ১১ অংশ বলিয়া জ্যোতির্বিদ, 'সর্ব্বং প্রত্যক্ষবান' ভাস্করাচার্য্য তাহাই লইয়াছিলেন। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাও ভাস্করের পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন।

চতুর্থতঃ, সৌরসিদ্ধান্তিক বর্ষমান লইয়া পঞ্জিকাকে বিজ্ঞানসম্মত রাখিতে হইলে বর্ত্তমান বর্ষে দৃক্‌সিদ্ধ ২২।৩৩ অয়নাংশ লইতে হয়। কেবলমাত্র বিজ্ঞান হিসাবে অন্যথা বর্ষমান গ্রহণ দোষাবহ নহে। যে কোন বর্ষমান অঙ্গীকার করিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট কালান্তে সূর্য্য কোথায় উপস্থিত হইলেন দেখিয়া বা দৃষ্টিমূলক গণনা দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়া আদি বিন্দু নির্দ্দেশ করিলে বৈজ্ঞানিক আপত্তি থাকে না। একথা যেন কেহ মনে না করেন যে চাক্ষুষ বর্ষমান লইতে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনিচ্ছুক; আমরা বলিয়া রাখিতেছি যে, সুযোগ উপস্থিত হইলেই বর্ষমান পরিবর্ত্তন করা হইবে। আপাততঃ পঞ্জিকাখানি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও বঙ্গে সভার মীমাংসাসম্মত করিয়া রাখা হইয়াছে। এ সকল কথা পঞ্জিকার ভূমিকায় আছে। সম্পূর্ণ তত্ত্ব আমরা শীঘ্রই প্রকাশ করিব। সে যাহা হউক, সৌরপুস্তকের বর্ষমান লইয়া অয়নাংশ পরিবর্ত্তন করিলে ও সৌরপুস্তকোৎপন্ন সচল আদিবিন্দু নিরূপণ করিয়া দিলে পঞ্জিকা পাশ্চাত্যমতে দৃক্‌তুল্য হয়। বঙ্গে সভায় সমবেত জ্যোতির্ব্বিদমণ্ডলীও এই হিসাবেই সৌরপুস্তকের বর্ষমান বজায় রাখিয়া ২২ অংশ হইতে ২৩ অংশের মধ্যে অয়নাংশ লইতে আদেশ করিয়াছিলেন। সাধারণের জ্ঞাপনার্থ বঙ্গে সভার নির্দ্দেশ পুনঃ প্রদর্শিত হইল।

প্রথম প্রশ্ন। পঞ্জিকা গণনা করিতে সূর্য্যের বৎসরের পরিমাণ কত দিন, কত দণ্ড, কত পল ইত্যাদি স্বীকার করিতে হইবে? এবং সূর্য্য ভিন্ন অন্য গ্রহের গতির মান (যেমন একদিনের গতি) কিরূপ স্বীকার করিতে হইবে?

উত্তর। সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত বর্ষমান স্বীকার করিতে হইবে। সূর্য্যাতিরিক্ত গ্রহগতিতে, বেধোপলব্ধ বীজ (যন্ত্রাদির দ্বারা গ্রহ গতির পরীক্ষা করিয়া যে অন্তর পাওয়া যায় তাহা) সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। বৎসরে অয়নগতির মান, কি স্বীকার করিতে হইবে?

উত্তর। সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত সূর্য্যের বর্ষপরিমাণ, যাহা স্বীকার করা হইয়াছে, তদনুসারে বর্ষে অয়নগতি কিঞ্চিৎ অধিক ৫৮ বিকলা হইবে। তাহাতেও যদি বেধস্থলে বৈগুণ্য উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে, বেধোপলব্ধ বীজ সংস্কার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

তৃতীয় প্রশ্ন। অয়নাংশ, ভিন্ন ভিন্ন মতে, আঠারো হইতে তেইশ অংশ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। গ্রন্থারম্ভ কালে অয়নাংশ কত স্বীকার করিতে হইবে?

উত্তর। আমাদের গ্রন্থারম্ভ কাল শকাব্দা ১৮২৬, ইহাতে বাইশ অংশের অধিক ও তেইশ অংশের কম অয়নাংশ স্বীকার করিতে হইবে।

উপর্যুক্ত কথার সামান্য পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা বলিয়াছি যে—

(১) বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তোক্ত গ্রহস্ফুটে, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তনির্দ্দিষ্ট অয়নাংশ যোগ করিলে পাশ্চাত্য সায়ন স্ফুট পাওয়া যায়। সুতরাং পঞ্জিকা অবৈজ্ঞানিক নহে।

(২) বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তধৃত অয়নাংশ কাশীর ৺বাপুদেব শাস্ত্রীর নিরূপণ হইতে অভিন্ন।

(৩) রায় বাহাদুর F. R. A. S. যোগেশ বাবু এই অয়নাংশের অনুমোদন করেন।

(৪) দ্বারকা মঠস্থ শ্রীশঙ্করাচার্য্যচালিত বম্বে পঞ্চাঙ্গ সভায় সমবেত দেড়শত পণ্ডিতের অনুমোদিত অয়নাংশই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় গৃহীত।

(৫) ভাস্করাচার্য্যের সন্দর্শন প্রক্রিয়া সমুদ্ভূত অয়নাংশ আমাদের অয়নাংশ হইতে অভিন্ন।

(৬) আমাদের গৃহীত অয়নাংশ সূর্য্য সিদ্ধান্তের দর্শনমূলক আদেশানুযায়ী।

বর্ষমানের ভ্রান্তিতে যে জ্যোতিষিক বিজ্ঞান বিধ্বস্ত হয় না সে বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে ইউরোপীয় বর্ষমানভ্রান্তির সংশোধন সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ নিউকোম সাহেব কি বলেন তাহা পাঠ করা আবশ্যক। ইঁহার মতে এই ভ্রান্তির সংশোধনের আবশ্যক ছিল না। "If there were any object in having the calender and the astronomical years in exact coincidence, the Gregorian year would be accurate enough for all practical purposes during

many centuries. In fact, however, it is difficult to show what practical object is to be attained by seeking for any such coincidence. It is important that summer and winter seed-time and harvest, shall occur at the same time of the year through several successive generations; but it is not of the slightest importance that they should occur at the same time now that they did 5000 years ago, nor would it cause any difficulty to our descendants of 5000 years hence if the equinox should occur in the middle of February, as would be the case should the Julian calender have been continued.

"The change of calendar met with much popular opposition, and it may hereafter be conceded that in this instance the common sense of the people was more nearly right than the wisdom of the learned."

আমাদের দেশে কিংবদন্তী আছে যে সূর্য্যগ্রহে বীজ সংস্কার করিলে বংশলোপ হয়। জ্যোতিষিক তত্ত্ব অনুসারে এই কিংবদন্তী ও নিউকোম্ব সাহেবের কথার ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যে বীজ সংস্কার না করা আর অশুদ্ধ বর্ষমান বজায় রাখা একই কথা। নিউকোম সাহেব যাহা বলিতেছেন সেই বৈজ্ঞানিক সত্য ভারতে বহুপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়া দীর্ঘপ্রচলনফলে কিংবদন্তীর আকার ধারণ করিয়াছে।

তবে আমরা একথা আদৌ বলি না যে, বর্ষমান পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই। অদ্যকার প্রবন্ধে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে সৌরপুস্তকের বর্ষমান গ্রহণ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। অবশ্য অশুদ্ধ বর্ষমানকে শুদ্ধজ্ঞান করিলে দোষ হয়; কিন্তু অশুদ্ধ জানিয়া অশুদ্ধিজনিত আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে কোন বৈজ্ঞানিক দোষ বর্ত্তায় না। এইরূপ কথাই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার ভূমিকায় আছে। কিন্তু ভূমিকার ভাষার অস্পষ্টতা নিবন্ধন একটি ভ্রম জন্মাইতে পারে। যাঁহারা বঙ্গে সভার প্রশ্ন ও সমাধান পাঠ না করিয়া কেবল বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার ভূমিকা পাঠ করিবেন তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, সেই মহতী সভা বর্ষমানাংশ সম্বন্ধে

কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন নাই। ভূমিকায় লেখা আছে "বর্ষমান ও আদিবিন্দু এই বিষয় দুইটি বঙ্গে পঞ্চাঙ্গ সংশোধন সভায় ভবিষ্যতে বিচার্য্য বলিয়া রাখা হইয়াছিল"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বঙ্গে সভা যে সাতটি প্রশ্ন মীমাংসা করেন তন্মধ্যে এই দুইটি ভবিষ্যতে পুনর্বিচার্য্য, এই দুইটি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, অন্যগুলির কখন পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে না। ভাষার দোষে ঠিক একথা বুঝা যায় না; তবে, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অস্পষ্ট ভাষা বঙ্গে সভার উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। বস্তুতঃ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের বর্ষমান, অয়নাংশ ও অয়নগতি বঙ্গে সভার আদেশ অনুযায়ী ও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত।

শ্রীআশুতোষ মিত্র, এম্ এ।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার

বৈজ্ঞানিকবর জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কথা এখন কেবল ভারতবর্ষেই আলোচিত হইতেছে না; পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুধীগণের মুখে ইঁহার কথা শুনা যায়। আজ কাল বিদেশীয় নানা বৈজ্ঞানিক পত্রিকাতেও তাহার আলোচনা হইতেছে। এজন্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারগুলি এখন কেবলমাত্র ভারতবর্ষের সম্পত্তি নয়, ইহা সমগ্র পৃথিবীবাসীর সম্পদ্। আমাদের অতি প্রাচীন পূর্ব্ব-পুরুষগণ জ্যোতিষ ও দর্শনাদি প্রসঙ্গে যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা যেমন সমগ্র সভ্যজাতির জ্ঞানভাণ্ডারকে পূর্ণ করিয়াছে, সেই প্রকারে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারগুলি বিশ্বমানবের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। ইহা আধুনিক ভারতবাসীর অল্প গৌরবের কথা নয়।

জগদীশচন্দ্র প্রায় অষ্টাদশ বৎসর হইতে নানা আবিষ্কার দ্বারা দেশে এবং বিদেশে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি প্রথম গবেষণা আরম্ভ করেন। পাঠক বোধ হয়

অবগত আছেন,—আধুনিক বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই বিশ্বব্যাপী ঈথর নামক একটি পদার্থকে তাপ আলোক এবং বিদ্যুতের উৎপাদক বলিয়া স্বীকার করেন। স্থির জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তাহাতে যেমন তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, ঈথরকে আলোড়িত করিলে তাহাতেও সেই প্রকার তরঙ্গ জন্মে। যখন কোনও দাহ্য পদার্থ পুড়িতে থাকে, তখন তাহার অণুগুলি বিশেষ ভাবে কম্পিত হইয়া পার্শ্বস্থ ঈথরে তরঙ্গের সৃষ্টি করে, এই তরঙ্গই তাপ তরঙ্গ। ইহা কোনও পদার্থ স্পর্শ করিলে তাহাতে তাপের সৃষ্টি করে। প্রজ্বলিত পদার্থের আলোকও অবিকল এই প্রকারে উৎপন্ন হয়। প্রজ্বলিত পদার্থ মাত্রেরই অণুসকল অতি দ্রুতবেগে স্পন্দিত হয়, এবং সেই স্পন্দনে পার্শ্বস্থ ঈথর স্পন্দিত হইয়া তরঙ্গের উৎপত্তি করে,—এই তরঙ্গ তাপোৎপাদক তরঙ্গ অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রতর। এইগুলিই আমাদের চক্ষুতে আসিয়া আঘাত করিলে আমরা আলোক দেখিতে পাই। পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ ঈথরের এই দুইটি কার্য্যের কথাই বিশেষ ভাবে জানিতেন। বিদ্যুৎ যে ঈথরের দীর্ঘতর তরঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা জানা ছিল না। ইহার কিছু কাল পরে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্স্‌ওয়েল সাহেব বিদ্যুৎ ঈথরের তরঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া কাগজ কলমে প্রমাণিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় বিষয়টির প্রত্যক্ষ পরীক্ষা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু এই বৃহৎ আবিষ্কারের প্রত্যেক প্রমাণ গ্রহণের জন্য অধিক কাল প্রতীক্ষা করিতে হয় নাই। জর্ম্মানিতে হার্জ সাহেব এবং ভারতবর্ষে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিষয়টির গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গবেষণার ফল প্রচারিত হইলে বসু মহাশয়ের সুখ্যাতি বিদেশে পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। তিনি কি প্রকারে প্রেসিডেন্সি কলেজে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে তাহার বিচিত্র কার্য্য দেখাইয়া ছিলেন, আমাদের আজও তাহা স্মরণ আছে। তখন তারহীন বার্ত্তাবহনের (Wireless Telegraphy) কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বসু মহাশয়ের এই আবিষ্কার তারহীন বার্ত্তাবহ-যন্ত্র নির্ম্মাণের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল।

প্রাণিদেহের যে সকল কার্য্য ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে অনুভব করা যায় না, প্রাণিতত্ত্ববিদগণ তাহা বিদ্যুৎ-প্রবাহের দ্বারা বুঝিয়া লইতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত

আবিষ্কারের পর জগদীশচন্দ্র বিদ্যুতের সাহায্য লইয়া জড় পদার্থের নানা অবস্থা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সজীব প্রাণীর পেশী বা স্নায়ু উত্তেজিত হইলে, উত্তেজনা-প্রাপ্ত অংশে অতি মৃদু বিদ্যুতের প্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে। উৎকৃষ্ট তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্র (Galvanometer) সাহায্যে এই প্রবাহের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মৃত প্রাণীর দেহে অবিরাম আঘাত দিলে, তাহাতে বিদ্যুৎ জন্মে না। ধাতু লইয়া পরীক্ষা করায় জগদীশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন, প্রাণীর ন্যায় ধাতুও আঘাত-উত্তেজনায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করিয়া "সাড়া" দেয়। তাহারও জীবন মরণ স্ফূর্ত্তি ও ক্লান্তি আছে। এতদ্ব্যতীত বিষপ্রয়োগে প্রাণীর পেশী যেমন মৃতপ্রায় হয় এবং ঔষধ প্রয়োগে পুনর্জ্জীবিত হয়, ধাতুপিণ্ডে বসু মহাশয় জীবনের এই সকল লক্ষণও দেখাইয়াছিলেন। প্রাণীর দেহ শীতে নিষ্ক্রিয় হয়, এবং দেহে বার বার চিমটি কাটিলে তাহা বেদনায় উত্তেজিত হইয়া বিদ্যুতের উৎপত্তি করিতে থাকে। ধাতুপিণ্ডে চিমটি কাটিয়া জগদীশচন্দ্র ঐ প্রকার বেদনাজ্ঞাপক বিদ্যুতের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছিলেন। মাংসপেশীতে পুনঃপুনঃ আঘাত দিলে তাহা অসাড় হইয়া যায়; কিন্তু যদি কিছুকাল আঘাত প্রয়োগ রোধ করা যায়, তবে সেই পেশীই আবার সুস্থ হইয়া পড়ে। বার বার আঘাত প্রয়োগ করিয়া জগদীশচন্দ্র ধাতুপিণ্ডকে প্রাণীর ন্যায়ই অসাড় হইতে দেখিয়াছিলেন, এবং বিশ্রামের অবকাশ দিয়া সেই পরিশ্রান্ত ধাতুকেই আবার প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন।

এই সকল আবিষ্কার সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-সভায় দেখাইলে জগদীশচন্দ্র বিদেশে কি প্রকার সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। আঘাতে সাড়া দেওয়া কেবল জীবেরই জীবনের লক্ষণ বলিয়া যে একটি সংস্কার বৈজ্ঞানিকদিগের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কারে তাহার উচ্ছেদ হইয়াছিল। সকলে বুঝিয়াছিলেন, আঘাত উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া যদি জীবনের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে ধাতুপিণ্ড নির্জীব নয়।

জগদীশচন্দ্র এই সকল আবিষ্কার করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়েন নাই। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের কার্য্যে যে কতকগুলি স্থূল ঐক্য আছে, অতঃপর তাহাই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, জীবন-মরণ,

পুষ্টি-বৃদ্ধি ইত্যাদি কতকগুলি ব্যাপারে প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে যে সকল ঐক্য দেখা যায়; সেগুলিতেই উভয়ের জীবনের কার্য্যের ঐক্য শেষ হইতে পারে না। সৃষ্টির আদিম কালে প্রাণী ও উদ্ভিদের পার্থক্য ছিল না। তখন একমাত্র আদিম জীবকেই বর্ত্তমান কালের বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌দিগের জনক স্বরূপে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই জীবেরই বংশধরগণ বিচিত্র অবস্থায় পড়িয়া বিচিত্র মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আধুনিক প্রাণী ও উদ্ভিদে পরিণত হইয়াছে। বসু মহাশয় মনে করিয়াছিলেন,—জীবের অভিব্যক্তির এই কথাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন-কার্য্যের ঐক্য জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি স্থূল ব্যাপারে শেষ হইতে পারে না; পরীক্ষা করিলে উভয়ের জীবনের কার্য্যের অতি সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলিতেও একতা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা আছে। বসু মহাশয় এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে উভয়ের যে সকল ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা অদ্ভুত। মূক উদ্ভিদ্ মাত্রেই প্রাণীর ন্যায় আঘাতে বেদনা জ্ঞাপন করে, মাদক দ্রব্যে প্রথমে উত্তেজিত এবং পরে অসাড় হয়; পুনঃপুনঃ আঘাতে ধনুষ্টঙ্কার-গ্রস্ত হয়, বিষপ্রয়োগে মৃতপ্রায় হয় ও উপযুক্ত ঔষধে সুস্থ হয়;—প্রাণি-জীবনের এই সকল সূক্ষ্ম ব্যাপার তিনি উদ্ভিদেও প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থে জগদীশচন্দ্র তাঁহার এই সকল আবিষ্কারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আধুনিক উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলী (Nervous System) নাই, এই কথা সুস্পষ্ট প্রচার করিয়া থাকেন। জগদীশচন্দ্র তাঁহার নিজের নির্ম্মিত যন্ত্রের সাহায্যে সম্প্রতি উদ্ভিদের দেহে স্নায়ুজালের অস্তিত্বের অব্যর্থ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উদ্ভিদের জীবনের যে সকল কার্য্যের কারণ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া বৈজ্ঞানিকগণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, জগদীশচন্দ্র সেই সকল ব্যাপারেরও কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারের স্থূল ইতিহাস দিতে "সংহিতার" অনেক স্থান অধিকার করিলাম। এখন আমরা তাঁহার আবিষ্কৃত একটি মাত্র তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া পাঠকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব।

প্রাণিদেহের কতকগুলি পেশী আপনা হইতেই তালে তালে স্পন্দিত হয়। প্রাণিদেহের কার্ডিয়াক্-পেশী (Cardiac Muscles) এই গুণবিশিষ্ট। প্রাণীর

হৃদ্‌পিণ্ডে ইহার প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। জীবন্ত প্রাণীর দেহ হইতে হৃদ্‌পিণ্ড পৃথক্ করিয়া রাখিলে তাহার স্বতঃস্পন্দন রোধ পায়, কিন্তু কোন্ প্রকার উত্তেজক বস্তু প্রয়োগ করিলে তাহা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিয়াও তালে তালে পূর্ব্ববৎ স্পন্দিত হইতে থাকে। এইগুলি সর্ব্বজন-বিদিত পরীক্ষাসিদ্ধ ব্যাপার। হৃদ্‌পিণ্ডের নিয়মিত স্বতঃস্পন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, হৃদ্‌পিণ্ডেই স্নায়ুর কেন্দ্র আছে; ইহাই হৃদ্‌পিণ্ডের পেশীকে তালে তালে স্পন্দিত করে। বলা বাহুল্য হৃদ্‌স্পন্দনের এই ব্যাখ্যাকে কথনই সন্তোষজনক বলা যায় না;—স্নায়ুজালই স্পন্দনের চালক হইলে, স্নায়ু সকল কি প্রকারে হৃদ্‌পিণ্ডকে নিয়মিত স্পন্দিত করে, এই প্রশ্নটি স্বতঃই মনে উদিত হয়। শারীরবিদ্‌গণ ইহার উত্তর দিতে পারেন না।

যাহা হউক, হৃদ্‌স্পন্দন যে বিশেষ স্নায়ুকেন্দ্র দ্বারা চালিত হয় না, তাহার কয়েকটি প্রমাণ আছে। স্নায়ুজাল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ভেকের হৃদ্‌পিণ্ডে উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে তাহা পূর্ব্ববৎ তালে তালে স্পন্দিত হয়। কচ্ছপের হৃদ্‌পিণ্ডে পরীক্ষা করিয়াও এই প্রকার ফল পাওয়া যায়। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, স্থানীয় স্নায়ুর সহিত হৃদ্‌পিণ্ডের নিয়মিত স্পন্দনের বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় কতকগুলি উদ্ভিদে হৃদ্‌-স্পন্দনের ন্যায় নিয়মিত স্পন্দন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং ইহার কারণ আবিষ্কার করিয়া প্রাণীর হৃদ্‌স্পন্দনের কারণ-সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। "বন-চাঁড়াল" গাছ পল্লীবাসী পাঠক অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন। ইহার বৃহৎ পত্রগুলির নিম্নে যে দুইটি ক্ষুদ্রতর পত্র থাকে, তাহা স্বতঃই উঠা-নামা করে। আমরা বাল্যকালে বন-চাঁড়ালের পত্রের নৃত্য দেখিয়া আমোদ পাইতাম। অনেকের বিশ্বাস আছে, এই ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলির নিকটে দাঁড়াইয়া "তুড়ি" দিলে পত্রগুলি "তুড়ির" তালে তালে নৃত্য করে। কিন্তু এই বিশ্বাস অমূলক; বন-চাঁড়ালের পত্র প্রাণীর হৃদ্‌-স্পন্দনের ন্যায় স্বতঃই স্পন্দিত হয়। কিন্তু ইহা সকল সময়েই দেখা যায় না,—বৃদ্ধ বা অতি শিশু বনচাঁড়ালের পত্র নৃত্য করে না। যখন ইহারা বেশ সতেজ থাকে তখনই পত্রের উঠা-নামা প্রত্যক্ষ করা যায়। বনচাঁড়ালের পত্রাবলীর এই স্বতঃস্পন্দন জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহার পরে লজ্জাবতী

জাতীয় আর একপ্রকার উদ্ভিদের (Biophytum) তিনি ঐ প্রকার স্বতঃ স্পন্দন আবিষ্কারও করিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত দুইটি উদ্ভিদ্ লইয়া যে সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। তিনি প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দেখাইয়া উদ্ভিদের স্বতঃস্পন্দন-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন আমরা তাহারই উল্লেখ করিব। জগদীশচন্দ্র নানা পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন, উদ্ভিদ্‌গণ বাহিরের তাপ আলোক মূলস্থিত রসের রাসায়নিক পদার্থাদি হইতে নিয়তই যে শক্তি দেহস্থ করিতেছে, জীবনের কার্য্যে তাহার সকলই ব্যয়িত হয় না; সঞ্চিত শক্তির উদ্বৃত্ত অংশও উদ্ভিদের দেহেই সুপ্তাবস্থায় থাকে। কিন্তু এই শক্তিধারণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। সঞ্চিত শক্তি সেই সীমা লঙ্ঘন করিলে, তাহা আর সুপ্তাবস্থায় দেহে থাকিতে পারে না; তখন উহা পত্রের উঠা-নামা দেখাইয়া ক্ষরিত হইয়া পড়ে ?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বাহিরের শক্তি দেহস্থ রাখা যখন উদ্ভিদের সাধারণ ধর্ম্ম, তখন আম জাম ইত্যাদি বৃক্ষও লজ্জাবতী ও বনচাঁড়ালের ন্যায় দেহে শক্তির সঞ্চয় করে। কিন্তু এই সকল বৃক্ষের পত্র কেন স্বতঃ স্পন্দিত হয় না ? এই প্রশ্নের উত্তরে বসু মহাশয় নানা পরীক্ষার সূচনা করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে, বনচাঁড়াল প্রভৃতি কয়েক জাতীয় উদ্ভিদের পত্রমূলে উঠা-নামার উপযোগী একটি অংশ স্বভাবতঃই জন্মে, কিন্তু আম্রাদি বৃক্ষের পত্রের মূলে সেই স্বাভাবিক ব্যবস্থা থাকে না; এই কারণে প্রচুর শক্তি দেহস্থ করিয়াও এই সকল সাধারণ বৃক্ষ, পত্র স্পন্দিত করিয়া বনচাঁড়ালের মত শক্তির পরিচয় দিতে পারে না।

বনচাঁড়ালের পত্রাবলী অনিয়মিতভাবে উঠা-নামা না করিয়া কি প্রকারে তালে তালে স্পন্দিত হয়, জগদীশচন্দ্র ইহারও রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তিনি নানা পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, মূল বস্তু অর্থাৎ জীব-সামগ্রী (Protoplasm) দিয়া জীবমাত্রেরই দেহ গঠিত, যন্ত্রবৎ কার্য্য দেখাইলেও তাহা যন্ত্রবৎ জড় পদার্থ নয়। জীব-সামগ্রী পত্রের স্পন্দনাদি কার্য্য দেখাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং এই শ্রমজাত অবসাদ দূর করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে তাহার অল্পাধিক সময় যায়। যতক্ষণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে না পায়,

ততক্ষণ প্রবল শক্তি প্রয়োগ শক্তির অধীনে থাকিয়াও জীবসামগ্রী শক্তির কার্য্য দেখাইতে পারে না। জগদীশচন্দ্র এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষাসিদ্ধ ব্যাপারটী অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন বনচাঁড়াল বৃক্ষের পত্রমূলস্থ জীবসামগ্রী স্পন্দিত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে। কাজেই এই অবসাদ দূর করিতে তাহার কালক্ষয় হয়। ইহার পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে তাহা প্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িলে, দেহস্থ সুপ্তশক্তির ক্রিয়ায় আবার একবার পত্রের স্পন্দন দেখায়। এই প্রকারে শ্রম ও বিশ্রামের ধারার সঙ্গে সঙ্গে পত্রের তালে তালে উঠানামা চলে।

জগদীশচন্দ্র এই আবিষ্কারের দ্বারা উদ্ভিদের দেহে শক্তির লীলার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আজকাল সর্ব্বত্র অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। তিনি উদ্ভিদের স্বতঃস্পন্দন সম্বন্ধে গবেষণা এখানেই শেষ করেন নাই। পরবর্ত্তী গবেষণায় তিনি প্রাণীর হৃদ্‌স্পন্দন এবং বৃক্ষের পত্রস্পন্দনের মধ্যে যে ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর।

তাপের ন্যূনাধিক্যে প্রাণীর হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন দেখা যায়। জগদীশচন্দ্র সুকৌশলে বনচাঁড়াল বৃক্ষে তাপ ও শৈত্য বিভিন্ন পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া তাহার পত্রের স্পন্দন অবিকল হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনের অনুরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। বসু মহাশয়ের স্বহস্তনির্ম্মিত সূক্ষ্মযন্ত্রে প্রাণীর হৃদ্‌পিণ্ড এবং বনচাঁড়াল বৃক্ষের পত্র যে সকল রেখাপাত করিয়া স্পন্দনের মাত্রা লিপিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহার ঐক্য দেখিলে সত্যই অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

প্রাণীর হৃদ্‌পিণ্ডে চাপ প্রয়োগ করিলে বা কয়েক জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য দিলে, তাহার স্পন্দন অনিয়মিত হয়। আবার এমন কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য আছে যাহার প্রয়োগে বিকৃত হৃদ্‌পিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দন নিয়মিত হইয়া পড়ে। ভেরাট্রিন্ (Veratrin) এবং বেরিয়ম্ নামক ধাতুঘটিত দ্রব্য হৃদ্‌পিণ্ডের নিয়মিত ক্রিয়া লোপ করে। জগদীশচন্দ্র এই দুইটি রাসায়নিক দ্রব্য বনচাঁড়ালের পত্রে প্রয়োগ করিয়া তাহারও স্পন্দন অনিয়মিত হইতে দেখিয়াছিলেন। তার পরে সুচিকিৎসক যে সকল ঔষধ প্রয়োগে হৃদ্‌যন্ত্রের গতি নিয়মিত করেন, সেই সকল ঔষধ বনচাঁড়াল বৃক্ষে প্রয়োগ করায় তাহারও অনিয়ন্ত্রিত স্পন্দন অল্প-কালের মধ্যে নিয়মিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

ক্ষারজ ও অম্ল-দ্রব্য অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করিলে প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রের বিকার

উপস্থিত হয়। অম্লে (Acid) হৃদয়ের পেশী শিথিল হয়। এবং ইহার জন্য স্পন্দন রোধ প্রাপ্ত হয়। ক্ষার পদার্থের ফল ইহার বিপরীত। ক্ষারে হৃদ্‌পিণ্ড সঙ্কুচিত হয় এবং ইহার ফলে যন্ত্রের কার্য্য লোপ পায়। জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বনচাঁড়াল প্রভৃতি উদ্ভিদের পত্রমূলে অম্ল ও ক্ষার উভয় পদার্থ প্রয়োগে পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে পত্রের স্পন্দন অবিকল হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনের ন্যায় লোপ পাইয়াছিল এবং অম্লে যে সত্যই উদ্ভিদের দেহযন্ত্র শিথিল হয় ও ক্ষারে সঙ্কুচিত হয় তাহাও প্রকাশ পাইয়াছিল।

জগৎপিতা পরমেশ্বর এই অনন্ত মহাবিশ্বকে যে শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তাহা মূলে এক। বিচিত্র আধারে এবং বিচিত্র অবস্থায় পড়িয়া সেই একমাত্র মহাশক্তিই বিচিত্ররূপ গ্রহণ করে। অঙ্গারের অন্তর্নিহিত শক্তিতে রেলের গাড়ী চলে, আবার সেই শক্তিই যন্ত্রবিশেষে পড়িয়া বিদ্যুতের উৎপত্তি করে এবং সেই বিদ্যুৎ আলোক দেয়। বাষ্পীয় শকটের গতি এবং বৈদ্যুতিক দীপের আলোক বিচিত্র ব্যাপার হইলেও মূলে উভয়েই এক নয় কি? জগদীশ-চন্দ্র বসু মহাশয় এই সার সত্য অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন, জড় ধাতুপিণ্ডের কার্য্য এবং প্রাণময় উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর জীবনী শক্তি মূলে একই মহাশক্তির লীলা। অণুপরম্পরার বিন্যাস ধাতুপিণ্ডে অতি সরল, উদ্ভিদ্-দেহে তাহাই কিঞ্চিৎ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। এজন্য বাহিরের শক্তির কার্য্যাবলী ধাতুপিণ্ডে এবং উদ্ভিদে কোন কোন অংশে স্থূলতঃ এক হইলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়েরই শরীরস্থ অণুপরম্পরা বিচিত্ররূপ গ্রহণ করিয়া নানা শারীর যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। উদ্ভিদের শারীর যন্ত্র অপেক্ষা প্রাণীর শারীর যন্ত্র অতীব জটিল। কাজেই উভয়ের জীবনের কার্য্যে স্থূলতঃ ঐক্য থাকিলেও অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার গুলিতে সহজে একতার সন্ধান পাওয়া যায় না; কিন্তু একতার অনুসন্ধান করিলে অনুসন্ধিৎসুকে কখনই বিফলমনোরথ হইতে দেখা যায় না। জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় এই প্রকারেই অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন এবং বৃক্ষ পত্রের নিয়মিত উঠা-নামা যে একই ব্যাপার তাহা ইহারই ফলে আবিষ্কার করিয়াছেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ভোগের অত্যাচার।

শত শত তরঙ্গ সমুদ্র হইতে উঠে আবার সমুদ্রে বিলীন হয়। উঠা, পড়া তরঙ্গের স্বভাব, তবে প্রবাহরূপে তরঙ্গের ধ্বংস নাই। একই সমুদ্র, কখন তরঙ্গ বা আবর্ত্ত, সময়ে ফেন বা বুদ্বুদ। আমরা এই সংসার সমুদ্রের তরঙ্গ বুদ্বুদপ্রায়। কখন উঠি কখন পড়ি, তাই কখন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি নানারূপ ধারণ করি। আবার যেথানকার বস্তু তথায় লীন হই। যে ব্যক্তি সমুদ্রের যে স্থান হইতে বহির্গত হয়, চেষ্টা থাকিলে, ভাল কর্ণধার পাইলে আবার তথায় সে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। তবে পথচেনা চাই। পথ হারাইলে পথের খবর লইতে হয়। সদ্‌গুরুরূপ কর্ণধারের কৃপায় যেখান হইতে প্রবাসে বাহির হইয়াছি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে পারি। চেষ্টা চাই। বিনা যত্নে রত্ন মিলেনা। পুরুষকার ব্যতীত পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। চেষ্টার অভাবে কেবল ঘুরা, ফেরা সার হয়। যদি ঘুরিতে হয়, তবে খুঁটি ধরিয়া ঘোরা ভাল। তাহা হইলে ঘুরের কষ্টের তত অনুভব হইবে না এবং পড়িবার ভয়ও থাকিবে না। আর যদি খুঁটি না ধরিয়া ঘুরিবার বাহাদুরি লইতে যাই, তবে একেবারে অধঃপাতে যাইতে হইবে। সাধের জীবন বিফল হইবে। সেই খুঁটি ত্রিবর্গসাধক ধর্ম্ম। যাই কর, ধর্ম্ম ছাড়িও না।

ভগবান্ যেমন মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নরসিংহ এইরূপ ক্রমোন্নতিতে অবশেষে মনুষ্যশরীর হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদ্রূপ আমরা কৃমি, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি নানাযোনি ভ্রমণ করিয়া শেষে মনুষ্য হইয়াছি। ভোগে পাপের এবং তমোগুণের ক্ষয়ে সত্ত্বগুণের বিকাশ হওয়ায়, প্রাণিসাধারণ প্রবৃত্তিনিচয় এবং ইতরপ্রাণিদুর্লভ মনুষ্যমাত্রবৃত্তিপ্রবৃত্তিপুঞ্জ লইয়া মানবদেহ ধারণ করিয়াছি। দুর্লভ মনুষ্যরূপ শ্রেষ্ঠ প্রাণী হইয়া যদি প্রাণিমাত্রসুলভ কামক্রোধাদির অনুশীলন করিতে করিতে ভবলীলা সম্বরণ করি, তাহা হইলে আর আমাদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই, বরং আবার তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণরূপ অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আমরা অনেক তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কামাদি প্রবৃত্তির অনুশীলনে অভ্যস্ত হইয়াছি। উহা আমাদের অস্থিমজ্জায় জড়িত।—উহা শিখিতে গুরূপদেশ বা সৎসঙ্গ প্রয়োজন হয় না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ

বিকাশিত হওয়ায় উহার অনুশীলন বড়ই প্রীতিকর হয়। অভ্যস্ত কর্ম্মকরার প্রবৃত্তি প্রাণীর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। তাই অধিকাংশ লোক ভোগের জন্য পাশব প্রবৃত্তির পরিচালনায় জীবন মরুভূমি করিতেছে। ক্রোধে অন্ধ হইয়া রক্তনদী প্রবাহিত করিতেছে। লোভপরবশ হইয়া মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছে। স্ত্রীপুত্রের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কত অকার্য্য করিতেছে। মদমাৎসর্য্যের উত্তেজনায় শান্তিময় সংসার অশান্তিময় করিতেছে। এই সব প্রবৃত্তির চরিতার্থতা অন্য প্রাণীতে শোভা পায়। মনুষ্যও পশুপক্ষীর ন্যায় প্রাণী; সুতরাং প্রাণিসুলভ ঐসব প্রবৃত্তি মনুষ্যের সহজাত। সংযমের আওতায় তাহাকে রাখিতে হয়। সৎসঙ্গপ্রসূত ও সদনুশীলনজনিত জ্ঞানের কর্ষণে তাহার মূল উৎপাটন করিয়া মানবধর্ম্মের বীজবপন করিবে। ধরতি ধর্ম্মঃ—যে ধরে রাখে অর্থাৎ যাহার অভাবে বস্তুর সত্তা লোপ হয়, তাহা তাহার ধর্ম্ম; যেমন—ক্ষিতির ধর্ম্ম গন্ধ, তেজের ধর্ম্ম রূপ, সেইরূপ মনুষ্যের অসাধারণ ধর্ম্ম ক্ষমাদি।

ক্ষমা দমো দয়াস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

যেমন গন্ধ না থাকিলে মৃত্তিকা থাকেনা, রূপের অভাবে তেজের অভাব হয়, সেইরূপ যতক্ষণ ক্ষমা, দম ও দয়া প্রভৃতি থাকে, ততক্ষণ প্রাণী মনুষ্যপদবাচ্য। যাহার ক্ষমাদি মনুষ্য ধর্ম্ম নাই, ক্রোধাদি প্রাণীর ধর্ম্ম আছে সে মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়াও লোমলাঙ্গুলহীন মনুষ্যচর্ম্মাচ্ছাদিত প্রাণী বা পশু। অতএব উক্ত হইয়াছে—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভি র্নরাণাং।
ধর্ম্মো হি তেভ্যো হ্যধিকো বিশেষঃ
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

এজন্মে প্রকৃতিতে পশু, জন্মান্তরে আকৃতিতেও পশু হইতে হইবে। অতএব ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে শ্রুতি বলিয়াছেন—

অথ ক্রতুং কুর্ব্বীত।
যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে ভবতি
তথেতঃ প্রেত্য ভবতি॥

অর্থাৎ এজন্মে যেরূপ মনের ভাব ধারণ করিবে, পরজন্মে তদনুরূপ শরীর হইবে। জন্মান্তর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে হয় না। আমাদের সেরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকিলে দেখিতে পাইতাম— ইহ জন্মে আকৃতির আবরণের অন্তরালে অব্যাকৃত পশুর আকৃতি অন্তর্নিহিত আছে। বৃষ দামড়া হইলে স্ত্রী গবীর আকৃতি ও প্রকৃতি লাভ করে। আমরা যদি মনুষ্য হইতে ইচ্ছা করি, তবে পশু প্রবৃত্তির দমন করিতে হইবে। দমগুণ না থাকিলে মনুষ্য হয় না। ক্ষমার অভ্যাসে দমগুণাদির শিক্ষা হয়। তাই মনু প্রথমে ক্ষমার উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষমাই ক্রোধোৎপাটনের অস্ত্র। ক্রোধের কার্য্যের পর লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিতে পাওয়া যায়, লাভ দূরে থাক্ বরং মনুষ্যের মূলধর্ম্ম ক্ষমার অপচয় হইয়াছে। শরীরের, মনের ও বাক্যের দমনে মনুষ্যত্ব উপার্জ্জন করিতে হয়। আমাদের স্বভাব - কাজে খাট হই, তথাপি মুখে খাট হই না। দমের অনুশীলনে এই সকল ভ্রম নিরাকৃত হয়।

অস্তেয় অর্থাৎ পরের দ্রব্য পরিহার। ভোগসুখে নিস্পৃহ হইয়া উপবাস করিলে এই সকল দোষের প্রসার থাকে না। ভবিষ্যপুরাণ বলেন—

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তবাসোগুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ॥

সমস্ত পাপ হইতে নিবৃত্তি ও সর্ব্বভোগ পরিহার করত ক্ষমাদিগুণের সহিত বাসের নাম উপবাস। নিরাহারে অনায়াসে এই সকল সাধিত হয়, বলিয়া তাহাকেও উপবাস বলা হইয়াছে। আজ কাল বৈধকার্য্যে ভবিষ্যপুরাণোক্ত উপবাস করা হয় না বলিয়া সমগ্র ফল প্রত্যক্ষ হয় না। মিথ্যা প্রসঙ্গাদি হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বাক্যের দমন করিতে হয়।

কামক্রোধাদি আমাদের ঘরে বসিয়া শত্রুতা করে। বহিঃশত্রুকে শত্রু বলিয়া চিনিতে পারা যায়। সুতরাং তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া অনায়াসসাধ্য। কিন্তু বিষম শত্রু কামাদি মিত্রের পরিচ্ছদ পরিয়া মনোরঞ্জন করে। মনুষ্য বিশ্বস্তবৎ তাহার অনুসরণ করিয়া মনুষ্য পদবী হইতে স্খলিত হয়। সংযমের প্রসাদে কায়িক, বাচিক ও মানসিক দণ্ড ধারণ করিয়া ত্রিদণ্ডী হইয়া মনুষ্য ব্রাহ্মণ হয়। কেবল ত্রিদণ্ডী যজ্ঞোপবীত ধারণে ব্রাহ্মণ হয় না।

তবে উহা ব্রাহ্মণের চিহ্ন ও স্মারক বলিয়া উহার ধারণ অবশ্যকর্ত্তব্য। ক্ষমাদির অস্তবিধ অর্থ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—

সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং মনসো দমনং দমঃ।
তপঃ স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং শৌচং শঙ্করবর্জ্জিতং।
সন্তোষো বিষয়ত্যাগো হ্রীরকার্য্যনিবর্ত্তনং।
ক্ষমা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা।
জ্ঞানংতত্ত্বার্থসম্বোধঃ শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা।
দয়া ভূতহিতৈষিত্বং ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ॥

অর্থাৎ প্রাণিবৃন্দের হিতসাধনের নাম সত্য। অসত্য ব্যবহারে আপনার বা পরের হিত হয় না। বিষয় হইতে মনের দমনের নাম দম। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালনের নাম তপ। সাঙ্কর্য্যদোষের পরিহারের নাম শৌচ। বিষয় সুখের ত্যাগের নাম সন্তোষ। আত্মা বা মন বিষয়নির্লিপ্ত হইলে স্বতঃই সন্তোষ স্ফুরিত হয়। নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে নিবৃত্তির নাম লজ্জা। সংযোগ বিয়োগাদি দ্বন্দ্বে অবিচলিত ভাব ক্ষমা। হর্ষবিষাদে সমানভাব সরলতা। যথার্থ উপলব্ধির নাম জ্ঞান। মনের শান্তি শম। প্রাণীর হিতকামনা দয়া এবং বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম ধ্যান।

প্রিয়জনের সংযোগ বিয়োগ জনিত সুখদুঃখে আত্মহারা হইতে নাই। আসক্তি সুখদুঃখের কারণ। আসক্তি মায়ায় কার্য্য। মায়ার প্রশ্রয় দিতে নাই। পরগাছা না কাটিলে অযথা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মূলবৃক্ষকে নষ্ট করে। ভেকশাবকের প্রথমে লেজ থাকে; কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে লেজ আপনি খসিয়া পড়ে। সেইরূপ সাধুর ভোগ প্রবৃত্তি বয়োবৃদ্ধির সহিত অন্তর্হিত হয়; কিন্তু অসাধুর প্রকৃতি অন্যবিধ। বানরের লেজ যেমন বয়সের সহিত বাড়ে সেইরূপ বানরপ্রকৃতি নরের ভোগস্পৃহা দিন দিন বাড়ে। বৃদ্ধকালে ভোগের সামর্থ্য থাকে না, তথাপি আকাঙ্ক্ষা, কেন না, সংসারের মায়াও ক্রমেই বাড়ে। এই সময় উহার উচ্ছেদ সাধন না করিলে মৃত্যুর পরও উহার যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়।

সুখই একমাত্র কাম্য বস্তু। সুখের জন্য ছুটাছুটি করি। প্রবল লালসা থাকিলে ভোগ্য বস্তুর উপভোগেও সুখের সাধ মিটে না। তা'ই মনু বলিয়াছেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

যেমন অগ্নি ঘৃতপ্রক্ষেপে নির্ব্বাণ হয় না, বরং বাড়ে, সেইরূপ কাম ভোগে বাড়ে বই, কমে না।

দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের অশান্তির কারণ। আমাদের চক্ষু আকাঙ্ক্ষার তীব্রতেজে ঝলসিত হওয়ায় সুখের প্রকৃত পথ দেখিতে পাই না। সদ্যঃপ্রসূত বৎস যেমন দুগ্ধের আশায় গাভীর অযথাস্থানে ঠোকর মারে, আমরাও সেইরূপ অস্থানে সুখের চেষ্টা করি। সুখ শান্তির নির্ম্মল ছায়ায় বাস করে। আকাঙ্ক্ষায় উপশম শান্তি, সুতরাং সুখলাভ করার ইচ্ছা থাকিলে দুরাকাঙ্ক্ষার পরিহার করা উচিত।

মরীচিকায় জলভ্রম হইলে পিপাসা দূর হয় না। উত্তপ্ত পায়স দধিভ্রমে গলাধঃকৃত হইলে শরীর শীতল হয় না। সেইরূপ সুখের আশায় কামাদির সেবা করিলে সুখের লেশমাত্র হয় না। দূর হইতে আকাশ দেখিলে বোধ হয়, একটু অগ্রসর হইলে আকাশ ধরিব; কিন্তু যতই অগ্রসর হই, আকাশ ততই হটিয়া যায়। সেইরূপ বিষয় সেবার জন্য যতই অগ্রসর হই, সুখ ততই দূর হইতে প্রলোভিত করে। আমরা মায়ার ঘোরে সাধের চিন্তামণি জীবন কাচমূল্যে বিক্রয় করিতে বসিয়াছি।

মরণের পর অপরের সহিত শত্রুতা থাকে না। কিন্তু মরিলেও বিষয় শত্রুর হাত হইতে নিস্তার নাই। প্রত্যুত তৎকালে অতিতীব্রভাবে শত্রুতা আচরণ করে। মরণের পর আমাদের আতিবাহিক দেহ হয়। তথাচ বিষ্ণুপুরাণ—

"তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকম্।
ঊর্দ্ধং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীণ্যস্মাত্তস্য দেহতঃ॥
আতিবাহিকসংজ্ঞোঽসৌ দেহো ভবতি ভার্গব।
কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ॥

জীব মরণের পর আতিবাহিক দেহ ধারণ করে। সেই দেহ তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই তিন ভূতে গঠিত হওয়ায় অতি লঘু হয়; সুতরাং শূন্যে গমনাগমন করিতে পারে। তাহার গতিও অতি দ্রুত হয়। মনুষ্যের মধ্যে কেবল পাপীর

আতিবাহিক দেহ হয়। অন্য প্রাণীর আতিবাহিকদেহ হয় না। এই দেহ পূরকপিণ্ডে নষ্ট হইয়া প্রেতদেহে পরিণত হয়। তথাচ

"পূরকেণৈব পিণ্ডেন দেহো নিষ্পাদ্যতে যতঃ।"

যাহার পূরকপিণ্ড দেওয়া হয় না, ভোগে তাহার আতিবাহিক দেহ নষ্ট হয়। যেমন যে রোগ মারাত্মক নয়, ভোগে তাহার উপশম হয়, তবে ঔষধ প্রয়োগে শীঘ্র ফল হয়, এই মাত্র ভেদ। অনন্তর বলিতেছেন—

"প্রেতাপিণ্ডৈস্তথাদত্তৈ দেঁহমাপ্নোতি ভার্গব।
প্রেতদেহ ইতি প্রোক্তঃ ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ॥
প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণম্।
শ্মাশানিভ্যো দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যতে॥
তত্রাস্য যাতনা ঘোরা শীতবাতাতপোদ্ভবাঃ।
ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ॥
পূর্ণে সম্বৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে।
ততঃ স নরকং যাতি স্বর্গং বা স্বেন কর্ম্মণা॥

(আতিবাহিক দেহের পর প্রেতদেহ হয়) ক্রমশঃ প্রেতপিণ্ড প্রদান করিলে অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণানন্তর শ্রাদ্ধ করিলে প্রেতদেহের নাশ হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহার প্রেতপিণ্ড প্রদত্ত না হয়, শ্মশানবাসী দেবের হাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই (অতি দীর্ঘকাল পরে ভোগে তাহার প্রেতদেহ নষ্ট হয়) প্রেতদেহে শীত, বাত, আতপ-জনিত অতি ঘোর যাতনা হয়। বান্ধবেরা পূর্ণ সম্বৎসরে সপিণ্ডীকরণ করিলে ভোগদেহ হয়। তাহার পর তাহার সুকৃতি থাকে স্বর্গে যায়, দুষ্কৃতি থাকে নরকে যায়। আবার ভোগে স্বর্গ নরক ভোগের পুণ্যের ও পাপের ক্ষয় হইলে আবার মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। অতএব উক্ত হইয়াছে—

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকমাবিশন্তি" ইত্যাদি শ্রুতি।

এইরূপ স্বর্গ নরকভোগের পর মানুষ প্রবৃত্তির অনুরূপ ভাল মন্দ জন্ম পরিগ্রহ করে।

আমাদের চর্ম্মময় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ দর্শনাদি ক্রিয়ার যন্ত্রস্বরূপ। যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূরের বস্তু দেখিতে পাই, সেইরূপ চক্ষুরাদি যন্ত্রের যোগে অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী রূপাদি দর্শন করি। প্রকৃত চক্ষু লিঙ্গশরীরে জীবাত্মার

সহিত অবিনাভাবে অবস্থিত। স্থূলদেহে চর্ম্মচক্ষুর সহায়তা ব্যতীত উপলব্ধি হয় না। আতিবাহিক দেহে বাহ্য চক্ষু থাকে না। বাহ্যচক্ষুর আবরণ না থাকায় সূক্ষ্ম শরীরস্থিত প্রকৃত চক্ষু অবাধে সমস্ত দেখিতে পায়। মরণের পর আতিবাহিক-দেহাদিতেও সব দেখিতে শুনিতে পাওয়া যায়। তৎকালেও অভ্যাস দোষ যায় না—ভোগীর ভোগস্পৃহা প্রবল থাকে, অথচ উপকরণের অভাবে ভোগ করিবার ক্ষমতা থাকে না। রজ্জুবদ্ধ ঔদরিকের সম্মুখে উপাদেয় অন্নব্যঞ্জন থাকিলে তাহার যেরূপ মর্ম্মন্তুদ যাতনা হয়, সেইরূপ মায়াবদ্ধ মৃতজীবের যাতনা ভুক্ত-ভোগী ব্যতীত অন্যের ধারণাতীত। মরণেও দুরাকাঙ্ক্ষার নিষ্পীড়ন হইতে তাহার নিস্তার নাই। দুধ কলা দিয়া চিরকাল কালসাপিনী পুষিলে তাহার দংশন যাতনায় ছটফট্ করিতে হয়। তাই বলি দিন থাকিতে দুরাকাঙ্ক্ষা কমাইলে ভাল হয়। একেবারে কমাইতে না পার, অহিফেনসেবীর ন্যায় একটু একটু করিয়া মাত্রা কমাইলে হয়। দীর্ঘকাল অধিক পরিমাণে মদ খাইলে যেমন মদাত্যয় রোগ হয়। মদ না খাইলেও নেশা ছোটে না। তখন নেশার সুখটুকু বড় থাকে না, কিন্তু দুঃখটুকু পুরমাত্রায় থাকে, সেইরূপ দীর্ঘকাল বিষয়ভোগে ডুবিয়া থাকায় ভোগের নেশা আর কমে না। সে এখন রোগে পরিণত হয়! ভোগ্যবস্তু থাকুক বা না থাকুক, নেশার ঝোঁকে মানসিক ভোগের অভাব হয় না। নিদ্রায়ও অব্যাহতি নাই। যুবক দুষ্টস্বপ্নের অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়। তা'ই বলি—এস, আমরা সময় থাকিতে সতর্ক হই। ঐ দেখ কাল করালবদন ব্যাদান করিয়া কবলিত করিতে আসিতেছে, এখনও দেহ কিছু স্থির আছে। আতিবাহিক দেহে আরও অস্থির হইতে হইবে।

মানুষ যেখানেই মরুক, মরণের পর মায়ার ঘোরে আতিবাহিকদেহে বাটী আসিয়া উপস্থিত হয়। বাটী আসিয়া দেখে—অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা মাতা কাঁদিতেছে। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যা আর্ত্তনাদ করিতেছে। অনাথ বালকেরা ধূলায় ধূসরিত হইয়া চারিদিক শূন্য দেখিতেছে। চিরসঞ্চিত সাধের অর্থ শত্রুর হস্তগত হইতেছে। সুত ও পিত্রাদির শোকে দিশেহারা হইতেছে। স্থূলদেহের অভাবে তাহার প্রতীকারের শক্তি নাই। তাহার বুক ফাটিতেছে। কিন্তু মুখ ফুটাইতে পারিতেছে না। কি কষ্ট! রোগ হইয়াছে, ঔষধ আছে, অনুপান নাই। পিপাসা আছে, জল সম্মুখে, কিন্তু জলপানের শক্তি নাই। ক্ষুধা আছে,

অন্ন আছে, ভোগসামর্থ্য নাই। কম আপ্‌সোসের বিষয় নয়! এই অনুতাপে মৃতের হৃদয় তুষানলে দগ্ধ হয়, বজ্রময়যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হয়। আসঙ্গলিপ্সা এই অনর্থের মূল। যাহার গতিশক্তি আছে, তাহাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিলে যেরূপ কষ্ট, যাহার বাক্‌শক্তি আছে, তাহার মুখে কাপড় দিয়া বাগ্‌রোধ করিলে যেরূপ কষ্ট, চক্ষুষ্মানের দৃষ্টি রুদ্ধ করিলে যেরূপ কষ্ট, মৃতব্যক্তির কষ্ট ততোধিক—বর্ণনাতীত। যথাসময়ে ঔষধ সেবন না করিলে রোগের যন্ত্রণা অনিবার্য্য। ভুগিতে আসিয়াছ ভুগিয়া যাও; কিন্তু দিন থাকিতে প্রতীকার করিলে ভাল হয়। ইহা কেবল হিন্দুশাস্ত্রের কল্পিত অলীকবস্তু নয়। যাঁহারা লিঙ্গশরীর চালনা করিতে পারেন, এখনও তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। জীবিত পিতা, মাতা, ভার্য্যা ও পুত্রগণের অপেক্ষা বিষয়মূঢ় মৃতের কষ্ট অতিতীব্র। সে নিজে এ কষ্টের কারণ। সে যদি মনুষ্যদেহে আসঙ্গলিপ্সা বিসর্জ্জন দিতে পারিত, ভোগস্পৃহা কমাইতে পারিত, সৎপ্রবৃত্তি সঞ্চিত করিয়া দিব্যজ্ঞানলাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার আতিবাহিক প্রভৃতি দেহ ধারণ করিতে হইত না, দুদিনের পিতা, মাতা, ভার্য্যার নিকট ঘুরিতে হইত না এবং তাহাদের অসার তুচ্ছ শোকে অভিভূত হইতে হইত না। তা'ই বলি দমবলে ইহকালে কামাদি প্রবৃত্তি সংযত না করিতে পারিলে পরপারেও শান্তি নাই।

উপসংহারে বক্তব্য—ভোগাসক্তচিত্ত আত্মীয় মরিলে তাহার জন্য স্নেহবশতঃ শোক করা নিস্বার্থস্নেহের কার্য্য নয়। শোক করিলে মৃতের দুঃখের বৃদ্ধি বই, হ্রাস হয় না। অতএব ঋষিরা বলেন—

"শ্লেষ্মাশ্রু বান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতোভুঙ্‌ক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়া কার্য্যা বিধানতঃ॥

অর্থাৎ মরণের পর আত্মীয়বর্গ কাঁদিতে কাঁদিতে যে শ্লেষ্মাশ্রু মোচন করে, মৃতব্যক্তি বাধ্য হইয়া তাহা ভোজন করে। অতএব রোদন করা উচিত নয়, তাহার পারলৌকিক কার্য্য যথাবিধি করাই উচিত।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

সুধাভোজন-জাতক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যে সময়ের কথা হইতেছে তখন শক্রের আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী ও হ্রী নাম্নী চারিটী কন্যা ছিলেন। তাঁহারা একদিন প্রচুর দিব্যমাল্যগন্ধাদি লইয়া জলকেলি করিবার অভিপ্রায়ে অনবতপ্ত হ্রদে * গমন করিয়াছিলেন। ক্রীড়া শেষ হইলে শক্রকন্যাগণ মনঃশিলাতলে উপবেশন করিলেন। সেই মনঃশিলার শিখরদেশে কাঞ্চনগুহায় নারদ নামক এক ব্রাহ্মণ তপস্বী বাস করিতেন। তিনি ঐ দিন দিবাভাগে বিশ্রাম করিবার জন্য ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে নন্দনবনস্থ চিত্রকূট শিলায় এক লতাকুঞ্জে ক্লান্তি অপনোদন পূর্ব্বক ফিরিবার সময় আতপনিবারণার্থ একটী পারিচ্ছত্রক পুষ্প † লইয়া আসিতেছিলেন। শক্রকন্যাচতুষ্টয় নারদের হস্তে ঐ দিব্য পুষ্প দর্শন করিয়া উহা যাচ্ঞা করিলেন।

[অনন্তর শাস্তা সমস্ত বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য
নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—]

নগকুলরাজ গন্ধমাদনের সুরম্য শিখরদেশ;
কেলি করে সেথা শক্রকন্যাগণ পরি মনোহর বেশ।
এমন সময়ে দেখা দিলা আসি, দেবতরু-শাখা ল'য়ে,
তাপস নারদ, গমন যাঁহার অবাধ ভুবনত্রয়ে।

সে তরুর ফুল সৌরভে অতুল, ত্রিদশগণের ভোগ্য,
অতি রমণীয় দেবরাজপ্রিয়; অন্যে নয় তার যোগ্য।
দানব মানব, সাধ্য কারো নাই করে তাহা দরশন;
সেবিতে তাহারে না পারে অপরে, বিনা স্বর্গবাসিগণ।

---

* বৌদ্ধ সাহিত্যে হিমালয়স্থ সপ্তমহাসরোবরের অন্যতম।

† সংস্কৃতসাহিত্যের 'পারিজাত'। মর্ত্ত্যলোকে এই পুষ্প এদেশে 'পাল্‌টে মান্দার' নামে পরিচিত।

আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী, হ্রী, কনকবরণী, রূপে গুণে অদ্বিতীয়া,
নারদের হাতে দেখি পারিজাতে উঠে সবে দাঁড়াইয়া।
পারিজাত পেলে পরিপাটি বেশ হবে এই ভাবি মনে,
মুনির নিকট করিল প্রার্থনা একবাক্যে চারিজনে—
"অপর কাহাকে দিবে বলি মনে নাহি যদি অভিপ্রায়,
দয়া করি তবে দেবপুষ্প ওই, দাও, তব পড়ি পায়।
বাসব যেমন, তুমিও তেমন সদয় মোদের প্রতি
সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হইবে তোমার, শুন ওহে মহামতি।"
দেবকন্যাগণ করিলা প্রার্থনা পুষ্প পাইবার আশে;
শুনি তাহা মুনি, ঘটাতে কলহ, কহিলা মধুর ভাষে :—
"নাহি প্রয়োজন *এ পুষ্পে আমার, করিলাম আমি দান;
শ্রেষ্ঠা যেইজন তোমাদের মাঝে করুক সে পরিধান।"

নারদের কথা শুনিয়া দেবকন্যারা বলিলেন :—

তুমি মহামুনি সর্ব্ব জ্ঞানের আধার,
যাকে ইচ্ছা তাকে দাও করিয়া বিচার।
তুমি যাকে দিবে পুষ্প, শুন মহাশয়,
তাহাকেই শ্রেষ্ঠ মানি লইব নিশ্চয়।

নারদ উত্তর করিলেন :—

এ যুকতি ভাল নহে লো সুন্দরি,
আমি কেন এই ভার ঘাড়ে করি?
ঘটাব কলহ, হইয়া ব্রাহ্মণ!
আমা হতে ইহা হবেনা কখন। †

---

* মূলে 'সুগাস্তে' আছে। চারিজনের সঙ্গে আলাপ করিলেও নারদ একজনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তর দিতেছেন এইরূপ বুঝিতে হইবে।

† অতএব দেখা যাইতেছে এই জাতকের রচনাসময়েও নারদের কলহঘটনপ্রিয়তা জনসাধারণের সুবিদিত ছিল।

যাও পিতৃপাশে—ভূতনাথ যিনি,
মীমাংসা ইহার করিবেন তিনি।
কে উচ্চ, কে নীচ, জানা আছে তাঁর;
তাঁরি কাছে হবে উচিত বিচার।

[অনন্তর শান্তা বলিলেন :—]

যশের গৌরবে মত্তা দেব-কন্যাগণ,
নারদের বাক্য শুনি রুষিল তখন।
সহস্রলোচন শক্র বিরাজেন যথা,
ত্বরা করি সবে গিয়া উতরিল তথা।
বলে, "পিতঃ, কোন্ কন্যা, বল ত তোমার,
গুণগ্রামে শ্রেষ্ঠপদ করে অধিকার?"

শক্রকন্যাগণ এই প্রশ্ন করিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

উৎকণ্ঠিত মনে কৃতাঞ্জলি পুটে উত্তরের প্রতীক্ষায়
দাঁড়াইয়া আছে কন্যাচতুষ্টয় দেখি পুরন্দর † কয়,—
তুল্য রূপে গুণে তোমরা সকলে, তারতম্য কিছু নাই;
করিল বপন * এ কলহ বীজ, কে, বল শুনিতে চাই।

দেবকন্যাগণ উত্তর দিলেন :—

সানুদেশে গিরিবর গন্ধমাদনের
পাইলাম দেখা মোরা ঋষি নারদের,
সত্যের নির্ণয়ে যাঁর অসীম শকতি,
সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে অব্যাহত গতি;
করেন ধর্ম্মের পথে সদা বিচরণ,
বলিলেন আমা সবে সেই তপোধন :—
"জানিবারে যদি চাও তোমাদের মাঝে
কে উত্তম, কে অধম, পুছ দেবরাজে।"

---

* পালি সাহিত্যে শক্রই ভূতনাথ বা ভূতপতি নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন।

† বৌদ্ধমতে, মাঘবজন্মে পুরীতে পুরীতে দান করিয়াছিলেন বলিয়া শক্রের এক নাম পুরন্দর।

শক্র ভাবিলেন, "ইহারা চারি জনেই আমার কন্যা। আমি যদি বলি যে ইহাদের মধ্যে অমুক গুণগ্রামে শ্রেষ্ঠা, তাহা হইলে অপর তিন জন ক্রুদ্ধা হইবে। অতএব এ ক্ষেত্রে কোন মীমাংসা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ইহাদিগকে হিমালয়ে কৌশিক তাপসের নিকট প্রেরণ করা যাউক; তিনিই ইহাদের প্রশ্নের সদুত্তর দিবেন।" ইহা স্থির করিয়া শক্র বলিলেন, "দেখ, তোমাদের এই বিবাদ আমি মীমাংসা করিতে পারিব না; হিমালয়ে কৌশিক নামক এক তাপস আছেন। আমি তাঁহার নিকট আমার ভোজ্য সুধা প্রেরণ করিতেছি। তিনি অন্যকে না দিয়া কোন দ্রব্য উদরস্থ করেন না; দিবার সময়ও বিচার করিয়া যাহারা গুণবান্ তাহাদিগকেই দিয়া থাকেন। অতএব তোমাদের মধ্যে যে তাঁহার হস্ত হইতে এই সুধার অংশ পাইবে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হইবে। হে বরাঙ্গি—

মহারণ্যমাঝে তপস্যানিরত আছেন সে মহামুনি;
না দিয়া অপরে কণামাত্র কভু নাহি খান অন্ন তিনি।
উপযুক্ত পাত্রে দান দেন তিনি, অপাত্রে কভু না পায়;
দিবেন যাহারে, তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ বলি মেন তায়।"

দুহিতাদিগকে এইরূপে কৌশিকের নিকট প্রেরণ করিয়া শক্র মাতলিকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকেও ঐ আশ্রমে পাঠাইবার অভিপ্রায়ে বলিলেন :—

"হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বেতে
গঙ্গাতীরে দেখিবে যে তাপস পুঙ্গবে,
কৌশিক তাঁহার নাম; অতি ক্লিষ্ট তিনি
অভাব বশতঃ খাদ্য আর পানীয়ের।
অতএব যাও তুমি, হে দেব-সারথে,
দাও গিয়া সুধা তাঁরে ভোজনের তরে।"

আজ্ঞা পেয়ে দেবেন্দ্রের মাতলি তখনি
সহস্রতুরগযুক্ত স্যন্দনে আরোহি
ছুটিলা অশনিবেগে, উত্তরিলা গিয়া
মুনির আশ্রম যেথা, দিলা সুধাভাণ্ড
হস্তে তাঁর; দেখা কিন্তু নাহি দিলা নিজে।

কৌশিক সুধাভাণ্ড গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই বলিলেন,—

অগ্নি-পরিচর্য্যা করে আসিনু কুটীর-দ্বারে তিমিরারি করিতে বন্দন,
হেনকালে কে গো তুমি, বল দেখি কোন্ দ্রব্য হস্তে মোর করিলা অর্পণ?
এ নহে অন্যের কাজ, বিনা শক্র দেবরাজ এত দয়া কে দেখায় আর?
সর্ব্বভূতে অতিক্রমি বিরাজ করেন তিনি; ধন্য তাঁর মহিমা অপার!
ধবল শঙ্খের মত; সুগন্ধে মানস হরে, হেন দ্রব্য পূর্ব্বে দেখি নাই;
পবিত্র অদ্ভুত ইহা, দেখিলে জুড়ায় আঁখি, তুলনা ইহার কোথা পাই?
কোন্ দেব বল তুমি, অধমেরে দয়া করি করিয়াছ হেথা আগমন?
নয়ন-মানস-হর কিবা অপরূপ দ্রব্য হস্তে মোর করিলা অর্পণ?

মাতলি উত্তর দিলেন:—

মহেন্দ্রের আজ্ঞা পেয়ে আসিয়াছি হেথা ধেয়ে,
তব তরে, মহামুনে, সুধাভাণ্ড লয়ে;
ভোজ্যোত্তম এই সুধা খেয়ে নাশ কর ক্ষুধা
মাতলি আমার নাম; খাও নিঃসংশয়ে।
রসোত্তম সুধা এই ভোজন করিবে যেই
দ্বাদশ দুঃখের তার হবে নিবারণ:—
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অসন্তোষ, বৈরভাব, ক্রোধদোষ,
গাত্রব্যথা, ক্লান্তি, তথা কলহে মগন,
শীতে গ্রীষ্মে কাতরতা, চরিত্রের পিশুনতা,
আলস্য—এসব হতে পাবে অব্যাহতি।
সত্বর ভোজন কর, নিঃসংশয়ে, মুনিবর,
শক্রদত্ত সুধা, যার এমন শকতি।

ইহা শুনিয়া কৌশিক নিজে যে ব্রত পালন করেন তাহা বুঝাইবার জন্য মাতলিকে বলিলেন:—

একাকী ভোজন অসঙ্গত ভাবি ব্রতোত্তম এই করেছি গ্রহণ—
ভোজ্য অংশ কিছু না দিয়া অপরে করিব না কভু গলাধঃকরণ।
একাকী ভোজন অতি অবিধেয়, শুনিয়াছি আমি আর্য্যগণ মুখে;
না দিয়া অপরে আহার যে করে, বঞ্চিত সে পাপী সকল সুখে।

মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, অপরকে অংশ না দিয়া ভোজন করিলে এমন কি দোষ হয় দেখিয়াছেন যে আপনি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?"

কৌশিক বলিলেন,

নারীহন্তা, ব্যভিচারী, মিত্রজনদ্রোহকারী,
দানকুণ্ঠ, সাধুদ্বেষী এই পঞ্চজন
নরাধম বলি খ্যাত; তাই এই দান ব্রত,
শুন হে, মাতলে, আমি করেছি গ্রহণ।
স্ত্রী-পুরুষ এ বিচার নাহিক দানে আমার
পণ্ডিতেরা একবাক্য দানগুণগানে;
করে দান অকাতরে, এ হেন বদান্য নরে
শুচি, সত্যপ্রিয় বলি সকলে বাখানে।

ইহা শুনিয়া মাতলি দৃশ্যমান শরীর পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন্। সেই সময়ে দেবকন্যারাও এক এক জন কৌশিকের এক এক দিকে অবস্থিতি করিলেন। শ্রী রহিলেন পূর্ব্বদিকে, আশা দক্ষিণদিকে, শ্রদ্ধা পশ্চিমদিকে এবং হ্রী উত্তরদিকে।

[এই ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—]

আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী, হ্রী, কনকবরণী
বাসবনন্দিনী এ চারি ভগিনী
পিতার আদেশে সুধার কারণ
কৌশিক-আশ্রমে দিলা দরশন।

চতুরা চারিটী বাসবদুহিতা
চৌদিকে মুনির হ'ল অবস্থিতা;
উজলি চৌদিক্ অগ্নিশিখাপ্রায়
দিব্যদেহযষ্টি-রূপের ছটায়।
নেহারি সে রূপ পরমপুলকে
জিজ্ঞাসে তাপস মাতলি-সম্মুখে :—

"পূরব আকাশে শুকতারা * সমা,
কনক-লতিকা কিংবা নিরুপমা
দেববালা তুমি, নাম তব বল,
নিবৃত্ত আমার কর কৌতূহল।"

"পূজ্যা নরকুলে শ্রী আমার নাম
পুণ্যাত্মায় সদা করি অধিষ্ঠান;
সুধাদানে মোর পূর মনস্কাম
এসেছি করিতে হেথা সুধাপান।

সুখী করিবারে চাই আমি যারে
সর্ব্ব মনোরথ লভিতে সে পারে;
হোতৃশ্রেষ্ঠ তুমি, মহাপ্রজ্ঞাবান্,
শ্রীকে তুষ্ট কর করি সুধাদান।

ইহা শুনিয়া কৌশিক বলিলেন :—

সর্ব্বশিল্পপটু, পরম বিদ্বান্,
পৌরুষসম্পন্ন, অতি বুদ্ধিমান্,
সেও শ্রী তোমার দয়া নাহি পায়,
অশেষ কেলেশে দিন তার যায়।
এই কি তোমার সাধু ব্যবহার?
ন্যায়ান্যায়ে তব এই কি বিচার?

দেখি পুনঃ কোন অলস মানব,
উদরসর্ব্বস্ব, নীচকুলোদ্ভব,
অতি কদাকার, প্রসাদে তোমার
ভুঞ্জে নানা সুখ, ঐশ্বর্য্য অপার।
কুলীন সন্তান দৈন্যের জ্বালায়
দাস হ'য়ে তার(ই) চরণে লুঠায়।

ওষধীতারস্বরা। চন্দ্র ওষধিপতি; কিন্তু ওষধিতারা বলিলে শুকতারা বুঝায়।

পণ্ডিত জনের পীড়নে নিরতা,
মূঢ়া, পাত্রাপাত্র-জ্ঞান-বিরহিতা ;
ন্যায়ের মর্য্যাদা নাহি তব ঠাঁই ;
তুষিতে তোমায় ইচ্ছা মোর নাই।
সুধা দূরে থাক্—উদক, আসন,
তাও, শ্রি, তোমায় দিবনা কখন।

এই কথা শুনিয়া শ্রী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর কৌশিক আশাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

চিত্রাঙ্গদা শুভ্রদতী কে তুমি, কল্যাণি,
বিমৃষ্ট-কনকময়কুণ্ডল-ধারিণি ?
দিব্য শ্বেত দুকূলেতে গাত্র আচ্ছাদিত ;
কর্ণিকার, অশোকের মঞ্জরী লোহিত
কর্ণদ্বয়ে দুলে তব, যাহার ছটায়
কুশাগ্নির উজ্জ্বলতা মানে পরাজয়।

যেরূপ ব্যাধের বাণে অবিদ্ধা হরিণী
চকিত নয়নে চায়, বনবিহারিণী,
সেই মত দৃষ্টি তব, নাহি কি লো ভয়
একাকী ভ্রমিতে বনে ? কে তব সহায় ?

আশা উত্তর দিলেন :—

সহায় এখানে মোর নাহি কোন জন,
অমরাবতীতে * আমি লভেছি জনম,
আশা নাম ধরি আমি, সুধার আশায়
এসেছি তোমার পাশে, শুন মহাশয়।

---

* মূলে 'মসক্কসার' পদ আছে। পালি টীকাকারের মতে ইহার অর্থ 'ত্রয়স্ত্রিংশভবন।" সংস্কৃতে কিন্তু এই শব্দের কোন প্রতিরূপ দেখা যায় না। সংস্কৃত মসারক শব্দ ইন্দ্রনীল মণিবাচক। ইহা হইতেই কি "মসারক শালা" বা 'মসক্কসার' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ?

তাপস কৌশিক তুমি মহাপ্রজ্ঞাবান্
সুধাদান করি রাখ আমার সম্মান।

ইহা শুনিয়া কৌশিক বলিলেন, "শুনিতে পাই যে তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর, কেবল তাহারই আশা পূরণ করিয়া তাহার মনে আবার নব নব আশার উৎপাদন করিয়া থাক, কিন্তু যাহাকে অনুগ্রহ কর না, তাহাকে নিয়ত নৈরাশ্যের মধ্যেই রাখ। শেষোক্ত ব্যক্তির কার্য্যসাফল্য সম্পূর্ণরূপে তোমার সাহায্যনিরপেক্ষ।" এই ভাবের বিশদীকরণার্থ তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

আশার ছলনে ধন অন্বেষণে বণিক্ বিদেশে যায়,
পণ্যপরিপূর্ণ পোতে আরোহিয়া সাগর তরিতে ধায়।
দৈবযোগে যদি মগ্ন হয় তরী, ধনে প্রাণে মারা যায়,
বাঁচিলেও প্রাণে, চিরদিন তরে ধননাশে দুঃখ পায়।

আশার ছলনে কৃষীবলগণ ক্ষেত্রের কর্ষণ করে,
বপে বীজ তাহে, করে কত শ্রম শস্য লভিবার তরে।
কিন্তু কোন ঈতি দেখা দেয় যদি, তা হ'লে ত রক্ষা নাই;
ক্ষেত্র ছারখার; অভাগা চাষার সে আশায় পড়ে ছাই।

আশার ছলনে বিলাসী মানব তুষিতে প্রভুর মন
যায় যুদ্ধক্ষেত্রে পৌরুষ দেখাতে, বল একি বিড়ম্বন?
শত্রুর বিক্রমে ছত্রভঙ্গ শেষে; যে যাহার প্রাণ লয়ে
কপর্দ্দক মাত্র না লভি সমরে পলায় চৌদিকে ভয়ে।

আশার ছলনে স্বর্গলাভ হেতু জ্ঞাতিজনে করি দান
ধন ধান্য আদি সর্ব্বস্ব, বিষয়ী সংসার ছাড়িয়া যান;
কঠোর তপস্যা করি দীর্ঘকাল মার্গ-দোষহেতু, হায়,
অশেষ দুর্গতি লভেন তাঁহারা দেহের হইলে ক্ষয়।
কুহকিনি আশে, ত্যজ সুধা-আশা; তোমার মতন যাঁরা,
সুধা ত দুর্লভ, আসন-উদক তাহাও না পায় তারা।

ঈতি—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, শলভ, শুকপক্ষী ও প্রত্যাসন্ন রাজা এই ষড়্বিধ শস্যনাশক।

এইরূপে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া আশাও তন্মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কৌশিক শ্রদ্ধার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন:—

কে তুমি গো যশস্বিনী আলোকিত করি রূপে
অকল্যাণকরী * দিকে লয়েছ আশ্রয় ?
কাঞ্চনবল্লীর সম দেহ তব অনুপম ;
কোন্ দেবী তুমি মোরে বল ত নিশ্চয়।

ইহার উত্তরে শ্রদ্ধা বলিলেন :—

নরকুলে পূজ্যা আমি শ্রদ্ধা এই নাম ধরি ;
পুণ্যাত্ম-হৃদয় সদা আমার সদন ;
সুধা পাইবার তরে ঘটিয়াছে যে বিবাদ,
তাহার(ই) মীমাংসা হেতু হেথা আগমন।
পরম পণ্ডিত তুমি মহাপ্রজ্ঞাবান্,
সুধা দিয়ে রক্ষা কর আমার সম্মান।

এই পরিচয় পাইয়া কৌশিক বলিলেন, "মনুষ্যেরা যার তার কথায় শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া তদনুসারে পরিচালিত হয় ; এই নিমিত্ত তাহারা কর্ত্তব্য অপেক্ষা অকর্ত্তব্যেরই অধিকতর অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই সমস্ত পাপাচারের জন্য তোমাকেই দায়ী বলিতে হয়।

শ্রদ্ধাবশে হয় লোকে কখনও বা পুণ্যব্রত
দাতা, দান্ত, ত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় ;
কভু বা কুপথে চলি পরপরীবাদ করে,
হয় মিথ্যাবাদী, চৌর্য্যপ্রিয়।
গৃহে পতিব্রতা নারী, সুশীলা, সদ্বংশজাতা,
রূপে গুণে সদৃশী ভর্ত্তার ;
তাহার সংসর্গে থাকি, বাসনা সংযত করি
পারে লোক করিতে সংসার।

---

* পশ্চিমদিকে।

কিন্তু বারবনিতার ছলনায় ভুলি নর
হেন ভার্য্যা ত্যাগ করি যায়;
মিটিবে দুখের তৃষ্ণা পঙ্কিল সলিলপানে
এই মূর্খ ভাবে হায়, হায়!
তোমার প্রভাবে, শ্রদ্ধে, পরদারসেবী নর,
পুণ্যত্যাগী, পাপপরায়ণ;
সুধা ত দূরের কথা, জলাসন পাইবারে
অযোগ্য, যে তোমার মতন।

এই কথা শুনিয়া শ্রদ্ধাও অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কৌশিক উত্তর দিকে অবস্থিতা শ্রী-দেবীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিয়া দুইটী গাথা বলিলেন:—

কে তুমি কল্যাণি, হেথা, দেবতা কিংবা অপ্সরী,
দাঁড়ায়ে রয়েছ রূপে চৌদিক্ উজ্জ্বল করি?
প্রভাতে অরুণোদয়ে বিচিত্রবসনপরা
স্মিতমুখে শোভে যেন প্রাচীদিক্ মনোহরা;

কিংবা যেন দগ্ধক্ষেত্রে নবজাতা 'কালালতা'
দুলে যবে বায়ুভরে লোহিতপত্রমণ্ডিতা?
নয়নে সলজ্জদৃষ্টি দেখি তব হয় মনে
কি যেন বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ বরাননে।
অথচ নীরব তুমি রহিয়াছ কি কারণ?
বল সত্য কি নিমিত্ত হেথা তব আগমন?

শ্রী দুইটী গাথা বলিয়া উত্তর দিলেন:—

মানবকুলের পূজ্যা শ্রী দেবী আমার নাম,
স্পর্শে মম পূত সদা পুণ্যাত্ম-হৃদয়-ধাম।

কালা, কলম্বীলতা (?)—ipomoea coerulia (নীলকলমী)। ইহার বীজ 'কালাদানা' নামে পরিচিত। কিন্তু প্রথমে ইহার পত্রগুলি কি লোহিতবর্ণ থাকে? বসন্তের শেষে বা গ্রীষ্মারম্ভে কৃষকেরা বনভূমির বা ক্ষেত্রের শুষ্ক উদ্ভিদ্ কাণ্ডাদি অগ্নিপ্রয়োগে দগ্ধ করিয়া থাকে। বর্ষাকালে তাহা আবার নবকিশলয়মণ্ডিত তৃণলতাদিতে সুশোভিত হয়।

বিবাদ সুধার হেতু; তাহার মীমাংসা তরে
এসেছি তোমার কাছে; কিন্তু বাক্য নাহি সরে।
নিতান্ত অক্ষমা সুধা যাচিতে তোমার ঠাঁই;
যাচ ঞা সমা রমণীর নির্লজ্জতা আর নাই।

ইহার উত্তরে কৌশিক দুইটী গাথা বলিলেন:—

সুগাত্রে, তোমার এই সুধা পাইবার
ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ আছে পূর্ণ অধিকার।
কে বলে চাহিলে শুধু সুধা পাওয়া যায়?
অযাচিত নিমন্ত্রণ করিনু তোমায়।
পাবে পূজা, খাবে সুধা কুটীরে আমার,
যার জন্য আগমন এখানে তোমার।
অতএব, হে তন্বঙ্গি, করি নিমন্ত্রণ;
কর এ আশ্রমে অদ্য আতিথ্য গ্রহণ।
নানারসযুক্ত খাদ্যে করিব অর্চ্চনা,
আস্বাদে যাহার তৃপ্ত হইবে রসনা।
যে সুধার তরে তব হেথা আগমন।
তাহাও পাইবে অগ্রে করিতে ভোজন।
তব ভোজনান্তে যাহা অবশিষ্ট রবে,
তাহাতেই এ দীনের ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে।'

[ইহার পর শাস্তার মুখ হইতে কয়েকটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা বাহির হইল:—]

দিব্য দ্যুতিবিমণ্ডিতা হ্রীদেবী তখন
কৌশিকের নিমন্ত্রণে প্রবেশি আশ্রমে
অপরূপ শোভা তার হেরিলা নয়নে।
বিরাজে বিটপিরাজী চৌদিকে সেখানে
ফলভারে অবনত; কুল কুল ধ্বনি
শ্রবণে অমৃত বর্ষে গিরিতটিনীর।
শত শত সাধুজনসমাগমে সদা
পবিত্র সে ভূমি; পাপ নাহি পশে সেথা

ঘনসন্নিবিষ্ট তথা নানা তরুলতা—
পিয়াল, পনস, আম্র, অশোক, কিংশুক,
শাল, সৌভাঞ্জন লোধ্র, পদ্ম, কেকা, ভঙ্গা,
তিলক, বরুণ, জম্বু, অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ,
মধুক, বেদিশ, বেণু, তিন্দুক, পাটলি,
সুবর্ণক, সিন্ধুবার, কেতকী, কদলী,
ভূর্জ্জ, মুচকুন্দ আদি কত, কি বলিব ?—*
ফলে, ফুলে, সৌরভেতে, অথবা ছায়ায়,
যাহার যেমন শক্তি, বিতরি সর্ব্বস্ব,
পালে অকাতরে এরা পরহিতব্রত।
কোথাও রয়েছে ক্ষেত্র বিবিধ শস্যের—
শ্যামক, নীবার, ধান্য, তণ্ডুল, চীনক, †
মুদ্গ, মাষ আদি, তথা শিম্বী নানারূপ। ‡

---

* এই গাথাগুলিতে বনৌষধিবর্গ প্রভৃতির নামের ঘটা দেখিয়া ইংরাজী অনুবাদক হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমারও অবস্থা প্রায় তদ্রূপ। অতিকষ্টে যে গুলির স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিয়াছি এবং সে গুলির পারি নাই তাহা নিম্নে দেখাইতেছি। 'সৌভাঞ্জন' আমাদের সজ্‌না। 'পদ্ম' দ্বারা এখানে স্থলপদ্ম বুঝিতে হইবে। 'কেকা' কি বুঝিতে পারি নাই। 'ভঙ্গা' ভাঙ্গ বা 'সিদ্ধি'। তিলক একপ্রকার পুষ্পগুল্ম। শ্বেত ও লোহিত পুষ্পভেদে ইহা নাকি দুই প্রকার; কিন্তু ইহা আমি দেখি নাই। 'বেদিশ' কি জানি না। 'সুবর্ণক' সোন্দালি। সংস্কৃতে ইহার নামান্তর বাতঘাতক বা কর্ণিকার; মূলে ইহার পরিবর্ত্তে 'উদ্দালক' শব্দ আছে। পাটলির বর্ণনা অভিজ্ঞানশকুন্তলেও পড়িয়াছি; ইহা বোধ হয় পারুল। 'তিন্দুক' আমাদের গাব (গালব শব্দজ কি?) বা আবলুস এবং 'সিন্ধুবার' নিষিন্দা। মূল গাথায় 'অশোক' বৃক্ষের উল্লেখ নাই; উহা আমি জোর করিয়া বসাইয়াছি। কদলীর উল্লেখ পরবর্ত্তী গাথায় আছে; সঙ্গতির অনুরোধে ইহাকেও আমি স্থানচ্যুত করিয়াছি। মূলে মোচ ও কদলী পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে। পালি টীকাকার বলেন "মোচ" = অষ্টিকদলী, অর্থাৎ বীচে কলা। ইহা হইতেই কি আমাদের মুখরোচক 'মোচার' প্রথম উদ্ভব ?

† শ্যামক—'শামা' ঘাসের বীজ। লোকে ইহার চাষ করিয়া থাকে। নীবার—বনজ ধান্য। 'তণ্ডুলা—নিকুণ্ডকথুসা সয়ংজাত তণ্ডুলসীসানি' অর্থাৎ ইহা কাণ্ড হইতে তণ্ডুল রূপেই বহির্গত হয়; কুঁড়া মাখে গায়, ইহাতে তুষও থাকে না। চীনক—চীনা। ইহা প্রথমে চীনদেশ হইতে আসিয়াছিল কি? সংস্কৃতে কিন্তু ইহার নাম ব্রীহিভেদ।

‡ মূলে হরেণুকা এই পদ আছে। পালি সাহিত্যে 'হরেণু' বলিলে মুগ, মাষ, তিল, কুলথ, অলাবু ও কুষ্মাণ্ড বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় 'হরেণু' শব্দে এক প্রকার মটর বুঝায়।

শোভিছে উত্তর ভাগে দর্পণের মত
সর্ব্বত্র অভগ্নতট দীর্ঘ সরোবর ;
শৈবলাদিবিবর্জ্জিত বারিরাশি তার
দেখিলে জুড়ায় চক্ষু।
বিচরে নির্ভয়ে
মনের আনন্দে সেথা পাঠীন, শকুল,
শতবক্র, কাকমৎস্য, সবক্র, রোহিত,
কাকিণ্ণা, আলিগর্গর, শৃঙ্গী আদি মৎস্য ;
না ঘটে অভাব কভু খাদ্যের তাদের। *

প্রচুর খাদ্যের লোভে রহে তার তটে
বিহঙ্গম নানা জাতি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে—
হংস, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, ময়ূর, কোকিল,
বহুচিত্রা, জীবজীব, উৎক্রোশ ইত্যাদি। †
করিতে সে বারিপান
আসে যায় অবিরত কত শত পশু—
কেহ হিংস্র, কেহ শান্ত ; মাহাত্ম্য এমনি
কিন্তু সেই আশ্রমের, ছাড়িয়াছে এরা
বৈরভাব স্বাভাবিক ; করে বারিপান
সিংহ-ব্যাঘ্র-তরক্ষু-ভল্লুক কোক-পার্শ্বে
গণ্ডার, গবয়, অশ্ব, মহিষ, বরাহ,
বিড়াল, শশক, আর মৃগ নানা জাতি—
রোহিত, এণক, রুরু, গোকর্ণ, কর্ণিকা, ‡
কদলী প্রভৃতি। পুণ্যক্ষেত্র সে আশ্রম ;

---

* পাঠীন—বোয়াইল মাছ। শকুল—শোল মাছ ; শৃঙ্গী—শিঙ্গী মাছ। শতবক্র প্রভৃতি কতকগুলি মাছ যে কি প্রকার তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

† পক্ষিপর্য্যায়ের মূলে ময়ূর ও শিখণ্ডী উভয় শব্দই দেখা যায়। টীকাকার 'শিখণ্ডী' শব্দে শিখাযুক্ত পক্ষী বুঝিয়াছেন।

‡ কোক—নেকড়ে। রোহিত, এণক, কদলী প্রভৃতি নানাজাতীয় হরিণ।

বিচিত্র কুসুমাকীর্ণ শিলাপট্টাসীন-
দ্বিজকণ্ঠ-সমুত্থিত শাস্ত্রবাক্যে সদা
মুখরিত ; সাধুশীল দ্বিজগণ ছাড়া
না করে বসতি সেথা অন্য কোন জন।

ভগবান্ এইরূপে কৌশিকের আশ্রমের বর্ণনা করিলেন। অনন্তর-হ্রীদেবীর আশ্রমপ্রবেশাদি বলিতে লাগিলেন :—

তরুর হরিৎশাখে ভর দিয়া চারুগাত্রী কুটীরের দ্বারদেশে যায় ;
নীল মহামেঘ হ'তে ছুটিয়া বিজলী যেন অবতীর্ণা হইল ধরায়।
কুশময় খট্টা এক, শীর্ষ প্রান্তে সুবিন্যস্ত সুগন্ধি উশীর* শোভে যার,
আনি তাহা মহামুনি অজীনে আস্তৃত করি আসনার্থ দিলেন তাঁহার।
বলিলেন যুড়ি কর হ্রীদেবীকে অতঃপর, "কর ভদ্রে আসন গ্রহণ ;
তব পাদস্পর্শে দেবি, পবিত্র আশ্রম এই ; অদ্য মোর সফল জীবন।
হ্রীদেবী বসেন সুখে ; জটাজীনধারীমুনি ছুটি সরোবরে চলি যান ;
আনিয়া কমলপত্র, গড়ি পূত পুট তাহে জলসহ করে সুধাদান।
দুই হস্তে লয়ে তাহা, পাইয়া পরমা তুষ্টি, হ্রীদেবী মধুর ভাষে কয়
জটাধর মুনিবরে, "তব দয়াহেতু আজ, লভিলাম পূজা আর জয়।
আজ্ঞা দেহ এবে তুমি, যাইব ত্রিদশভূমি, যথা শক্র সহস্রলোচন
পথপানে চেয়ে মোর রয়েছেন, মহামুনে, বিলম্ব দেখিয়া এতক্ষণ।"
লভি আজ্ঞা কৌশিকের, যশের আশায় মত্তা হ্রীদেবী স্বরগে চলি যান ;
বলে, পিতঃ, এই সুধা দেখ লভিয়াছি আমি, জয় মোরে কর এবে দান।"
শক্র আদি দেবগণ, কৃতাঞ্জলিপুটে সবে সম্মান তখন করে তাঁর ;
দেবকন্যা কুলে শ্রেষ্ঠা হ্রীদেবী হইলা তুষ্টা লভি পূজা স্থানে সবাকার।
বিচিত্র নব আসন তাঁর তরে নিয়োজন দিলা করি সহস্রলোচন ;
দেবতা, মানব সবে দাঁড়ায়ে তাহার পাশে করে হ্রীর মহিমা কীর্ত্তন।

শক্র এইরূপে হ্রীর যথোচিত সম্মান করিয়া ভাবিতে লাগিলেন "কৌশিক

* উশীর—বীরণ-মূল বা খস্ খস্ (বীরণ = বেণা)।

অন্য কাহাকেও না দিয়া স্ত্রীকেই যে সুধা দিলেন ইহার অর্থ কি?" প্রকৃত কারণ জানিবার নিমিত্ত তিনি মাতলিকে পুনর্ব্বার তাঁহার আশ্রমে পাঠাইলেন।

[এই ভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—]

পুনর্ব্বার মাতলিকে করি সম্বোধন
সহস্রলোচন ইন্দ্র বলেন বচন:—
যাও কৌশিকের পাশে, শুধাও তাঁহায়
স্ত্রী একা কি হেতু লাভ করিল সুধায়।

মাতলি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বৈজয়ন্তরথে আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন।

[শাস্তা নিম্নলিখিত গাথা গুলি দ্বারা রথের সৌন্দর্য্য এবং মাতলির কৌশিকাশ্রম-গমন বর্ণনা করিলেন :—]

দেবরথ সুসজ্জিত করিলা মাতলি,
আরোহিলে যায় নাহি হয় অনুভূত
পথক্লান্তি কোনরূপ, অগ্নিশিখা-সমা
উজ্জ্বল তাহার ভাতি নয়ন ঝলসে।
বিচিত্র যেমন রথ, সাজসজ্জাগুলি
তেমনি বিচিত্র সব; ঈষা খানি তার
জাম্বূনদ বিনির্ম্মিত; * পশু পক্ষীকত
খচিত সর্ব্বাঙ্গে তার বিবিধ রতনে।

হেথা নৃত্যশীল শিখী; পুচ্ছে জ্বলে, দেখ,
বিবিধবরণ-মণিবিন্যাস-রচিত
চন্দ্রক-সহস্র অই; নীলকণ্ঠ হোথা;
গো, ব্যাঘ্র, বারণ, দ্বীপী, মৃগ নানাজাতি—

* বিশুদ্ধ, রক্তাভ সুবর্ণ। হিমালয়ে যে মহাজম্বুবৃক্ষ আছে (যাহার নাম হইতে জম্বুদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে) তাহার ফল নদীর জলে পড়িয়া ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া স্বর্ণরেণুতে পরিণত হয় এই বিশ্বাসে বিশুদ্ধ সুবর্ণের 'জাম্বূনদ' নাম হইয়াছে।

বৈদূর্য্যে রচিত কেহ, কেহ মরকতে।
সকলি জীবন্ত বলি ভ্রম হয় মনে—
যেন সবে নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বিসহ
রণে মত্ত হইয়াছে অরণ্যের মাঝে।

তরুণ বারণ সম অতি বীর্য্যবান্
সহস্র হরিৎ অশ্ব যুজিলা সে রথে
মাতলি সারথিবর ; চামীকর-জালে
আচ্ছাদিত উরঃস্থল প্রত্যেক অশ্বের,
কর্ণে দুলে কনকের মালা সুশোভন।
এমনি শিক্ষিত তারা, দৃঢ়বদ্ধ কভু
যোত্র দ্বারা করিবারে নাহি প্রয়োজন ;
বায়ুবেগে ছুটি যায় শব্দমাত্র শুনি।

এ হেন স্যন্দনশ্রেষ্ঠে আরোহি মাতলি
চলিলা ছুটিয়া, নিনাদিয়া দশদিক্
গম্ভীর নির্ঘোষে ; কাঁপে নভঃস্থল,
কাঁপে শৈল, বনস্পতি ; সসাগরা ধরা
সে নিনাদ-অভিঘাতে উঠিল কাঁপিয়া।

উতরি অশনিবেগে আশ্রমে মাতলি,
আবরি একটী অংশ প্রাবরে নিজের
নিবেদন সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে
করেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠে,* † যিনি দেবোপম,
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বৃদ্ধ জ্ঞানবলে—

---

* বৌদ্ধভিক্ষুরা উত্তরীয় বস্ত্র পরিধানকালে একটী অংস আবৃত এবং একটী অংস অনাবৃত রাখেন। ইহার বিপরীতাচরণ অবিনয়ের চিহ্ন।

† কৌশিককে ব্রাহ্মণ বলা হইল কেন? তিনি ত শ্রেষ্ঠি (সম্ভবতঃ বৈশ্য) কুলে জন্মিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে ধর্ম্মপদ (ব্রাহ্মণবগগো) দ্রষ্টব্যঃ—ব্রাহ্মণ যোনিজকে আমি ব্রাহ্মণ বলি না; যিনি ধ্যানশীল, আসক্তি-রহিত, একাকী অবস্থিত, কর্ত্তব্যানুষ্ঠায়ী, পাপবিমুক্ত ও অর্হত্বপ্রাপ্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি···ইত্যাদি।

"দূত আমি, মহামুনে, শুনাই তোমারে
বাসবের আজ্ঞা যাহা ; শুধান দেবেন্দ্র :—
আশা, শ্রদ্ধা, শ্রীকে তুমি লঙ্ঘন করিয়া
কি হেতু করিলা দান সুধা হ্রী দেবীরে ?"

মাতলির প্রশ্ন শুনিয়া কৌশিক বলিলেন :—

শ্রীদেবীর দেখি পক্ষপাত দোষ ; শ্রদ্ধার স্থিরত্ব নাই ;
আশা কুহকিনী সর্ব্বস্বনাশিনী ; দেই নাই সুধা তাই।
আর্য্যগুণ যত বিরাজ সতত করে হ্রীদেবীর মনে ;
তিনি ভিন্ন সুধা পাইবার যোগ্যা নাহি কেহ ত্রিভুবনে।

অনন্তর তিনি হ্রী দেবীর গুণবর্ণনা করিতে লাগিলেন:—

রক্ষিতা পিতার গৃহে অদত্তা কুমারী,
বিধবা, সধবা কিংবা যত আছে নারী—
পর পুরুষের সনে মিলন বাসনা মনে
হয় যদি ইহাদের, হ্রী আসি তখন
পাপ পথে বিচরিতে করে নিবারণ।

ভীষণ সমরে যবে শক্তিশরাঘাতে
কেহ মরে, কেহ ভয়ে যায় পলাইতে,
হ্রী দেবীর শুনি বাণী, নিজপ্রাণ তুচ্ছ মানি
পলায়নপর যারা যুঝে পুনর্ব্বার,
শত্রু হস্ত হতে করে নেতার উদ্ধার।

বেলা যথা রুদ্ধ করে বেগ সাগরের,
হ্রী তথা রোধেন দুষ্টবৃত্তি পাপীদের।
সর্ব্বলোকে আর্য্যগণ হ্রীকে পূজে অনুক্ষণ
বলিও একথা ইন্দ্রে, হে দেবসারথি ;
হ্রীর অনুগ্রহে সবে লভেন সুমতি।

ইহা শুনিয়া মাতলি বলিলেন:—

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, প্রজাপতি, * কে বল, তাপস,
দিয়াছেন তব মনে এহেন বিশ্বাস ;
হ্রীদেবী মহেন্দ্রাত্মজা, শুন তপোধন,
সুরলোকে শ্রেষ্ঠা বলি অর্চ্চিতা এখন।

মাতলির বাক্য শেষ হইতে না হইতেই কৌশিকের কর্ম্মফল-জনিত দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। তখন মাতলি বলিলেন, "কৌশিক, তোমার আয়ুঃ ফুরাইয়াছে ; দানধর্ম্মেরও অবসান হইয়াছে। এখন আর মনুষ্যলোকের সহিত তোমার সম্পর্ক কি ? চল, আমরা দেবলোকে যাই।"

কৌশিককে দেবলোকে লইয়া যাইবার অভিলাষে মাতলি বলিলেন:—

এই প্রিয় রথ মম আরোহণ করি
এখনই চল স্বর্গে মর্ত্ত্য পরিহরি।
মহেন্দ্র সগোত্র তব ; ইচ্ছা তাঁর মনে,
তুমি গিয়া বাস কর তাঁহার ভবনে।
উঠ, মুনে, যাই মোরা ইন্দ্রের সভায় ;
অদ্যই সকলে সেথা দেখিবে তোমায়।

মাতলির সহিত এইরূপ আলাপ করিতেছেন এমন সময়ে কৌশিক ঔপপাতিক দেবপুত্রে পরিণত হইয়া দিব্যরথে আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং মাতলি তাঁহাকে শক্রের নিকট লইয়া গেলেন। কৌশিককে দেখিয়া শক্র পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, নিজের কন্যা হ্রীকে তাঁহার অগ্রমহিষীর পদে নিয়োজিত করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে অপার ঐশ্বর্য্য দান করিলেন।

"মহাপুরুষদিগের কৃতকার্য্যের এইরূপই বিশুদ্ধীভাব হইয়া থাকে" ইহা বলিয়া শাস্তা নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা জাতক সমাপ্ত করিলেন:—

* ব্রহ্মা ও প্রজাপতি সংস্কৃত ভাষায় একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম। কিন্তু পালি গ্রন্থকার এখানে ইঁহাদিগকে পৃথক্ কল্পনা করিয়াছেন।

† ঔপপাতিক অর্থাৎ শুক্রশোণিত-সংযোগ বিনা জাত। মর্ত্ত্যলোকে জীবোৎপত্তির জন্য স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম আবশ্যক ; কিন্তু দেবলোকে সূক্ষ্মশরীরী হইবার জন্য ইহার প্রয়োজন নাই।

পুণ্যাত্মার কর্ম্মে ফলে শুভফল, সদা দেখিবারে পাই ;
সুকৃতির ফল হয় চিরস্থায়ী ; বিনাশ তাহার নাই।
কৌশিক আশ্রমে হ্রীকে সুধাদান দেখিল যে সব জন,
দিব্য জ্ঞান লভি ইন্দ্রের সভায় দেহান্তে করে গমন।]

[এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্ব এক জন্মেও আমি এই দানকুণ্ঠ কৃপণাধমের মতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম।"

সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিল হ্রীদেবতা ; এই দানবীর ভিক্ষু ছিল কৌশিক ; অনিরুদ্ধ ছিল পঞ্চশিখ ; আনন্দ ছিল মাতলি ; কাশ্যপ ছিল সূর্য্য ; মৌদ্‌গল্যায়ন ছিল চন্দ্র ; শারীপুত্র ছিল নারদ ; এবং আমি ছিলাম শক্র।]

☞ যে সকল জাতক উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, সুধাভোজনজাতক তাহাদের অন্যতম। কৌশিককর্ত্তৃক সুধাদান-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে শ্রীবৎসরাজার নিকট প্রাধান্যপ্রার্থী শনি ও লক্ষ্মীর, কিংবা ট্রয়রাজপুত্র পারিশের সম্মুখে সুবর্ণ-সেব ফলপ্রার্থিণী গ্রীকদেবীত্রয়ের আবির্ভাব-কাহিনী মনে পড়ে। কিন্তু গ্রীক্‌দেবীরা রূপগর্ব্বিতা ও রূপজিগীষা-পরায়ণা ; বৌদ্ধদেবীচতুষ্টয় রূপসম্বন্ধে উদাসীনা, গুণপ্রাধান্যের জন্যই লালায়িতা। হিন্দু ও গ্রীক্ আখ্যায়িকায় পরাজিত দেবতারা বিচারপতিদিগের চিরশত্রু হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নানারূপ অনিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধদেবীগণ এরূপ নীচতা প্রদর্শন করেন নাই।

আশার সুন্দরীমূর্ত্তি দেখা যায় গ্রীক্ পুরাণবর্ণিত প্যাণ্ডোরার আখ্যায়িকায়। জাতককার আশাকে কুহকিনী মায়াবিনী ভাবেই দেখিয়াছেন।

হ্রী লজ্জা—পাপকার্য্যের বাধাদায়িনী বিবেকচহিতা—"ছি ! আমি মানুষ হইয়া মানুষের অকার্য্যসাধনে অগ্রসর হইতেছি" এই বুদ্ধি, বিবেচনা বা আত্মধিক্‌কৃতি।

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ, এম্,এ।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায়, ৫ম খণ্ড।]   ১৩২৩ সাল, জ্যৈষ্ঠ।   [২য় সংখ্যা

সুশ্রুতের আদর্শ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২) শারীর স্থান।

সুশ্রুতের আদর্শ সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে, বিগত ১৩২২ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের সাহিত্য-সংহিতা পত্রিকায়, সূত্রস্থানের কতিপয় অধ্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি, যে গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে আদর্শগ্রন্থের প্রাচুর্য্য থাকা বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে আদর্শ হস্তলিখিত গ্রন্থের অভাব বশতঃ প্রথম মুদ্রাঙ্কনে যেরূপ পাঠাদি পরিগৃহীত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী সংস্করণ গুলিতেও প্রায় সেইরূপ পাঠই স্বীকৃত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত সুশ্রুতের মুদ্রাঙ্কন অনেকবার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই সেই "গতানুগতিক" ব্যাপারই পরিদৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে সুশ্রুতের "শারীর স্থানের" মূল ও ডল্লনাচার্য্য কৃত টীকার পাঠের অনৈক্য কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস করা গিয়াছে। আমরা মূল শারীর স্থান ও ডল্লনের টীকার হস্তলিখিত পাঁচ খানি আদর্শের একতায় এই পাঠের বিভিন্নতা এইস্থানে প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহার মধ্যে পাঁচ খানিতে মূল ও তিন খানিতে মূল ও ডল্লনের টীকা আছে। বর্ত্তমানে মুদ্রিত সটীক সুশ্রুতের সহিতও আমরা মিল করিয়া আমাদের এই আদর্শ সংগ্রহের যত্ন করিয়াছি।

সংস্কৃত গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিপি অবলম্বন পূর্ব্বক আদর্শ প্রণয়ন করা কিরূপ দুরূহ কার্য্য, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। যাঁহারা এইরূপ

কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই ইহাতে কিরূপ কঠিন পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারেন। সংস্কৃত গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন বঙ্গদেশেই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম আরব্ধ হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা সংস্কৃতগ্রন্থপ্রকাশ ব্যাপারে বোম্বাই প্রদেশই সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী, মাদ্রাজ ও বারাণসী প্রদেশও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে।

সে যাহা হউক, সুশ্রুত গ্রন্থের শারীর স্থানের পাঠান্তর সম্বন্ধে এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক)

আহার রস, আত্মার সন্নিকর্ষ, সত্ত্বাদিগুণের উৎকর্ষ ও গর্ভাধানের পরে শরীরের হিতকর আহারের উপযোগনিবন্ধন গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সমূহের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে, আয়ুর্ব্বেদ আচার্য্যগণ এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। আমরা সুশ্রুতের বিভিন্ন আদর্শে পাঠক্রমে ইহার বক্ষ্যমাণ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইয়াছি :—

(অ)

গর্ভস্য কেশ-শ্মশ্রু-নখ-লোম-দন্তাস্থি-শিরা-স্নায়ু-প্রভৃতীনি স্থিরাণি পিতৃজানি।" (১।৬ আদর্শে)

(আ)

"× × × কেশ-শ্মশ্রু-লোম-নখ-দন্ত-শিরা-স্নায়ু-ধমনী-রেতঃ-প্রভৃতীনি × × ×।" (৩।৭ আদর্শে)

(ই)

" × × × কেশ-শ্মশ্রু-লোমাস্থি-নখ-দন্ত-শিরা-স্নায়ু-ধমনী-রেতঃ···।" (২য় আদর্শে)

গর্ভস্থ শিশুর শ্মশ্রু, নখ, লোম, দন্ত, অস্থি, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও রেত প্রভৃতি শরীরের স্থির অংশগুলি পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(খ)

নাভি হইতে শিরাসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়া সমস্ত শরীর সমাচ্ছাদিত করিয়া থাকে, এই বিষয়ে সুশ্রুতের অন্যতম আদর্শে পাঠ প্রাপ্ত হইয়াছি :—

"প্রাপ্নুবন্ত্যভিতো দেহং নাভিতঃ প্রসৃতাঃ শিরাঃ।
প্রতানাঃ পদ্মিনীকন্দাদ্বিসাদীনাং জলং যথা॥"

(৭ ম অ° শরীরে)

২।৬।৭ আদর্শে "প্রাপ্নুবন্তি" স্থলে "ব্যাপ্নুবন্তি" এবং "জলং যথা" স্থানে ৩।৬ আদর্শে পাঠ আছে, "যথা জলম্"। কিন্তু এস্থলে ডল্লন কৃত টীকায় সপ্তম আদর্শে যে পাঠটি প্রাপ্ত হইয়াছি, অন্যত্র মুদ্রিত বা অমুদ্রিত গ্রন্থের সর্ব্বত্রই তাহার প্রচ্যুতি ঘটিয়াছে! নিম্নে উহা সমুদ্ধৃত হইল:—

"যথা বিশাদীনাং প্রতানা বিস্তারাঃ পদ্মিনী-কন্দাৎ প্রসৃতা জলং ব্যাপ্নুবন্তি, তথা নাভিতঃ প্রসৃতাঃ শিরাঃ সর্ব্বতঃ শরীরং ব্যাপ্নুবন্তি।"

যেরূপ পদ্মের কন্দ হইতে মৃণালের অঙ্কুরসকল নানাদিকে জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ নাভিমূল হইতে শিরাসমূহ বহির্গত হইয়া সকল-শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

(গ)

ধাতুসমূহের মর্য্যাদাজ্ঞাপক ক্লেদবিশেষ "কলা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শরীরের সপ্ত কলা বিদ্যমান, "পুরীষাধরা" উহার অন্যতম—পঞ্চম "কলা"। এই কলার লক্ষণ জ্ঞাপনার্থ সুশ্রুত শারীরের চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন;—

"পঞ্চমী পুরীষ-ধরা নাম, যাঽন্তঃ কোষ্ঠে মলং বিভজতি পক্বাশয়স্থেতি।"

মুদ্রিত বা অমুদ্রিত গ্রন্থ সর্ব্বত্রই এই স্থানের ডল্লনকৃত ব্যাখ্যার প্রস্খলন দেখা যায়, কিন্তু দ্বিতীয় ও সপ্তম আদর্শে এই স্থানের ব্যাখ্যায় দেখিতে পাইতেছি;—

"পক্বাশয়স্থা অন্তঃ কোষ্ঠ ইতি কোষ্ঠস্যান্তর্ম্মধ্যমন্তঃকোষ্ঠং পুনস্তস্মিন্ মলং মূত্রপুরীষতয়া বিভজতি। গয়ী তু অন্তঃকোষ্ঠে কোষ্ঠমধ্যে তত্রাপি রসবভিাগে কিট্টস্য পুরীষত্বাত্তং পুরীষং কোষ্ঠে বিভজতি কোষ্ঠাৎ পৃথক্ করোতি। সা চাত্র পুরীষবিভাগোঽগ্নিমারুতকৃতোঽপি তত্রাগ্নিকৃতো যথা বিরেচয়তি চ রস মূত্রপুরীষাণি মারুতকৃতোযথা সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তি হীতি ব্যাখ্যাতি। পক্বাশয়স্থেতি পুরীষস্য পক্বাশয়স্থিতত্বাৎ। কোষ্ঠং পুনরামপক্বাশয়াশ্রয়ম্। তথা চ কোষ্ঠলক্ষণম্—

স্থানান্যামাগ্নিপক্কানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ।
হৃদুণ্ডুকফুস্ফুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে॥

তেন কোষ্ঠস্থিতাপি পুরীষস্য পক্কাশয়স্থিতত্বাদ্বাহুল্যেন পক্কাশয়স্থা কথ্যতে।"

পুরীষধরা নামক পঞ্চম কলা কোষ্ঠের অভ্যন্তরে পক্কাশয়ে অবস্থিতি করিয়া মূত্র ও পুরীষরূপে মলের বিভাগ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।

ডল্লনাচার্য্য উল্লিখিতরূপে কলার লক্ষণের নিজে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু গয়ী * বলেন, পুরীষধরা কলা কোষ্ঠের অভ্যন্তরে রসবিভাগের জন্য কিট্টরূপী মলকে পৃথক্ করিয়া থাকে। রস ও মলের এই বিভাগ ও পচন ক্রিয়া কোষ্ঠস্থিত অগ্নি ও বায়ুকর্ত্তৃকই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পক্কাশয়েই রস ও মল (মূত্র ও পুরীষ) পৃথক্কৃত হইয়া থাকে; এইজন্যই উল্লিখিত হইয়াছে "পক্কাশয়স্থা," কেননা আমাশয় ও পক্কাশয়ও কোষ্ঠেই বর্ত্তমান থাকে। কোষ্ঠের লক্ষণে অভিহিত হইয়াছে, আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, পক্কাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক ও ফুসফুস এই সকল শরীরাবয়বের সমষ্টি লইয়াই কোষ্ঠের মর্য্যাদা স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং ঐগুলি সমুদয়ই কোষ্ঠের অন্তর্গত।

(ঘ)

শারীর স্থানের ধমনী-ব্যাকরণ নামক নবম অধ্যায়ে পাঠের নিম্নলিখিত রূপ বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

(১)

(অ)

"তোয়বহে দ্বে মূত্রবস্তি মভি-প্রতিপন্নে।" (৩।৪)

(আ)

"তোয়বহে দ্বে মূত্রবস্তি মভি-প্রপন্নে মূত্রবহে দ্বে।" (১।২।৬)

(২)

(অ)

"দ্বে শুক্রবহে। দ্বে শুক্রপ্রাদুর্ভাবায় দ্বে বিসর্গায় দ্বে।" (৩)

* গয়ী, ডল্লন অপেক্ষা পূর্ব্বতন সুশ্রুতের অন্যতম প্রামাণিক টীকাকার। ইঁহার নাম গয়দাস, কিন্তু ডল্লন স্বকৃত সুশ্রুতটীকায় নামের সংক্ষেপ করিয়া কখনও "গয়ী" আর কখনও বা পূর্ণনাম "গয়দাস" বলিয়াই ইঁহাকে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

(আ)

"শুক্র প্রাদুর্ভাবায় দ্বে বিসর্গায় দ্বে।" (১।৭)

(ই)

"শুক্রবহে শুক্রপ্রাদুর্ভাবায় দ্বে বিসর্গায় দ্বে।" (২)

(ঈ)

"দ্বে শুক্রবহে দ্বে শুক্রপ্রাদুর্ভাবায় দ্বে বিসর্গায়।" (৪।৬)

(৩)

(অ)

"ত এব রক্তমভিবহন্ত্যো বিসৃজতশ্চ নারীণামার্ত্তবসংজ্ঞম্।" (১।৭)

(আ)

"তে এব রক্তমভিবহতো বিসৃজতশ্চ নারীণামার্ত্তবসংজ্ঞে।"(২)

(ই)

"তে এব রক্তমভিবহতো নারীণামার্ত্তবসংজ্ঞম্।" (৩।৪।৬)

জলীয় ধাতু বহনকারিণী ধমনী দুইটি এবং শুক্রধাতুবাহিনী ধমনী চারিটি; ইহাদিগের মধ্যে কাহারও দ্বারা "সংগ্রহণ" এবং অপরের দ্বারা "নির্গমন" ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা পুরুষের শুক্রবাহিনী, তাহারাই স্ত্রীলোকের আর্ত্তব রক্তের সংগ্রহণে ও নির্গমনে ব্যাপৃত আছে।

(ঙ)

স্ত্রীলোকের গর্ভপরিগ্রহণের পরে প্রতিমাসিক আহার ও আচার বিধির পরিপালন প্রসঙ্গে দশম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ;—

(১)

(অ)

"চতুর্থে পয়োনবনীতসংসৃষ্টমাহারয়েজ্জাঙ্গল-মাংসসহিতং হৃদ্যমন্নং ভোজয়েৎ।" (১।২।৪।৬।৭)

(আ)

"চতুর্থে পয়োনবনীত-সংসৃষ্টমাহারয়েৎ * * *।" (৩)

(২)

(অ)

"পঞ্চমে ক্ষীরসংসৃষ্টম্।" (১)

(আ)

"পঞ্চমে ক্ষীরসর্পিঃ-সংসৃষ্টম্।" (২।৪।৬।৭)

(ই)

"পঞ্চমে ক্ষীরং সর্পিঃ সংসৃষ্টম্।" (৩)

(৩)

(অ)

"ষষ্ঠে শ্বদংষ্ট্রাসিদ্ধস্য সর্পিষো মাত্রাং যবাগূংবা পায়য়েৎ।" (১।২।৭)

(আ)

"ষষ্ঠে শ্বদংষ্ট্রাসিদ্ধস্য সর্পিষো মাত্রাং যবাগৃবা পায়য়েত।" (৩)

(ই)

"ষষ্ঠে শ্বদংষ্ট্রাসিদ্ধস্য সর্পিষো মাত্রাং পায়য়েদ্ যবাগূংবা।" (৪।৬)

চতুর্থমাসে গর্ভিণীকে দুগ্ধ বা নবনীত সংযুক্ত আহার্য্য বস্তু প্রদান করিবে। এই সময়ে হরিণ প্রভৃতি জাঙ্গল পশুর মাংসরস বিশেষ হিতকর; যথাসম্ভব উল্লিখিত উপাদান সহ গর্ভিণীর রুচি অনুসারে অন্নের ব্যবস্থা করা বিধেয়।

পঞ্চম মাসে দুগ্ধ ও ঘৃত সংযুক্ত উপযুক্ত অন্ন আহারার্থে গর্ভিণীকে প্রদান করিবে।

ষষ্ঠমাসে গোক্ষুর ক্কাথে সিদ্ধ ঘৃত বা যবাগূ যথোপযুক্ত মাত্রায় গর্ভের ও গর্ভিণীর বলবিধানার্থ প্রদান করা হিতকর।

(চ)

গর্ভস্রাব দোষ পরিহারার্থ সুশ্রুতে প্রতিমাসে যে যোগগুলি ব্যবহারের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার নবম ও দশম মাসিক বিধানে দেখা যায়;—

(অ)

"নবমে মধুকানন্তাং পয়স্যাং সারিবাং পিবেৎ।
পয়স্যাং দশমে শুণ্ঠ্যা সিদ্ধমেবং প্রশস্যতে॥" (৩)

(আ)

"নবমে মধুকানন্তা পয়স্যা শরিবাঃ পিবেৎ।
ক্ষীরং শুণ্ঠী-পয়স্যাভ্যাং সিদ্ধংস্যাদ্দশমে হিতম্॥" (১।২।৪।৬।৭)

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা পরিহারার্থ নবমমাসে যষ্টিমধু, অনন্তমূল ও ক্ষীরবিদারী সিদ্ধ এবং দশমমাসে শুণ্ঠী ও ক্ষীরবিদারীসিদ্ধ দুগ্ধপান করান বিধেয় *।

* সাধারণতঃ গর্ভিণীর গর্ভাবস্থায় কিরূপ আহার ও আচার অবলম্বন করা বিধেয় এবং

(ছ)

পরিণতবয়স্ক পুত্রের বিবাহ প্রসঙ্গে সুশ্রুত শারীরের দশম অধ্যায়ে বলিয়াছেন ;—

(১)

(অ)

"অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবার্ষিকীং পত্নীমাবহেৎ পিতৃ-ধর্ম্মার্থ-কাম-প্রজাঃ প্রাপ্স্যতীতি।" (৩)

(আ)

"* * * দ্বাদশবর্ষাং পিত্র্যধর্ম্মার্থ..."। (১।৪।৬।৭)

"* * * দ্বাদশবর্ষাং * * * পিত্র্যধর্ম্মার্থ * * * প্রাপ্যতে ইতি।" (২)

বিদ্যাশিক্ষার পরে পিতা যখন দেখিবেন পুত্রের পঞ্চবিংশতিতম বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, তখন তাহার সহিত দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দিবেন, কারণ এই বয়সেই সন্তানগণ, পিতৃঋণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, অর্থোপার্জ্জন, বিষয়-সুখ-সম্ভোগ ও সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে।

(২)

প্রশস্ত সন্তান উৎপাদন বিষয়ে সুশ্রুত আরও বলিয়াছেন ;—

(অ)

"ঊনদ্বাদশবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্‌গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেদ্ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্ত-বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥" (২।৭)

(আ)

'ঊনদ্বাদশবর্ষায়ামপ্রাপ্তে পঞ্চবিংশতিম্।" (১)

(ই)

ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।" (৩।৪।৬)

ইহার ব্যাখ্যায় ডল্লনের টীকাতেও দেখিতে পাই ;—

গর্ভিণীর গর্ভবিচ্যুতি দোষের সম্ভাবনা থাকিলেই বা কিরূপ নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য ;—আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে গর্ভের সূচনা (প্রথম মাস) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসবকাল (দশম মাস) পর্য্যন্ত তাহার বিহিত বিধান যথারীতি প্রকটিত হইয়াছে, এ স্থলে বাহুল্য বিবেচনায় সমুদয় আহার ও আচার বিধির উল্লেখ করা গেল না।

(অ)

অপ্রাপ্ত-পঞ্চবিংশতেরূনদ্বাদশবর্ষয়া * সহ সংযোগাদ্ দোষং দর্শয়ন্নাহ।"

(১।২।৭)

(আ)

"অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতেরূনষোড়শবর্ষয়া।" (৫)

অপূর্ণপঞ্চবিংশতিবৎসরবয়ঃক্রম পুরুষ ও অপ্রাপ্তদ্বাদশবৎসরবয়স্কা স্ত্রীর যে সন্তান জন্মিয়া থাকে, সে হয়ত গর্ভেই মৃত হয়; আর যদি বা জীবিত অবস্থাতে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলেও দীর্ঘজীবন লাভ করে না, অথবা রুগ্ন ও ক্ষীণবল হইয়াই দুর্ব্বল দুঃখময় জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

সুশ্রুতের শারীর স্থানের মূল বা ডল্লনের টীকা কিরূপ ভ্রমপ্রমাদ সংবলিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, আমরা এই প্রবন্ধে যতদূর দেখাইয়াছি, তাহাই প্রমাণ পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে; সুতরাং এইখানেই শারীর স্থান সম্বন্ধীয় এই প্রস্তাবের উপসংহার করা গেল। অতঃপর অন্যান্য স্থানগুলির ভ্রম ও প্রমাদ প্রকটিত করিতে অভিলাষ রহিল।

কবিরাজ—শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ-কবিচিন্তামণি।

* আমরা যে সকল হস্তলিখিত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছি, তন্মধ্যে তিনখানিতে "ঊনদ্বাদশ" পাঠ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহার মধ্যে তিন শত বৎসরের প্রাচীনতম গ্রন্থও আছে। এই সকল আদর্শের মূলে বা ডল্লনের টীকায় উভয়ত্র "ঊনদ্বাদশ" এই পাঠ আছে, উপরে তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সুশ্রুতের যত মুদ্রাঙ্কন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, সর্ব্বত্রই 'ঊনষোড়শ" পাঠ দৃষ্ট হইয়াছে। কোন কোন হস্তলিপিতেও "ঊনষোড়শ" পাঠ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সুশ্রুতের সর্ব্বত্রই যখন স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, "দ্বাদশ বর্ষীয়া স্ত্রীর সহিত পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষের বিবাহ বিধেয়" তখন এই স্থলে "ঊনদ্বাদশ" এই পাঠই অধিক সমীচীন; কারণ স্বাভাবিক রজঃ প্রবর্ত্তনাই স্ত্রীলোকের যৌবন ও গর্ভধারণ কাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এইজন্যই সুশ্রুত স্থানান্তরেও বলিয়াছেন;—

"রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃ-সংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।
তদ্বর্ষাদ্ দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্।"

(১৪ অং সূত্রং)

আরও :—

"তদ্বর্ষাদ্ দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমানমসৃক্ পুনঃ।
জরাপক্কশরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্।"

(৩ অং শারীরং)

স্ত্রীলোকের রজোরক্ত, রস ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়; উহা দ্বাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে এবং তৎপরে দেহের জড়তা নিবন্ধন ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের "চারুচর্য্যা"।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৭৮। ধূর্ত্তের সর্ব্বগ্রাহিতা স্বাভাবিক।

পদ্মবন্ন নয়েৎ কোশং ধূর্ত্ত-ভ্রমর-ভোজ্যতাম্।
সুরৈঃ শক্রেণ নীতার্থঃ শ্রীহীনোঽভূৎ পুরাম্বুধিঃ ॥

ক্রূর ভ্রমর মধু আহরণ করিতে করিতে লোভে পদ্মকোশ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া ফেলে, ধূর্ত্তব্যক্তিও সেইরূপ অতি লুব্ধতায় অর্থকোশ পর্য্যন্ত অপহরণ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না। দেবরাজ ইন্দ্র সুরগণের সহিত সমুদ্র মন্থন করিয়া, ধন ও রত্ন প্রভৃতি ত গ্রহণ করিয়াছিলেনই, অধিকন্তু সমুদ্রকে একেবারে "শ্রীহীন" পর্য্যন্ত না করিয়া তাঁহারা বিরত হয়েন নাই।

"ততঃ শতসহস্রাংশুর্মথ্যমানাত্তু সাগরাৎ।
প্রসন্নাত্মা সমুৎপন্নঃ সোমঃ শীতাংশুরুজ্জ্বলঃ ॥
শ্রীরনন্তরমুৎপন্না ঘৃতাৎ পাণ্ডরবাসিনী।
সুরাদেবী সমুৎপন্না তুরগঃ পাণ্ডরস্তথা ॥
কৌস্তভস্তু মণির্দিব্য উৎপন্নো ঘৃতসম্ভবঃ ॥
শ্রীঃ সুরা চৈব সোমশ্চতুরগশ্চ মনোজবঃ।
যতো দেবাস্ততো জগ্মুরাদিত্যপথমাশ্রিতাঃ ॥

(মহাভারত।)

সমুদ্রমন্থনে প্রথমে শীতাংশু চন্দ্রমা, তৎপরে শ্বেতবসনা শ্রীদেবী, অনন্তর মানসমোহিনী সুরাদেবী, সুধাধবল তুরঙ্গম উচ্চৈঃশ্রবা ও কৌস্তভ মণি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া, আদিত্য পথে দেবগণের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বার্থপর ইন্দ্রাদি দেবগণ, সমুদ্র হইতে সারভূতরত্ন সকল গ্রহণ করিয়াও দুরাকাঙ্ক্ষার বশে পরিতৃপ্ত হইলেন না! তাঁহারা দুর্ব্বার আশা তৃষ্ণায় বিমোহিত হইয়া, পুনর্ব্বার মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! তাহাতে বিশ্বধ্বংসের জন্য ভীষণ হলাহল উত্থিত হইয়া পড়িল! (৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

৭৯। বিষয়ান্ধের তত্ত্ববিমূঢ়তা।

নোপদেশামৃতং প্রাপ্তং ভগ্নকুম্ভনিভং ত্যজেৎ।
পার্থো বিস্মৃতগীতার্থঃ সাসূয়ঃ কলহেঽভবৎ॥

অমৃতকল্প তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভগ্নকুম্ভের ন্যায় তাহা পরিত্যাগ করিতে নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে গীতায় সারজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলেও, বিষয়প্রমূঢ় পার্থ গীতার তত্ত্বজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া, ঈর্ষ্যাভরে ভীষণ সংগ্রামে পৃথিবী জনশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

গীতার প্রারম্ভেই দেখা যায়, রণকামুক মহাবীর অর্জ্জুন, আত্মীয় বান্ধব প্রভৃতিকে সংগ্রাম ভূমিতে সমুপস্থিত দেখিয়া, সকলের বিনাশ আশঙ্কায় যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের এই আগন্তুক রণ-বৈরাগ্য দর্শন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সংসারের অসারতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন যদি প্রকৃতই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে বন্ধুগণের বিয়োগ আশঙ্কায় প্রথমে তিনি যেরূপ যুদ্ধে অনাস্থা দেখাইয়াছিলেন, পীযূষধারা-বর্ষী ব্রহ্মতত্ত্বরসের আস্বাদ উপভোগ করিয়াও পরিণামে তিনি সেইরূপ সর্ব্বভূতের হিতৈষণা অবলম্বনপূর্ব্বক নিশ্চয়ই যুদ্ধপরিহার পূর্ব্বক নিজজীবনে বৈরাগ্য ব্রত ধারণ করিতেন। সর্ব্বভূতান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের বিষয়প্রমূঢ় প্রকৃতির এই দৌর্ব্বল্য অনুভব করিয়াই গীতার উপসংহারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন;—

"যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥"

কি জানি, যুদ্ধে যদি তোমার আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ ঘটে, সেই আশঙ্কাতেই তুমি কেবল নিজের অহঙ্কারের (মমত্বের) বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিবে না, এই ক্ষণিক অসার প্রতিজ্ঞাতে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিয়াছ! কিন্তু "যুদ্ধ করিব না," তোমার এই উদ্যম বৃথা বলিয়াই জানিও। নিজের প্রকৃতিকে বিষয়পরতন্ত্রতা হইতে বিমুক্ত করিবার ক্ষমতা তোমার কিছুমাত্র নাই, একথা

তুমি নিশ্চয় জানিও। সুতরাং ঐশ্বর্য্যের কুহকে বিমুগ্ধ হইয়া তুমি আপনা হইতেই রাজ্যভোগ লালসায় নিশ্চয়ই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।

ভগবানের এই মর্ম্মস্পর্শী উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন নিজ হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য বুঝিতে সক্ষম হইলেন। অতঃপর তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন ;—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াঽচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

হে অচ্যুত, আপনার অনুগ্রহে আমার ক্ষণিক মোহ বিদূরিত হইয়াছে এবং আমরা কি ছিলাম এবং এক্ষণেই বা কিরূপ অবস্থাতে নিপতিত হইয়াছি, তাহাও আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়াছে। আমার অসার সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে, এক্ষণে আমি দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। যুদ্ধে জয় লাভ করিতে আপনি আমাকে যেরূপ পরামর্শ প্রদান করিবেন, আমি শিরোধার্য্য পূর্ব্বক তাহাই প্রতিপালন করিব, নিশ্চয় জানিবেন।

ভগবানের উপদেশের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে অর্জ্জুন নিশ্চয়ই "কৃপাণ" পরিত্যাগ পূর্ব্বক "কৌপীন" ধারণ করিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। সংসারের এই বিষম ঘাত ও প্রতিঘাতে বিষয়াসক্ত কোন মানবের চিত্তে প্রকৃত বৈরাগ্যের ভিত্তি যে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এইরূপ নহে। প্রসিদ্ধ মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকটিত হইয়াছে। রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি, উভয়েই তুল্যঅবস্থাপন্ন—নিজ নিজ বিষয় বৈভব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনন্তর ঋষি মেধসের নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া রাজর্ষি ক্ষত্রিয় সুরথ হইতেও বণিক্ বৈশ্য সমাধির তত্বজ্ঞান অগ্রে বিকসিত হইয়া পড়িয়াছিল!

মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রবল বিষয় বাসনা হইতে বৈরাগ্যের প্রোজ্জ্বল বিকাশ অলর্কচরিত্রে সুন্দর প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অলর্ক রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবাহু, কনিষ্ঠের উদ্দাম বিষয় বাসনার বিনিময়ে পারমার্থিক শান্তির আবির্ভাবের কামনা করিয়া, কাশীপতির সাহায্যে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। রাজ্যচ্যুত অলর্ক ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের উপদেশে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া নিজ শত্রুকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন ;—

"সোঽহং ন তে হরিন´ মমাসি শক্রঃ
সুবাহুরেষো ন মমাপকারী।
দৃষ্টং ময়া সর্ব্বমিদং যথাত্মা
অন্বিষ্যতাং ভূপ রিপুস্ত্বয়ান্যঃ॥"

হে রাজন্, সেই অলর্ক আমি এক্ষণে আর আপনার শত্রু নহি এবং আপনিও আমার আততায়ী নহেন। এই সুবাহু যিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াও নিজের পূর্ব্ব পরিত্যক্ত রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় আপনার বলে বলীয়ান্ হইয়া আমাকে রাজ্য হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন; তিনিও আমার কোন অপকারই করেন নাই, কারণ এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই আমার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়াছে। আমি এক্ষণে সর্ব্বভূতেই সেই বিশ্বব্যাপক অদ্বিতীয় পরমাত্মার সত্তা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছি, সুতরাং বিষয়-মৃগতৃষ্ণিকার মোহিনী শক্তি আমার মানসক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে! মহারাজ, আপনি বিমূঢ়প্রায়, বৃথা আর কেন এই শান্তি-নিকেতন ঋষির আশ্রমে আমার অনুসরণ করিতেছেন? যাহার বিষয়-ভোগ-বাসনা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, অন্যত্র গিয়া সেইরূপ শত্রুর অনুসন্ধান করিতে আপনি প্রয়াসপর হউন।

কাশীপতি, সুবাহুকে অলর্ক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন, মহারাজ, ভ্রাতার মনে তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাবের জন্যই আমি অলর্ককে রাজ্য হইতে পরিচ্যুত করিয়াছি, এবং আমার এই কার্য্য আপনার সাহায্যে সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হইয়াছে। আমি বিষয়-সম্ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতেই শান্তিপ্রদ মুনিব্রত অবলম্বন করিয়াছি, সুতরাং নীচ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের রাজ্যভোগ-কামনায় আমি এই ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। আমার ভ্রাতার বিবেক-বিকাশে, আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি, এক্ষণে ভবদীয় মঙ্গল কামনা পূর্ব্বক, আমি নিজ আশ্রম অভিমুখে প্রস্থান করিতেছি।

অতঃপর সুবাহু প্রস্থান করিলে, কাশীপতিও স্বকীয় রাজ্যে গমন করিলেন। অলর্ক, স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন।

৮০। ক্ষমতার পরিত্যাগে আত্মগ্লানি।

ন পুত্রায়ত্তমৈশ্বর্য্যং কার্য্যমার্য্যৈঃ কথঞ্চন।
পুত্রার্পিতপ্রভুত্বোঽভূদ্ধৃতরাষ্ট্রস্তৃণোপমঃ॥

যদি বিষয়পরিবৃত হইয়া সংসারে থাকিতেই হয়, তাহা হইলে, জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কখনও নিজের ধনৈশ্বর্য্যের ভার পুত্রের হস্তেও সমর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে। অন্ধ নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব নিজপুত্রগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়া পরিণামে তৃণের ন্যায় লঘু হইয়া পড়িয়াছিলেন!

"নিরস্য বিদুরং ভীষ্মং দ্রোণং শারদ্বতং তথা।
বিগ্রহে তুমুলে তস্মিন্ দহৎক্ষত্রং পরস্পরম্॥
জয়ৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু জ্ঞাত্বা সুমহদপ্রিয়ম্।
ধৃতরাষ্ট্রশ্চিরংধ্যাত্বা সঞ্জয়ং বাক্যমব্রবীৎ॥
শৃণু সঞ্জয় সর্ব্বং মে ন চাসূয়িতু মর্হসি॥
ন বিগ্রহে মম মতির্ন চ প্রীয়ে কুলক্ষয়ে।
বৃদ্ধং মামভ্যসূয়তি পুত্রা মন্যুপরায়ণাঃ॥" (মহাভারত।)

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর রাজ্যার্দ্ধ প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতে বারংবার বলিলেও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের বৈষয়িক দুরাকাঙ্ক্ষায় মুগ্ধ হইয়া কিছুতেই তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। অতঃপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন নিজ পক্ষীয় বীরধুরন্ধরগণের নিধন সংবাদ ক্রমাগত শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল, তখন অন্ধরাজ শোকে বিহ্বল হইয়া, নিজমন্ত্রী সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন, সঞ্জয়, তুমি মন দিয়া আমার কথা শ্রবণ কর, তাহা হইলে এক্ষণে কিছুতেই এই কুলক্ষয় দেখিয়া তাহার জন্য আমার প্রতি কোনরূপ দোষের আরোপ করিতে পারিবে না। আমার এই যুদ্ধে কখনও অভিলাষ ছিল না, দৈবদুর্ব্বিপাকে এই ভীষণ কুলক্ষয় দর্শন করিয়া আমার মর্ম্মগ্রন্থি সকল যেন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু আমি কি করিব? নিজে অন্ধ বলিয়া কোন ক্ষমতাই কখনও আর আমার নিজ হস্তে ছিল না। আমার পুত্রগণ সকলেই হিংসা বিষে জর্জ্জরিত। তাহারা বৃদ্ধ ও অন্ধ বলিয়া, আমাকে তুচ্ছ করিয়াই এই কুলসংহারক ঘোর আহবে প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছে!

৮১। শত্রুপক্ষপাতী ব্যক্তির সংসর্গে আত্মনাশ।

ন শত্রুপোষদুষ্যানাং স্কন্ধে কার্য্যং সমর্পয়েৎ।
নিষ্প্রতাপোঽভবৎ কর্ণঃ শল্যতেজোবধাহিতঃ॥

যাহাকে শত্রুর পক্ষপাতী নিকট আত্মীয় বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার প্রতি কোন কার্য্যের ভার অর্পণ করা নিজের হিতজনক নহে। মহাবীর কর্ণ, শল্য রাজাকে নিজ সারথি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পাণ্ডবগণের একান্ত হিতৈষী শল্য কর্ত্তৃক তিনি প্রতিপদে তিরস্কৃত হইয়া নিজ ক্ষত্রতেজ হইতে পরিচ্যুত হইয়াছিলেন।

"প্রথমমপি পলায়িতে ত্বয়ি প্রিয়কলহা ধৃতরাষ্ট্রসূনবঃ।
স্মরসি ননু যদা প্রমোচিতাঃ খচরগণানবজিত্য পাণ্ডবৈঃ॥
ইদমপরমুপস্থিতং পুনস্তব নিধনায় সুযুদ্ধমদ্য বৈ।
যদি ন রিপুভয়াৎ পলায়সে সমরগতোঽদ্য হতোঽসি সূতজ॥"

(মহাভারত।)

শল্য কর্ণকে বলিলেন, যখন নিয়তবিবাদপরায়ণ দুর্য্যোধনের সহিত চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, হে কর্ণ, তুমিই সস্ত্রীক দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভ্রাতৃবৃন্দকে সমরক্ষেত্রে পরিত্যাগপূর্ব্বক কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিয়া অগ্রে নিজের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে। হে মহাবীর, সে সব পুরাতন কথা, এক্ষণে তোমার স্মৃতিগোচর হয় কি? বল দেখি, সেই বিপদের সময়ে কাহারা কৌরবদিগের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিল? তৎকালে বনবাসী পাণ্ডবগণই গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া সভার্য্য দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে শত্রুর কারাগার হইতে পরিমুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে কথা এখন থাকুক, আমি দেখিতে পাইতেছি, তোমার ভাগ্যের বিপর্য্যয়েই অদ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সহিত তোমার এই দ্বৈরথ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে! এক্ষণে তুমি যদি এই কালসমরে বৃথা দম্ভবশে অন্ধ হইয়া সমরক্ষেত্র হইতে অপসরণ পূর্ব্বক তোমার পূর্ব্ব অনুষ্ঠিত পন্থার অনুসরণ না কর, নিশ্চয়ই অর্জ্জুন কর্ত্তৃক মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে।

৮২। প্রভু হইতে সম্মান আকাঙ্ক্ষায় অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়।

ন লব্ধ-প্রভু-সম্মানে ফলক্লেশং সমাশ্রয়েৎ।
ঈশ্বরেণ ধৃতো মূর্দ্ধ্নি ক্ষীণায় চ ক্ষপাপতিঃ॥

সাধনায় ফল লাভের জন্য অনেক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, কিন্তু ফলপ্রাপ্তির জন্য যে কষ্ট পাইতে হয়, ধৈর্য্যসহকারে তাহা সহ্য করার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। চন্দ্রের সম্মাননার জন্য ভূতপতি মহাদেব শশধরকে নিজের শিরোদেশে ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ক্ষপাপতি সেই সাধনার পরিক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া এত ক্ষীণকলেবর হইয়াছিলেন, যে, যেন তাহাতেই নিজের এক কলায় তাঁহার আকৃতির পরিণতি হইয়া পড়িয়াছিল।

"যোহসৌ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞো বৈ দেহে হস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।
স এব সোমো মন্তব্যো দেহিনাং জীবসংজ্ঞকঃ॥
উপজীবন্তি বৃক্ষাশ্চ তথৈবৌষধয়ঃ প্রভুম্।
রুদ্রস্তমেব শকলং দধার শিরসা তদা॥"

(বরাহপুরাণ।)

জীবদেহে যে পর পুরুষকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়া থাকে, তিনিই সোম অর্থাৎ চন্দ্র; ইনিই প্রাণীদিগের দেহে "জীব" স্বরূপ হইয়া থাকেন। বৃক্ষ ও ঔষধিগণ তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই সজীব থাকে। ভগবান্ ভূতপতি মহাদেব সেই চন্দ্রের কলামাত্র নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।

৮৩। ধর্ম্মচ্যুতির শোচনীয় পরিণাম।

শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত মাচারং ন ত্যজেৎ সাধুসেবিতম্।
দৈত্যানাং শ্রীবিয়োগোহভূৎ সত্যধর্ম্মচ্যুতাত্মনাম্।

বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের অনুমোদিত ও সাধু ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক চিরন্তন কাল হইতে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম আচরণ পরিত্যাগ করা ঐহিক বা পারত্রিক শ্রেয়স্কর নহে।

দৈত্যগণ সনাতন ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট হওয়াতে, তাহাদিগকে ঐশ্বর্য্যবিহীন হইয়া "শ্রীভ্রষ্ট" হইতে হইয়াছিল।

"দত্তাত্রেয়স্ততো দেবান্ বিহস্যেদমথাব্রবীৎ।
দিষ্ট্যা বর্দ্ধথ দৈত্যানামেষা লক্ষ্মীঃ শিরোগতা॥
সপ্তস্থানান্যতিক্রান্তা নরমন্যমুপৈষ্যতি॥
নৃণাং পদে স্থিতা লক্ষ্মীর্নিলয়ং সংপ্রযচ্ছতি।
সক্থ্নোশ্চসংস্থিতা বস্ত্রং তথা নানাবিধং বসু॥
কলত্রঞ্চ গুহ্যসংস্থা ক্রোড়স্থা হপত্যদায়িনী।
মনোরথান্ পূরয়তি পুরুষাণাং হৃদিস্থিতা॥
লক্ষ্মীর্লক্ষ্মীবতাং শ্রেষ্ঠা কণ্ঠস্থা কণ্ঠভূষণম্।
মুখসংস্থা কবিত্বঞ্চ যচ্ছত্যাদধিসম্ভবা॥
শিরোগতা সন্ত্যজতি ততোহন্যৎ যাতি চাশ্রয়ম্।
সেয়ং শিরোগতা চৈতান্ পরিতক্ষ্যতি সাম্প্রতম্॥
প্রগৃহ্যাস্ত্রাণি বধ্যন্তাং তস্মাদেতে সুরারয়ঃ।
ন ভেতব্যং ভৃশং চৈতে ময়া নিস্তেজসঃ কৃতাঃ॥
পরদারাবমর্ষাচ্চ দগ্ধপুণ্যা হতৌজসঃ॥"

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ।)

জম্ভদৈত্য বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি বীরগণের সহায়তায় ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলে তাঁহারা নারায়ণের অবতার ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। দত্তাত্রেয়ের উপদেশ অনুসারে দেবগণ দৈত্যদিগকে পুনর্ব্বার যুদ্ধে আহ্বান করত কৌশলক্রমে পশ্চাদ্ অপসরণ পূর্ব্বক ক্রমে ঋষির আশ্রম ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অসুরগণ দেখিতে পাইল, অরণ্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীললনাসহায় অকিঞ্চন দত্তাত্রেয় সমাসীন রহিয়াছেন। দেখিয়া কালবিলম্ব না করিয়া দানবগণ দত্তাত্রেয়ের অঙ্কলক্ষ্মীকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া আপন আপন শিরোদেশে স্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার পরে ভগবান্ দত্তাত্রেয় সহাস্যমুখে দেবতাদিগকে বলিলেন, হে দেবগণ, ভাগ্যবশতঃ অদ্য তোমাদিগের মহাসুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ

ভ্রষ্টাচার পাপমতি দানবগণ, আমার ক্রোড় দেশ হইতে লক্ষ্মীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া আপনাদের মস্তকোপরি আরোহণ করাইয়াছে ; অতএব উহারা এই মুহূর্ত্ত হইতে লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইল, ইহা নিশ্চয় জানিও। মানব দেহের পদ, সক্থি, গুহ্য, ক্রোড়, হৃদয়, কণ্ঠ ও মুখ এই সপ্ত স্থান অতিক্রমণের পরে কমলা শিরোদেশে অবস্থান করিবার অবসর পাইয়া, সেই ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু পরস্ত্রীর প্রতি কাম ভাবে দৃষ্টিপাত নিবন্ধন, বিমূঢ় দৈত্যগণ হতবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, অতএব এই সুযোগে তোমরা অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ পাষণ্ডদিগকে আক্রমণ করিয়া বিজয় লক্ষ্মীলাভ কর। অতঃপর পরস্ত্রী হরণ পাপেই ঐশ্বর্য্য সহ দানবগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৮৪। সদ্ধর্ম্মাচরণে ঐশ্বর্য্য লাভ।

শ্রিয়ঃ কুর্য্যাৎ পলায়িন্যা বন্ধায় গুণসংগ্রহম্।
দৈত্যাংস্ত্যক্ত্বাশ্রিতা দেবা নির্গুণান্ সগুণাঃ শ্রিয়া ॥

লক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেও সদ্গুণে বশীভূতা হইয়া তথায় চিরস্থায়িনী হইয়া থাকেন ; এইজন্যই কমলা ভ্রষ্টাচার নির্গুণ দৈত্যদিগকে পরিত্যাগ করত সদ্গুণশালী দেবতাগণকে আশ্রয় করিয়াছিলেন।

"নাত্র দুঃখং ত্বয়া রাজন্ কার্য্যং পার্থ কথঞ্চন।
যদধর্ম্মেণ বর্দ্ধেয়ুরধর্ম্মরুচয়ো জনাঃ ॥
বর্দ্ধত্যধর্ম্মেণ নরস্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥
তীর্থানি দেবা বিবিশুর্নাবিশন্ ভারতাসুরাঃ।
তানধর্ম্মকৃতো দর্পঃ পূর্ব্বমেব সমাবিশৎ ॥
দর্পান্মানঃ সমভবন্মানাৎ ক্রোধো ব্যজায়ত।
ক্রোধাদহ্রীস্ততোঽহ লজ্জা বৃত্তং তেষাং ততো হনশ্যৎ ॥
তানলজ্জান্ গতহ্রীকান্ হীনবৃত্তান্ বৃথাব্রতান্।
ক্ষমা লক্ষ্মীশ্চ ধর্ম্মশ্চ নচিরাৎ প্রজহুস্ততঃ ॥
দৈতেয়ান্ দানবাংশ্চৈব কলিরপ্যাবিশত্ততঃ।

নির্ব্যশঙ্কা স্তথা দৈত্যাঃ কৃৎস্নশো বিলয়ং গতাঃ ॥
দেবাস্ত সাগরাংশ্চৈব সরিতশ্চ সরাংসি চ।
অভ্যগচ্ছন্ ধর্ম্মশীলাঃ পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥
তপোভিঃ ক্রতুভির্দানৈ রাশীর্ব্বাদৈশ্চ পাণ্ডব।
প্রজহুঃ সর্ব্বপাপানি শ্রেয়শ্চ প্রতিপেদিরে ॥
কীর্ত্তিং পুণ্যামবিন্দস্ত যথা দেবাস্তপোবলাৎ।
দেবর্ষয়শ্চ কাৎস্নেন তথা ত্বমপি বেৎস্যসি ॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্ত্বধর্ম্মেণ মোহন চ বশীকৃতাঃ।
ন চিরাদ্বৈ বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দৈত্যা ইব ন সংশয়ঃ ॥”

(মহাভারত।)

পাণ্ডবগণ ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়াও অধর্ম্মপরায়ণ কৌরবগণ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয় বনবাসী হইয়াছিলেন। লোমশমুনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মপরায়ণতার পরিণাম প্রদর্শন পূর্ব্বক বনবাসপরিক্লিষ্ট ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মাচরণের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,—হে মহারাজ, হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিগণ অধর্ম্মাচরণ করিয়াও যে ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিয়া থাকে, ইহা দেখিয়া আপাততঃ তোমার দুঃখ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। অধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণ স্বীয় যথেচ্ছচারিতায় পাপ পথেও ক্ষণস্থায়ী সমুন্নতি লাভ করিয়া থাকে, তাহাদিগের নিত্য মঙ্গল সংঘটিত হইতেও দেখা গিয়া থাকে, এবং স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবেও তাহারা শত্রুপক্ষকে পরাভূত করিয়া ঐশ্বর্য্য ভোগে সমর্থ হইয়া থাকে ;—এই সকলই আপতিত হয়, ইহা যথার্থ বটে ; কিন্তু তাহাতেই একেবারে বিস্ময়বিমূঢ় হওয়া জ্ঞানবানের পক্ষে সমুচিত নহে, কারণ স্বাভাবিক ধর্ম্মমার্গের সূক্ষ্মতম পরিণতির প্রভাবে ঐ সকল অধর্ম্মরত জনগণ, অকস্মাৎ প্রবল ঝঞ্ঝাবির্ভাবে বিচ্ছিন্ন ধূলিকণার ন্যায় এককালে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহারাজ, দেখ, ধর্ম্মশীল দেবতাগণ, পুণ্য তীর্থ সকল আশ্রয় করিয়া থাকেন, কিন্তু বিষয়মদমত্ত দানবগণ ঐশ্বর্য্য লাভের পরে আর তীর্থের মাহাত্ম্য কিছুতেই গ্রাহ্য করে না, অধিকন্তু প্রবল অধর্ম্মরুচিহেতু তাহারা ঘোর দর্পান্ধ হইয়া পড়ে। ক্রমে দর্প হইতে অভিমান, অভিমান হইতে ক্রোধ ও ক্রোধ হইতে নির্লজ্জতার আবির্ভাব হইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে এবং এইরূপে তাহাদের চরিত্র সম্পূর্ণ কলুষিত হইয়া পড়ে। কোন সৎকার্য্যের

অনুষ্ঠানকালেও তাহাদের বিমল সাত্বিক শ্রদ্ধার কিঞ্চিন্মাত্র বিকাশ হইতে দেখা যায় না, পরন্তু দর্পান্ধ হইয়াই তাহারা বৃথা ব্রত ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহার ফলে ক্ষমা, লক্ষ্মী ও ধর্ম্ম সেই পামর জনকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই দানবগণ বৃথা বিবাদপরায়ণ হইয়া সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ওদিকে দেখ, দেবতাগণ্ সর্ব্বদাই পুণ্যময় সাগর, সরিৎ, সরোবর ও ধর্ম্মনিকেতনে অধিষ্ঠান করিয়া তপস্যা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যপুত হইয়া পারমার্থিক অক্ষয় শ্রেয়োভাজন হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র তপশ্চর্য্যার প্রভাবেই দেবতারা অধর্ম্মনিষ্ঠ অসুরদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া পুণ্য কীর্ত্তি ভাজন হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাজ, আমি দিব্য চক্ষে ভবিষ্যদ্‌ব্যাপার দেখিতে সমর্থ হইতেছি; ভ্রাতৃসহায় তুমিও নিজ পূত চরিত্র প্রভাবে দুর্বৃত্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সম্মুখ যুদ্ধে বিদলিত করিয়া নিজ রাজ্যৈশ্বর্য্য পুনর্ব্বার লাভ করিতে নিশ্চয় সমর্থ হইব।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি।

প্রাচীন কবিতা। *

মদ্বিধবহুবিধদুর্বিধদৈন্যো
জলদনলস্তং তৃণ ইব মন্যো।
কত ইহ শত শত যতনত এবা
ভবতি ভবতি লিপিরথ সবিশেষা॥
অহং তবৈবাস্মি নিদেশকারী
তথা তবৈবাস্মি মতানুসারী।
অত্রানৃতে কিন্তু বিপত্তি ভারি
যথা তথাস্তাং ভরসা তোমারি॥

৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর।

---

* স্বর্গীয় রায় বাহাদুর রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সংস্কৃত কলেজে পঠদ্দশায় প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বৈদিক অধ্যাপক ছিলেন। কোন কারণে তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর বিরক্ত হইলে, তিনি এই শ্লোক দুইটি রচনা করিয়া রাজকুমার বাবুর হাত দিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য, অধ্যক্ষ মহাশয় শ্লোক পাঠ করিয়া হাসিয়া আকুল হইয়াছিলেন।

"আর্য্য জ্যোতিষ। *

(ক) মানবের ভাগ্যফল অবগতির আবশ্যকতা।

দেখিতে পাওয়া যায়, যে জাতি যত প্রাচীন, যে বিদ্যা যত পুরাতন, তাহাদের আদিম ইতিহাসও ততই অন্ধকারাবৃত। সেই সকল জাতির ও বিদ্যার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করা বড়ই দুষ্কর। আমাদের এই বহু প্রাচীন ভারতের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। ভারতীয় আর্য্যগণের প্রাচীনত্ব এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্তপ্রায়। আর্য্যগণের অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জ্যোতিষ গ্রন্থাদিও প্রায় লোপ পাইয়াছে। সুতরাং এই প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রেরও একটা ক্রমিক ইতিহাস সংগ্রহ করা দুষ্কর। কিন্তু বহুপ্রকার আলোচনা ও গবেষণার ফলে যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয় হইতে, 'আমাদের এই স্বর্ণপ্রসবিণী ভারত জননীই যে জ্যোতিষপ্রসবিণী' এ গর্ব্ব আমরা করিতে পারি। অধুনা জাতীয় অবনতির কালে আমাদের গৌরব করিবার যদি কিছু থাকে, তাহা এই জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান। খ্রীষ্টের জন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যমহর্ষিগণ যে সকল জ্যোতিষতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তদ্দর্শনে, আজ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি সময়ে, বহুবিধ যন্ত্রের সাহায্যে বিবিধ তত্ত্ব আবিষ্কার দ্বারাও, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আপনাদিগকে প্রাচীন ঋষিগণাপেক্ষা অধিকতর উন্নত মনে করেন কি না সন্দেহ। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ ভারতকেই জ্যোতিষের মূল উৎপত্তি স্থান বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্র।

যে শাস্ত্রদ্বারা জ্যোতিষ্পথস্থিত গ্রহনক্ষত্রগণের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল ও গ্রহণ, পরস্পরের অন্তর ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ, এবং তাহাদের গতি স্থিতি ও সঞ্চারানুসারে মানবজীবনের শুভাশুভ যাবতীয় বিষয় নিরূপণ করিতে পারা যায় তাহারই নাম জ্যোতিষ শাস্ত্র।

---

* সাহিত্য-সভার মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

উৎপত্তি ।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এই জ্যোতিষশাস্ত্র সর্ব্বপ্রথমে আদিপুরুষ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভের নিকটে অবগত হয়েন, এবং তদনন্তর মুনিগণের প্রার্থনায় তিনি সেই নিত্য, সমগ্র বিশ্বের প্রকাশক, গ্রহচরিতবেত্তা পণ্ডিতগণের জ্ঞানচক্ষুরূপ এবং অধ্যাত্মরূপ গুহ্যশাস্ত্র জগতে প্রচার করেন ।

প্রবর্ত্তক ।

সূর্য্য, পিতামহ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, লোমশ, পৌলিশ, ভৃগু, যবন, বৃহস্পতি এবং শৌনক এই অষ্টাদশ মুনি আর্য্যজ্যোতিষের প্রবর্ত্তক ; এতদ্ব্যতীত যবনাচার্য্য, রোমক, হিল্লাজ প্রভৃতি কয়েকজন যবন 'জাতক' ও 'তাজিক' জ্যোতিষ প্রণয়ন করেন। আমি এই মাত্র যে 'লোমশ' ও 'রোমক' নামদ্বয়ের উল্লেখ করিলাম, কোন কোন সংহিতাকার ঋষি তন্মধ্যে কেবলমাত্র 'লোমশ' পদটী ব্যবহার করিয়াছেন, আবার কেহ বা 'রোমক' পদের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ৺সুধাকর দ্বিবেদী প্রভৃতি জ্যোতিষাচার্য্যগণ মনে করেন, লোমশ ও রোমক পদদ্বয় একজনেরই নামান্তর মাত্র ।

বিভাগ ।

ভগবান্, সূর্য্য, ব্রহ্মা প্রভৃতি অষ্টাদশ মহর্ষি আর্য্যজ্যোতিষকে সিদ্ধান্ত, সংহিতা এবং হোরারূপ ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ আকারে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সিদ্ধান্ত ।

যে শাস্ত্রে সৃষ্টির আরম্ভকাল হইতে গ্রহদিগের গণনার উপায়, চান্দ্রমান, সৌরমান, সাবনমান প্রভৃতি কালের প্রভেদ, গ্রহগণের গতি, ব্যক্তগণিত, অব্যক্তগণিত সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তর, পৃথিবী, গ্রহ ও নক্ষত্রগণের সংস্থান, গ্রহবেধ ও সময়নিরূপণের উপযোগী নানা প্রকার যন্ত্র, এবং তদ্দ্বারা গ্রহবেধাদির উপায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ বলা যায়।

সংহিতা।

যাত্রা ও বিবাহাদির বিশুদ্ধ সময়, রাজা, মন্ত্রী, ধূমকেতু, উল্কাপাত প্রভৃতির ফল, হস্তী, ঘোটক প্রভৃতির শুভাশুভ লক্ষণ, রত্ন, মণি, মাণিক্য প্রভৃতির বিশুদ্ধতা পরীক্ষার উপায়, এবং পশুপক্ষী প্রভৃতির স্বরাদি দ্বারা শুভাশুভ অবগতির উপায়, যে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার নাম সংহিতা।

হোরা।

আর যে শাস্ত্র সাহায্যে জন্মকালীন গ্রহগণের অবস্থানুসারে মানবের শুভাশুভ কর্ম্মফল পরিজ্ঞাত হওয়া যায় সেই শাস্ত্র হোরা নামে কথিত।

বহুকাল যাবৎ আর্য্য জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত, সংহিতা ও হোরা নামক স্কন্ধত্রয় মধ্যে সিদ্ধান্ত, গণিত নামে, এবং সংহিতা ও হোরা ফলিত জ্যোতিষ নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। আমিও অদ্য জ্যোতিষের এই স্কন্ধত্রয় গণিত ও ফলিত নামেই আলোচনা করিব।

জ্যোতিষ গ্রন্থাদি পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, পুরাকালে ভারতে জ্যোতির্ব্বিদ্যার পরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এই শাস্ত্র বেদের একতম প্রধান অঙ্গ বলিয়া তৎকালে এই বেদাঙ্গবিদ্ জ্যোতিষীর দর্শনও পুণ্যকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। আর্য্যঋষিগণ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানবলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানবৎ প্রত্যক্ষ করিতেন। কিন্তু অধুনা ত্রিকালদর্শী দূরে থাকুক, বর্ত্তমান-দর্শী জ্যোতিষী প্রাপ্ত হওয়াও দুর্ঘট। কালের কি কুটিল গতি! আর্য্যঋষি-প্রণীত প্রত্যক্ষফলপ্রদ জ্যোতিষশাস্ত্রের কি ঘোরতর অবনতিই ঘটিয়াছে! কিন্তু কি কারণে আজ জ্যোতিষশাস্ত্রের এরূপ অবনতি ঘটিয়াছে? আর জ্যোতি-র্ব্বিদ্গণ আজ জনসাধারণের এত অশ্রদ্ধার পাত্রই বা হইয়াছেন কেন?

জ্যোতিষশাস্ত্রের অবনতির কারণ।

এ বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারত যখন মুসলমান রাজগণের করতলগত হয়, সেই সময়ে সংস্কৃত চর্চ্চার বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল। বিপন্ন হিন্দুরাজগণের সাহায্যাভাবে আর্য্যজ্যোতিষের উন্নতিস্রোত হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া অতি ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হইতেছিল। হিন্দুশাস্ত্রের ভিত্তি অতিশয় দৃঢ় বলিয়াই

নানা ঘাতপ্রতিঘাতসত্ত্বেও বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্ব সম্যক্ বিলুপ্ত হয় নাই। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, জাতীয় অবনতির সময়ে জ্যোতিষ অধ্যাপকগণ শিক্ষাদানে কৃপণতা করিয়া স্ব স্ব প্রাধান্য রক্ষার জন্য কয়েকটী উৎকৃষ্টতর বিষয় কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। সে সকল বিষয় তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের সহিত এ জগৎ হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। আবার আজ কাল জ্যোতিষী হওয়া অপেক্ষা জীবিকানির্ব্বাহের সহজ উপায় আর নাই। দুই একখানা ফলিত জ্যোতিষের সংগ্রহগ্রন্থ পাঠ করিলেই হইল। ইহাতে চিকিৎসাশাস্ত্রের ন্যায় দায়িত্ব নাই, কেবলমাত্র বাক্যবীর হইলেই যথেষ্ট অর্থাগম হইয়া থাকে। অনেকে আবার সংগ্রহগ্রন্থ পাঠেরও কষ্ট স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না। সন্ন্যাসিদত্ত শক্তি কিংবা দৈবশক্তিবলে তাঁহারা জ্যোতিষী। তাঁহারা করকোষ্ঠী দৃষ্টে ভবিষ্যৎ গণনা করিয়াই ক্ষান্ত নহেন; জন্মপত্রিকা বিচার এবং জন্মপত্রিকা প্রস্তুত পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন। অনেকে এই সকল অপটু জ্যোতিষী দ্বারা গণনা করাইয়া বিফলমনোরথ হয়েন, শাস্ত্র অমূলক মনে করেন, এবং জ্যোতির্ব্বিদগণের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অধুনা কোষ্ঠী প্রস্তুত ও কোষ্ঠীবিচারে আর এক মহা বিভ্রাট দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন জ্যোতিষী বিংশোত্তরীমতে, এবং কেহ বা অষ্টোত্তরী মতে কোষ্ঠী গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কলিযুগে বিংশোত্তরী মতই গ্রাহ্য। পরাশরে উক্ত হইয়াছে,

"ফলানি নক্ষত্রদশাপ্রকারেণ বিবৃম্মহে।
দশা বিংশোত্তরী চাত্র গ্রাহ্যা নাষ্টোত্তরীমতাঃ॥"

অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগে বিংশোত্তরী দশাই গ্রাহ্য, অষ্টোত্তরী দশা অগ্রাহ্য। বিংশোত্তরী মতে ফলবিচার করিয়া ফলাফল নির্ণয় করিলে মানবজীবনের যাবতীয় ফলাফল অভ্রান্ত হইবে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অষ্টোত্তরী ফল বিচারের পুস্তকাদি তেমন নাই, এমন কি অষ্টোত্তরী মতে বিচারই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অষ্টোত্তরী মতে শুভগ্রহের দশা আসিলেই শুভফল, এবং অশুভগ্রহের দশায় অশুভফল কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে পারে না। অন্যান্য গ্রহের বলাবলানুসারে শুভগ্রহের দশায় অশুভফল এবং অশুভগ্রহের দশায়ও শুভফল ফলিয়া থাকে। শনি অশুভগ্রহ এবং বৃহস্পতি শুভগ্রহ। কিন্তু

শনির দশাতেও রাজ্যলাভ হইতে পারে, অথচ বৃহস্পতির দশাতেও অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন। অষ্টোত্তরী গণনার পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, বৃহস্পতির দশায় পুত্রলাভ হইয়া থাকে। মনে করুন, কোনও জাতকের পঞ্চম বর্ষে বৃহস্পতির দশা। কিন্তু এই পঞ্চবর্ষ বয়সে তাহার পুত্রলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিংশোত্তরী গণনা অতি দুরূহ, অপিচ বহু গ্রন্থাধ্যায়নসাপেক্ষ বলিয়া বিশেষ আয়াসলব্ধ। অর্থলোলুপ অল্পবিদ্য জ্যোতির্ব্বিদগণ এরূপ অত্যধিক ক্লেশ স্বীকার সমীচীন বলিয়া মনে করেন না, কিংবা দুরূহ গ্রন্থাদি অধ্যয়নের ক্ষমতা তাঁহাদের নাই; তাঁহারা পুঁথিগতবিদ্যার সাহায্যে অষ্টোত্তরী মতে মানবের শুভাশুভ ফল মিলনের বৃথা চেষ্টা করিয়া পদে পদে বিফলমনোরথ হয়েন, এবং সাধারণের অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকেন।

আর্য্যজ্যোতিষ শাস্ত্রের কালবিভাগ।

কোন প্রাচীন বিস্তৃত বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিতে হইলে তাহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত একটা আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস সংগ্রহ করা আবশ্যক, এবং তৎসঙ্গে তাহার একটা কালনির্ণয়েরও প্রয়োজন। আর্য্যঋষিগণের এই অতি প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলেও একটা কাল-বিভাগ একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন্ সময়ে কিরূপ অবস্থা ছিল এবং কখন কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারা যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রাচীন আর্য্যগণের প্রায় সকল জ্যোতিষগ্রন্থই আজ বিলুপ্ত। প্রাচীন জ্যোতিষগ্রন্থাদি লুপ্তপ্রায় না হইলে তৎসমুদায় হইতে আর্য্যজ্যোতিষের কালবিভাগ অতি সহজসাধ্য হইত। যাহা হউক, পুরাতন যে দুই একখানা জ্যোতিষগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তৎসমুদয় এবং সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থ ও বিবরণাদি আলোচনা করিয়া আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্-গণ আর্য্যজ্যোতিষের একটা কালবিভাগ করিয়াছেন। গণকতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে প্রাচীন আর্য্যজ্যোতিষের ইতিহাস ও কালবিভাগ অতি সুন্দররূপে লিপি-বদ্ধ হইয়াছে। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" নামক গ্রন্থেও ভারতীয় জ্যোতিষের ইতিবৃত্ত ধারাবাহিক ক্রমে অতি সুচারুরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থকার জ্যোতিষ-

চর্চা কালকে (১) বেদাঙ্গকাল; (২) সংহিতাকাল; (৩) সিদ্ধান্তকাল; (৪) করণকাল —এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

বেদাঙ্গকাল।

বেদ হিন্দুদিগের আদি ধর্ম্মগ্রন্থ। ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারিবেদ। ইহাদের আবার শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ, এই ছয়টী অঙ্গ।

বেদের উচ্চারণের নিমিত্ত উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরজ্ঞানলাভে 'শিক্ষা' নামক অঙ্গের প্রয়োজন। বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন্ কার্য্যের পর কি করিতে হইবে ইত্যাদি ক্রমবিশেষজ্ঞান 'কল্প' হইতে সম্পন্ন হয়। বৈদিকপদের শুদ্ধাশুদ্ধি 'ব্যাকরণ' সাহায্যে অবগত হওয়া যায়। বৈদিক মন্ত্রস্থ পদার্থসকলের জ্ঞান 'নিরুক্তজ্ঞান'সাপেক্ষ। মন্ত্রের গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি সাতটী বৈদিকছন্দ ও লৌকিক ছন্দের বিষয় 'ছন্দঃ' শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। আর বৈদিক কর্ম্মের অঙ্গীভূত দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি কালজ্ঞান এবং মানবের শুভাশুভ কর্ম্মফলের জ্ঞানলাভ জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম কালসাপেক্ষ। যেমন উপযুক্তকালে বীজবপন না করিলে তাহা অঙ্কুরিত বা ফলবান্ হয় না, তেমনই বৈদিক ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মসকল যথাকালে সম্পন্ন না হইলে ফলপ্রসূ হয় না। এই চিরন্তন সত্য সৃষ্টির আদিমকাল হইতে প্রচলিত। শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে—'বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ।" যে গ্রন্থানুসারে গণনা করিলে গ্রহগণের গণিতাগতস্থান দৃক্‌তুল্য হয়, তাদৃশ গ্রন্থানুসারে গণিত তিথ্যাদিই ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহার্য্য। বশিষ্ঠও বলিয়াছেন, "যে গ্রন্থানুসারে গণনা করিলে দৃষ্টির সহিত গণনার ঐক্য হয়, সেই গ্রন্থই প্রামাণ্য।" বেদের নানা মন্ত্রে ও উপনিষদে আমরা গ্রহনক্ষত্রগণের বহুবিধ বর্ণনা দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা একস্থানে সন্নিবিষ্ট নহে এবং তাহাতে গণনার প্রকৃষ্ট প্রণালীও সন্নিবেশিত নাই। বৈদিককালে চাক্ষুষদর্শনদ্বারা অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতির জ্ঞান সম্পন্ন হইত। বৈদিক ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মকর্ম্মাদি উপযুক্ত সময়ে সম্পন্ন হওয়ার অভিপ্রায়েই জ্যোতিষগ্রন্থকার মহর্ষিগণ দৃক্‌তুল্য গ্রহসাধনোপযোগী গ্রন্থ প্রণয়নে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কালক্রমে মহাত্মা লগধ 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষ' নামক জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এই গ্রন্থে অতি স্থূলভাবে গণনা সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং তাহাতে ৩৮৬ দিনে বৎসর, ৩০ তিথি, ২৭ নক্ষত্র, এবং দ্বাদশমাস ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। বেদাঙ্গকালের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ভারতীয় আর্য্যগণের আদিগ্রন্থ বেদেই আর্য্য জ্যোতিষের সর্ব্বপ্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত পাঠ করিলে তৎকালীন আর্য্যগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে কতদূর অভিজ্ঞ ছিলেন তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। জ্যোতিষের এই বেদাঙ্গকাল খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সংহিতাকাল।

খ্রীষ্টের জন্মের সহস্রাধিকবর্ষ পূর্ব্ব হইতে আর্য্যগণকে জ্যোতিষগণনার ফলাফলের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে দেখা যায়। ঐ সময়ে পরাশরাদি সংহিতায় জ্যোতিষশাস্ত্রের ফলগণনা বিস্তৃতিলাভ করে। প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যগণ জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করিয়া আসিতেছিলেন সংহিতায় তাহা লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের ন্যায় সেই সংহিতাকালের জ্যোতিষগ্রন্থাদিও বিলুপ্ত হইয়াছে। পরাশর সংহিতাও লোপ পাইয়াছে। আজকাল যে পরাশরতন্ত্র পাওয়া যায় তাহা আধুনিক। পরাশর ব্যতীত কশ্যপ, নারদ, গর্গ, ব্যাস, মনু, ভৃগু ও যবন সংহিতাকার ছিলেন।

সিদ্ধান্তকাল।

খ্রীষ্টের জন্মের পর হইতে সিদ্ধান্তকালের সূচনা। সূর্য্য, ব্রহ্মা, শৌনক, বশিষ্ঠ, পৌলিশ ও রোমক সিদ্ধান্তকার ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের রচিতগ্রন্থ একপ্রকার বিলুপ্ত বলিলেই চলে। সিদ্ধান্ত শাস্ত্র হইতে গ্রহগণনা করিতে হইলে সৃষ্টির আরম্ভকাল হইতে অভীষ্টকাল পর্য্যন্ত যতদিন দণ্ডাদি অতীত হইয়াছে তদ্দ্বারা অনুপাত করিয়া গ্রহসাধন করিতে হয়। কিন্তু তাহা অনেক পরিশ্রমসাপেক্ষ। এজন্য কোনযুগের আদি হইতে গতকাল হিসাব করিয়া, তদ্দ্বারা গণনা করিবার উপায় তন্ত্রশাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদপেক্ষাও পরিশ্রমলাঘবের জন্য, করণগ্রন্থে, অভীষ্ট কোন শকবর্ষ হইতে গ্রহসাধনের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধান্তকারগণ দৃষ্টির সহিত গণনার ঐক্য দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে,—"গ্রহদিগের গতি বিভিন্ন হইলেও যাহাতে দৃষ্টির

সহিত গণিতের ঐক্য হয় সেইরূপ গ্রন্থ আমি প্রণয়ন করিয়াছি।" পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তকারগণ নলিকাদি যন্ত্রদ্বারা গ্রহভেদ করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে মুনি-প্রণীত শাস্ত্রানুসারে গণনা করিয়া গ্রহগণ দৃক্‌তুল্য হইতেছেনা, তখন তাঁহারা মুনিপ্রণীত এই সকল সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন এক সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রহগণনা করত তাহার সহিত বাস্তবিক পরিদৃষ্টগ্রহস্থানের কত অন্তর তাহা নির্ণয় করিতেন। এই গণিতাগত গ্রহস্থান ও বাস্তবিক গ্রহস্থানের অন্তরের নাম বীজ। তাঁহারা এই বীজ বা অন্তর মুনিপ্রণীত শাস্ত্রে সংস্কার করিয়া নূতনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খ্রীষ্টীয় ৩৯৮ অব্দে পাটলীপুত্রনগরে ভারতীয় লুপ্তপ্রায় জ্যোতিষশাস্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা আর্য্যভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আর্য্যভট্টতন্ত্র নামে এক প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করিয়া স্বীয় অনন্যসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

লল্লাচার্য্য আর্য্যভট্টের বহু শিষ্যের মধ্যে একজন। তিনি কালে একজন খ্যাতনামা জ্যোতিষী হইয়াছিলেন। তিনিও একখানি সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতমরত্ন মহামতি বরাহমিহির, পৌলিশ, রোমক, বশিষ্ট, সূর্য্য এবং ব্রহ্মপ্রণীত সিদ্ধান্ত অবলম্বনে পঞ্চসিদ্ধান্তিকানামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে এই পাঁচখানা সিদ্ধান্তগ্রন্থের মধ্যে পৌলিশ-সিদ্ধান্তের গণনা স্ফুট অর্থাৎ দৃক্‌তুল্য, রোমক সিদ্ধান্তের গণনা দৃক্‌তুল্যের নিকটবর্ত্তী, সূর্য্যসিদ্ধান্তের গণনা স্ফুটতর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অধিক দৃক্‌তুল্য। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও বশিষ্ঠ সিদ্ধান্তের মতে গণনা করিলে বাস্তবিক গ্রহস্থান হইতে বহু-পার্থক্য উপলব্ধ হয়। তজ্জন্য ইহাদের গণনা অগ্রাহ্য। ব্রহ্মপ্রণীত সিদ্ধান্তে বীজসংস্কার করিয়া ব্রহ্মগুপ্ত নূতন সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন। ক্রমে মুঞ্জাল, শ্রীপতি, ভোজরাজ, শতানন্দ প্রভৃতি আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী স্ব স্ব সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ১০৩৬ শকে জ্যোতিষ সিদ্ধান্তকার-দিগের মধ্যে মধ্যাহ্ন ভাস্করতুল্য ভারতগৌরব মহামতি ভাস্করাচার্য্য কর্ণাট প্রদেশান্তর্গত বীজাপুর নামক স্থানে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি সিদ্ধান্ত শিরোমণি, বীজগণিত, লীলাবতী, প্রভৃতি সর্ব্বজন প্রশংসিত বহুগ্রন্থ প্রণয়নপূর্ব্বক, অসামান্য বুদ্ধি কৌশল প্রদর্শন করতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকেও বিস্ময়াভিভূত করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, "সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলি মহামতি গোলগণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক সময়ে সময়ে পরিশোধিত

হওয়ায় গণিতাগত স্থান এবং বাস্তবিক গ্রহস্থানে অধিক পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছেনা।" বেদের চক্ষুস্বরূপ জ্যোতির্গণনা দ্বারা ধর্ম্মকার্য্যের কালাকাল নিরূপণ আবহমানকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। গণিতাগতগ্রহে কত অন্তর পড়িয়াছে তাহা অবগত হইবার জন্য, এবং ধর্ম্মকর্ম্মাদির কালাকাল দৃক্‌সিদ্ধরূপে নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় রাজন্যবর্গ বিপুল অর্থব্যয়ে বহুমানমন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা করিতেন। এই সকল মানমন্দির হইতেই গ্রহবেধ হইত।

করণকাল।

সিদ্ধান্তকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎপর হইতেই করণকালের সূচনা। এই করণকালেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকার অবনতি পরিলক্ষিত হয়। ১০৭২ শকে ভাস্করাচার্য্য তাঁহার 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' প্রণয়ন করেন। ইহার স্বল্পকাল পরেই মুসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। হিন্দু নরপতিগণ এই উপস্থিত বিপদের সময়েও ঘোরতর আত্মকলহে প্রবৃত্ত হয়েন এবং আর্য্যঋষিগণের প্রাচীন গৌরব রক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়েন। ক্রমে ভারত মুসলমানগণের করতলগত হয়। কিন্তু তখনও ভারতের জ্যোতিষগৌরব-রবি সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয় নাই। রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ জয়পুর, দিল্লী ও কাশীধামে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রহ-বেধাদির সুবিধা করিয়া দেন। তাঁহার সভায় গ্রীস্‌ ও আরবদেশ হইতে সমাগত কয়েকজন জ্যোতিষী অবস্থান করিতেন। জগন্নাথ পণ্ডিত আরবীয় ভাষা হইতে ১৫ অধ্যায় জ্যামিতিশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। এই জ্যামিতিশাস্ত্র আর্য্য-ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হইলেও, ইহা আরবদেশে উন্নতিলাভ করে এবং তথা হইতে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে নীত হয়। জগন্নাথ আরবীয় ভাষায় লিখিত মেগাষ্টি নামক জ্যোতিষগ্রন্থ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া 'সম্রাট্ সিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খ্রীষ্টীয় ১০৯২ অব্দে বঙ্গ ও মিথিলাপতি বল্লালসেন 'অদ্ভুতসাগর' নামক এক জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৪৪২ শকে বৃহত্তিথি চিন্তামণি, গ্রহলাঘব প্রভৃতি জ্যোতির্বিষগ্রন্থের প্রণেতা গণেশ দৈবজ্ঞ প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "আর্য্যতন্ত্র পরাশর সিদ্ধান্তে অন্তর দেখিয়া সংস্কার বিশেষ দ্বারা নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতেও কালক্রমে অন্তর হইতেছে

দেখিয়া দুর্গসিংহ, বরাহমিহির প্রভৃতি তাহার সংস্কার করত স্ব স্ব গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাও অন্তরিত হওয়ায় বিষ্ণুপুত্র ব্রহ্মগুপ্ত বেধ দ্বারা সংস্কার পূর্ব্বক নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তদনুসারেও গণনায় পার্থক্য অনুভূত হওয়ায় মদীয় পিতৃদেব কেশব দৈবজ্ঞ মহাশয় তাহার সংস্কারপূর্ব্বক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার ৬০ বৎসর পর পুনর্ব্বার সংস্কারের আবশ্যকতা হওয়ায় আমি দৃষ্টি ও গণিতের ঐক্য সম্পাদক এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছি।" বস্তুতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈদিককাল হইতে গণেশ দৈবজ্ঞ পর্য্যন্ত ভারতের যাবতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌ই এই দৃক্‌সিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে, গণনা দৃষ্টির সহিত যে পরিমাণে এক সেই পরিমাণেই অভ্রান্ত। সুতরাং যখন যে গণনা দৃক্‌সিদ্ধ হইবে তখন তদ্দ্বারাই তিথ্যাদি নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। প্রাচীনকালে জ্যোতিষ শাস্ত্র তাৎকালিক দৃক্‌প্রত্যয়ানুযায়ী ছিল, এক্ষণে নানা কারণে দৃক্‌সিদ্ধ হইতেছে না। অতএব সংস্কার আবশ্যক। আর্য্য ঋষিগণ এ মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ভাস্করাদি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণও অসঙ্কোচে পরিবর্ত্তন সংশোধন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণকেও প্রয়োজনমত সংস্কার করিতে স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ দিয়াছেন। গণেশ দৈবজ্ঞের পর হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল গণনা দৃক্‌সিদ্ধ না হওয়াতে পঞ্জিকা সমূহে ভ্রম উপলব্ধি করা সত্ত্বেও আর কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ গ্রহগণিত সংস্কারে সাহসী হয়েন নাই। কিন্তু এ সময়ে সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক একথা সুধীজন মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই সংস্কারাভাবে আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্মের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং গণনার উপাদান সমূহের পরিবর্ত্তন দ্বারা গণনা যাহাতে দৃক্‌সিদ্ধ হয় সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া প্রত্যেক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরই একান্ত কর্ত্তব্য। গণেশ দৈবজ্ঞের পর ক্রমে বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞ, কৃচনাচার্য্য, রাঘবানন্দ, রঘুনাথ শর্ম্মা, মহাদেব, দামোদর, নীলাম্বর শর্ম্মা, শঙ্কর, বাপুদেব শাস্ত্রী ও সুধাকর দ্বিবেদী প্রভৃতি বহু জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রাদুর্ভূত হয়েন। কিন্তু কেহই তাঁহাদের পূর্ব্বগত মহাপুরুষদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

মুসলমান সম্রাট্‌গণের সময়েও জ্যোতিষীদিগের সমাদর সম্যক্ লোপ পাইয়াছিল একথা বলা যায় না। সম্রাট্ আওরাঙ্গজেবের সভাস্থ জ্যোতিষী কমলাকর 'সিদ্ধান্ত তত্ত্ববিবেক' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি গণিত বিষয়ে

অশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কমলাকর গণিতে পাণ্ডিত্য দেখাইলেও গ্রহবেধ বিষয়ে নিজের অপটুতা স্বীকার করিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বকালে কমলাকর ব্যতীত রঙ্গনাথ প্রভৃতি কয়েকজন জ্যোতিষী কয়েকখানা সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল গ্রন্থ তাদৃশ উপাদেয় নহে। বর্ত্তমান ইংরেজ রাজত্বেও উড়িষ্যার মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সামন্ত 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' নামক একখানা সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থানুসারে উড়িষ্যার পঞ্জিকা গণিত হয়। নাবিক পঞ্জিকার গণনার সহিত ইহার গণনার অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। বোম্বাই প্রদেশে কেরোপন্থ, বেঙ্কটেশ, কেতকর প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইউরোপীয় জ্যোতিষ এবং ভারতীয় জ্যোতিষের সংমিশ্রণে যথাক্রমে 'কেরোপন্থসারণী' ও 'জ্যোতির্গণিত' এবং আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থানুসারেই বোম্বাই প্রদেশের পঞ্জিকা গণিত হইতেছে। বঙ্গদেশীয় অধুনাতন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ, সহজে পঞ্জিকা গণনার উপযোগী অনেকগুলি করণগ্রন্থ ও ফলিতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণনগর রাজসভার জ্যোতির্ব্বিদ্ রাঘবাচার্য্য প্রণীত সিদ্ধান্তরহস্য, দিনচন্দ্রিকা, বিদগ্ধতোষিণী ও বিশ্বহিত, বালীনিবাসী মথুরানাথ দৈবজ্ঞ প্রণীত গ্রহার্ণব, এবং নবদ্বীপনিবাসী রামাচার্য্য প্রণীত দিনকৌমুদী প্রধান। ফলিত জ্যোতিষগ্রন্থের মধ্যেও রাঢ়দেশীয় শ্রীনিবাসকৃত শুদ্ধিদীপিকা এবং গঙ্গাতীরনিবাসী শ্রীনাথভট্টকৃত কোষ্ঠীপ্রদীপ উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় জ্যোতিষিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচনা করিতে গিয়া দেখা গেল যে, ভারতের অন্যান্য দেশাপেক্ষা আমাদের বঙ্গদেশ জ্যোতিষ চর্চ্চা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। একমাত্র শ্রীধরাচার্য্য ব্যতীত অন্য কোনও জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রাচীন বঙ্গদেশকে অলঙ্কৃত করেন নাই। শ্রীধর 'ত্রিশতিকা' নামক একখানা পাটীগণিত প্রণয়ন করেন। তিনি একখানা বীজগণিতও প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য বা বিলুপ্ত।

ফলিত জ্যোতিষ।

আমি যে গণিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, তাহার সহিত ফলিত জ্যোতিষের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; ফলিত জ্যোতিষ গণিত জ্যোতিষের উপর সম্পূর্ণ-

রূপে নির্ভর করে। ফলিত জ্যোতিষ সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রাদির গতি, স্থিতি ও সঞ্চারানুসারে মানবের কার্য্যাবলী শুভাশুভ ফল এবং মানবাদৃষ্টের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের অবশ্যম্ভাবী ঘটনাবলী অবগত হওয়া যায়। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মা মানবের অদৃষ্টচক্রে সদসৎ, শুভাশুভ যে কর্ম্মফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, দীপ যেমন অন্ধকার গৃহস্থিত ঘটাদি সকল বস্তুর প্রকাশক, ফলিত জ্যোতিষও সেইরূপ মানবাদৃষ্টের তত্তৎ শুভাশুভ কর্ম্মফলের প্রকাশক। কিন্তু মানবের এই ভাগ্যফল অবগতির আবশ্যকতা কি? ভবিষ্যৎ যদি সুখময় না হয় তবে অদৃষ্ট কর্ম্মফল পরিজ্ঞাত হওয়ায় লাভ কি? মানুষ কি তাহার ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ? যদি কার্য্য কারণ সূত্র অলঙ্ঘ্য হয়, এবং যদি অতীতের সঞ্চিত কারণ সমূহই ভবিষ্যৎ কার্য্যের নিয়ামক হয়, তবে ভবিষ্যৎ কে রোধ করিবে? আর যদি ভবিষ্যৎকে রোধ করিতেই না পারা যায় তবে ভবিষ্যতের অন্ধকারময় যবনিকা উত্তোলন করিয়া ভাবি দুঃখ বিপদের চিত্রদর্শন করিয়া বর্ত্তমান সুখময় জীবন দুঃখপূর্ণ করিয়া তুলি কেন?" এরূপ প্রশ্ন অনেকেই উত্থাপন করিয়া থাকেন। এ প্রশ্ন নূতন নহে, বহুপুরাতন। অদৃষ্টবাদ এবং পুরুষকারবাদে এই প্রশ্নই পল্লবিত হইয়াছে।

দৈব এবং পুরুষকার।

"পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সদসৎকর্ম্মবিপাকো দৈবম্" অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সদসৎ কর্ম্মফলের নাম দৈব বা অদৃষ্ট। আর "ঐহিক আত্মকৃত কর্ম্ম" অর্থাৎ ইহজন্মের নিজকৃত কর্ম্মের নাম পুরুষকার। এই অদৃষ্টবাদী ও পুরুষকারবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে আবহমান কাল হইতে ঘোরতর দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা ঘোরতর অদৃষ্টবাদী তাঁহারা বলেন, "পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ ফল অবশ্যম্ভাবী। স্বয়ং দেবমন্ত্রী বৃহস্পতিও স্বকৃতকর্ম্মফল খণ্ডন করিতে সমর্থ হয়েন না। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাত ঘটিবেই। অতএব ফলিত জ্যোতিষের সাহায্যে অর্থাৎ কোষ্ঠী, ঠিকুজী প্রস্তুত করাইয়া ভাগ্যফল জানিবার প্রয়োজন কি?" ইঁহাদের বিরুদ্ধে পুরুষকারবাদী সম্প্রদায় বলিতেছেন, "যদি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলই অবশ্যম্ভাবী হয় তবে অগ্নিতে গৃহদগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে দমকল আনাইয়া অগ্নিনির্ব্বাপিত করিবার প্রয়োজন কি? গৃহে চোর প্রবেশ করিলে চীৎকার করিয়া পাড়ার লোক ও পুলিশ একত্র করিবার আবিশুক কি? পরিবারস্থ কাহারও উৎকট পীড়ার সময়ে সর্ব্বপ্রধান

চিকিৎসক আনয়ন করিয়া অর্থব্যয়ই বা কর কেন? প্রচুর শস্য প্রাপ্তির আশায় যথা সময়ে ভূমিকর্ষণ ও বীজ বপন করিবার আবশ্যকতা কি? যদি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হও, তাহা হইলে কেবলমাত্র অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিও না। যেহেতু,—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি॥

উদ্যোগী পুরুষের প্রতিই লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ অনুগ্রহ দেখা যায়। আর কাপুরুষেরাই দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে।” পুরুষকারবাদিগণ দৈবের পরিবর্ত্তে পুরুষকারকেই উচ্চস্থান প্রদান করেন।

যাজ্ঞবল্ক্য দৈব এবং পুরুষকার এতদুভয়েরই আবশ্যকতা স্বীকার করত বলিয়াছেন, “রথের একটি চক্রের দ্বারা যেমন রথ চলিতে পারেনা সেইরূপ পুরুষকার ব্যতীত কেবলমাত্র দৈব সাহায্যেও কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না।” কেহ কেহ আবার এই উক্তির বিরুদ্ধে তর্ক করিয়াছেন,—

“অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতিকারো ভবেদ্ যদি।
তদা দুঃখৈর্ন বাধ্যেরন্ নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ॥”

অর্থাৎ যাহা অবশ্যম্ভাবী, পুরুষকার প্রয়োগে যদি তাহার প্রতিকার সম্ভবপর হইত তবে নলরাজা, শ্রীরামচন্দ্র, এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কখনই দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। এস্থলে দেখা যায়, ভাগ্যফলই অবশ্যম্ভাবী, পুরুষকার ভাগ্যফল খণ্ডন করিতে পারে না। অনেককে দেখিতে পাওয়া যায়, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও ঈপ্সিত কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। আবার অনেকে হয়ত সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিয়াও বিশেষ লাভবান্ হইয়া থাকেন। আমাদের এই বঙ্গদেশেই অনেক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি রহিয়াছেন যাঁহারা অতি সামান্য অবস্থা হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে বা দত্তকপুত্ররূপে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহাদের পুরুষকারের বিন্দুমাত্রও প্রয়োগ দেখা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলই তাঁহাদের এই বিপুল বিভবের কারণ।

বস্তুতঃ ভাগ্যফল আলোচনা করিতে গেলে দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে একের প্রাবল্য ও অপরের দৌর্ব্বল্য সর্ব্বদাই স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে;—

"দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যপহন্যতে।
দৈবেন চেতরেৎ কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে॥"

অর্থাৎ প্রবল পুরুষকার, দুর্ব্বল দৈবকে পরাজিত করিয়া থাকে, এবং প্রবল দৈব দুর্ব্বল পুরুষকারকেও পদে পদে বাধা দিয়া থাকে।

স্থির ভাগ্য এবং অস্থির ভাগ্য।

আমি যে ভাগ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, তাহা দ্বিবিধ যথা,—স্থিরভাগ্য এবং অস্থির ভাগ্য। আমাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্মফলও দ্বিবিধ যথা,—দৃঢ় কর্ম্মার্জ্জিত বা স্থিরভাগ্যসম্ভূত ফল এবং অদৃঢ়কর্ম্মার্জ্জিত অথবা অস্থির-ভাগ্যসম্ভূত ফল।

দৃঢ়কর্ম্মার্জ্জিত ও অদৃঢ়কর্ম্মার্জ্জিত ফল।

আমাদের দৃঢ়কর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। প্রবল পুরুষকারের প্রয়োগেও তাহার প্রতিকার করা অসম্ভব। কিন্তু মানবের অদৃঢ়কর্ম্মার্জ্জিত ফল ইহজন্মের কর্ম্ম বা পুরুষকার বলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; কিন্তু এই পুরুষকারের প্রয়োগ কখন করিতে হইবে? প্রত্যেক ক্রিয়ানুষ্ঠানের এক একটা উপযুক্ত সময় আছে। একটী ক্ষেত্রে প্রচুর উৎপাদিকা শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহাতে অসময়ে বীজবপন করিলে বীজগুলি নষ্ট হইয়া যায়, এবং পরিশ্রমেরও অপব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে কর্ষণ পূর্ব্বক সেই ক্ষেত্রে বীজ বপন ও জলসিঞ্চনাদি করিলে প্রচুর শস্যলাভ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় অশুভদশা অবগত না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সেই অশুভ মুহূর্ত্তে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তাঁহার অশুভসময় জনিত আশা ভঙ্গ ও পণ্ডশ্রম অনিবার্য্য। অথচ সেই ব্যক্তিই শুভদশাতে বা শুভ মুহূর্ত্তে কার্য্যারম্ভ করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইয়া থাকেন। এ স্থলেই আমাদের ফলিত জ্যোতিষের আবশ্যকতা। জ্যোতিষ শাস্ত্র ভিন্ন আর কোন শাস্ত্র নাই যাহা মানবের পুরুষকার প্রয়োগের এই শুভ মুহূর্ত্তের জ্ঞাপক। এই জন্যই মানবের কোষ্ঠী, ঠিকুজী অথবা জন্মপত্রিকার প্রয়োজন। শাস্ত্রকার যথার্থই বলিয়াছেন,—

"যস্য নাস্তি খলু জন্মপত্রিকা যা শুভাশুভফলপ্রকাশিনী।
অন্ধকবতি তস্য জীবনং দীপহীনমেব মন্দিরং নিশি॥"

অর্থাৎ যাহার শুভাশুভ ফলপ্রকাশিনী জন্মপত্রিকা নাই তাহার জীবন নিশা-কালীন দীপবিহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন মন্দিরের ন্যায়।

আমরা ফলিত জ্যোতিষ সাহায্যে ফল গণনা দ্বারা আমাদের দৃঢ়কর্ম্মার্জ্জিত ও অদৃঢ়কর্ম্মার্জ্জিত এই উভয়বিধ শুভাশুভ কর্ম্মফল অবগত হইতে পারি, আমাদের শুভাশুভ দশার কাল জানিতে পারি, আর কখন কোন্ গ্রহ বিরুদ্ধ এবং কখন কোন্ গ্রহ আমাদের প্রতি প্রসন্ন তাহাও জ্ঞাত হইতে পারি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানবের দৃঢ়কর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগ অনিবার্য্য। সেই ফল শুভ হইলে আনন্দের সহিত তাহার আগমন প্রতীক্ষা করা যাইতে পারে; আর অশুভ হইলে, সেই অশুভফলভোগোপযোগী সাহস ও বল সঞ্চয় করিতে পারা যায়। অদৃঢ়কর্ম্মার্জ্জিত অশুভ ফল পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা যাইতে পারে। গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে উপযুক্ত সময়ে শান্তি স্বস্ত্যয়ন দ্বারা অশুভ গ্রহের শান্তি করা যাইতে পারে। আর গ্রহ অনুকূলে থাকিলে বা দৈব সহায় থাকিলে শুভ মুহূর্ত্তে পুরুষকার প্রয়োগ করত অত্যধিক উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কার্য্য করিয়া আশা-তীত ফল লাভ করিতে পারা যায়। ইহা হইতেই ভাগ্যফল অবগতির আবশ্যকতা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

আমি এই মাত্র 'গ্রহবিরুদ্ধতা' ও 'গ্রহশান্তি' কথাদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছি। অনেকেই হয়ত মনে করিতে পারেন, 'এ আবার কি? গ্রহবিরুদ্ধই কি আর গ্রহশান্তিই বা কি? এ সকল বুজরুকী কথা। বাস্তবিক অনেকেই এই গ্রহ-বিরুদ্ধতা ও গ্রহশান্তিতে প্রত্যয় করেন না। কিন্তু বস্তুতঃ এ সকল কথা অবাস্তব কল্পনা প্রসূত নহে। এ সকল কথা ত্রিকালজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী অসীমধীশক্তিসম্পন্ন ঋষিগণ প্রণীত শাস্ত্রোক্ত, অভ্রান্ত সত্য। শুধু জ্যোতিষশাস্ত্রে কেন, আয়ুর্ব্বেদেও গ্রহবিরুদ্ধতা এবং গ্রহশান্তির উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। চরকে উক্ত হইয়াছে,—

"গ্রহেষু প্রতিকূলেষু নানুকূলম্ হি ভেষজম্।
তে ভেষজানাং বীর্য্যাণি হরন্তি বলবন্ত্যপি॥"

অর্থাৎ গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে বিশুদ্ধ ঔষধেও রোগীর কোন উপকার হইতে পারে না; বিরুদ্ধগ্রহ বলবান্ ঔষধের সকলগুণ নষ্ট করিয়া থাকে।

এই জন্যই অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াও রোগীর কোন উপকার হয় না। অথচ তত্তৎ স্থলে জন্ম পত্রিকা সাহায্যে গ্রহদোষ অবগত হইয়া বিরুদ্ধ গ্রহের শান্তি করাইবার পর আশ্চর্য্য সুফল ফলিয়া থাকে। এই গ্রহশান্তির কথা আজ নূতন নয়, ইহা ঔপন্যাসিক কল্পনা নয়, ইহা অতি সত্য কথা। একথা সামবেদে গোভিলের পরিশিষ্টেও অতি স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। আর্য্যসমাজেও এই শান্তিপ্রথা বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে কথা এই যে, এই সকল কার্য্যোপযোগী প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও কর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত আজকাল অতি বিরল।

এই গ্রহশান্তির প্রকরণ বহুপ্রকার, যথা,—গ্রহস্নান, গ্রহদান, গ্রহপূজা, গ্রহহোম, গ্রহকবচ ধারণ এবং গ্রহ রত্নাদি ধারণ ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেক বিষয়ে আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র গ্রহরত্নাদি ধারণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

স্মরণাতীত কাল হইতেই মণিরত্নসমূহ মানবের অতি প্রয়োজনীয় এবং আদরের সামগ্রী। নরনারীমাত্রেই, ইহার ব্যবহার মঙ্গলজনক বলিয়া, অল্পাধিক ধারণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নারীসমাজে মণিরত্ন-খচিত অলঙ্কার ধারণের আবশ্যকতা বিলাসিতার নামান্তর মাত্রে পর্য্যবসিত। এই মণিরত্নাদির ধারণ আজ নূতন নয়। অতি প্রাচীন কালে আর্য্যঋষিগণের সময়েও রত্নাদিধারণের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ঋষিগণ বিলাসপ্রিয় ছিলেন না। সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাঁহারা বিলাসিতার জন্য রত্নালঙ্কার পরিধানের কিম্বা মণিমুক্তা ধারণের ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। তাঁহাদের এই ব্যবস্থার অন্তরালে অতি উচ্চ উদ্দেশ্য ছিল। মণিরত্নাদি ধাতুসমূহ শারীরিক মঙ্গলপ্রদ, এবং গ্রহনির্ব্বিশেষে সুফলপ্রদ বলিয়াই তাঁহারা মানবের হিতার্থে এই সকল রত্নধারণের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিলে বুধ ও বৃহস্পতি গ্রহ প্রীত হয়েন এবং তাহাতে রমণীগণ অতি নম্রস্বভাবা, মিষ্টভাষিণী ও লক্ষ্মীযুক্তা হইয়া থাকেন। রৌপ্যালঙ্কারধারণে শুক্রগ্রহ প্রীত হইয়া থাকেন এবং তাহার ফলে নারীগণ সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ু সন্তানপ্রসবিনী হয়েন। এতদ্ব্যতীত মানবদেহের উপর মণিমাণিক্য ও রত্নাদির রাসায়নিক প্রক্রিয়াও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে মানবদেহের নানাপ্রকার ব্যাধিরও উপশম হইয়া থাকে।

শাস্ত্রানুসারে মণিরত্নাদি ধারণে কি ফল, কোন্ গ্রহ বিরূপ হইলে কোন্ ধাতু বা রত্ন ধারণ প্রশস্ত, তাহা দীপিকায় বিশিষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"মাণিক্যং বিগুণে সূর্য্যে বৈদূর্য্যং শশলাঞ্ছনে।
প্রবালং ভূমিপুত্রে চ পদ্মরাগং শশাঙ্কজে।
গুরৌ মুক্তাং ভৃগৌ বজ্রমিন্দ্রনীলং শনৈশ্চরে।
রাহৌ গোমেদকং ধার্য্যং কেতৌ মরকতং তথা॥"

অর্থাৎ সূর্য্যগ্রহ বিরুদ্ধ হইলে মাণিক্য, চন্দ্রগ্রহে বৈদূর্য্য, মঙ্গলে প্রবাল, বুধে পদ্মরাগ, বৃহস্পতিতে মুক্তা, শুক্রে হীরক, শনিতে ইন্দ্রনীল, রাহুতে গোমেদক এবং কেতুগ্রহে মরকতমণি বা পান্না ধারণ করিবে।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে আর্য্যঋষিগণের এই সকল উপাদেয় এবং হিতকর উপদেশ পদে পদে উপেক্ষিত হইতেছে। রৌপ্যালঙ্কার অল্পমূল্য অথচ হালফ্যাসানবিরুদ্ধ বলিয়া ইহার ব্যবহার লুপ্তপ্রায়। আর মণিমুক্তাখচিত রত্নালঙ্কার শুভফল লাভের অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত না হইয়া ভদ্রমহিলাগণের বিলাসদ্রব্যে পরিণত।

বিবাহগণনা বা যোটকবিচার আমাদের আর এক অতি প্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। এ সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। পতি পত্নী উভয়ের রাশি, নক্ষত্র, গণ এবং বর্ণ মিলাইয়া বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। চন্দ্র হইতে রাশি গণনা হয়, এবং নক্ষত্র হইতে গণ নিরূপিত হয়। চন্দ্র মনকারক গ্রহ। সুতরাং উভয়ের রাশির সাদৃশ্য থাকিলে দম্পতির মানসিক অবস্থা এক-প্রকার হইয়া থাকে, এবং তাহাতে বিবাহ-জীবন অতীব সুখময় হইতে দেখা যায়। আবার, পরস্পরের রাশির প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইলে স্বামী, স্ত্রী উভয়েরই মানসিকবৃত্তি বিভিন্ন হয় এবং পরিণামে সেই পরিবারে অতি বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। বিবাহগণনায় গণ, বর্ণ মিলন ব্যতীত আরও অনেক বিবেচ্য বিষয় আছে। মনে করুন, একটী যোটকবিচারে দেখা গেল পাত্র পাত্রীর গণ, বর্ণ, রাশি, নক্ষত্র মিলনাদি অতি উত্তম হইয়াছে। কিন্তু পাত্রীর বৈধব্য যোগ রহিয়াছে। শাস্ত্রানুসারে এ বিবাহ সর্ব্বৈব অসঙ্গত। তবে এ মেয়ের কি বিবাহ হইবে না? অনেকে হয় ত তাহাই মনে করিতেছেন। কারণ, কে এই বৈধব্য-যোগসম্পন্না পাত্রীর সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিবেন? কিন্তু যে পাত্রের পত্নী-

হানি যোগ রহিয়াছে তাহার সহিত এই কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হইলে অতি উত্তম হইবে এবং উভয়ের পতিপত্নীহানি যোগের খণ্ডন হইবে।

অনেকে বিবাহগণনার কোন প্রয়োজন মনে করেন না। লোকে সামান্য এক কাঠা ভূমি ক্রয় করিতে গিয়া উকীল ব্যারিষ্টারের সহিত কত পরামর্শ, কত লেখাপড়া ও কত দেখাশুনা করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহাতে ভাবী পতিপত্নীর সুখ, দুঃখ ও শুভাশুভ সকল বিষয় সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহার মুসবিদা বা পাণ্ডুলিপি বিশেষরূপে পরীক্ষা করাইবার আবশ্যকতা আদৌ অনুভব করেন না, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? আবার অনেকে কোষ্ঠী, ঠিকুজীও প্রস্তুত করান সত্য, কিন্তু বিবাহ সময়ে আর কোষ্ঠীর মিলন না করাইয়া বর্ত্তমান যুগানুযায়ী আর্থিক মিলন করাইয়াই নিজ নিজ পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। হয় ত নরগণ ও রাক্ষসগণে বিবাহ দেওয়ায় বিবাহের একমাস মধ্যেই পুত্র মৃতদার হইল, কিম্বা কন্যাটী বিধবা হইয়া গেল। হয় ত অরিষড়াষ্টক মিলনে বিবাহ হওয়াতে দম্পতীর চিরজীবন বিষময় হইয়া চিরকলহে যাপন করিতে হইল। অবশ্য কোন কোন স্থলে কোষ্ঠী মিলন করা সত্বেও বিবাহে বিষময় ফল ফলিতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু তত্তৎস্থলে জ্যোতিষীর দোষ অথবা জন্মসময়ের অস্থিরতা ব্যতীত কারণান্তর দৃষ্ট হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুযোগ্য জ্যোতিষীর দ্বারা সূক্ষ্মরূপে পাত্র পাত্রীর জন্মপত্রিকা বিচার করাইয়া যথানির্দ্দিষ্ট শুভলগ্নে বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলে সে বিবাহে কখনও অশুভফল ফলিতে পারে না। তবে যে ক্ষেত্রে মানবকে তাহার দৃঢ়কর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগ করিতে হইবে, সে স্থলে নানারূপ ভ্রমভ্রান্তির ভিতর দিয়াও দৃঢ়কর্ম্মার্জ্জিত ফল ফলিবেই ফলিবে। কিন্তু সেই জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া না থাকিয়া পুরুষকারের প্রয়োগ করত প্রত্যেকেরই অশুভফল খণ্ডন করিতে চেষ্টা করা উচিত। আমার ভাগ্যে থাকিলে অগ্নিতে হাত পুড়িবে, তাই বলিয়া স্বেচ্ছায় অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করা কি উচিত?

আমাদের ভারতপ্রসূত জ্যোতিষশাস্ত্রকে ভারতবাসীরাই অনেক সময় অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকেই হয় ত শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, যে পাশ্চাত্যসমাজকে আমরা সুসভ্য ও কুসংস্কারশূন্য বলিয়া সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, সেই সমাজের বহু উচ্চপদস্থ, সুশিক্ষিত এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিও তাঁহাদের

নিজেদের এবং সন্তানসন্ততির জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করান একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। অনেকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের মিলন সুখকর হইবে কি না ইহা গণনা করাইতেও বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অথচ যে ভারতভূমি আদি জ্যোতিষজননী—সেই ভারতে হিন্দুর নিত্য-প্রয়োজনীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের কি শোচনীয় অবস্থা!

সাহিত্যিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যে কোন বিষয়েই কোনরূপ উন্নতিসাধন করিতে হইলে সে দিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং রাজন্যবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমাদের এই প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের উন্নতির আশাও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং রাজন্যবর্গের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিন্তু অনেকেই আর্য্যজাতির গৌরবের নিদান এই প্রাচীন প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ জ্যোতিষশাস্ত্রকে বুজরুকি বলিয়া মনে করেন; অনেকে দৈব বা অদৃষ্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ করিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহারা হয় ত অতীব শুভ প্রাক্তন কর্ম্মফল বশতঃ, যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই সফলকাম হইয়াছেন, জীবনে কখনও অকৃতকার্য্য হয়েন নাই, সুতরাং তাঁহাদের ভাগ্যের উপর বিশ্বাসস্থাপনের সুযোগ কখনও হয় নাই। তাঁহারা পুরুষকার ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার করেন না। কিন্তু এমনও দেখা গিয়াছে যে, এই সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রপীড়িত হইয়া বহু পুরুষকারবাদী ঘোরতর অদৃষ্টবাদী হইয়া উঠিয়াছেন। যাহা হউক, জ্যোতিষ-শাস্ত্রটা শুধু অদৃষ্টবাদীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই। অদৃষ্টবাদী পুরুষকারবাদী উভয়েরই জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রয়োজন। উভয়েরই কোন্ শুভমুহূর্ত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্য সুসম্পন্ন ও ফলপ্রসূ হইবে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক।

আজ পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে পর্য্যন্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের কত চর্চ্চা চলিতেছে; এ শাস্ত্রের কত উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু হায়! যে ভারত জ্যোতিষ-প্রসবিনী, যে ভারতে আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া ভারতীয় জ্যোতিষজগতে এক এক নবযুগের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়া আজ পর্য্যন্ত অমর হইয়া রহিয়াছেন, যে ভারতে হিন্দুর "ঐহিক ও পার-লৌকিক উভয়বিধ কল্যাণের মূলে জ্যোতিষশাস্ত্র," যে ভারতে "সদ্যপ্রসূতের জাতকর্ম্ম হইতে মৃতের শ্রাদ্ধ, বালকের বিদ্যারম্ভ হইতে বৃদ্ধের তপ, জপ, যজ্ঞানুষ্ঠান, কুমারী ও সধবার ব্রতাচরণ হইতে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, সকলেরই মূলে

জ্যোতিষ," সেই ভারতেই আজ জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি ভারতসন্তানগণ বীতশ্রদ্ধ! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

উপযুক্ত জ্যোতির্ব্বিদাভাবে গণনাদি ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে, তজ্জন্য আর্য্যঋষি-প্রণীত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ জ্যোতিষশাস্ত্র কখনই অমূলক হইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রবিদ্‌গণ সর্ব্বদাই কি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির উপশম করিতে সমর্থ হয়েন? ইহাতে শাস্ত্রব্যবসায়ীর অজ্ঞতা বা দোষ থাকিতে পারে; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শাস্ত্র নহে, কিম্বা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মিথ্যা, এ কথা কেহই বলেন না। আর দুই একজন অজ্ঞ জ্যোতিষীর ভ্রম বা অজ্ঞতার জন্য কি এই প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রটা অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইবে?

যাঁহাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, তাঁহাদিগের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, তাঁহারা যেন সম্যক্ বিচার ও অনুসন্ধান না করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রকে অমূলক মনে করত আবর্জ্জনারূপে পরিত্যাগ না করেন। তাঁহারা এই প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা করুন, উপযুক্ত জ্যোতিষীর দ্বারা ফলাফল গণনা, যোটক বিচার ও শুভাশুভ কার্য্যের সময়নিরূপণ করাইয়া দেখুন ফলাফল-গণনা ও যোটকবিচার সত্য কি না? গণনা দ্বারা শুভকার্য্যের শুভমুহূর্ত্ত অবগত হইয়া পুরুষকারের প্রয়োগ করিয়া দেখুন আশাতীত ফললাভ হয় কি না? আর অশুভকার্য্যের সময় অবগত হইয়া শান্তি, স্বস্ত্যয়নাদি করাইয়া দেখুন অশুভ খণ্ডন হয় কি না? তখন বুঝিতে পারিবেন, জ্যোতিষশাস্ত্র অমূলক নয়, বুজরুকী বিদ্যা নয়, উপহাস বা অবজ্ঞার বিষয় নয়। তখনই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, ভাগ্যফল অবগতির আবশ্যকতা আছে কি না। কেবলমাত্র তখনই তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন,—

"বিফলান্যন্যশাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলম্।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ" ॥

অর্থাৎ যে শাস্ত্রে চন্দ্র ও সূর্য্য সাক্ষী সেই জ্যোতিষশাস্ত্রই প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করে, আর অন্যান্য সকল শাস্ত্রই নিষ্ফল, এবং ঐ সকল শাস্ত্রে কেবল বিবাদই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব।

সমালোচনা।

পৃথ্বীরাজ, মহাকাব্য, সচিত্র, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী। মূল্য দুই টাকা। কাগজের বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতার প্রসঙ্গে জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যিক সে দিন বলিতেছিলেন যে, এই দুর্ম্মূল্যতার ফলে পাঠককে আধুনিক বাঙ্গালী কবিদিগের কবিতাঘাত সহ্য করিতে না হইলে তাহাও লাভ বলিয়া মনে করিতে হইবে। বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্যে কবিতার অত্যাচার অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। কেবল যে শক্তিহীন লেখকেরাই অত্যাচার করিতেছেন, তাহা নহে, শক্তিশালী লেখকদিগের অত্যাচারও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। শক্তিশালী লেখকদিগের যথেচ্ছাচারিতার অনুকরণে বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যে দিন দিন যে আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইতেছে, তাহা অচিরে দূরীভূত না হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া বরং তাহার অবনতিই হইতে থাকিবে।

প্রসাদগুণ রচনার একটি প্রধান গুণ। আধুনিক বাঙ্গালা কবিদিগের রচনায় এ গুণের অত্যন্তাভাব ঘটিয়াছে। "খেয়ালী" "হেঁয়ালি"কারদিগের রচনা এরূপ দুর্ব্বোধ যে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিতের কথা ছাড়িয়া দিই, পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারেন না। তাই আজ মাসিক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় কাব্যে বস্তুতন্ত্রতা ইত্যাদি বিষয়ে এত বাদবিতণ্ডা চলিতেছে। তথাকথিত Mysticism এর জালায় পাঠক অস্থির। যাঁহার রচনা যত দুর্ব্বোধ তিনি তত বড় কবি। কেবল শব্দের জীমূতগর্জ্জন—একবিন্দু বারিপাতের প্রত্যাশা নাই। শব্দগহনে অর্থ যে কোথায় লুক্কায়িত তাহা সহজে ধরিবার উপায় নাই।

এই সকল কারণে আজকাল অনেকেই আধুনিক লেখকদিগের রচিত কবিতা পড়া ছাড়িয়া দিতেছেন। এ সময়ে যোগীন্দ্র বাবু "পৃথ্বীরাজ" কাব্য রচনা ও প্রকাশ করিয়া নিতান্ত দুঃসাহসিকের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। তাহার উপর কাব্যখানি মহাকাব্য। আধুনিক গীতিকবিতাপ্লাবিত বাঙ্গালা সাহিত্যে মহাকাব্যের আদর হইবে কি? তাই পুস্তকখানি পাইয়া প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, যোগীন্দ্রবাবু নিতান্ত অসময়ে "পৃথ্বীরাজ" লিখিয়াছেন।

কিন্তু পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাদের মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন মনে হইতেছে তিনি এই কাব্য রচনায় দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন নাই ; আপনাকে সর্ব্বতোভাবে যে কার্য্যের যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যেই ব্রতী হইয়াছিলেন। মনে হয়, "পৃথ্বীরাজের" ন্যায় মহাকাব্য প্রকাশের ইহাই উপযুক্ত সময়। কোন শ্রদ্ধাস্পদ সমালোচক বলিয়াছিলেন যে, মাইকেলের কাব্য রচনা যেন একটি প্রাচীন রুদ্ধস্রোত নদীর সংস্কার। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্য যে প্রণালীতে চলিতেছিল, কালে তাহা শৈবালদামে অবরুদ্ধ হইয়া স্রোতোবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। মধুসূদন সেই প্রণালীর সংস্কার করিয়া তাহাকে এমন এক নূতন পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন যে, পরবর্ত্তী কাব্য সাহিত্য আর প্রাচীন পথ অবলম্বন করিতে চাহিল না ; নূতন পথে, নূতন উচ্ছ্বাসে, উদ্বেল তরঙ্গলীলায় সাগর-সঙ্গমে ছুটিতে লাগিল। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মাইকেল যাহা করিয়াছিলেন, আজ মাইকেলের জীবন-চরিত-লেখকের দ্বারা যদি তাহা আবার সাধিত হয়, তাহা হইলে তাহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। এই মহাকাব্য রচনার ফলে যদি আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য শক্তিহীন গীতিকবিতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নূতন পথে নূতন উদ্যমে ছুটিতে পারে, তাহা হইলে বুঝিব "পৃথ্বীরাজ" রচনা সার্থক হইয়াছে।

একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ সাহিত্য-সমালোচক বলিয়াছেন যে, মহাকাব্য-রচনায় কবির দুইটি প্রধান গুণ থাকা চাই—Energy ও honesty. গীতিকবিতার সে বালাই নাই। সাময়িক মনের ভাব, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, দশ বিশ পংক্তিতে প্রকাশ করিয়া কবি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। মহাকাব্য-প্রণেতাকে সাধকের ন্যায় এক মহান্ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়—লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে চলে না। এই একনিষ্ঠ সাধনা আধুনিক ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে একরূপ অসম্ভব। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহা-কাব্যের অভাবের ইহা অন্যতম কারণ। যোগীন্দ্র বাবুর উদ্যম ও উৎসাহ বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও একনিষ্ঠ সাধনার সহিত একখানি প্রকৃত মহাকাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রের মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে ভারতবর্ষে কিরূপে মুসলমান সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই এই মহাকাব্যের

প্রতিপাদ্য বিষয়। হিন্দুদিগের জাতীয় জীবনগঠনের পরিপন্থী প্রভাব সকল অলক্ষ্যে দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করিয়া কিরূপে হিন্দুসাম্রাজ্যের মূলোচ্ছেদে সহায়তা করিয়াছিল, তাহা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কবি ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"পৃথ্বীরাজ পাঠ করিয়া যদি কোন হিন্দু আমাদিগের জাতীয় অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধানে ও প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। কবিতা-রস-বিতরণ এই কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য; মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রতীকারের পথ দেখিলে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, পতনের পর উত্থান অবশ্যই আরব্ধ হইবে।"

কবি যাহাকে গৌণ উদ্দেশ্য বলিয়াছেন, আমরা তাহাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য ধরিয়া এই কাব্যের আলোচনা করিয়াছি। কাব্য ইতিহাস নহে, নীতিশাস্ত্রও নহে; কিন্তু নীতিশাস্ত্র যাহা পারে না, কাব্যের দ্বারা অতি সহজেই তাহা সাধিত হইয়া থাকে। কারণ, কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই সৌন্দর্য্যলিপ্সা যদি না থাকিত, তাহা হইলে সমাজের বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত, সংহিতাকারগণের উপদেশ অরণ্যে রোদন হইয়া দাঁড়াইত। শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, যুধিষ্ঠির, নল, দময়ন্তী, সাবিত্রী প্রভৃতির চরিত্রের অলৌকিক সৌন্দর্য্য হিন্দুর জীবনগঠনে যেরূপ সহায়তা করিয়াছে, এমন আর কিছুতেই পারে নাই। অবশ্য কবি মহদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই এই সকল চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই উদ্দেশ্যের কথা তিনি পাঠককে বলেন নাই, কারণ, তাহা করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। এই জন্য আমাদের মনে হয়, যোগীন্দ্র বাবু তাঁহার এই উদ্দেশ্যের কথা ভূমিকায় বিবৃত না করিলেই ভাল করিতেন।

যাহা হউক, আমরা কবিতা-রসাস্বাদনের উদ্দেশ্যেই তাঁহার কাব্য পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিয়া তাঁহার কবি-শক্তির পূর্ণবিকাশ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার ভাবুকতা, স্বদেশপ্রেম, বর্ণনাশক্তি, সৌন্দর্য্য-বোধ, শব্দসম্পদ্ বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। ইতিহাসের শুষ্ক কঙ্কালে তিনি কেবল রক্তমাংসের যোজনা করেন নাই, তাহাতে প্রাণসঞ্চার পর্য্যন্ত করিয়াছেন। বর্ণনাগুণে ঘটনাবলী যেন চক্ষের সমক্ষে প্রতিভাত হয়; দেশকালের বাধা অতিক্রম করিয়া পাঠক কাব্য-

বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে আপনার সত্ত্বা হারাইয়া ফেলেন। কয়জন কবির রচনা সম্বন্ধে এ কথা বলিতে পারা যায়?

গ্রন্থের কয়েক স্থল উদ্ধৃত করিয়া আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু স্থানাভাবে আমাদিগকে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই মহাকাব্যের আদর হইবে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বুঝিব, বাঙ্গালী পাঠক কাব্যামৃতরসাস্বাদের শক্তি হারাইয়াছেন।

পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর; কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিত্রসন্নিবেশ দ্বারা গ্রন্থের রমণীয়তা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

শুভদৃষ্টি।—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী। ইহা একখানি সামাজিক নাটক; ব্যঙ্গচিত্র বলিলেই ইহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষময় ফলে আমাদের দেশের প্রাচীন উন্নত আদর্শগুলি একে একে তিরোহিত হইয়া সমাজের কি অনিষ্ট সাধন করিতেছে, ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভাষায় তাহাই দেখান গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। তাঁহার এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। হিন্দুসমাজে কাঞ্চন-কুলীন সাবু স্তাভারামের সংখ্যা এখন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এই স্তাভারামেরা এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। নির্লজ্জতার মাত্রা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা স্বদেশীয়-দিগের সহিত আর সংস্রব রাখিতে চাহেন না; পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার জন্য বিলাতের অনুকরণে স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের সৃষ্টি পর্য্যন্ত করিতেছেন। অপরেশ বাবুর কশাঘাতে এই গম্ভীরবেদী হস্তিমূর্খদিগের চৈতন্যোদয় হইবে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রতোদ-প্রয়োগের প্রয়োজন। ডোরা-নলিনীর চরিত্রের ক্রম পরিবর্ত্তন সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে। যে হিন্দুকুমারী মাতা-পিতার দোষে বিকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া একেবারে নষ্ট হইতে বসিয়াছিল, ঘটনাচক্রে দরিদ্র নিষ্ঠাবান্ হিন্দু-পরিবারের কুলবধূ হইয়া সে একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জন্মান্তরীণ সংস্কার প্রবল হইয়া বিজাতীয় শিক্ষার বিষ চরিত্র হইতে একেবারে বিদূরিত করিয়া দিল। আশা করি, এ গ্রন্থের আদর হইবে।

সাহিত্য-সভার

১৩২৩ সালের

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি।

সভাপতি—

মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে, সি, আই, ই।

সহ-সভাপতিগণ—

শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ।

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম,এ, বি, এল,সি, এস, আই।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী কেটি ইত্যাদি।

" " বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী এম, এ,।

" স্যার ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ কেটি, সি, এস, আই ইত্যাদি।

" রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর।

" মহারাজ-কুমার শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

" কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

" মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

" " ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল।

" রায় ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, আই, এস, ও, এফ, সি, এস।

সভ্যগণ—

" মাননীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর।

" কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

" কুমার প্রকাশকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

" কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

রায় মতিলাল হালদার বাহাদুর বি. এল।

শ্রীযুক্ত রায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর।

মাননীয় „ রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম, এ, বি এল।

„ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পিএচ, ডি।

„ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

„ পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

„ পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী।

„ পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ।

„ ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এম, বি।

„ ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস।

„ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ, এল, এম, এস।

„ কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

„ অমৃতলাল বসু।

„ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ।

„ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

„ রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল।

„ বিনোদলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ।

„ পণ্ডিত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ।

„ চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ।

„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

ধনরক্ষক—

শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

সহযোগি-সম্পাদকগণ—

শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ।

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম, এ।

সাহিত্যসংহিতা-সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি।

পুস্তকালয়াধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাখা-সমিতি।

১৩২৩ সাল।

১। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস সমিতি।

সভাপতি—

শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ।

সভ্যগণ—

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই।

„ জে, এন, দাস গুপ্ত বি, এ (অক্সন)।

„ রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই।

„ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এচ, ডি।

„ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল।

„ মাননীয় স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেটি।

„ কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ, এল, এম্ এস।

„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

„ কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

„ সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ।

„ অক্ষয়কুমার মৈত্র বি, এল।

„ রমাপ্রসাদ চন্দ এম, এ।

„ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

(২) গণিত ও বিজ্ঞান-সমিতি।

সভাপতি—

শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কেটি ইত্যাদি।

সভ্যগণ—

শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি।

„ মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী।

„ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বার-এট-ল।

„ রায় ডাক্তার চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি আই, এস, ও।

„ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ।

„ কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এম, এ, এম, বি।

„ স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেটি।

„ ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এম, বি।

„ গিরিশচন্দ্র বসু এম, এ।

„ পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব।

„ কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন।

„ ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

„ ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্।

„ রজনীকান্ত দে এম, এ, বি, এস সি।

শ্রীযুক্ত ডাঃ অমিয়মাধব মল্লিক এম, বি।
„ হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় এম, এ।
„ সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ।
„ রাধাবল্লভ জ্যোতিষতীর্থ।
„ কুমুদবিহারী বসু বি, এস সি।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

(৩) পারিভাষিক সমিতি।

সভাপতি—

শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ।

সভ্যগণ—

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই।
„ মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
„ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
„ রায় ডাক্তার চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, আই, এস, ও।
„ কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি এ।
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ।
„ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এচ, ডি।
„ পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
„ সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ।
„ পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বি, এ।
„ কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন।
„ মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন।
„ ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস।
„ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত প্রমোদপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়।

„ রমাপ্রসাদ চন্দ এম, এ।

„ লালমোহন বিদ্যানিধি।

„ পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

„ পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ।

„ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম এ,এল,এম,এস্।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

(৪) বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-সমিতি।

সভাপতি—

শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি এম, এ, ডি, এল, পি এচ, ডি।

সভ্যগণ—

শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কেটি ইত্যাদি।

„ মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ।

„ কিরণচন্দ্র দে সি, আই, ই, আই, সি, এস।

„ সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল।

„ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

„ অমৃতলাল বসু।

„ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

„ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

„ রায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর।

„ পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী।

„ রায় ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, আই, এস, ও।

„ ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ,এল,এম,এস্।

„ কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি এ।

শ্রীযুক্ত কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।
,, কুমার প্রকাশকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
,, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল।
,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ।
,, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এচ ডি।
,, পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
,, সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ।
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।
,, কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন।
,, মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন।
,, ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস।
,, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, প্রমোদপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়।
,, রমাপ্রসাদ চন্দ এম, এ।
,, লালমোহন বিদ্যানিধি।
,, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
,, পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

(৫) সংস্কৃতভাষা-সমিতি।

সভাপতি—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

সভ্যগণ—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
,, মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ।
,, সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এচ, ডি।
,, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
,, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ,এল্,এম,এস্।
,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
,, পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী।
,, কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।
,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ।
,, পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
,, কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এম, এ, এম, বি।
,, পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি।
,, সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন, এম, এ।
,, কবিরাজ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ।
,, মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ।
,, পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ।
,, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
,, কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি।
,, প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ এম এ।
,, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ এম, এ।
,, দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ।
,, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
,, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।
,, বহুবল্লভ শাস্ত্রী।
,, জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।
,, চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ।
,, মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী।
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম এ।

(৬) দর্শন-সমিতি।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

সভ্যগণ—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

,, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

,, মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী।

,, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বার-এট-ল।

,, মাননীয় রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম, এ।

,, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পিএচ, ডি।

,, কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

,, পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী।

,, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ, এল,এম,এস।

,, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম, এ।

,, পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

ইংরাজি সাহিত্য-সমিতি।

সভাপতি—

শ্রীযুক্ত স্যার রাসবিহারী ঘোষ কেটি, সি, এস, আই, এম, এ, ডি, এল।

সভ্যগণ—

শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কেটি ইত্যাদি।

,, সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল।

,, কিরণচন্দ্র দে, সি, আই, ই, আই, সি, এস।

,, জে, এন্, দাস গুপ্ত বি, এ।

,, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই।

,, রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এম, এ, বি, এল।

শ্রীযুক্ত মাননীয় রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম, এ।
„ মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী।
„ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বার-এট-ল।
„ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম, এ, এল, এম, এস।
„ রবীন্দ্রনাথ মিত্র বার-এট-ল।
„ মহারাজ-কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
„ কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।
„ কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ।
„ রায় ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, আই এস. ও।
„ স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেটি।
„ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।
„ মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল।
„ অতুলচন্দ্র ঘোষ বি, এ।
„ প্রিয়লাল দাস এম, এ, বি, এল।
„ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল।
„ বিনোদলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ।
„ রায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর।
„ সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ।
„ অমৃতলাল বসু।
„ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ।
„ কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।
„ রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ।
„ মাননীয় রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম, এ, বি, এল।
„ জ্যোতিপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ, বি, এল।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু বার-এট-ল।
„ কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।
„ রায় মতিলাল হালদার বাহাদুর বি, এল।
„ মাননীয় রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর এম, এ, বি, এল।

শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ ঘোষ বি, এল।

„ নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু বার-এট-ল।

„ শৈলেন্দ্র নাথ সরকার এম, এ।

„ সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, এম্, এ, বি এল।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

(৮) পত্রিকা-সমিতি।

সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ, এল্, এম্, এস্।

সভ্যগণ—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল।

„ রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

„ রায় ডাঃ চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, আই, এস, ও।

„ কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

„ কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

„ অমৃতলাল বসু।

„ কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ।

„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

„ কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

„ রায় সাহেব হারাধন বসু।

„ রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল।

„ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

„ পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

„ দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

„ পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ।

(৯) পুস্তকালয়-সমিতি।

সভাপতি—

শ্রীযুক্ত মাননীয় স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে, সি, আই, ই।

সভ্যগণ—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল।
" মাননীয় রাজা হৃষীকেশ লাহা সি, আই, ই।
" মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কেটি ইত্যাদি।
" রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।
" স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি।
" কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।
" কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।
" কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ।
" সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ।
" অমৃতলাল বসু।
" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" ফণীন্দ্রলাল দে।
" হরিধন দাঁ।
" সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ।
" মাননীয় রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম, এ. বি, এল।
" বিনোদলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ।
" রায় সাহেব হারাধন বসু।
" বরেন্দ্রনাথ মিত্র।
" মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম,এ, এল,এম, এস

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১০) গ্রন্থপ্রচার-সমিতি।

সভাপতি—

শ্রীযুক্ত মাননীয় স্যার মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে, সি, আই, ই।

সভ্যগণ—

শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ।
„ মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কেটি ইত্যাদি।
„ সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল।
„ মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
„ স্যার রাসবিহারী ঘোষ কেটি ইত্যাদি।
„ রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর।
„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
„ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ।
„ রায় ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, আই, এস, ও।
„ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এচ্, ডি।
„ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।
„ কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, বি, এ।
„ সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ।
„ কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন।
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ।
„ রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী।
„ রায় কিরণ চন্দ্র রায় বাহাদুর।
„ মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর।
„ রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল।
„ গোবিন্দচন্দ্র বসু।
„ কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর।
„ রাজা শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর।
„ মাননীয় কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।
„ রাজা শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায়, ৪র্থ খণ্ড। ১৩২৩ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

ক্ষেমেন্দ্রের চারুচর্য্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৮৫। আচারভ্রংশে দুর্গতি।

পদাগ্নিং গাং গুরুং দেবং নচোচ্ছিষ্টঃ স্পৃশেদ্ঘৃতম্।
দানবানাং বিনষ্টা শ্রীরুচ্ছিষ্ট-স্পৃষ্ট-সর্পিষাম্॥

অগ্নি, গো, গুরু বা দেবতাকে পদদ্বারা এবং অশুচি অবস্থায় ঘৃত স্পর্শ করিতে নাই। উচ্ছিষ্ট পঙ্কিল অবস্থাতে ঘৃত স্পর্শ করাতে দানবেরা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

পূজ্যতম মহর্ষিগণকে পদাঘাত ও প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া অমরেশ্বর নহুষকে স্বর্গচ্যুত ও নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। (৫৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

*শ্রীরুবাচ।
সত্যে স্থিতাস্মি দানে চ ব্রতে তপসি চৈব হি।
পরাক্রমে চ ধর্ম্মে চ পরাধীনস্ততো বলিঃ॥
ব্রহ্মণ্যোঽয়ং পুরাভূত্বা সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অভ্যসূয়দ্ ব্রাহ্মণানামুচ্ছিষ্টশ্চাস্পৃশদ্ ঘৃতম্॥
যজ্ঞশীলঃ সদাভূত্বা মামেব যজতে স্বয়ম্।
প্রোবাচ লোকান্ মূঢ়াত্মা কালেনোপনিপীড়িতঃ॥
অপাকৃতা ততঃ শক্র ত্বয়ি বৎস্যামি বাসব।
অপ্রমত্তেন ধার্য্যাস্মি তপসা বিক্রমেণ চ॥* (মহাভারত।)

দানবেন্দ্র বলি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিরুদ্দিষ্ট হইলে, বলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে দেখিতে সক্ষম হইলেন। সৌভাগ্যবিহীন বলি, গর্দ্দভরূপ ধারণ পূর্ব্বক নির্জ্জনে একাকী অবস্থান করিতেছেন। দেবরাজ প্রতিহিংসাবশে শ্লেষবাক্যে বলির মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিবার পরে দেখিতে পাইলেন, সেই রাসভরূপী দানবপতির কলেবর হইতে প্রদীপ্ত দিব্য তেজোরাশি ঊর্দ্ধগমন পূর্ব্বক পরম শোভমানা শিখণ্ডিনী মূর্ত্তিমতী সৌভাগ্য লক্ষ্মীর রূপ ধারণ করিলেন।

দেবরাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া দেবী কমলা তাঁহাকে বলিলেন, হে বাসব, আমাকে সাক্ষাৎ "শ্রী" বলিয়াই জানিও। যেখানে সত্য, যেখানে দান, যেখানে ব্রত, যেখানে তপস্যা, যেখানে পরাক্রম এবং যেখানে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন; নিশ্চয় জানিও, সেই স্থানেই আমি "অচল" হইয়া থাকি। দানবপতি এই বলি, বর্ত্তমানে ঐসকল সদ্‌গুণ পরিবর্জ্জন করিতে আমি অদ্য তাঁহার শরীর হইতে বহির্গতা হইলাম। বলি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্মশীলই ছিলেন, আর সকল সদ্‌গুণের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া আমিও তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া ছিলাম। কিন্তু মোহবশে বলির প্রকৃতি আর সত্ত্বগুণময়ী রহিল না, তিনি দম্ভ ও অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণের বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া পড়িলেন এবং উচ্ছিষ্ট কলুষিত অবস্থাতেই পবিত্র ঘৃত স্পর্শ করিয়া নিজ ভ্রান্তমতিতার পরিচয় প্রদান করিলেন। বলি পূর্ব্বে সর্ব্বদাই যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ছিলেন, কিন্তু উত্তরকালে পরিণাম বিস্মৃতির বিপাকে তাঁহাতে এরূপ ঘোর মোহের প্রাদুর্ভাব হইল যে, দানবপতি স্থির করিলেন একমাত্র তিনিই সর্ব্বপ্রধান। অতএব সকলে যজ্ঞাদি ব্যাপারে কেবল তাঁহাকেই অর্চ্চনা করুক। হে সুরপতি, এই কারণেই আমি অদ্য বলিকে পরিত্যাগ করিয়াছি এবং উপযুক্ত পাত্র জানিয়া তোমাকেই এখন আশ্রয় করিব। হে ইন্দ্র, আমাকে পাইয়া তুমি কখনও প্রমাদে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িও না; তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি কেবল তপোনিষ্ঠা ও পরাক্রম দেখিয়াই সেই পবিত্র স্থানে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকি।

৮৬। প্রতিলোম বিবাহের অবৈধতা।

প্রতিলোমবিবাহেষু ন কুর্য্যাদুন্নতিস্পৃহাম্।
যযাতিঃ শুক্রকন্যায়াং সস্পৃহো ম্লেচ্ছতাং গতঃ॥

প্রতিলোম বিবাহের অভিলাষ করা বৈধ নহে। রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার প্রণয়ে কামপরতন্ত্রতায় ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী ও অসুররাজ বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উভয় পত্নীর গর্ভে ভূপতির যদু, তুর্ব্বসু, অনু, দ্রুহ্য ও পুরু এই পঞ্চ পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। রাজা উভয় পত্নীর প্রতি একান্ত সমাসক্ত থাকিয়া স্বীয় পরিণত বয়সেও প্রবল কামসুখে অভিভূত হওয়ায় জরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সেইকালে কনিষ্ঠ পুত্র শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুরু ভিন্ন অপর সকল সন্তানকেই তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করা নিবন্ধন অভিশাপ প্রদান করিয়া স্বীয় অনার্য্যজনোচিত কাম প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে যযাতি ক্ষান্ত হন নাই (১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। রাজা দেবযানীর গর্ভজাত স্বীয় মধ্যম পুত্র তুর্ব্বসুকে বলিয়াছিলেন ;—

"যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।
তস্মাৎ প্রজা সমুচ্ছেদং তুর্ব্বসো তব যাস্যতি॥
গুরুদারপ্রসক্তেষু তির্য্যগ্‌যোনিগতেষু চ।
পশুধর্ম্মিষু পাপেষু ম্লেচ্ছেষু ত্বং ভবিষ্যসি॥

হে তুর্ব্বসো, তুমি আমার আত্মজ হইয়াও অদ্য মদীয় আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছ, অতএব তোমার বংশপ্রবর্ত্তক পুত্রের অভাব হইবে*। যাহারা গুরু ও লঘু গণ্য করে না, তির্য্যগ্‌ জীবের ন্যায় যাহাদের আচার, পাপকর্ম্মে যাহারা সর্ব্বদা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আছে, ধর্ম্মে পশুর ন্যায় আচরণশীল সেই ম্লেচ্ছগণের উপরেই তোমার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৮৭। নির্দ্দোষের বিড়ম্বনায় আত্মক্ষতি।

রূপার্থকুলবিদ্যাদিহীনং নোপহসেন্নরম্।
হসন্তমশপন্নন্দী রাবণং বানরাননঃ॥

---

* এই শাপ বাক্য তুর্ব্বসুর পক্ষে বর লাভের ন্যায়ই নিয়তি বশে হইয়া পড়িয়াছিল, কেননা দেবী ভাগবত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় সাক্ষাৎ নারায়ণ ও লক্ষ্মীর পুত্র "হৈহয়" তুর্ব্বসুর পুত্রত্বে পরিণত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীর পুত্র হৈহয়ের পুত্র "কৃতবীর্য্য" ও তাঁহার পুত্র প্রাতঃ স্মরণীয় "অর্জ্জুন" (কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন)। পুরাণে হৈহয় বংশ সুপ্রসিদ্ধ।

যাহার রূপ, অর্থ, কুল বা বিদ্যা প্রভৃতি কিছুই বর্ত্তমান নাই, সেইরূপ ব্যক্তিকে স্বপ্রবৃত্তির বশে কখনও উপহাস করা কর্ত্তব্য নহে। লঙ্কাধিপতি রাবণ, বানরের ন্যায় কদাকারমুখ মহাদেবের প্রিয় অনুচর নন্দীকে উপহাস করিয়া অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

"সোঽপশ্যন্নন্দিনং তত্র দেবস্যাদূরতঃ স্থিতম্।

তং দৃষ্ট্বা বানরমুখমবজ্ঞায় স রাক্ষসঃ।
প্রহাসং মুমুচে তত্র সতোয় ইব তোয়দঃ॥
তং ক্রুদ্ধো ভগবান্নন্দী শঙ্করস্যাপরা তনুঃ।
অব্রবীত্তত্র তত্রস্থং দশাননমুপস্থিতম্॥
যস্মাদ্বানরমূর্ত্তিং মামবজ্ঞায় দশানন।
অশনিপাতসঙ্কাশমুপহাসং প্রমুক্তবান্॥
তস্মান্মদ্বীর্য্যসংযুক্তা মদ্রূপা মমতেজসঃ।
উৎপৎস্যন্তে বধার্থং হি কুলস্য তব বানরাঃ॥" (রামায়ণ।)

রাবণ দেখিতে পাইলেন, ভগবান্ ভূতপতি মহাদেবের সন্নিকটে শঙ্করের দ্বিতীয় তনুসদৃশ নন্দী প্রদীপ্ত শূল হস্তে অবস্থিতি করিতেছেন। নন্দীর মুখ বানরের অনুকৃতি দেখিয়া দশানন জীমূতগর্জ্জনে তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন। তাহাতে নন্দী সক্রোধে রাবণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন। রে মূঢ়, আমার মুখ বানরের ন্যায় দেখিয়া তুমি উপহাস করিতেছ, কিন্তু আমার ন্যায় বলবীর্য্যশালী পরাক্রান্ত বানরগণ তোমাকে সবংশে ধ্বংস করিবার জন্য অচিরে উৎপন্ন হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিও।

৮৮। বন্ধু বিরোধে নিরপেক্ষতাই শ্রেয়স্কর।

বন্ধূনাং বারয়েদ্বৈরং নৈকপক্ষাশ্রয়ো ভবেৎ।
কুরুপাণ্ডবসংগ্রামে যুযুধে ন হলায়ুধঃ॥

নিজ বান্ধবদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে যাহাতে পক্ষীয়

বিবাদ দূরীভূত হইয়া যায়, তাহাতেই চেষ্টা করা আত্মীয়ের কার্য্য। যদি সেইরূপ হওয়া অসম্ভাব্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই অনর্থকর ব্যাপারে নিজের নিরপেক্ষ হইয়া দূরে থাকাই কর্ত্তব্য। কিন্তু উভয়ের মধ্যে অন্যতম পক্ষে যোগ প্রদান পূর্ব্বক বন্ধুদিগের বিগ্রহে ইন্ধন প্রদান করা শ্রেয়স্কর নহে। হলধর বলদেব, কুরু ও পাণ্ডবগণের তুমুল সংগ্রামে নিজে মধ্যস্থ বৃত্তিই অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি বিবদমান কোন পক্ষেই যোগ প্রদান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

"পাণ্ডবা হি যথাঽস্মাকং তথা দুর্য্যোধনো নৃপঃ।
উভৌশিষ্যৌ হি মে বীরৌ গদাযুদ্ধবিশারদৌ॥
তুল্যস্নেহোঽস্ম্যতো ভীমে তথা দুর্য্যোধনে নৃপে।
তস্মাদ্ যাস্যামি তীর্থানি সরস্বত্যা নিষেবিতুম্॥

(মহাভারত।)

কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া বলরাম বলিয়াছিলেন, মহাবীর পাণ্ডবগণ ও নৃপতি দুর্য্যোধন উভয় পক্ষেই আমাদের আত্মীয়তা তুল্য প্রকার। বিশেষতঃ গদাযুদ্ধে ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই আমার প্রিয় শিষ্য; ভীমের প্রতি আমার যেরূপ স্নেহ, দুর্য্যোধনের প্রতিও আমার ঠিক সেইরূপ মমতা; অতএব এখন এই ঘোর সংকট সময়ে আমি কৌরব বা পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন পক্ষই অবলম্বন করিতে পারিতেছি না, আমি সরস্বতীর পুণ্যময় তীর্থ উদ্দেশ্যেই এখন প্রস্থান করিব।

৮৯। ভগবান্ বুদ্ধদেবের জীবোদ্ধার।

পরোপকারং সংসারসারং কুর্ব্বীত সত্ত্ববান্।
নিদধে ভগবান্ বুদ্ধঃ সর্ব্বসত্ত্বোদ্ধৃতৌ ধিয়ম্॥

শুদ্ধসত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারে একমাত্র সার লোকের জন্য পরের উপকারব্রতে ব্রতী হইবে। ভগবান্ বুদ্ধদেব সকলজীবের নির্ব্বাণ কামনায় আপনার বিমল প্রজ্ঞাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

পুরাণ শাস্ত্রে ভগবান্ বুদ্ধদেবকে সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতাররূপেই সর্ব্বত্র বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতেই হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম বলিয়া স্থির করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। উত্তরকালীন ভগবদ্‌ভক্ত কবিরাজ জয়দেবও দশ অবতার স্তোত্রে স্বীয় গীতগোবিন্দগ্রন্থে বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করিয়া মধুস্বরে সঙ্গীত লহরীতে জগৎ উদ্বুদ্ধ করিয়া গান করিয়া গিয়াছেন ;—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে !"

যাগ যজ্ঞাদি কাম্যক্রিয়াতে পশুবধ করিবার বিধান আছে। মহাপ্রাণ বুদ্ধদেব জীবের প্রাণ হত্যায় বিচলিতহৃদয় হইয়া সেই সকল শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধে মানবমাত্রকে ব্রতী হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাহাতেই তৎপ্রচারিত ধর্ম্মে চিত্তশুদ্ধির ব্যাপার ভিন্ন অপর ক্রিয়া কাণ্ডের বিধান অকর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল।

আমরা এস্থলে ভগবান্ বুদ্ধদেব কিরূপে ঘোর কামাসক্ত মানবকেও প্রবুদ্ধ করিয়া মহান্ ভিক্ষুব্রতে সমুন্নত করিয়াছিলেন, তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। এই উপাখ্যানটী মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত বোধিসত্ত্ব অবদান কল্পলতার দশম পল্লবে সুন্দরী নন্দাবদানে ও বৌদ্ধ মহাকবি আর্য্যভদন্ত অশ্বঘোষ প্রণীত সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত উভয় গ্রন্থই এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে।

ভগবান্ বুদ্ধদেব ও শাক্য রাজকুমার নন্দ উভয়েই নৃপতি শুদ্ধোদনের পুত্র, কিন্তু তাঁহারা সহোদর নহেন। পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পরেও বুদ্ধদেব শাক্যবংশের উদ্ধার কামনায় পিতৃরাজধানী কপিলবস্তুতেই নিজ আশ্রমে ভিক্ষুসংঘপরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেন। একদা যুবরাজ নন্দ বুদ্ধদেবের দর্শনার্থ তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। বিনীত নন্দ তাঁহাকে বলিলেন—পবিত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা তাঁহার ন্যায় বিষয়মদাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে নিতান্তই অসম্ভাব্য, অতএব তিনি আলয়ে গৃহস্থের ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক ভিক্ষুগণের অভাব পরি-

মোচনের চেষ্টায় সর্ব্বদা নিরত থাকিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছেন।

প্রব্রজ্যা শব্দেই নন্দের ভীষণ হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ পার্থিব জগতের সুন্দরীকুলের সারভূতা স্বীয় দয়িতা ভার্য্যা সুন্দরাকে স্মরণ করিয়া তিনি নিতান্তই ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কাজেই অতঃপর আশ্রমে আর ক্ষণমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়াই তিনি উৎকণ্ঠিত মনে স্বীয় প্রাসাদে প্রিয়তমা সুন্দরার সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইহার পরে একদিন নন্দ দেখিতে পাইলেন, ভগবান্ বুদ্ধদেব ভিক্ষুমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া তাঁহার প্রাসাদে ভিক্ষার্থ সমাগত হইয়াছেন। এ দৃশ্য অবলোকনে নন্দের হৃদয় ভক্তিভরে উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। তিনি যথোচিত সৎকার ক্রিয়া দ্বারা সমাগত ভিক্ষু সংঘের অভ্যর্থনা করিলেন।

পতির ক্ষণমাত্র বিরহেও অসমর্থা পতিদেবতা সুন্দরা ভিক্ষুগণের সৎকার ব্যাপারে ব্যাপৃত নন্দকে গবাক্ষমার্গে তৃষিতা চাতকীর ন্যায় অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নন্দ প্রিয়তমাকে ইঙ্গিত দ্বারা জানাইলেন, ভগবানের সৎকার জন্য তাঁহার আশ্রম পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া তিনি শীঘ্রই বিরহবিধুরা প্রিয়ার সন্নিকটে উপনীত হইবেন। কিন্তু হায়, নন্দ ও সুন্দরা ক্রূর ভাবিতব্যতার বিষম পরিণতি ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করিয়া দেখিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না যে, তাঁহাদের দাম্পত্যের অকপট প্রণয়লীলা এখন হইতেই সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গেল।

আশ্রমে গিয়াই নন্দ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য ভগবানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তখন বুদ্ধদেব বলিলেন, তুমি এখনই ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ কর। যেমন আদেশ, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণ ব্যাপারও ভগবানের আদেশে অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। অদ্য বিনা মেঘেই বিভিন্ন স্থানে থাকিয়াও একপ্রাণ দম্পতি নন্দ ও সুন্দরার মস্তকে নির্ঘাত বজ্রপাত হইয়া গেল।

নন্দ এই অবস্থাতেও বুদ্ধদেবের অলক্ষিতে সুন্দরার নিকটে উপস্থিত হইবার জন্য অনেক বার চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধদেব, এখনই নন্দ আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে উদ্যত

হইয়াছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিষয় মরীচিকার মায়াজাল হইতে স্বীয় শান্তিময় ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন।

অনন্তর বুদ্ধদেব সুন্দরায় আসক্তি হইতে নন্দের চিত্ত অপসারিত করিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া ত্রিদিব ধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে অপার্থিব সুন্দরী অপ্সরাবৃন্দকে দেখাইয়া ভগবান্ বুদ্ধ নন্দকে বলিলেন, যদি তুমি তোমার স্মৃতিপথ হইতে সুন্দরায় আসক্তি বিদূরিত করিয়া ভিক্ষুব্রত পরিপালন করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে যাহাতে তুমি এই দিব্য সুন্দরীগণের সহিত মিলিত হইতে পার, আমি সেইরূপ উপায় করিয়া দিব।

নিজ ভার্য্যা সুন্দরা হইতেও অনুপম কান্তিময়ী কামিনীকুলের তীব্ররূপ-সম্পদে পরিভ্রান্ত নন্দ অতঃপর পতিগত প্রাণা স্বীয় দারার অপার্থিব প্রণয় বিস্মৃতির জলধিতে সমাহিত করিয়া ফেলিলেন। হায়, এই জগতে ক্ষণস্থায়ী রূপের জ্বালাময়ী উন্মাদনা পরিণামে এইরূপ বিয়োগবিধায়ক হইয়াই প্রণয়ীর মর্ম্ম কর্ত্তন করিয়া থাকে। মিথ্যা তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হইয়া নন্দ তগদতজীবিতা সতীকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন। তিনি রূপোন্মাদে পরস্ত্রীপ্রাপ্তি কামনায় দুঃসহ সাধনাতেও একান্ত মনে দৃঢ়ব্রত অবলম্বন করিলেন।

ইহার পর একদা নন্দ কোনস্থানে অগ্নিগর্ভ সুবৃহৎ অসংখ্য কুম্ভ দর্শন করিয়া ভয়ে কণ্টকিতকলেবর হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার মনে চিন্তা হইল, কি ভয়ঙ্কর! এই অগ্নিগর্ভ কুম্ভ সমূহ কি উদ্দেশে এখানে নিহিত রহিয়াছে? তখনই অমরবাণী তারস্বরে প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল—যাহারা নিত্য সুখ পরিহার পূর্ব্বক অনিত্য অসার সুখসম্ভোগকামনায় মিথ্যাবেশ পরিগ্রহ করিয়া তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হয়, এই জ্বালাময় অগ্নিগর্ভ কুম্ভরাশি কেবল তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের জন্য। মিথ্যাব্রত শাক্যনন্দন নন্দের পাপপ্রতীকারের নিমিত্তই এই নরক যন্ত্রণার ব্যবস্থা।

অতঃপর পাপের সুতীব্র পরিণতি প্রত্যক্ষ করিয়া নন্দের মানসক্ষেত্র হইতে উৎকট অপ্সরাপ্রীতির মোহ বিদূরিত হইয়া গেল। উত্তর কালে তিনি সত্য-সত্যই ভিক্ষুব্রতে সমুন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া নিজ জীবন সার্থক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই উপাখ্যান পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, নন্দ বুদ্ধদেবের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে প্রব্রজ্যাগ্রহণ না করিয়া সংসারে বর্ত্তমান থাকিয়াই ভিক্ষু সংঘের সৎকারে জীবন সার্থক করিতে অভিলাষী, কিন্তু বুদ্ধদেব এই অবস্থাতেও সেই রাজদম্পতির পরস্পরের প্রতি অকপট গভীর প্রণয় বৃত্তান্ত সম্যক্ জ্ঞাত থাকিয়াও নন্দকে ভিক্ষু ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বুদ্ধদেবের মহান্ ধর্ম্মের এই গূঢ় রহস্য বোধ হয় গম্য হয় যে উদার বৌদ্ধধর্ম্ম সংসার পরিত্যাগকারী ভিক্ষুগণেরই কেবল অবলম্বনীয়; কারণ ভিক্ষুরাও এই পবিত্র ব্রত সর্ব্বথা রক্ষা করিতে সর্ব্বত্র সক্ষম হয়েন না। যখন এইরূপ অবস্থা তখন ঘোর সংসারাসক্ত বিমূঢ় গৃহস্থ ব্যক্তি এই মহান্ ধর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ না হইয়া পড়িবে কেন?

মানব মাত্রই সংসার বন্ধন মুক্ত হউক—ইহাই ভগবান্ বুদ্ধদেবের আন্তরিক অভিমত। প্রোক্ত উপাখ্যান পাঠ করিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, কামমণ্ডুক নন্দকেও বুদ্ধদেব স্বয়ং ঘোর সংসারকূপের বিভ্রম হইতে পরিত্রাণ করিয়া চির শান্তিময় নির্ব্বাণ পথে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব ত আর জীবের উদ্ধার কামনায় অনন্ত জীবন লইয়া এই রোগ-শোক-মোহ-সঙ্কুলভূমণ্ডলে সকলের হিতার্থ অবস্থান করিয়া থাকিতে পারেন নাই; কিংবা বুদ্ধদেবের অন্তর্দ্ধানের পরে অপর কেহ বুদ্ধের অভীপ্সিত জীবনিস্তার ব্রতে ব্রতী থাকিয়া তাঁহার ন্যায় সাধারণ মনুষ্য মাত্রেই নির্ব্বাণ সাধনায় পরাকাষ্ঠা শিষ্যানুশিষ্যক্রমে ধারাবাহিক রূপে প্রদর্শন করাইতে সক্ষম হয় না। এই কারণেই পরিণামে ভগবান্ বুদ্ধদেবের নির্ম্মল:স্বাভাবিক ধর্ম্মও সংকীর্ণতার আবিলতায় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, বুদ্ধের ধর্ম্ম হইতে জীব উদ্ধার ব্রত বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে।

মানব মাত্রের প্রকৃতি অনুসারেই ধর্ম্মে অধিকারিভেদ হইয়া থাকে, তাহার জন্যই সনাতন আর্য্য ধর্ম্মে বুদ্ধের ন্যায় পবিত্র নিষ্কাম ধর্ম্ম কেবলমাত্র সংসার-গ্রন্থি পরিচ্যুত মানবের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু সংসার পঙ্কে ঘোর আবিলতা প্রাপ্ত জনসাধারণের জন্য সকামধর্ম্ম বর্ণাশ্রম আচারের প্রবর্ত্তনার আবশ্যকতা হইয়াছিল। এই বিধান হইতেই আর্য্যধর্ম্মক্ষেত্রে রাজর্ষি জনকের ন্যায় সংসারবিরাগী হইয়াও ঘোর সংসারাসক্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব দেখা গিয়া থাকে।

পুরাণগ্রন্থে ভগবান্ বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যেরূপ উল্লেখ আছে, আমরা সংক্ষেপে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি ;—

"মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥
ইত্যেতাঃ কথিতাস্তস্য মূর্ত্তয়ো ভূতধারিণি।
দর্শনং প্রাপ্তুমিচ্ছানাং সোপানানি চ শোভনে॥"

(বরাহপুরাণ।)

ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বরাহ পৃথিবীকে বলিয়াছিলেন, যে ভূতধাত্রি, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী ;—ভগবান্ নারায়ণের এই দশ অবতার—যাহা মুক্তিকাম জনগণের সোপানস্বরূপ।

"বক্ষ্যে বুদ্ধাবতারঞ্চ পঠতঃ শৃন্বতোঽর্থদম্।" (অগ্নিপুরাণ।)

বুদ্ধাবতারের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে, যাহা পাঠ বা শ্রবণ মাত্রই লোক সমূহের পরমার্থ লাভ হইয়া থাকে।

"ততঃ কলেস্তু সন্ধ্যান্তে সংমোহয়ন্ সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধনামা জিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥"

(গরুড়পুরাণ।)

কলির প্রথম সন্ধ্যা বিগত হওয়ার পরে ভগবান্ নারায়ণ কীকট দেশে বুদ্ধ নাম ধারণপূর্ব্বক জিনসুতরূপে দেববিদ্বেষপরায়ণ জনসমূহের বিমোহনের জন্য অবতীর্ণ হইবেন।

"শুক্লদন্তা হঞ্জিতাক্ষাশ্চ মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ।
শূদ্রা ধর্ম্মং বদিষ্যন্তি শাক্যবুদ্ধোপজীবিনঃ॥"

(হরিবংশ।)

শাক্যকুলসিংহ বুদ্ধদেবের মতাবলম্বী শূদ্রগণও স্বধর্ম্মমতানুযায়ী নিজেদের দন্তরাজি শঙ্খবৎ ধবল করিয়া, চক্ষুদ্বয় অঞ্জনরাগে সুরঞ্জিত করিয়া, মস্তক বিমুণ্ডিত করিয়া এবং কষায়রাগে পাণ্ডুবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া সকলকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন।

বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবগণ দৈত্যযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে বলিতেছেন ;—

"স্ববর্ণধর্ম্মাভিরতা বেদমার্গানুসারিণঃ।
ন শক্যাস্তে হরয়ো হন্তমস্মাভিস্তপসান্বিতাঃ॥"

অসুরগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিপালন ও বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিয়া দেবতাদিগের অজেয় হওয়াতে ভগবান্ বিষ্ণু নিজ দেহ হইতে মায়া মোহকে উৎপাদন করিয়া বলিলেন ;—

"মায়ামোহোঽয়মখিলান্ দৈত্যাস্তান্মোহয়িষ্যতি।
ততো বধ্যা ভবিষ্যন্তি বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ॥"

মায়ামোহের উপদেশে দৈত্যগণ বৈদিক আচার পরিত্যাগ করিয়া দেবতাদিগের বধ্য হইবে।*

বিষ্ণু ও অগ্নিপুরাণে এইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের প্রকল্পনা দেখা যায়। অধিকার ভেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জনগণ কেবলমাত্র নির্ব্বাণ পথ অবলম্বন করা নিবন্ধন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিপ্লব ঘটাতেই সম্ভবতঃ এইরূপ উপাখ্যানের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধকে জগতের একমাত্র স্রষ্টা বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহারা অর্চ্চনা করিতে পৌরাণিকগণ কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই, কারণ তাঁহারা জানিতেন এই ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে অলৌকিক শক্তির সমাবেশ হইতে দেখা যায়, তাহাতেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের অখণ্ড প্রভাব প্রকটিত হইয়া থাকে।

৯০। বন্ধু ও মিত্রের পরিত্রাণ বান্ধবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিভূয়াদ্বন্ধুমধনং মিত্রং ত্রায়েত দুর্গতম্।
বন্ধুমিত্রোপজীব্যো ভূদর্থিকল্পতরুর্বলিঃ॥

নির্ধন বান্ধবের জীবিকার উপায় করিয়া দিবে এবং বিপদ্গ্রস্ত মিত্রকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবে। দৈত্যরাজ বলি প্রার্থনাপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে কল্পতরু

* শুক্রাচার্য্যের অনুপস্থিতিতে স্বর্গগুরু বৃহস্পতি শুক্রের রূপ ধারণ করিয়া এইরূপে দৈত্যগণকে স্বধর্ম্মাচার হইতে বর্জ্জিত করিয়াছিলেন। পুরাণে এই দৃষ্টান্তই দেখিতে পাওয়া যায়।

সদৃশ ছিলেন। ফলতঃ তিনি অভীপ্সিত কামনা পূর্ণ করিয়া বন্ধু ও মিত্রদিগের পক্ষে যথার্থ প্রতিপালক স্বরূপ হইয়াছিলেন।

"বিমুখা নার্থিনো যান্তি ভবতো গৃহমাগতাঃ।
অর্থিনাং কল্পবৃক্ষোঽসি দাতা চান্যো ন বিদ্যতে ॥"

(মহাভারত।)

দেবরাজ ইন্দ্র, দৈত্যপতি বলিকে বলিয়াছিলেন, হে দৈত্যরাজ, আপনার গৃহে সমাগত যাচক ব্যক্তি কথনও বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যান না। অতএব আপনি বাস্তবিকই অর্থী ব্যক্তিগণের পক্ষে "কল্পবৃক্ষতুল্য"। এই জগতে আপনার তুল্য অন্য দাতা নাই, একথা ধ্রুব সত্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি ॥

পূজার ছুটি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যাঁহারা বৃন্দাবনে যাইবেন তাঁহারা যেন লালাবাবুর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটী দেখিতে অবহেলা না করেন। লালাবাবুর নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন, প্রাতঃস্মরণীয় পরম ভক্ত স্বর্গীয় লালাবাবু, যাঁহার প্রকৃত নাম ৺কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবনধামে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ইহা দর্শন করিলে নয়ন চরিতার্থ হয়। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি লালাবাবু একটী কথাতে একদিনেই সংসার ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। এইরূপ শুনা যায় যে একদা এক মেছুনী লালাবাবুর বাটীতে মৎস্য বিক্রয় করিতে আসিয়া বলিল "হরিহে পার কর সময় বয়ে যায়," তিনি এই বাক্যের সার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াই সংসার ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়া

অবশিষ্ট জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। লালাবাবু ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া যে সংসার ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা যে তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের বিশেষ সাধনার ফল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, এরূপ ত্যাগের উদাহরণ প্রায় দেখা যায় না। এস্থলে শাস্ত্রজ্ঞ পাঠকগণ সাংখ্যোক্ত পিঙ্গলা বেশ্যার উপাখ্যান স্মরণ করিবেন।

সময় অল্প বলিয়া আমরা চারি দিন মাত্র শ্রীবৃন্দাবন ধামে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি আমার পাণ্ডা শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর প্রেমবল্লভ পুষ্করের একজন বড় পাণ্ডাও অতি সদাশয় লোক, আমার পরম বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ঐ পাণ্ডাটীর নামে একখানি পত্র দিয়াছিলেন তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আছি যাঁহার জন্য আমি তথায় সুখে কাটাইয়া ছিলাম এখানেও আমার পাণ্ডা শ্রীযুক্ত চুণীলাল চোবে, একজন ভদ্রলোক, নির্যাতন দ্বারা অর্থ শোষণ তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ কার্য্য, আরও আমরা শ্রীমৎ কেশবানন্দজীর পরিচিত বলিয়া আমাদিগকে কোন বিষয়েই কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই; তবে মধ্যে মধ্যে বাড়ী হইতে এক এক খানি পত্র পাইতেছি যাহাতে আমাদের চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট হইতেছে এবং আমাদের অনবচ্ছিন্ন সুখে ব্যাঘাত পড়িতেছে অর্থাৎ আমরা এরূপ ভাবে সংসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকি যে কিছুতেই যেন আমাদের স্বাধীনতা নাই বলিয়া মনে হয়। ও সকল কথায় কাজ নাই। বৃন্দাবন ধামের দ্রষ্টব্য অসংখ্য, সময় অল্প, এই অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর পারা যায় দেখিয়া লইব এইরূপ ধার্য্য করিয়া আমরা পঞ্চম দিনে সেবাকুঞ্জ অর্থাৎ এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত সর্ব্বদা বিহার করিতেন বলিয়া প্রবাদ শুনা গেল, শ্রীনিধুবন প্রভৃতি পুরাতন স্থান সমূহ দর্শন করিলাম; এবং ফিরিবার পথে প্রাতঃকালে উঠিয়াই মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। বৃন্দাবন হইতে মথুরা অতি অল্পক্ষণে যাওয়া যায়, অনেকে পদব্রজেও যাইয়া থাকে তদ্ব্যতীত এক্কা ও ভাড়াটে গাড়ি প্রভৃতিও পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা রেল গাড়িতে যাত্রা করিলাম এবং তথায় পৌঁছিয়া রাজা কংসের রাজধানী মথুরা দর্শনে বহির্গত হইলাম। মথুরা একটী অতি প্রাচীন বিখ্যাত সহর, ইহার পথ ঘাট প্রশস্ত ও পরিষ্কার,

এখানে বহুলোকের বাস। এমনকি টলেমি, প্লিনি এরিয়ান প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থেও এই নগরীর নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পাণ্ডাগণকে চোবে বলিয়া থাকে। মথুরার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব তবে যাহাতে পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি না হয় এইরূপ ভাবে যৎকিঞ্চিৎ বলিব। মথুরার আদি ইতিহাস নিতান্ত অস্পষ্ট। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের যত্নে মথুরার নানা স্থান খুঁড়িয়া যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি বাহির হইয়াছে তাহার অধিকাংশই জৈন। তন্মধ্যে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায়, যে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে এখানে জৈন প্রাধান্য ও ২য় শতাব্দীর শেষভাগে বৌদ্ধ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চীন পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এখানে ২০টী সঙ্ঘারাম ও ৫টী মন্দির দেখিয়া যান, ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য যুগের পর প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধযুগ মথুরার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখনকার মন্দির গুলিও স্থানে স্থানে উহাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে বোধ হয় যে এক কালে মুসলমান রাজগণের হস্তে মথুরার প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি বিশেষরূপে নিগৃহীত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা মথুরা দর্শনে গিয়াছেন তাঁহারা সে বিষয়ে বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে কাটরা নামে পরিচিত স্থানটীতে বহু পূর্ব্বে ৺কেশব দেবের মন্দির ছিল। সম্রাট আরঙ্গীব উহার স্থানে একটী মসজিদ নির্ম্মান করাইয়াছিলেন, মসজিদ গাত্রস্থ নাগরলিপি তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। উহার অদূরে ভূতেশ্বরের মন্দির উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভগ্নাবশেষ নিরীক্ষণ করিলে অনুমান হয় যে উহা কৃষ্ণাবতার যুগের বহুপূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং উহার সন্নিকটে কাজীবাগ নামক উদ্যানে একটী ক্ষুদ্র মসজিদ দেখা যায়। উহাতে হিন্দুধর্ম্মের কোন চিহ্ন না পাইলেও উহার গঠন কার্য্য দেখিয়া বোধ হয় যে উহা এক সময়ে হিন্দু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমি পূর্ব্ব হইতেই মথুরার চোবে দিগকে ভয় করিতাম কারণ তাহারা যাত্রিগণকে বিশেষ নির্য্যাতন করিয়া পয়সা লইয়া থাকেন। সুতরাং স্বামীজী মহারাজের নিকট হইতে কানমে নাড়ু সাড়ে আট ভাই নামক এক চোবের নামে পত্র লইয়া মথুরায় পৌছিলাম। চোবেজী ব্রজবাসজীর লোক বলিয়া আমাদিগকে বিশেষ যত্ন সহকারে তীর্থ কার্য্য গুলি করাইয়া দিলেন।

মথুরার কেল্লা হইতে যমুনা বাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যমুনা বক্ষে ২৪টী স্নানের ঘাট আছে তন্মধ্যে আমরা প্রথমে বিশ্রান্ত বা বিশ্রাম ঘাট দর্শনে যাইলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম বিশ্রাম ঘাট হইয়াছে। মথুরার ২৪টী ঘাটের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান এইটীই এখানকার সন্ধ্যা আরতি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। যাঁহারা মথুরা দর্শনে যাইবেন তাঁহাদের এই আরতি দর্শন করা আবশ্যক। আমরা এই স্থানে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি যাবতীয় তীর্থ কার্য্য সমাপন করিয়া ধ্রুব ঘাটেও ঐরূপ যথাবিধি তীর্থ কার্য্য সম্পাদন করিলাম। এই সকল স্থান পাণ্ডাগণই যাত্রিগণকে দেখাইয়া দেন, ইহা ব্যতীত এই সকল তীর্থস্থানের প্রকৃত নির্দ্দেশ পাওয়া সহজ নয়, ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ব-বিৎগণ ইহাদিগের যাথার্থ প্রমাণ করিতে সমর্থ হইতে পারেন, আমাদের ন্যায় লোকের পাণ্ডার কথায় বিশ্বাস করিতে হয়। এই ধ্রুব ঘাটের উপরিভাগে এক পাহাড়ের উপর বালক ধ্রুব ইচ্ছাপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন অদ্যাপি যাত্রিগণ এই স্থানে ধ্রুবের তপস্যা মূর্ত্তির দর্শন পাইবেন, মথুরা সহরের মধ্যে ধ্রুব ঘাটের পশ্চিম ভাগে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে কংসটিলা বর্ত্তমান আছে। এই স্থানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত বীর যোদ্ধ্‌গণের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞদর্শনহেতু উপস্থিত হইয়া কংসকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

মথুরায় পূর্ণব্রহ্ম অনাদিদেব শ্রীকৃষ্ণরূপে নরদেহ ধারণ করিয়া কংসকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়াই উহা হিন্দুর নিকট মহা পবিত্র স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, সেই কংসালয়ের ধ্বংসাবশেষ এখন বিশ্রামঘাটের পার্শ্বে; যে স্থানটী এখন কংসালয় বলিয়া কথিত হইতেছে মৃত্তিকার মধ্যে ভগ্ন বাসগৃহের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ইহা অতি প্রাচীন কালের কীর্ত্তি বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। ৪।৫ ইঞ্চি পরিমিত ইষ্টকে উহা নির্ম্মিত। উহার নিকটে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ইহাও অতি প্রাচীন, ইহার পুরাতত্ত্বের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গেল কিন্তু বাহুল্য ভয়ে উহা পরিত্যক্ত হইল। আমরা সর্ব্বপ্রথম ঐ মন্দিরটী দর্শন করিলাম। মথুরা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান গোকুল যাইতে হয়। যাত্রিগণ এই স্থানে পৌঁছিলেই একাওয়ালা ও গাড়িওয়ালারা আসিয়া উপস্থিত হইবে ও গোকুল লইয়া যাইবে। যমুনার পূর্ব্বপার

সমস্তই গোকুল নামে খ্যাত। ইহার অপর নাম মহাবন। মথুরা হইতে যমুনার পূর্ব্বতীরে প্রায় দশ মাইল বাঁধা রাস্তা ধরিয়া গোকুলস্থ নন্দালয়ে যাইতে পারা যায়। পথে কাম্যবন দর্শন করিবেন, এই বনে এইরূপ কথিত আছে, রাজা যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় সর্ব্বস্বান্ত হইবার পর বাস করিয়াছিলেন এবং এইস্থানেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এই সকল স্থান ভ্রমণ করিলে মনে বাস্তবিকই একটু বিমল আনন্দের উদ্রেক হয়। বৃন্দাবন অপেক্ষা মথুরা বড় সহর, এবং ইহার স্বাস্থ্য ও যমুনাতীরস্থ ঘাট গুলির দৃশ্যও ভাল। তবে সংস্কারাভাবে দিন দিন ঐ গুলি বড় নিরানন্দদায়ক হইয়া উঠিতেছে প্রকৃত স্বার্থশূন্য আস্থাবান হিন্দু রাজা মহারাজাগণের ঐ দিকে দৃষ্টি না পড়িলে ঐ সকল হিন্দু কীর্ত্তি যে অচিরে ধ্বংস মুখে পতিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই, আমাদের অনুরোধ তীর্থ দর্শনাভিলাষিগণ যেন এই সকল স্থান দর্শনে অনাস্থা প্রকাশ না করেন, আমরা প্রথম যে দিন মথুরায় পৌছিয়াছিলাম সেই দিন ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া, ঐদিনে মথুরার যমুনা স্নানে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে, সুতরাং যাত্রিগণের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পুলিশের বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হয়। ঐ দিনকে ঐ স্থানে যম দ্বিতীয়া বলে, আমরা আমাদের পাণ্ডার সাহায্যে অতি কষ্টে ঐ দিনে যমুনায় স্নান করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

ইহার অনতিদূরে শ্রীকেশবদেবের মন্দির। এই মন্দির দর্শন ও ইহার অভ্যন্তরস্থ প্রতিষ্ঠিত কেশবজীর দর্শন ও অর্চ্চনা অতীব আবশ্যক। ঐ দেবতার মন্দির ও ইহার বিগ্রহ যে কত কাল স্থাপিত হইয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারেন না, এই সকল অতি প্রাচীন কালের হিন্দু কীর্ত্তি সকল দর্শন করা আমাদের উচিত। বাস্তবিকই ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির উপর শ্রদ্ধা ভক্তির যে বৃদ্ধি হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, কেবল পুস্তকস্থিত বর্ণনা পাঠে সকল সময়ে প্রকৃত বিষয়ের অনুধাবন করা যায় না, এই সকল মন্দিরের প্রাচীনত্ব ও ইহাদের ইতিহাস অনেক গ্রন্থ হইতেই জানিতে পারা যায় সন্দেহ নাই এমন কি ইউরোপীয় ইতিহাস লেখকগণও একবাক্যে ইহার প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তত্রাপি ইহা বলা অনাবশ্যক পর্য্যটন স্পৃহা হউক বা ধর্ম্মানুসন্ধানচরিতার্থ করিতেই

হউক প্রত্যেক হিন্দুই যেন একবার মথুরা বৃন্দাবন দর্শনে সচেষ্ট হয়েন। এই সকল স্থান দর্শনে হিন্দুধর্ম্মে ঘোর অবিশ্বাসীর মনেও কতকটা হিন্দুভাব আসিয়া পড়িবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। মথুরা সহরের অধিকাংশ ধর্ম্মশালা, দেবালয়, ও তীর্থঘাট সকল মহারাজ ভরতপুরাধিপতি প্রভৃতি অন্যান্য রাজা, মহারাজগণের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকালকার রাজা মহারাজগণের মনের গতি অন্যরূপ হইয়াছে! যমুনার সেতুর উপর হইতে এই সহরের দৃশ্য দেখিলে কাশী সহর বলিয়া ভ্রম হয়। যাঁহারা শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড তীর্থ স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা এই থান হইতেই ভাল ঘোড়ার গাড়ী, কিম্বা একাগাড়ী, উষ্ট্রের গাড়ী বা গোশকটাদি করিয়া লইবেন। শ্যামকুণ্ড মথুরা হইতে প্রায় আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে বাঁধা প্রশস্ত রাস্তা আছে। মধ্যপথে চারি মাইলের মধ্যে গিরিগোবর্দ্ধন তীর্থ নয়ন পথে পতিত হইবে, এখানে থাকিবার ধর্ম্মশালা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত আছে। আমাদের ভাগ্যে মথুরার আর সকল দেখা হইল না, কেননা শীঘ্রই বাটী আসিতে হইবে। আমাদের Tour Programme বড়ই সুন্দর, যাহা গতকল্য স্থির করিয়া রাখিয়া দিলাম তাহা অদ্য বন্ধ হইয়া গেল! আমাদের সমস্তই অনিশ্চিত ও অস্থির, ইহা আমাদের কি পুরুষকার কি অদৃষ্টবাদ কোনটীর উপরই সম্পূর্ণ বিশ্বাসের অভাবের ফল বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক আমরা রাত্রে ৯।৩০ মিনিটের ট্রেণে বাটী ফিরিবার জন্য মথুরার ষ্টেসনে আসিয়া ট্রেণ ধরিলাম। লোকের অত্যন্ত ভিড, অতি কষ্টে এক খানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িতে উঠিলাম, তাহাতে আলো মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। পথে জল চাহিলে কোন উত্তরই পাওয়া গেল না, মধ্যে মধ্যে মুসলমানদিগের জন্য মশকধারী জলওয়ালা দেখা গেল। পানিপাঁড়গণের কণ্ঠধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। আমাদের গাড়ীর একটী যাত্রী তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পিপাসা শান্তির কোন উপায়ই হইল না। যাহা হউক, প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে গাড়িতে দুইটী ভদ্রলোকের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে আমাদের রাত্রে রেলের কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে

একজন চক্ষু চিকিৎসক, সিন্ধুদেশ হইতে পিতামাতার পিণ্ড দান করিতে গয়ায় আসিতেছেন, জাতিতে ক্ষেত্রী, ইউরোপীয়ান বেশধারী, ইংরাজীতে কথাবার্ত্তায় অভ্যস্ত। আর একজন যৌনপুরের উকিল, জৈনধর্ম্মাবলম্বী এবং Congress-man. সিন্ধুদেশীয় চিকিৎসকটী অতি অমায়িক ভদ্রলোক, তাঁহার কোন দ্রব্যেরই অভাব ছিল না এবং তিনি আমাদিগের আতিথ্য করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন। কিন্তু উকিল মহাশয় কেবল মাত্র দুই একটী Cigarette লইয়াই তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিলেন, তাঁহার নিকট হইতে চা পান বা তাঁহার জল গ্রহণ করিলেন না, ইহাতে তিনি একটু দুঃখিত হইলেন সন্দেহ নাই। আমাদের সঙ্গে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্যাদি ছিল না, থাকিলেই বা কি হইবে, জলাভাব। যাহা হউক রাত্রিটা একপ্রকার কথাবার্ত্তায় কাটিয়া গেল, আমাদের পরিচ্ছদাদি দেখিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক তিনি আমাদিগকে তাঁহার চা, বিস্কুট, রুটী মাখন প্রভৃতির কিছুই দিলেন না।

এই প্রকারে সাধারণ বাঙ্গালীদিগের রেলের কষ্টের বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে আমরা পরদিন বেলা ১০ দশটার সময় কানপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখানে গাড়ী অনেকক্ষণ থামে। যাহার যাহা দরকার এখানে তাহা পাওয়া যায়, সকলেই এইস্থানে আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। বিহারী উকিল বাবুটির অবস্থা বড় ভাল বোধ হইল না, তিনিও আমার ন্যায় কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন সেবাদ্বারা জলযোগ সম্পাদন করিয়া লইলেন এবং কেলনারের হোটেলে উপবিষ্ট উন্নতিশীল বাঙ্গালী বাবুগণের প্রতি সতৃষ্ণনয়ন নিক্ষেপ দ্বারাই নিজের ক্ষুধা শান্তি করিতে লাগিলেন। ইহার পর আমরা এলাহাবাদে অবতরণ করিলাম, যেহেতু গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে স্নান করিবার পর আমাদের তীর্থভ্রমণে যবনিকা পতন হইবে। আমাকে কোথাও পাণ্ডার উপদ্রব সহ্য করিতে হয় নাই। এখানেও আমরা আমাদের আত্মীয় এখানকার হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আতিথ্য স্বীকার করায় সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

প্রভাতে আমরা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থান ৺বেণীঘাটে পৌঁছিয়া সেখানকার যাবতীয় তীর্থকার্য্য সম্পাদন করিলাম। প্রয়াগ অতি প্রাচীন

হিন্দুতীর্থ। পূর্ব্বকালে এরূপ শুনা যায়, রাজাদের অভিষেক কালে ইহার জল না হইলে চলিত না এবং ইহার নিকটে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম ছিল। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ৪১৪ খৃষ্টাব্দে যখন এই স্থানে আসিয়াছিলেন তখন ইহা কোশল রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল বলিয়া শুনা যায়। দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে এখানকার কেল্লা, তন্মধ্যস্থ "অক্ষয় বট", মেওকালেজ, আলফ্রেড পার্ক, সমরুবাগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রধান। এখানকার জলবায়ু মন্দ নয়। আমরা এই সকল দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। এলাহাবাদ কেল্লার মাটির নীচে নানাবিধ দেবতা সন্দর্শন করিয়া আমরা পরদিন পুনরায় ৺কাশীধামে আসিয়া পড়িলাম।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাজ ও সাহিত্য।*

"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি।
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?"

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত)।

যথার্থই বঙ্গভাষা আজ নানা-রত্ন-বিভূষিতা, বঙ্গবাসীর মাতৃভাষার ভাণ্ডার আজ নানারত্নে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালীর সে দৈন্য, সে দুঃখ আজ আর নাই। কবি যথার্থই গাইয়াছেন,—

"বিশ্ব-পূজনীয়া আজি যেন রাজরাণী,
রাজভাষা মাতৃভাষা এবে তুল্য মানি॥

* ২৩শে জুলাই (১৯১৬) রবিবার অপরাহ্নে, মাননীয় বিচারপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, কেটি, সি, এস, আই, এম, এ, ডি, এল, ডি, এস, সি, এফ, আর, এস, এফ, আর, এস, ই, এফ, এ, এস, বি, মহোদয়ের সভাপতিত্বে সাহিত্যসভায় পঠিত।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মনস্বিগণ কতিপয় কুসুমে যে বঙ্গ-বাণীর পাদপূজা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, শিশিরস্নাত শ্যামল দূর্ব্বার ন্যায় সামান্য কয়েকটি বঙ্গ প্রবচনে যে বঙ্গ-ভারতীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন,—না না, এক প্রকার প্রথম উদ্বোধন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার চরণ-কমল কত সাধকের সদ্ভাব-চন্দন-চর্চ্চিত কুসুমদামে আপীড়িত। মা আমার বাসন্তী প্রতিমার ন্যায়, স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, মনোমোহিনী আশার ন্যায়, ঐ দেখ সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন স্নেহ-গদ্গদকণ্ঠে বঙ্গবাসীকে আহ্বান করিতেছেন,—ঐ শুন, মায়ের অকপট সাধক, বঙ্গভূমির বরেণ্য পুত্র, যেন মায়েরই অঙ্গুলি সঙ্কেতে উদ্বুদ্ধ হইয়া, মার প্রাণের সুরে সুর মিশাইয়া বঙ্গবাসীকে ডাকিতেছেন, পথ-হারা, ক্লান্ত পথিককে যেন স্বর্ণমন্দিরে আহ্বান করিতেছেন—

ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি।
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?

অমর কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বাণীর বরপুত্রগণ নানা পত্রপুষ্পপল্লবে, স্থিরজ্যোতিঃ অবিদ্ধ-রত্নজালে, মায়ের মন্দির কি সুন্দরই না সাজাইয়া গিয়াছেন! কত তাপ, কত ঝঞ্ঝায় বঙ্গের বক্ষঃ বিশুষ্ক বিশীর্ণ হইলেও, সে মন্দিরের নয়ন-তর্পণ শোভার বিন্দুমাত্রও অত্যয় ঘটে নাই। বরঞ্চ দিনের পর যত দিন যাইতেছে, তত সেই সুন্দর মন্দির যেন ক্রমেই সুন্দরতর, সুন্দরতম হইতেছে। বঙ্গবাসীদিগের চিত্তে যতই আত্ম-সম্মান জ্ঞান,—যাহা কিয়ৎকালের জন্য, জানিনা কোন্ অভিশাপে, যেন কিসে আচ্ছন্ন হইয়াছিল,—সেই লুপ্ত আত্মসম্মান জ্ঞান যতই উদ্বুদ্ধ হইতেছে, ততই সে মন্দিরের সৌন্দর্য্যে, স্নিগ্ধ কান্তিতে, বঙ্গবাসী আকৃষ্ট হইতেছে। শরজ্জ্যোৎস্না-বিধৌত রজনীর অবসানে সুপ্তোত্থিত যেমন স্নিগ্ধ মধুর প্রভাতের কুজ্ঝটিকার শুভ্রবসনে আবৃত-কায়া, শিশির মুক্তাখচিতা প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্যপূর্ণ মুখচ্ছবি দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হয়, উদ্ভ্রান্তভাবে কেবল সেই অনন্ত সুষমার নির্ঝরিণীর দিকে চাহিয়াই থাকে, দেখে, দেখে, দেখে, তদ্রূপ মোহনিদ্রাবশ বঙ্গবাসী আজ নিদ্রাভঙ্গের পর, বঙ্গবাণীর সেই সুসজ্জিত মন্দিরের শোভা দেখিয়া কি আনন্দই না উপভোগ করিতেছে। যত দেখিতেছে, বঙ্গভাষার কমনীয় কান্তি, আশাপ্রদীপ্তমুখচ্ছবি

যত দেখিতেছে, ততই আরও দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। এই আমার মা, এই মার কোলে আমি বর্দ্ধিত, লালিত পালিত, এই মা'র আদরে আহ্লাদে আমি ধন্য কৃতার্থ—ভাবিয়া, অকপট ভাবে জননী বঙ্গভাষার প্রতি প্রীতিবিহ্বল হৃদয়ে ও প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে। এই আমার মাতৃভাষা, এই আমার বঙ্গভাষা. আমি এই দিব্য ভাষার সেবক, এই অমরীর সন্তান,—ভাবিয়া নিজকে ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ মনে করিতেছে। আত্মবিস্মৃতি অধঃপতনের নিদান। আত্ম-স্মরণ অভ্যুদয়ের সোপান। যে জাতি যত আত্মবিস্মৃত, সে জাতি তত দুর্গত, লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত। আজ আত্মস্মরণে, আপন মাতৃভাষার স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখচ্ছবির দর্শনে, বঙ্গবাসীর প্রাণ যেন কেমন একটা আশার বৈদ্যুতী প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই বাঙ্গালী ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে মার উদ্দেশে গাইতেছেন—

"ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি।
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন, এই দেশেতে মরি॥"

(দ্বিজেন্দ্র লাল)

বর্ত্তমান সময়ে, দেশের যাঁহারা গৌরবভাজন সন্তান, বঙ্গভূমি যাঁহাদের দ্বারা অলঙ্কৃত, সেই সকল মনীষাসম্পন্ন, পাশ্চাত্যবিদ্যাবিভূষিত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও উপেক্ষিতা বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন। বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষ পর্য্যন্ত সভাসমিতিতে বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া, বঙ্গবাসীর হৃদয় যেন করতলস্থ করিয়া লইতেছেন। বেশি দিনের কথা নহে, এমন দুর্দ্দিনও ছিল, যখন, বাঙ্গালায় কথা বলা বা বঙ্গভাষার আলোচনা করা পর্য্যন্ত একটা লজ্জাজনক কার্য্য মনে হইত। সেদিন চলিয়া গিয়াছে, সে মোহ কাটিয়াছে। পূর্ব্বকৃত সেই মহাপাপের এখন প্রায়শ্চিত্তের কাল উপস্থিত। তাই, বঙ্গসন্তান বাঙ্গালায় দুটো কথা বলা বা বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লেখাকে বিশেষ গৌরবজনক বলিয়া মনে করিতেছেন। বঙ্গভূমির তথা বঙ্গভাষার ইহা পরম কল্যাণের বিষয়। ছেলে মাকে চিনে না, বা চিনিয়াও মা বলিয়া ডাকে না, ইহা ছেলের পক্ষে ঘোর কলঙ্কের কথা। এতদিনে মনে হয়, সে বোধ আমাদের জন্মিয়াছে। আত্মবিস্মৃতির কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গিয়া, মধুর প্রভাতের স্নিগ্ধমূর্ত্তি ঐ ক্রমে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। বঙ্গভূমির পরম কল্যাণময়ী ঊষা আবির্ভূত হইয়াছেন। এ

সমুদয় যখন নিবিষ্টচিত্তে ভাবি, তখন যথার্থই একটা অখণ্ড আনন্দে হৃদয় আপ্লুত হইয়া আসে। বাঙ্গালী বলিয়া শ্লাঘা অনুভব করি।

এই পরম কল্যাণের মধ্যেও কিন্তু একটা অকল্যাণের ছায়া দর্শনে মনে বিষম ত্রাস ও দুঃখ জন্মে। যখন দেখি, মাতৃভাষার সেবা করিবার ব্যপদেশে কেহ কেহ বঙ্গ ভারতীর পবিত্র মন্দিরে ঘোর ব্যভিচার করিতেছেন, মায়ের অঙ্গ সুসজ্জিত করিতে যাইয়া তাহাতে অস্ত্রোপচার করিতেছেন, তখন যথার্থই একান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়ি। যে বনশোভিনী লতিকা পত্রপুষ্পপল্লবে আনত হইয়া আপনিই আপনার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইতেছে এবং সমস্ত বনভূমিকেও সুশোভিত করিতেছে, তুমি পার ত, তাহার সেই শোভার স্থায়িত্ব-কামনায় জলসেচনাদি কর, কিন্তু নির্দ্দয়-হৃদয়ে সে লতার কুসুমচ্ছেদ, পল্লবভঙ্গ বা পত্রনাশ করিও না। যে বঙ্গভাষা আপনার সৌন্দর্য্যে, আপনার ভাবে, আপনিই উল্লসিতা ও নানা ভাবময়ী হইয়া উঠিতেছে, নিষ্ঠুর তুমি, সেই বঙ্গভাষার গাত্রে কলঙ্কলেপ করিও না। সাজাইতে পার, ভাল করিয়া সাজাও, কিন্তু বিরূপ করিও না। বিধাতার অনুগ্রহে যদি তোমার সেবা করিবার প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, যদি তুমি লেখনী চালনায় অধিকারী হইয়া থাক,—যাহাতে তোমার মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়, তোমার স্বজাতির হৃদয়ে ও সমাজে বলবৃদ্ধি হয়, ভাববৃদ্ধি হয়, এমন ভাবে লেখনী পরিচালিত কর। মনে রাখিও,—নিদারুণ ও নিরপেক্ষ কালের হস্তে তুমি আমি অচিরেই লোপ পাইব, কিন্তু তোমার আমার দুষ্কার্য্যের ফলভোগ, আমাদের স্বজাতি ও সমাজ চিরদিন করিবে। তোমার অপকার্য্যের ফলে তুমি ত সপরিজনে উৎসন্ন যাইবেই, তোমার ছায়া স্পর্শ যাহারা করিবে, তাহাদেরও নিস্তার নাই। বিষবৃক্ষের বিষময় ফলে কেবল কুন্দনন্দিনীই মরে নাই, সূর্য্যমুখীর সোনার সংসার জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল, দেব-স্বভাব নগেন্দ্রনাথ দানবে পরিণত হইয়াছিলেন।

তোমার দেশ, তোমার সমাজ, তোমার জাতি যাহাতে গৌরবিত হয়, যাহাতে উন্নত হয়, জগতের অন্যান্য সভ্যজাতির সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমকক্ষকতা করিতে পারে, তোমার জাতীয় সাহিত্য যাহাতে অপর জাতির আদর্শ হইতে পারে, সেই পক্ষে চেষ্টা কর, সেই রূপ ধ্যান কর, সেই মন্ত্রের উপাসনা কর। ভুলিও না যে, তুমি কে, কত বড় একটা প্রাচীন ও প্রথম-সমৃদ্ধ জাতির তুমি এক ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ। সময়ের স্রোতে, কালের ধর্ম্মে, নিজের পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃত হইও না।

অবশ ভাবে প্রবাহে গা ছাড়িয়া দিও না। যাহা হারাইয়াছ, তাহার উদ্ধার করিতে পার-না-পার, যাহা এখনও আছে, ভারতের উর্ব্বর মৃত্তিকার গুণে যাহা আবার নবীন জীবন লাভ করিয়া ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিতেছে,—তাহাকে বাধা দিও না। তাহার মস্তক আবর্জ্জনা রাশির দ্বারা আবৃত করিও না। যদি তোমার সমাজ ও তোমার জাতিকে প্রকৃত পক্ষে সমুন্নত করিতে চাও, যদি তোমার দেশের আপামর সাধারণকে একভাবে এক প্রাণে জ্ঞান-বিজ্ঞানে দীক্ষিত করিতে চাও, তবে যাহাতে তাহাদের চিন্তাশক্তি দিন দিন উপচিত হয়, যাহাতে উৎকৃষ্টের প্রতি, নির্দ্দোষের প্রতি তাহাদের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পায়, এমন ভাবে তোমার জাতীয় সাহিত্য গঠন কর। তোমার মাতৃভাষার মোহন মন্ত্রে তাহাদিগকে একেবারে বিমোহিত কর, তাহারা অবশচিত্তে, তোমার অনুসরণ করিবে। নতুবা কেবল গোয়েন্দা কাহিনীর আপাতরমণীয়া বেশ-চাতুরীতে তোমার সরল, সবে-এই-প্রথম-উদ্বুদ্ধ স্বজাতিকে মজাইও না। আলেয়ার আলোকে, ক্ষণপ্রভার চকিত বিলাসে, অন্ধকারই গাঢ়তর রূপে প্রতীত হয় মাত্র, প্রকৃত দর্শনের সহায়তা তাহাতে হয় না। পার যদি, যাহাতে তোমার মাতৃভাষার পবিত্র মন্দির প্রাঙ্গণে কোনরূপ বন্যবৃক্ষাদি জন্মিতে না পারে, তাহার চেষ্টা কর। তুমি, হে বঙ্গভাষার সেবক, তোমার মায়ের সুধাধবল মন্দির শীর্ষে স্বহস্তে অশ্বত্থের বীজবপন করিও না। যাহা উদার, যাহা নির্ম্মল, নিষ্পাপ, মনোহর, যাহা শান্ত, স্নিগ্ধ, সরল,—এমন মূর্ত্তি তোমার মাতৃভাষার দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়া, তোমার স্বদেশবাসীর নয়নরঞ্জন ও চিত্তবিশোধন কর। উদার আদর্শ তোমার মাতৃভাষায় অঙ্কিত করিয়া, তোমার স্বজাতিকে আদর্শের পূজা করিতে শিখাও। তাহারা আদর্শের ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে উন্নত, উন্নততর ও উন্নততম হইবে। আপাতরম্য অসার চিত্রের মোহন কুহকে জাতীয় সাহিত্য কলঙ্কিত ও স্বজাতিকে প্রতারিত করিও না। নিজের গুরুতর কর্ত্তব্যের কথা মনে করিয়া, লেখকের পবিত্র আসনের মর্য্যাদা যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহা করিও। ক্ষণিক স্তুতি বা ক্ষণ-প্রভ যশের উন্মাদে প্রমত্ত হইয়া, হে বঙ্গসাহিত্যের সুনিপুণ চিত্রকর! তুমি মাতৃভাষার শান্তিময় মণ্ডপে তরল, প্রবঞ্চক, আলেখ্য স্থাপন করিও না। একের পাপে আর দশজনকে মজাইও না।

দেশ-কাল-পাত্র—এই তিনটির প্রতি নিয়ত সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া, পার ত প্রতিমা

গঠন কর অন্যথা বিরত হও। রাম, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দধীচি যে দেশের আদর্শ পুরুষ,—সীতা, সাবিত্রী, লোপামুদ্রা, দময়ন্তী, ঔশীনরী, অরুন্ধতী যে দেশের আদর্শ রমণী—ভরত, লক্ষ্মণ, অর্জ্জুন যে দেশের আদর্শ ভ্রাতা—সে দেশের কাব্য-নাটকে, উপন্যাস-নবন্যাসে যথেচ্ছচারিতা করিও না। পুষ্কর-পুরুষোত্তম, কাশী-কুরুক্ষেত্র, জাহ্নবী-যমুনা, বিন্ধ্য-হিমাচল এখনও তোমার সমক্ষে বিদ্যমান, চক্ষুষ্মান্ হইয়া অন্ধবৎ চলিও না। যাহা বিরাট্, প্রকাণ্ড, তাহার প্রতি দৃষ্টি কর, আত্মার সঙ্কোচ পরিহার কর। সৌভাগ্যক্রমে যে পৈতৃক-সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছ তাহার অপচয় বা অপব্যবহার করিও না। বরঞ্চ যেটুকু পার, তাহার মাহাত্ম্য, নিজে অনুভব করিয়া, এবং তোমার স্বজাতিকে তদ্দ্বারা—অনুভাবিত করিয়া লেখনীধারণ সার্থক কর, ধন্য হও। মনে রাখিও, এই ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের এই মধুর বঙ্গদেশে, মহাকবি মধুর, কিন্নর মধুর, এই মধুময় বঙ্গদেশে, যাহাতে মাধুরী নাই, পবিত্রতা নাই, যাহাতে সদ্ভাব নাই, সমবেদনা নাই, এমন মূর্ত্তি কদাচ স্থায়িত্ব লাভ করিবে না। পুণ্যের জয় পাপের ধ্বংস নিশ্চিত। কত গ্রন্থকার, সাময়িক ও ভঙ্গুর উত্তেজনার বশে, এই বঙ্গভূমিতে কত কবিতা, কত গ্রন্থই না রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহার কয়খানির অস্তিত্ব আমরা খুঁজিয়া পাই ? দেশের মাটী না চিনিয়া, না বুঝিয়া তাহাতে বীজবপন করিলে, যে ফল হয়, ঐ ঐ গ্রন্থকারের গ্রন্থাদিরও তাহাই হইয়াছে। আর ভাবিয়া দেখ, কবে, কোন্ দিন্, কোন্ নির্জ্জন মুহূর্ত্তে, স্বভাবের কবি, কোন্

"বিকসিত কামিনী কুসুম তরুতলে
বসিলাম চিন্তাসখী সহ কুতূহলে"—

বলিয়া জ্যোৎস্নোন্মত্ত তরঙ্গিণীর কুল কুল গীতিকার সহিত গান ধরিয়াছিলেন, আর আজও যেন সে সঙ্গীতের বিরাম হয় নাই। সম্ভাবশতকের কবির সেই গান এখনও যেন বাঙ্গালীর "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" বাঙ্গালীকে আকুল করিয়া রাখিয়াছে। দেশের লোকের প্রাণের সুরে যদি সুর মিশাইতে না পার, তবে তোমার গান কদাচ জমিবে না, ইহা মনে রাখিয়া লেখনী চালনা করিও। আমার লেখার যাহারা পাঠক বা আমার অঙ্কিত আলেখ্যের যাহারা দর্শক, তাঁহারা লেখার পাঠকালে বা ঐ আলেখ্যের দর্শনকালে, যদি তাহাদের নিজকে,

আমাকে, ভিতরে, বাহিরে, সমস্ত পদার্থকে ভুলিতে না পারে, বিশ্বের তাবৎ পদার্থ বিস্মৃত হইয়া একমাত্র আমার সৃষ্ট চরিত্রে তন্ময় হইতে না পারে, তবে আমি কি লিখিলাম? আমার যাহারা সামাজিক, তাহাদের চিত্তবৃত্তি যদি সমস্ত বহির্ব্যাপার হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া আমি আমার হাতের মধ্যে আনিতে না পারিলাম, তবে সেই চিত্তের ভিত্তিতে আমার অঙ্কিত মূর্ত্তির ছায়াপাত করিব কি প্রকারে? সুতরাং আমাকে সর্ব্বদাই অতি সাবধানে লেখনী-চালনা করিতে হইবে। আমার সমাজের, আমার দেশের, আমার প্রতিবেশীর যাহাতে চিত্তবৃত্তি উন্নত হয়, দিব্য-সৌরভে আমোদিত হয়, যাহাতে তাহারা দয়া, পরদুঃখকাতরতা, সমবেদনা, স্নেহ প্রেম প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে সম্পন্ন হইতে পারে, বিমলজ্যোৎস্নায় তরঙ্গিণীবক্ষের ন্যায়, যাহাতে তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব দিনদিন উদ্ভাসিত হয়, এ বিষয়ে যদি বিন্দুমাত্র সাহায্যও আমার লেখার দ্বারা সাধিত হয়, তবেই আমার লেখনীধারণ সার্থক, অন্যথা উহা সম্পূর্ণরূপে বিড়ম্বনা, সন্দেহ নাই। এই লোকহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া যদি আমরা মাতৃভাষার সেবা করিতে পারি, তবেই ভাষার এবং সেই সঙ্গে আমার স্বজাতির, সমাজের এবং স্বদেশের কল্যাণ সাধন হইবে।

কেবল লোকরঞ্জনই কোন চিত্রের যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহাকে আমি উৎকৃষ্ট চিত্র এবং সেই চিত্রের কর্ত্তাকে নিপুণ চিত্রকর বলিতে পারি না। যে যে প্রণালীতে লোক হৃদয় বিমোহিত করা যায়, তাহার কোন একটি বা একাধিক প্রণালী দ্বারা বাহ্যতঃ লোকচিত্ত বিমোহিত ও বশীভূত করিয়া তাহাতে এমন উৎকৃষ্ট বস্তুর সংস্কার, এমন উদার ভাবের অভিব্যক্তি করিয়া দিব, যাহাতে আমার চিত্রের দর্শক বা আমার লেখার পাঠক অপ্রবুদ্ধ ভাবে আমার প্রদর্শিত পথে যাত্রা করিবে, আমার চিত্রের সদ্‌গুণ রাশিতে একেবারে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। তাহারা চিত্র দর্শন করিতে করিতে ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর সোপানে আরোহণ করিবে। তাহাদের চিত্তের দানবী বৃত্তি তিরোহিত হইবে, তাহারা ক্রমে দৈবী সম্পদে সুসম্পন্ন হইবে। যদি এইরূপ করিতে পারি, তবেই আমার মাতৃভাষার আমি যথার্থ সেবক। অন্যথা আমার লেখনীচালনা পণ্ডশ্রম মাত্র। শারদী জ্যোৎস্নার অঙ্গে শান্ত বনানীর স্নিগ্ধচ্ছায়া যেমন আপনাকে ঢালিয়া দেয়, নীলাম্বুরাশির প্রশান্ত গম্ভীর বক্ষে যেমন উষার স্বর্ণচ্ছটা আসিয়া

এলাইয়া পড়ে, প্রৌঢ়ের প্রবীণ হৃদয়ে যেমন বাল্যের মধুর স্মৃতি মাঝে মাঝে উদিত হইয়া জীবন ক্ষণেকের জন্য মধুময় করিয়া তোলে, পার যদি, তোমার পাঠকের চিত্ত ঐ ভাবে মধুময় করিতে চেষ্টা কর। পাঠককে মর্ত্ত হইতে লইয়া যাও, যেখানে তোমার উন্মাদিনী কল্পনা আপনা ভুলিয়া ছুটিয়াছে, সেই দিকে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তোমার পাঠকের চিত্তকে উধাও করিয়া লইয়া চল। একবিন্দু কর্পূরের সুবাসে সমস্ত কলসের জল সুবাসিত হয়, একবিন্দু অমৃতে সমস্ত হৃদয়টা অমৃতময় হয়, একদিনের একটি সুখের স্মৃতিতে সমস্ত জীবনটা সুখময় হয়, তোমার অঙ্কিত একটি মাত্র চিত্রে, সেইরূপ পাঠকের সমস্ত হৃদয়টা, সমস্ত জীবনটা, সারা সংসারটা যাহাতে সুখময়, অমৃতময়, আবেশময় হয়, তাহার চেষ্টা কর; তুমি নিজে ত ধন্য হইবেই, তোমার লেখা বা তোমার অঙ্কিত আলেখ্য বক্ষে ধারণ করিয়া, তোমার দেশ, তোমার জাতি তোমার মাতৃভাষাও ধন্য হইবে। তোমার জীবন সার্থক হইবে। যে দেশের বায়ু মলয় পবন, কাননে পিকঝঙ্কার, সরসীবক্ষে কমল ও কমলে ভ্রমরের লাস্য, যে দেশের আকাশে নিশীথে তারকার খেলা, বেলায় রত্নাকরের মূর্চ্ছা, পতির চিতায় সতীর আত্মত্যাগ, সে দেশে, যাহা অসুন্দর, অপবিত্র, যাহা আপাতরম্য, পরপীড়ক, যাহাতে আবেগ নাই, উৎকণ্ঠা নাই, পুণ্যের বিমল প্রভায় যাহার অঙ্গ উদ্ভাসিত নহে, এমন মূর্ত্তি কদাচ অঙ্কন করিও না। কদাচ সাময়িক প্রলোভনে পড়িয়া একটা উদীয়মান জাতির জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ কলঙ্কিত করিও না। বীণা-পাণির কৃপায় যদি একটু লিখিবার ক্ষমতা পাইয়া থাক, তাহার অপব্যবহার করিও না। ঐ কৃপার অসদ্ব্যবহার করিয়া, সাধারণের কৃপার পাত্র হইও না। জন্মজন্মান্তরের পুণ্যপ্রভাবে যে শক্তি লাভ করিয়াছ, যাহাতে তাহা তোমার মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত হয়, সমাজ সেবায় নিয়োজিত হয়, দেশের সেবায় নিয়োজিত হয়, তৎপক্ষে যত্নবান্ হও। দু'দিনের জন্য সারস্বত রাজ্যের রাজা বা রাজকর্ম্মচারী হইয়াছ বলিয়া প্রজার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিও না। মনে রাখিও, তুমি যাইবে, আমি যাইব, যাহাদের লইয়া আজ হাসিতেছি কাঁদিতেছি, তাহারাও যাইবে, কিন্তু তোমার আমার অপকার্য্যের বা সৎকার্য্যের ফল আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা ভোগ করিবে। সুতরাং একটু দূরদৃষ্টি হইয়া, একটু ত্যাগী হইয়া, একটু সংযত হইয়া চল, তোমার দ্বারা দেশ

ও সমাজের অনেক হিতসাধন হইবে। উচ্ছৃঙ্খলতা সর্ব্বত্রই সর্ব্বনাশকরী। উচ্ছৃঙ্খল জাতি, উচ্ছৃঙ্খল সমাজ, উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্য, ইহাদের অধঃপতন অনিবার্য্য এবং অপরিহার্য্য। মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড ও বিশ্ববিদাহী তাপ যে কমল বুক পাতিয়া লইয়াও অম্লানকান্তিতে সরসীর শোভাবর্দ্ধন করে, মানবের নির্দ্দয় করের সামান্য স্পর্শমাত্রেই তাহার সে শোভা তিরোহিত হয়, শতদল ঝরিয়া পড়ে। যে ভাষা কত ঝঞ্ঝা কত বিপ্লবের মধ্যেও আপনার সত্তা রক্ষা করিয়া আসিতেছে, উত্তরোত্তর অনুপম সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইতেছে, মনে রাখিও সামান্য অবজ্ঞায় বা সামান্য অত্যাচারে সে ভাষার সেই শোভা বিলুপ্ত হইবে। ক্রমে অপভাষায় পরিণত হইবে। যাহাকে রাখিবে, সেই থাকিবে। যাহাকে অবজ্ঞা করিবে, বা যাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে তুমি পরাঙ্মুখ, সে কদাচ তোমার অনুকূল থাকিবে না। আজ হউক, কাল হউক, তোমাকে সে ছাড়িয়া যাইবে। জাতীয় চিন্তাশক্তি যদি উপচিত করিতে চাও, তবে জাতীয় সাহিত্যের পরিখায় চিন্তাস্রোত প্রবাহিত কর। তোমার সাহিত্য সুচিন্তাপ্রসূত ও উদার-কল্পনা-সম্ভূত ভাবসম্পদে গরীয়ান্ করিয়া তোল। তবেই ত তোমার জাতির অভ্যুদয় হইবে। সাধক যে ভাবে স্বীয় অভীষ্ট মন্ত্রের সাধনা করেন, তাপস যে ভাবে একপ্রাণে তপস্যা করেন, সেইরূপ একাগ্র হৃদয়ে, নিরপেক্ষভাবে ও স্বাধীনভাবে মাতৃভাষার সেবা কর; তবেই ত তোমার সাহিত্য-সেবাব্রত সম্পূর্ণ হইবে। কতকগুলি আপাতমধুর, অসদ্ভাবপূর্ণ, শিষ্টজনবিগর্হিত কথা বলিয়া, সম্প্রদায়-বিশেষে তুমি বাহাদুরী লইতে যাইও না। গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ, সদ্ভাব-সম্পন্ন ও সুবিন্যস্ত শব্দের সাহায্যে সাহিত্যকে স্থায়ী করিতে চেষ্টা কর। নতুবা কতিপয় তরল, মুখরোচক, গ্রাম্য বা অশিষ্ট রুচিপূর্ণ কথার মালা গাঁথিয়া স্বদেশবাসীর তথা স্বমাতৃভাষার কণ্ঠে পরাইও না। ও মালা প্রকৃত পক্ষে মালা নহে, জাতীয় সাহিত্যের কণ্ঠে উহা ফাঁস। তাহার অন্তিম কণ্ঠরজ্জু।

পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও অলসভাবে পরের কুৎসা রটনায় সাহিত্যের উপকার হয় না। ক্ষণভঙ্গুর তরল শব্দে কখন স্থায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে না। চিত্তবিশুদ্ধি ব্যতিরেকে যেমন মানুষ প্রকৃত মানুষ হয় না, ভাববিশুদ্ধি ব্যতিরেকে তেমনই ভাষাও প্রকৃত ভাষাপদবাচ্য হইতে পারে না। সৌরভহীন কিংশুকের মত ভাবহীন শব্দের সমষ্টির নামই ভাষা নহে। অথবা বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রণোদিত

লেখকের লিপিচাতুর্য্যপূর্ণ কটাক্ষবাণে জর্জ্জরিত ভাষাও ভাষা নহে। উহা সাহিত্য কাননের দাবানল। যে বৃক্ষদ্বয়ের ঘর্ষণে দাবানল উৎপন্ন হয়, সেই বৃক্ষদ্বয় ত দগ্ধ হয়ই, পরন্তু বনের অপরাপর শ্যামল তরুরাজিও সেই অনলে পুড়িয়া ছারখার হয়। ঐরূপ অসদুদ্দেশ্যে রচিত ভাষার কর্ত্তা, ঐ ভাষা স্বয়ং এবং উহার পাঠকগণ সকলে ঐ আগুনে পুড়িয়া মরেন। ক্রমে জাতির মধ্যে একটা নীচভাবের প্রচার হয়। উত্থান অপেক্ষা পতন অতি সহজ। জাতিটা ক্রমে অধঃপতিত হয়। চিত্তশুদ্ধির পরিবর্ত্তে জাতীয়চিত্তে ঘোর অশুদ্ধির, ভয়ানক অপবিত্রতার আবির্ভাব হয়। বর্দ্ধনোন্মুখ জাতির শরীরে বিষদোষ জন্মে। নবীন জাতীয়তারূপ অম্লান কুসুমে কীট প্রবেশ করে। ফলে জাতি ও জাতীয় সাহিত্য—উভয়েই অনেক নিম্নে নামিয়া পড়ে। যে সবে উঠিতেছে, তার যদি অধঃপতন ঘটে, তবে তাহাকে আবার উঠানো বড়ই কঠিন। একপ্রকার অসাধ্য। তাই বলিতেছিলাম, লেখকের কর্ত্তব্য বড়ই গুরুতর, বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। পূর্ব্বাপশ্চাৎ ভাবিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া, লোকহিতৈষণায়, সমাজ-হিতৈষণায় আপনাকে অনুপ্রাণিত করিয়া, তবে লেখককে লেখনি চালনা করিতে হইবে। সাহিত্যের সুনিয়ন্ত্রিত সাম্রাজ্যে স্বৈরচারিতার বা উচ্ছৃঙ্খলতার স্থান নাই। যাহাতে লোকের হিত, সমাজের হিত, জগতের হিত সাধিত হয়, এমন ছবি আঁকিতে হইবে, এমন ভাবের প্রবাহ বহাইতে হইবে। যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, এমন দীক্ষার প্রচার করিতে হইবে। খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া, বীণাপাণির অঙ্গ লেখনীর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিলে, সাহিত্য-সাধনা হয় না। মানব চিরদিনই মানব, মানবকে একেবারে দেবতা করা যায় না। কিন্তু মানবকে দানবে পরিণত করা যাইতে পারে, ঘটনার স্রোতে পড়িয়া অনেকস্থলে হইয়াও থাকে। যিনি দেশের মঙ্গলকামী মহানুভব, তাঁহার প্রাণপণে চেষ্টা হয় যে, কি করিলে, কোন্ মন্ত্রের প্রচার করিলে, মানব সাধুতর হইবে, ধীরে ধীরে মানবসমাজ উন্নত হইবে। নর বিকল্পে নর না হইয়া, ক্রমে নরদেব আখ্যায় আখ্যাত হইবে। পক্ষান্তরে মানুষের অপরিপক্ক চিত্তবৃত্তি, যাহা মাতৃভাষার মহৌষধে বলিষ্ঠ করিতে হইবে,—সেই চিত্তবৃত্তিকে কুহকিনী ছবির সাহায্যে বিপথগামিনী করিবার সহায়তা করা, যিনি যে ভাবেই করুন—ঘোর পাপের এবং ঘৃণার কার্য্য। এই সংসারে সুন্দর, নির্ম্মল এবং নিষ্পাপ পদার্থের

ত অভাব নাই। তবে কেন তোমার কল্পনাকে তুমি অসুন্দরের সেবায় নিয়োগ করিতেছ? সায়ংকালের শ্যামায়মানা বনানীর স্নিগ্ধ-মূর্ত্তি দর্শন না করিয়া, কেন তুমি নিশীথ-পাপের চিন্তায় বিভোর রহিয়াছ? কেন তুমি পল্লীপ্রান্তরের উপকণ্ঠে ছায়াময় বটবৃক্ষের তলে না বসিয়া ঐ উত্তপ্ত সৈকতে শয়ন করিতেছ? কাহার অপেক্ষায়, তুমি, কত জন্ম জন্মান্তরের তপস্যালব্ধ মনুষ্যত্বের অমর্য্যাদা করিতেছ?

এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনে, যাহাতে টিঁকিয়া থাকিতে পার, বাঁচিতে পার, আর তোমার সমাজ ও স্বজাতিকেও বাঁচাইয়া রাখিতে পার, তাহার চেষ্টা কর। দেহের বলাধানের জন্য যেমন পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন, মনের বলাধানের জন্যও তেমনি উদার চিন্তা ও নির্ম্মল বিষয়ের ধ্যানের প্রয়োজন। বিশ্বপতির এই চিরসুন্দর বিশ্বে অসুন্দরের প্রতি প্রীতি পরিহার কর। যাহা ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, নীচ,—তাহার চিন্তা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহা বিরাট্, যাহা অখণ্ড, যাহা ভূমা,—তাহার ধ্যান করিয়া নিজে উন্নত হও, আর তাদৃশ আদর্শের অঙ্কন করিয়া, তোমার মাতৃভাষা, মাতৃভূমি ও সমাজের কল্যাণ সাধন কর। জীবন সার্থক কর। মনে রাখিও—

"ভালমন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়ব
পর উপকার সে লাভ।"

(বিদ্যাপতি।)

তোমার স্বজাতির হৃদয়ে নির্ম্মল সৌন্দর্য্যের প্রতি ভালবাসার সৃষ্টি কর। যাহাতে তোমার জাতি—সুন্দর চিত্র, সুন্দর চরিত্র, সুন্দর মূর্ত্তির দর্শনে আগ্রহান্বিত হয়, এমন শিক্ষার প্রচার কর। তোমার মাতৃভাষা হইতে অসুন্দর, নীচ, পাপের মূর্ত্তি মুছিয়া ফেল। পার্থিব সুন্দর বস্তুর ধ্যানে ক্রমে অপার্থিব চিরসুন্দর বস্তুর দিকে স্বজাতির চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লও। ক্রমে তোমার সমাজকে ঊর্দ্ধে—দেবতার দিকে লইয়া চল।

ভাবিয়া দেখ,—জগতে সকলেই সৌন্দর্য্যানুভবের জন্য, সৌন্দর্য্য-প্রীতি-সাধনার জন্য উৎসুক। যাঁহারা বলেন, "আমি সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী নহি,—" তাঁহাদের কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারি না। মানুষের হৃদয় কদাচ নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চিন্ত অবস্থায় থাকিতে পারে না। তুমি যদি সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী না-ই

হও, তুমি কিসের পক্ষপাতী? কোন্ দিকে তোমার হৃদয়ের গতি? গুণের দিকে? তাই যদি হয়, তবে ত তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতমরূপে সৌন্দর্য্যের সেবক হইলে রূপ বস্তুর অস্থায়ি বহিঃস্থ সৌন্দর্য্য, আর গুণ তাহার অন্তঃস্থ স্থায়ি সৌন্দর্য্য। বহিঃসৌন্দর্য্যের আরাধনায় হৃদয় উন্নত হয়, উদার হয়, ক্রমে সৌন্দর্য্য লিপ্সায় প্রাবল্য ঘটে, ও শেষে অন্তঃসৌন্দর্য্যের অমিয় সাগরে মিশিয়া সেই পিপাসু হৃদয় নির্ব্বাণলাভ করে। তামসী নিশীথিনীতে যখন কাননকুন্তলা প্রকৃতির প্রসন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি অবলোকন করি, যখন কৃষ্ণকান্তি তরুশিরে খদ্যোতের লীলাময় লাস্য দর্শন করি, তখন কেন আমার মন আকুল হয়? কেন আমার হৃদয় কোন্ অজ্ঞাত পথে অজ্ঞাত রাজ্যের দিকে ছুটিতে চায়, ইহা কেহ বুঝাইয়া দিতে পার কি? সৌন্দর্য্যের এই আকর্ষণের বিশ্লেষণ করিবার কেহ আছ কি?

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নীলাম্বুরাশির উন্মত্ত তরঙ্গের নর্ত্তন দর্শনে, কেন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য ঐ তরঙ্গ বক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন? ইহা একবার ভাবিয়াছ কি? নির্ম্মল সৌন্দর্য্য মানুষকে উন্নত করে, উদার করে, পাগল করিয়া দেয়। জগৎকে ভালবাসিতে শিখায়। বিধাতার অপার করুণা যাহার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে, সেই সৌভাগ্যবান্ মহাত্মাই সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারেন। তুমি আমি পারি না।

সমাজকে উন্নত ও উদার করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে সৌন্দর্য্য লিপ্সা সমাজের হৃদয়ে জাগ্রত করিতে হইবে। ফুলের মত নিষ্পাপ নির্ম্মল সৌন্দর্য্যের যাদুমন্ত্রে যে একবার আত্মদান করিয়াছে, তাহার আর ভাবনা নাই। সে ক্রমে বস্তুর বহিঃ-সৌন্দর্য্যের সোপান বাহিয়া উঠিয়া তাহার অন্তঃসৌন্দর্য্যের স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ করিবে। পত্রপুষ্পশোভিত তরুর সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে দর্শক তখন উদ্ভ্রান্ত-ভাবে আপনিই গাইয়া উঠিবেন——

"তরু বল্ বল্ বল্,
কে তোরে সাজালো দিয়ে পত্রপুষ্পফল।"

বহিঃসৌন্দর্য্যের সেবায় মানুষের চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল হয়, দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়, আর অন্তঃসৌন্দর্য্যানুভবে মানুষ অনেকটা দেবভাবময় হইয়া উঠে। বহিঃসৌন্দর্য্য একান্ত নয়নরঞ্জন ও মনোমোহন, কিন্তু প্রাণহীন। আর অন্তঃসৌন্দর্য্য

নিয়ত সজীব, নিয়ত মৃগনাভিবৎ সৌরভবিধায়ক। যে তাহার সম্পর্কে আসিবে সে পর্য্যন্ত সুরভিত হইবে। পাষাণ খণ্ডে কবে মৃগ, নাভিঘর্ষণ করিয়াছিল, আজও তাহা সেই কস্তূরীর গন্ধে ভুরভুর করিতেছে। অন্তঃসৌন্দর্য্যের এমনই মাহাত্ম্য। রমণীর মুখ, গাছের ফুল, আকাশের নীলিমা, ভ্রমরের গুঞ্জন, পর্ব্বতের বিশালতা, নিশার শিশির, মাত্র এই সকল নির্জীব সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণে বা ভূয়োভূয়ো বর্ণনে দর্শকের মনে একটা সাময়িক তরঙ্গ উঠানো যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী কিছু রাখিতে পারে না। কেবল তাদৃশ বহিঃসৌন্দর্য্যের নিয়ত নির্ম্মাণে জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ অক্ষয়ত্ব বা পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে তাহা কতকটা পরিপুষ্টি বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু ঐ পরিপুষ্টি শোথজ স্থূলতার ন্যায়। সুতরাং লোকহিতৈষী গ্রন্থকারের প্রধান কর্ত্তব্য তাদৃশী মূর্ত্তির নির্ম্মাণ, যে মূর্ত্তি অন্তঃসৌন্দর্য্যের ভাস্বর দীপ্তিতে, উষার তরুণচ্ছটায় কমলের মত উদ্ভাসিত। অন্যথা সে মূর্ত্তি কদাচ আদর্শরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য নহে। নৈষধের কবি, শতাধিক শ্লোকে রাজকুমারী দময়ন্তীর রূপবর্ণনা করিয়াছেন, যেন রূপ বর্ণনার জন্যই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সহৃদয়সমাজে তাই সে বর্ণনা হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই; শব্দসম্পদে শ্রুতিমধুর হইলেও সে বর্ণনা পাঠকের স্তিমিত হৃদয়কক্ষের নিদ্রিত চিন্তাকে জাগ্রত করিতে পারে নাই। মৃদঙ্গের ধ্বনিতে বা জলদের মন্দ্র নির্ঘোষে যেমন মনটা ক্ষণেকের জন্য সেই দিকে যাইয়াই আবার পরক্ষণে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তদ্রূপ তাদৃশী বর্ণনায়, অর্থাৎ মাত্র বহিঃসৌন্দর্য্যের দুন্দুভি নিনাদে মুহূর্ত্তের জন্য শ্রোতার কাণ সেইদিকে যায় মাত্র, হৃদয় সেইদিকে দৃষ্টিপাতও করে না।

হৃদয়কে বশীভূত করিতে হইলে, হৃদয়ের সম্পদ্ তাহাকে দেখাইতে হইবে। দয়া, স্নেহ, প্রেম, পুণ্যে অনুরাগ, পাপে বিতৃষ্ণা প্রভৃতি হৃদয়ের দিব্য ভূষণ গুলি যদি স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শন করিতে পার, তাহা হইলে, ঐ হৃদয়ের দ্বারা অপরের হৃদয় জয় করিতে পারিবে। হৃদয়ের দ্বারা হৃদয় জয় করিতে হয়, অন্যের দ্বারা হয় না। লাবণ্যতরঙ্গিণী উমা অনুপম সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় যখন, বসন্তের পত্রপুষ্পপল্লবের অলঙ্কারে সমলঙ্কৃতা হইয়া তপোরত ত্রিলোচনের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তখন কিন্তু, সে রূপের দিকে, গিরিরাজ কুমারীর সেই অমরদুর্লভ দৈহিক সৌন্দর্য্যের দিকে, ত্রিনয়নের কোন নয়নই প্রকৃতপক্ষে ভ্রূক্ষেপও করে নাই। বরঞ্চ ঐ নির্ম্মল রূপের সাগরে যিনি তরঙ্গ উঠাইতেছিলেন, সেই অবিনীত মদনকে

রুদ্রদেব ভস্মীভূত করিয়া, দৈহিক রূপের, বহিঃসৌন্দর্য্যের অলীকত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদন করিলেন। তখন পার্ব্বতী বুঝিলেন যে, বাহ্যরূপের শক্তি অতি অল্প। বহিঃস্বরূপের দ্বারা অন্তঃস্থ হৃদয় জয় করা যায় না। তাই রাজনন্দিনী গৌরী তপস্বীর হৃদয় জয়ের জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন। আপন হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া চন্দ্রশেখরের সমক্ষে ধরিলেন। আশুতোষ দেখিলেন যে, সে হৃদয় কত অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার। তাই তপস্বিনী উমার তপস্যায় সর্ব্বত্যাগী বিশ্বনাথেরও হৃদয় আকৃষ্ট হইল। পার্ব্বতী আত্মহৃদয়ের সৌন্দর্য্যে বাঞ্ছিত মহেশ্বরের হৃদয় জয় করিলেন। মহাদেবের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, পার্ব্বতীর অন্তঃসৌন্দর্য্যের নিকট মহাদেব আত্মবিক্রয় করিলেন। তাই বলিতেছিলাম, অন্তঃসৌন্দর্য্য ব্যতিরেকে কাহারও অন্তঃকরণ জয় করা যায় না। বীচিমালিনী তটিনীর সান্ধ্যসমীরকম্পিত বক্ষে চন্দ্রমার অমৃতময় করস্পর্শে যেমন একটা অনুপম শোভা জন্মে, অন্তঃসৌন্দর্য্যের সহিত যদি বহিঃসৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণ ঘটে, তবে তাহাতেও ঐ প্রকার একটা চিরস্পৃহণীয় শোভা জন্মিয়া থাকে। এই জন্যই লোকচরিতবিৎ সুকবিগণ তাঁহাদের কাব্যের নায়ক নায়িকাকে একেবারে বহিঃসৌন্দর্য্য বর্জ্জিত করেন না। বহিঃসৌন্দর্য্যের দ্বারা অন্তঃসৌন্দর্য্যের জ্যোতিঃ অধিকতররূপে পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পান। এই বিষয়ে যে কবির যতটা সার্থকতা, তাঁহার কাব্য তত সুন্দর ও কালজয়ী।

'নয়ন হৃদয়ের দ্বার।' বহিঃসৌন্দর্য্য দ্বারপ্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে, তাহার অধিক আর যায় না, যাইবার ক্ষমতাও তাহার নাই। নব-জলসম্ভূত, ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার সন্দর্শনে শিখণ্ডী পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতে থাকে, এ বড় সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু এ দৃশ্যের শক্তি নয়ন অতিক্রম করিয়া মনের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। আর ঐ যে সত্যের প্রতিমূর্ত্তি হরিশ্চন্দ্র, সত্যরক্ষার জন্য স্ত্রীপুত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, এমন কি আত্মা পর্য্যন্ত বিক্রীত করিতেছেন, এই সৌন্দর্য্যের মহিমা হৃদয়কে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ যে রাজার নন্দিনী, রাজার মহিষী, রাজার পুত্রবধূ সীতা পতি কর্তৃক বিনাদোষে নির্ব্বাসিতা হইয়াও "জন্মান্তরে যেন তোমাকেই আবার স্বামী পাই,—আর যেন তোমার বিরহ সহ্য করিতে না হয়"—বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—এ সৌন্দর্য্যের অমৃত ধারায় অতি বড় নীরস, কঠিন, পাষাণকল্প হৃদয়ও বিগলিত হয়। নয়ন অশ্রুপ্লুত হইয়া আসে।

সরসীর স্বচ্ছ সুনীল বক্ষে যখন কমলিনী উষার স্বর্ণচ্ছটায় সাজিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করে, সায়ংকালে ছায়াশীতল নীল গগনের কোলে যখন ধবল বকপঙ্‌ক্তি শ্বেত উৎপলের মালা গাঁথিতে গাঁথিতে উড়িয়া বেড়ায়, প্রাতঃসমীর-কম্পিত শত দলের উপর বসিতে না পারিয়া যখন ব্যথিত ভ্রমর গুণ গুণ করিয়া কাতরতা জ্ঞাপন করে,—তখন কে এমন পাষাণ যে, তাহাতে বিমুগ্ধ না হয়, অবাক্‌ হইয়া, সেই সেই অনবদ্য সৌন্দর্য্য-দর্শন না করে? কিন্তু ঐ ঐ সৌন্দর্য্য দর্শনে কয়জনের চক্ষুতে জল আসে? ঐ সকল বহিঃসৌন্দর্য্যের আধিপত্য হৃদয় পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। তবে ঐ প্রকার সৌন্দর্য্যের সেবায় নয়নরূপী মনের দ্বার খুলিয়া যায়, —ফলে, মনে সৌন্দর্য্য সেবায়—একটা প্রবৃত্তি জন্মে। মানুষ তখন, যাহা সৎ যাহা নির্ম্মল, স্নিগ্ধ ও প্রকাণ্ড, যাহা চিরসুন্দর, চিরনবীন, চিরধ্যেয়,—তাদৃশ মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া, পূজা করিয়া আত্মোন্নতি লাভ করে। একভাবে না এক ভাবে, সৌন্দর্য্যের সেবা জীব মাত্রেই করে ও করিতে চায়। সৌন্দর্য্যের লিপ্সা নিন্দার বিষয় নহে। জগতে এমন লোক অতি বিরল, যিনি সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী নহেন। যদি কেহ থাকেন, তিনি চির সুন্দর বিশ্বনাথের অনুগ্রহে বঞ্চিত—কৃপার পাত্র।

কেহ বহিঃসৌন্দর্য্য ভালবাসেন, কেহ অন্তঃসৌন্দর্য্য ও বহিঃসৌন্দর্য্যের সমবায়ে প্রীত হন। কেবল মানুষের নহে, সৌন্দর্য্য জীবমাত্রেরই অভিপ্রেত, তৃপ্তিপ্রদ। সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়াই মৃগ চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হইয়া, ঊর্দ্ধকর্ণে ভ্রমরের গুণ গুণ ঝঙ্কার শ্রবণ করে। সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হইয়াই ফণী, বাঁশরীর রবে ফণা উত্তোলন করিয়া নাচে। সৌন্দর্য্য লোভেই চকোর শীতদ্যুতি চন্দ্রের দিকে ধাবমান হয়। সৌন্দর্য্য লোভেই পতঙ্গ অনলে প্রাণপাত করে। যে হৃদয়ে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা নাই, তাহা ক্ষারদগ্ধ উষরক্ষেত্রের তুল্য। বিধাতার এই সুন্দর বিশ্ব তাহার জন্য নহে, সে হতভাগ্য। জীবের হৃদয়ে যখন সৌন্দর্য্য লিপ্সা এমন বলবতী, তখন সেই হৃদয়ে, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে, তোমার জাতীয় সাহিত্যের দ্বারা সৌন্দর্য্যের বীজ বপন কর, —যাহার জন্য বিশ্ব উন্মত্ত, তাহাকে বাসন্তী শোভার ন্যায়, দশভুজা মূর্ত্তির ন্যায়, চির পোষিত আশার ন্যায়, লোক নয়নের পুরোবর্ত্তিনী কর,—তোমার ঐ সুন্দরী প্রতিমার আলোকে, তোমার ঐ পুণ্যময়ী মূর্ত্তির সংসর্গে, তোমার মাতৃভাষা, মাতৃভাষায় সেবক ও তোমার স্বজাতি কৃতার্থ হইবে, নিষ্পাপ হইবে। সীতার মূর্ত্তি, সাবিত্রীর মূর্ত্তির আদর্শে চরিত্র-সৃষ্টি কর, উর্ব্বশী মেনকার কুহকে সরল

স্বজাতিকে আর মজাইও না। ভক্তির অমৃতহ্রদে বিলাসের ঢেউ তুলিও না। আপনার হস্তে আপনার শিরে খড়্গাঘাত করিও না। মাতৃভাষার দোহাই দিয়া স্বৈরচারিতায় সাহিত্যের নির্ম্মল মন্দির অপবিত্র করিও না। সাহিত্যে অবাধ বাণিজ্যের প্রচার করিও না, করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। নিজের জাতীয়তা, নিজের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ক্রমে অশ্বত্থপাদপজাত উপবৃক্ষে পরিণত হইও না। যাহাই কর, নিজকে বজায় রাখিয়া করিও। আত্মবিসর্জ্জন দিও না।

কত সাধনার ফলে, আজ বঙ্গভাষা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে বিশ্ব আলোকিত করিতেছেন। আজ সেই দুঃসময়ের কথা, সেই দুর্দ্দিনের কথা থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়ে। যখন দেশের তদানীন্তন শিক্ষিত বৃন্দের নিকট আমার এই মাতৃ-ভাষা দীনার ন্যায়, অনাথার ন্যায় উপেক্ষিত হইতেন, তখন বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সাধক কৃত্তিবাস, কাশী-দাসের আবির্ভাব হয় নাই, তখন মহাকবি মাইকেলের বীরবাহু সম্মুখ সমরে পড়িয়া বাঙ্গালার নূতন ছন্দের অবতারণা করে নাই, বা শচীর দুঃখে বিগলিত হেমচন্দ্রের ইন্দুবালার প্রতপ্ত নয়নজলে দৈত্যরাজলক্ষ্মী ঝলসিয়া যান নাই, তখন নবীনচন্দ্রের কবিতা সমুদ্রের এক প্রান্তে চন্দ্রমা উদিত হইয়া সীমা হইতে সীমান্তরে সমুদ্রবক্ষ উদ্ভাসিত করে নাই, বা প্রাচীন চণ্ডীদাস গোবিন্দ দাসের মধুর কান্ত পদাবলীর একাবলী হারে বঙ্গ জননীর কণ্ঠ সুশোভিত হয় নাই,—সেই সময়ে আমার মাতৃভাষার সেই প্রথম প্রভাতে কি অবজ্ঞাই না মা আমার মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। পুরাণ, ইতিহাস, রামায়ণ প্রভৃতি যদি কেহ তখন ভাষায়, অর্থাৎ সংস্কৃতের দেশীয় ভাষায় পাঠ করিতেন বা শ্রবণ করিতেন, বলা দূরের কথা, ভাবিতেও কষ্ট হয়, তাঁহার রোমহর্ষণ রৌরব নরকে গতি হইত।

অষ্টাদশ-পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

সেই এক দিন, আর আজ এক দিন। যেন বিদর্ভের উপেক্ষিতা রাজকুমারী মালবিকা আজ বিদিশার অধিশ্বরী। মা আমার আজ দশভুজার মূর্ত্তিতে বঙ্গদেশের বক্ষে দণ্ডায়মানা। বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় পুরুষ শ্রেষ্ঠ হইতে অসূর্য্যম্পশ্যা ললনা পর্য্যন্ত আজ মায়ের অর্চ্চনায় রত, অঞ্জলীবদ্ধ করে, মাতৃমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত। লক্ষ্মীর বরপুত্র, সৌভাগ্যের সযত্নলালিত দুলাল, আজ বঙ্গবাণীর চরণতলে বসিয়া তাঁহার "মানসী" কল্পনার বীণায়' নিজের সুখ দুঃখপূর্ণ জীবনের

"মর্ম্মবাণী" শুনাইবার জন্য কত না লালায়িত। ঐ শুন, মহারাজাধিরাজের চিরবাঞ্ছিত কমলার স্বর্ণসিংহাসনে আজ বীণাপাণির নূপুর ধ্বনি! ঐ দেখ, পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমুজ্জ্বল-চেতা, পরম মেধাবী, বঙ্গমাতার বড় গর্ব্বের সন্তান আজ তাপসের ন্যায়, মাতৃভাষার চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট! বঙ্গভূমির তথা বঙ্গভাষার ইহা পরম মাহেন্দ্রক্ষণ। দীর্ঘ তামসী নিশার অবসানে ঊষার অরুণচ্ছটায়, ঐ দেখ, বঙ্গ-সাহিত্য-সাম্রাজ্য আজ বিভূষিত। বাঙ্গালীর পক্ষে এত বড় শ্লাঘার দিন আর আসে নাই,—এত বড় গর্ব্বের দিন যে আসিবে, ইহা স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই। তমসার তীরে, কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের আর্ত্তস্বরে আদি কবি রত্নাকরের প্রাণ গলিয়া যেমন সংস্কৃতে প্রথম কবিতার পীযূষপ্রবাহ বহিয়াছিল, সেইরূপ সুদূর ইউরোপখণ্ডের বিলাসতরঙ্গে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়াও,—বঙ্গের অমিত্রাক্ষর কবিতার রত্নাকর—মহাকবি মধুসূদন যখন মিত্রাক্ষর শৃঙ্খলে কবিতাদেবীর চরণ আবদ্ধ দেখিয়া, আকুল প্রাণে,——

"বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর বেড়ি! আহা কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমলচরণে,
চীন-নারী সম পদ কেন লোহ ফাঁসে?"

বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষররূপী নূতন ছন্দের অবতারণা করিয়া বাঙ্গালার, বাঙ্গালীর তথা বঙ্গভারতীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন,—অথচ বঙ্গের সেই রত্নাকর সদৃশ মধুর প্রতিও

"দ্রুহিণ বাহন-সখে, অনুগ্রহনিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে,"—

বলিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কশা উত্তোলন করিবার লোকের অভাব ছিল না,—"পদ্ম-গন্ধা ছুছুন্দরীর" উপঢৌকনে, বঙ্গভাষার বাল্মীকিকে আপ্যায়িত করিতেও আমরা দ্বিধাবোধ করি নাই,—বঙ্গের সেই একদিন গিয়াছে, আর আজ একদিন! দাতব্য চিকিসালয়ে যাহাকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, বঙ্গবাণীর কোল আঁধার করিয়া, বাঙ্গালীকে অমার্জ্জনীয় কলঙ্কপঙ্কে নিমগ্ন করিয়া যিনি মর্ত্তে অমরতালাভ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার স্মৃতিবাসরে বঙ্গের তাবৎ সুধীবৃন্দ ঐ সজলনয়নে ও ভক্তি-পূর্ণহৃদয়ে সেই মহাকবির সমাধিপার্শ্বে নীরবে সমাসীন।

ইহা বাঙ্গালার মহামঙ্গলের লক্ষণ। আপনার জাতির বরেণ্য ব্যক্তিকে যত দিন পূজা করিতে না শিখিব, সম্মানীকে যত দিন তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দান করিতে না পারিব, ততদিন আমরা মানুষ পদবাচ্যই নহি। এতদিন পরে, আজ বাঙ্গালী স্বজাতীয় গুণীর পূজা করিতে শিখিতেছে। বঙ্গভূমির তথা বাঙ্গালী-জাতির ইহা পরম কল্যাণের কথা। তাই বলিতেছিলাম,—আজ মনে পড়ে সেই দুর্দ্দিন, আর এই আনন্দের দিন। কিন্তু দুর্দ্দিন অপেক্ষা সুদিনেই ভয় অধিক। আনন্দে যেমন লোকের মুক্তি, আবার আনন্দেই তেমন স্খলন। আনন্দের সময়ে সংযম সমধিক আবশ্যক। বঙ্গের ইতরভদ্র, উচ্চ, নীচ—সকলের দৃষ্টি বঙ্গভাষার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, "আমার মাতৃভাষা" বলিয়া গর্ব্বিতকণ্ঠে ও শ্লাঘা-পূর্ণ হৃদয়ে বঙ্গবাণীকে সকলেই আহ্বান করিতেছেন,—বঙ্গভাষার আলোচনা করিয়া বাঙ্গালীমাত্রই একটা শ্লাঘা অনুভব করিতেছেন, বঙ্গবাসিমাত্রেরই বাঙ্গালা-ভাষার প্রতি একটা কেমন প্রাণের টান আসিয়াছে, একটা ঔৎসুক্যপূর্ণ আগ্রহ জন্মিয়াছে। বঙ্গের মনস্বী লেখকগণের, সহৃদয় সারস্বতগণের এ সময়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর্ত্তব্য। বর্ষার পল্লীপ্লাবিনী বন্যায় যখন জনপদ ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন যেমন কোনও নির্দ্দিষ্ট খাতে সেই প্রবল স্রোত প্রবাহিত করিয়া পল্লীরক্ষা সর্ব্বাগ্রে বিধেয়; সতত বর্ষণে যখন দীর্ঘিকার বক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া আসে, এবং প্রতিক্ষণেই কূলভঙ্গের আশঙ্কা হয়, তখন যেমন তটভূমির কোন একস্থান দিয়া একটি প্রণালী কাটিয়া ঐ বর্দ্ধিত জলধারা বহাইয়া দিয়া, দীর্ঘিকাটিকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য; সেইরূপ, বঙ্গবাসীর হৃদয়ে যখন মাতৃভাষার প্রতি একটা অনির্ব্বচনীয় অনুরাগের লহরী ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, সকলেই মাতৃ-ভাষার প্রেমে আকুল হইয়াছেন, দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র, রাজাধিরাজের মর্ম্মর সৌধ হইতে নিরন্ন বাঙ্গালীর পর্ণশালায় পর্য্যন্ত মাতৃভাষার প্রেমের বান ছুটিবার উপক্রম হইয়াছে, তখন চিন্তাশীল বঙ্গবাসীর প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে, ঐ অনুরাগ-লহরী, ঐ মাতৃভাষা-বিষয়িণী রতি, যাহাতে কোন সৎপথে পরিচালিত হয়, এমন বিধান করা। ক্ষুধাতুর যে, তাহাকে এমন খাদ্য দিও না, যাহাতে সে প্রাণ হারাইতে পারে। বাঙ্গালাভাষার প্রতি যখন আপামর সাধারণের এমন একটা প্রীতি আসিয়াছে, তখন সেই প্রীতিকে মন্দাকিনীর ধারায় মিশাইতে চেষ্টা কর, নরকের প্রবাহের দিকে লইয়া যাইও না। দেশবাসিবৃন্দের আগ্রহের সময়ে,

তোমার মাতৃভাষার নাম করিয়া, যাহা তাহাদিগের সমক্ষে ধরিবে, মার নামের গৌরবে, তাহারা তাহাই অম্লানবদনে গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া, তাহারা গ্রহণ করে বলিয়া, তোমার কি যাহা ইচ্ছা, তাই তাহাদিগকে দেওয়া উচিত? দেশবাসীর এই আকিঞ্চন, বঙ্গভাষার প্রতি এই যে নবীন আগ্রহ,—ইহা এমন পরিখায় প্রবাহিত করিয়া দাও, যাহাতে ক্রমে তোমার স্বজাতি একটা প্রধান সম্পদে সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে। এই আগ্রহকে সংযত-ভাবে সুপথে চালিত কর। দেশবাসীর ক্ষুধার সময়ে ভাল খাদ্য দাও, তাহারা বলিষ্ঠ হইবে; অন্যথা কুৎসিত, পর্য্যুষিত খাদ্যে তাহাদের দেহে, তোমার সমাজের দেহে, কুৎসিত ব্যাধি, জরা প্রবেশ করিবে। তোমরা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

বাগ্‌দেবতার পবিত্রমন্দিরের প্রান্তদেশে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক লেখকেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যে লেখায় আমার জন্মভূমির ভ্রাতৃবৃন্দ নির্ম্মল আনন্দরসে আপ্লুত হইবেন না, যে লেখায় আমার সমাজ উন্নত হইবেনা, যে লেখা পাঠ করিয়া আমার সামাজিকগণ কিছু শিখিতে পারিবেন না, সেরূপ লেখার কোনই আবশ্যকতা নাই। যাহাদিগকে লইয়া আমি, যাহাদিগকে বাদ দিলে আমার একপ্রকার কিছুই থাকে না, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়, এই বিশাল ভারতের তুলনায়, যাহাদিগকে ছাড়িলে আমি ধূলিকণা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও তুচ্ছতর; আমার সেই স্বদেশবাসীদিগের দিকে চাহিয়া আমাকে লেখনী পরিচালনা করিতে হইবে। বাগ্‌দেবতার কৃপায় যদি তুমি লেখনীধারণের শক্তিলাভ করিয়া থাক, তবে সেই শক্তির যাহাতে সদ্ব্যবহার হয়, তাহাই তোমার ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য। অসদ্ব্যবহার করিবার তুমি কে? সাময়িক স্তুতিপ্রিয়তার বশবর্ত্তী হইয়া তুমি শ্বেতশতদলবাসিনীর শুভ্রমন্দির কলঙ্কিত করিও না। লেখনী চালনার পূর্ব্বে অন্ততঃ একবার স্মরণ করিও যে, তুমি কে? কোথায় বসিয়া লিখিতেছ? কাহাদের জন্য লিখিতেছ? আর কেন লিখিতেছ? একবার ভাবিও যে, তুমি একাকী নও, তোমার আরও দশজন আত্মীয় আছেন; তুমি একাকী তৃপ্তি উপভোগ করিলে চলিবে না, তোমার দেশবাসীকেও পরিতৃপ্ত ও সমুন্নত করা তোমার ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য। আর, তারপর একবার স্মরণ করিও যে, যে দেশ ব্যাস বাল্মীকির বীণার তানে এখনও বিমুগ্ধ, যে দেশ কালিদাসের বাঁশরীর ঝঙ্কারে এখনও মুখরিত, ভবভূতির করুণ সঙ্গীতে এখনও সকরুণ, যে দেশের প্রতি

জনপদে, প্রতি পত্রপুষ্পপল্লবে, প্রতি হৃদয়ে এখনও রামপ্রসাদ, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাসের মধুর সঙ্গীতধারা ক্ষরিতেছে,—তুমি সেই দেশেরই একজন অধিবাসী। এখনও অপরাহ্নে, গোধূলি সময়ে, যে দেশের পল্লীপ্রান্তরে, "বেলা গেল সন্ধ্যা হলো পার কর আমারে" বলিয়া নিরক্ষর কৃষক কেমন এক অজ্ঞেয়ভাবে বিভোর হইয়া তান ধরিয়া শ্যামা বনানীর সহিত পল্লীবাসীদিগকেও উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলে, তুমি সেই দেশেরই একজন অধিবাসী। যে মুক্তগগনের চন্দ্রাতপতলে বসিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ নিরাবিল সঙ্গীতের ধারায় ভারত অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন, তোমার মাথার উপর এখনও সেই গ্রহনক্ষত্র-খচিত চন্দ্রাতপ তেমনিভাবে দোদুল্যমান। যে লোকহিতৈষণা, সমাজহিতৈষণা বক্ষে পোষণ করিয়া, তপস্বীর ন্যায়, তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সারস্বত সম্প্রদায় সরস্বতীর সাধনায় আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তুমি সেই লোকেরই অন্যতম অধিবাসী। সেই সমাজেরই অন্যতম স্তম্ভ। লেখকের পবিত্র আসনে বসিয়া তুমি আত্মবিস্মৃত হইও না, বা আর দশজনকেও ভুলাইয়া বিপথে টানিয়া লইও না। তুমি একেবারে লেখনী স্পর্শ না কর ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি স্পর্শ কর—দেখিও, যেন তোমার লেখায় তোমার সমাজ-সেবার ব্যাঘাত না ঘটে।

একবার চাহিয়া দেখ, তোমার মাথার উপরে হীরক-মুক্তা-খচিত নীল-নভঃ-স্থল, তোমার চারিদিকে জাহ্নবী-যমুনা নর্ম্মদাকাবেরীর চন্দ্রহার-শোভিতা, নীলজলধিবসনা কানন-কুন্তলা শ্যামা ভারতভূমি, আর ঐ দেখ, তোমার সম্মুখে, ঐ স্তূপীকৃত রত্নরাজি নিহিত। ঐ দেখ, আজ এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনেও ঐ সকল চিরপ্রভ রত্নের অচঞ্চল প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত। এতাদৃশ অনর্ঘ সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়া তুমি আত্মবিস্মৃত হইও না। কল্প-পাদপের মূলে বসিয়া আপাতযশের অনুচিত আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হইও না। মাথার উপর যাহার অনন্ত নীল আকাশ, সম্মুখে যাহার অনন্ত নীল সমুদ্র, চারিদিকে যাহার অনন্তনীলা বনস্থলী, তাহার চিত্তে উদারতার অভাব থাকিবে কেন? তাহার বক্ষে প্রেমের অভাব থাকিবে কেন? লোকহিতৈষণার, পরদুঃখ-কাতরতার, পরগুণ-সহিষ্ণুতার ও আত্মার উপর প্রভুতার অভাব থাকিবে কেন? সৌভাগ্য-ক্রমে যে পবিত্র দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই দেশের প্রকৃত অধিবাসী হইয়া 'লেখনী চালনা কর। তোমার লেখায় ভারত বিমোহিত হইবে।' তোমার

কল্পনার লীলাতরঙ্গে ভারত তরঙ্গিত হইবে। তোমার অঙ্কিত আলেখ্যে, ভারতের অমর কবিগণের অক্ষয়-জ্যোতিঃ, চিত্রশালার সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইবে। যাহাতে সঞ্চিত ধনের বৃদ্ধি হয়, তাহা করিও, যাহাতে ধ্বংস হয়, এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের সহিত তোমার নিজের দেশের এবং নিজের ভাষার সর্ব্বনাশ করিও না। মনে রাখিও, তুমি যাইবে, আমি যাইব, কিন্তু তোমার আমার সদসৎ কার্য্যাবলী থাকিবে, তুমি আমি স্বহস্তে সমাজের যতটা ক্ষতি করিয়া না গেলাম, তোমার আমার অজ্ঞানমূলক লেখার এবং অপুণ্য চিত্রের অঙ্কনে দেশের তথা দেশীয় সাহিত্যের ততোধিক ক্ষতি হইবে। লেখকের সমুচ্চ আসনে বসিয়া এ তত্ত্ব কদাচ বিস্মৃত হইও না। তোমার "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননী বঙ্গভাষার অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিয়া জাতীয় সাহিত্যের সর্ব্বনাশ করিও না। কদর্য্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া তোমার সুখের সমাজ ধ্বংস করিও না। মনে রাখিও, একবার ভাঙ্গিলে আর গড়িতে পারিবে না। তাই বলি,—নিজের শক্তিমত্তায় অধৈর্য্য হইয়া তোমারা "ঘরে বাহিরের" আগুনে, বঙ্গ-সাহিত্যের স্বর্ণমন্দির আর ছারখার করিও না। আচার্য্য দণ্ডীর—

"তদল্পমপি নোপেক্ষ্যং কাব্যে দুষ্টং কথঞ্চন।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্॥"

সামান্য দোষও যাহাতে আছে, তাহা যেন তোমার কাব্যে, তোমার সাহিত্যে স্থান না পায়। ক্ষুদ্র একখানি ধবল চিহ্নে অতি সুন্দর, কান্তিমান দেহও একান্ত ঘৃণার্হ হইয়া থাকে,—প্রবীণের এ কথা বিস্মৃত হইও না। জাতীয় সাহিত্যের বিমল গাত্রে, তোমার মাতৃভাষার প্রবিত্র অঙ্গে, শিত্ররোগ জন্মাইও না। পূজার্হকে ঘৃণার্হ করার প্রবৃত্তি দমন করিয়া, তোমার মৃন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিকে ক্রমে হিরণ্ময়ী করিয়া তোল, হে বঙ্গভাষার সেবক, তোমার নিকট ইহাই এই অকিঞ্চনের সানুনয় প্রার্থনা।

তুমি ভুলিও না যে, সকল বিষয়েরই একটা সুনিয়ত ও সুন্দর সীমা আছে, সেই সীমালঙ্ঘনে সুখ শান্তি তিরোহিত হয়। জীবন ক্রমে কেমন একটা ক্ষিপ্তগ্রহের ন্যায় হইয়া উঠে। হে বঙ্গ-সাহিত্যসেবিগণ! হে দেবী দেশমাতার বরেণ্য পুত্রগণ! হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ জাতীয় সাহিত্য মন্দিরের স্থপতিগণ! বাগ্‌দেবতার কৃপায় অধিকারী হইয়াছ বলিয়া, বঙ্গসাহিত্যের সাম্রাজ্যের গণ্যমান্য রাজপুরুষ হইয়াছ বলিয়া, দশজনের শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি পাইতেছ বলিয়া, আত্মবিস্মৃত

হইও না, বা একপদে, তোমার মুখাপেক্ষী স্বদেশবাসীদিগকে উপেক্ষা করিয়া, লব্ধ ক্ষমতার অপব্যবহার করিও না। তোমাদের এমন অনুপম রচনানৈপুণ্য, সুন্দর লিখিবার ক্ষমতা, হায় এমন সুকণ্ঠ,—যদি সমাজের উন্নতিকর, হিতকর সাহিত্যনির্ম্মাণে নিরত করিতে পারিতে, আদর্শ সৃষ্টিতে নিযুক্ত করিতে পারিতে, ভাবিয়া দেখ, কি সুখেরই না হইত! সরল দেশবাসীর অতি স্তুতিতে তোমাদের মতিভ্রংশ দর্শনে, ব্যথিত হৃদয়ে বলিতে সাধ যায় যে, কেন তোমরা এত ক্ষমতা পাইয়াছিলে, কেন তোমাদের লেখায়, তোমাদের গানে দেশ একেবারে বিমুগ্ধ হইয়াছিল, কেন তোমাদের জয়গাথায় দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়াছিল? যদি এতটা না হইত, তবে বুঝি তোমরা এমন বিগড়াইতে না! মার সন্তান মার পূজায় আত্মসমর্পণ করিতে! অতি স্তুতিতেই তোমাদের এবং সেই সঙ্গে তোমাদের সমাজ ও সাহিত্যের সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে! হায়, তোমাদের দিকে চাহিলে, সেই মহাকবির করুণকণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা করে—

"কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুইলো অভাগি!
কাল-পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা এ ভুজগে?—"

আমি জানি আমার এই কাতর প্রার্থনা,—এই মর্ম্মের ক্রন্দন, তোমাদের যশোগীতি-বধির কর্ণে বা অতিস্তুতিবিমুগ্ধ হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিবে না, আমি জানি, পশ্চাদ্ভাগে,—তোমাদের অতীত সৌভাগ্য সূর্য্যের দিকে আর তোমরা চাহিতে চাও না, তোমরা এখন সম্মুখের ঐ যশোধবলিতা দিগ্বধূর সস্মিত মুখ লইয়াই ব্যস্ত। অতীত ভাবিবার সময় এখন তোমাদের নাই, জানি। তবুও—"পৃথ্বীরাজের" মহাকবির ন্যায় আজ এই মর্ম্মপীড়িত লেখক—

"বিষাদে ভাবিছে বসি', আর কি তেমন দিন আসিবে এ ভারত ভিতরে!
বীর-পতিপুত্রগণে; মিলি মাতা জায়া সবে, বরণ করিবে সমাদরে!
চলিয়া গিয়াছে দিন, স্মৃতি মাত্র ছিল তার, তা'ও বুঝি ক্রমে লুপ্ত হয়;
ভারতের কবিগণ, গাইছেন অন্যগান, বীরকীর্ত্তি গেয় কারো নয়।
শয্যা এবে রণক্ষেত্র, নূপুরে দুন্দুভিধ্বনি, অবিরাম ছুটে ফুলবাণ;
তারি' অনুকূল কথা, শুনি প্রীত সর্ব্বজন, কে শুনিবে আমার এ গান?
নিঃসঙ্গ বিহগ-সম, গাইব আপন মনে, ডাকিয়া শুনাব আপনারে।
সার্থক হইবে শ্রম, একজন (ও) শ্রোতা যদি, পাই এই ভারত মাঝারে॥"

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

মিথিলার প্রাচীন কাহিনী।

বৈদিক সাহিত্যে দৃষ্ট হয় বিদেহ রাজগণ পাঞ্জাব হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া দ্বারভাঙ্গার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বসতি করিতেন। এইরূপ কথিত আছে, অগ্নিদেব বিদেহ রাজগণকে সঙ্গে লইয়া সরস্বতীর তীর হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া গমন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে তাঁহারা আগমনপূর্ব্বক সুবিস্তীর্ণ গণ্ডক নদীর তীরভূমে সমুপস্থিত হয়েন। অগ্নিদেব বিদেহরাজগণকে বলেন তোমাদের প্রাসাদ এই নদীর পূর্ব্বতীরে নির্ম্মাণ কর। তদনুসারে গণ্ডকের পূর্ব্ব তীরেই বিদেহ রাজগণ বিশাল হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করত বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। সর্ব্ব প্রথমে তাঁহারা উক্ত প্রদেশে গমন করিয়া জঙ্গল পরিষ্কৃত ও জলাভূমি উচ্চ করিয়া লইলেন। উর্ব্বরাভূমিতে শস্যোৎপাদিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা তথায় এক সমৃদ্ধিশালী ও প্রভাবসম্পন্ন নগরী সংস্থাপিত করিলেন। মহর্ষি জনক এই রাজ্যেই রাজত্ব করিতেন। * তাঁহার রাজ্যের রাজধানীর নাম মিথিলা। শ্রীমদ্ভাগবতে মিথিলা রাজগণের বংশতালিকা নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা :—

অরাজকভয়ং নৃণাং মন্যমানা মহর্ষয়ঃ।
দেহং মমন্থুঃস্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত॥ ১২
জন্মনা জনকঃ সোঽভূদ্বৈদেহস্তু বিদেহজঃ।
মিথিলো মথনাজ্জাতো মিথিলা যেন নির্ম্মিতা॥ ১৩ †
তস্মাদুদাবসুস্তস্য পুত্রোঽভূন্নন্দিবর্দ্ধনঃ।
ততঃ সুকেতুস্তস্যাপি দেবরাতো মহীপতে॥ ১৪
তস্মাদ্বৃহদ্রথস্তস্য মহাবীর্য্যঃ সুধৃৎ পিতা।
সুধৃতে র্ধৃষ্টকেতুর্বৈ হর্য্যশ্বোঽথ মরুস্ততঃ॥ ১৫
মরোঃ প্রতীপকস্তস্মাজ্জাতঃ কৃতরথো যতঃ।
দেবমীঢ়স্তস্য পুত্রো বিশ্রুতোঽথমহাধৃতিঃ॥১৬

---

* বিদেহা মিথিলাঃ প্রোক্তাঃ। ইতি হলায়ুধঃ।

† জন্মনা অসাধারণেন জন এব জনকঃ। যদ্বা স্বদেহদ্বারা জনকত্বাৎ স নিমির্জনকোঽভূদিত্যর্থঃ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং নবমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ। ১৩।

কৃতিরাতস্ততস্তস্মান্মহারোমা চ তৎসুতঃ।
স্বর্ণরোমা সুতস্তস্য হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত॥ ১৭
ততঃ শীরধ্বজো জজ্ঞে যজ্ঞার্থং কর্ষতো মহীম্।
সীতা শীরাগ্রতো জাতা তস্মাৎ শীরধ্বজঃ স্মৃতঃ॥ ১৮
কুশধ্বজস্তস্য পুত্রস্ততো ধর্ম্মধ্বজো নৃপঃ।
ধর্ম্মধ্বজস্য দ্বৌ পুত্রৌ কৃতধ্বজমিতধ্বজৌ॥ ১৯
কৃতধ্বজাৎ কেশিধ্বজঃ খাণ্ডিক্যস্তমিতধ্বজাৎ।
কৃতধ্বজসুতো রাজন্নাত্মবিদ্যাবিশারদঃ॥ ২০
খাণ্ডিক্যঃ কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞো ভীতঃ কেশিধ্বজাদ্ দ্রুতঃ।
ভানুমাংস্তস্য পুত্রোঽভূচ্ছতদ্যুম্নস্তু তৎসুতঃ॥ ২১
শুচিস্তু তনয়স্তস্মাৎ সনদ্বাজঃ সুতোঽভবৎ।
ঊর্জ্জকেতুঃ সনদ্বাজাদজোঽথ পুরুজিৎ সুতঃ॥ ২২
অরিষ্টনেমি স্তস্যাপি শ্রুতায়ুস্তৎ সুপার্শ্বকঃ।
ততশ্চিত্ররথ স্তস্য ক্ষেমাধি র্মিথিলাধিপঃ॥ ২৩
তস্মাৎ সমরথস্তস্য সুতঃ সত্যরথ স্ততঃ।
আসীদুপগুরু স্তস্মা দুপগুপ্তোঽগ্নিসম্ভবঃ॥ ২৪
বস্বনন্তোঽথ তৎ পুত্রো যুযুধো যৎসুভাষণঃ।
শ্রুতস্ততো জয়স্তস্মাদ্বিজয়োঽস্মাদৃতঃ সুতঃ॥ ২৫
শুনকস্তৎসুতো জজ্ঞে বীতহব্যো ধৃতি স্ততঃ।
বহুলাশ্বো ধৃতে স্তস্য কৃতিরস্য মহাবশী॥ ২৬
এতে বৈ মৈথিলা রাজন্নাত্মবিদ্যাবিশারদাঃ।
যোগেশ্বর-প্রসাদেন দ্বন্দ্বৈর্মুক্তা গৃহেষপি॥ ২৭

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
সূর্য্যবংশকীর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩।

ইক্ষ্বাকোরেব পুত্রস্য নিমের্ব্বংশস্ত্রয়োদশে।
বর্ণ্যতে জজ্ঞিরে যত্র ব্রহ্মজ্ঞা জনকাদয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

জনকের বংশ পরিচয়ঃ—

(১) নিমি, (২) জনক, (৩) উদাবসু, (৪) নন্দিবর্দ্ধন, (৫) সুকেতু, (কেতু), (৬) দেবরাত, (৭) বৃহদ্রথ, (৮), মহাবীর্য্য, (৯) সুধৃতি, (১০) ধৃষ্টকেতু, (১১) হর্য্যশ্ব, (১২) মরু, (১৩) প্রতীপক, (১৪) কৃতরথ, (১৫) কৃতি, (১৬) বিবুধ, (১৭) মহাধৃতি, (১৮) কৃতিবাত, (১৯) মহারোমা, (২০) সুবর্ণরোমা, (২১) হ্রস্বরোমা, (২২) সীরধ্বজ ও কুশধ্বজ, (২৩) সীরধ্বজ পুত্র ভানুমান্ ও কন্যা সীতাদেবী, (২৪) শতদ্যুম্ন, (২৫) শুচি, (২৬) ঊর্জ্জবহ, (২৭) সত্যধ্বজ, (২৮) কুণি, (২৯) অঞ্জন, (৩০) ঋতুজিৎ, (৩১) অরিষ্টনেমি, (৩২) শ্রুতায়ু, (৩৩) শ্রুতায়ুধ, (৩৪) সুপার্শ্ব, (৩৫) সঞ্জয়, (৩৬) ক্ষমারি, (৩৭) অনেনা, (৩৮) মীনরথ, (৩৯) সত্যরথ, (৪০) সাত্যরথি, (৪১) উপগু, (৪২) শ্রুত, (৪৩) শাশ্বত, (৪৪) সুধন্বা, (৪৫) সুভাস, (৪৬) সুশ্রুত, (৪৭) জয়, (৪৮) বিজয়, (৪৯) ঋত, (৫০) সুনয়, (৫১) বীতহব্য, (৫২) সঞ্জয়, (৫৩) ক্ষমাশ্ব, (৫৪) ধৃতি, (৫৫) বহুলাশ্ব এবং (৫৬) কৃতি। ইঁহারা সকলেই রাজর্ষি ছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মহর্ষি জনকের রাজ্যের রাজধানীর নাম মিথিলা। নগরের জননশক্তি হেতু তিনি জনক নামে কীর্ত্তিত হয়েন। মন্থনদ্বারা তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তিনি মিথি নামে অভিহিত হয়েন।* অধুনা মিথিলার স্থান নির্দ্দেশ সুকঠিন।

মহারাজ দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত ঋষিগণের যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণের দণ্ড বিধান করিবার জন্য অযোধ্যা হইতে যে স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞসমাধান্তে ঋষিগণের অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ জনকপুরে যে পথাবলম্বন করিয়া উপস্থিত হয়েন তাহাই এক্ষণে আমরা আলোচনা করিব।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যাধিপতি দশরথের নিকট শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে

---

* অপুত্রস্য তস্য নিমের্ভুভুজঃ শরীরমরাজকভীরবস্তে মুনয়ঃ অরণ্যা মমন্থুঃ। তত্র চ মারো জজ্ঞে। জননাজ্জনকসংজ্ঞাঞ্চাসাববাপ। অভূদ্বিদেহস্য পিতেতি বৈদেহঃ। মথনান্মিথিরভূৎ। তস্যোদাবসুঃ পুত্রোঽভূৎ। ইতি বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ৫ অধ্যায়ঃ।

প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ দশরথ তাদৃশবাক্যে অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয় হইলেন। তিনি ক্ষণকাল নিশ্চেষ্টভাবে চিন্তাপূর্ব্বক পরিশেষে কহিলেন, "আমার পুত্র রামের বয়ঃক্রম অদ্যাপি ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। এবং রাম অদ্যাপি অস্ত্র বিদ্যায়ও সুশিক্ষিত হইতে পারে নাই; সুতরাং ভবদীয় যজ্ঞরক্ষার্থ আমাকেই যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইবে। আমার সম্পূর্ণ এক অক্ষৌহিণী দুর্জ্জয় সৈন্য আছে, সুতরাং আমি তাহা লইয়া অগ্রসর হইব।" তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, "কাহাকেও যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে না। কেবল আপনার দুই পুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিলেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে।" যাহা হউক, কি প্রকারে তিনি রাজা দশরথের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিলেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। আমরা এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া কোন্ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ঋষিগণের যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া কার্য্য সমাপন করিয়া বিশ্বামিত্রের অনুরোধে জনকপুরে বা মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন তাহাই দেখাইব। ইহা দ্বারা মিথিলার স্থান নির্দ্দেশ সহজসাধ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন। কাকপক্ষধারী মহাযশা রামচন্দ্র শরাসনগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা ছয়ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক সরযূর দক্ষিণ তটে উপনীত হইলেন। তখন তপোনিধি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে কহিলেন, "বৎস! এই স্থানে হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক যথা বিধানে আচমন কর, আমি তোমাকে দীক্ষা দিব, তাহাতে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। আমি তোমাকে ও লক্ষ্মণকে, বলা ও অতিবলা নামে দুইটি বিদ্যাপ্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। এই বিদ্যা প্রভাবে তোমাদের কদাচ শ্রম, জরা বা অঙ্গবৈকল্য হইবে না।" পরে মহাযশা রাম ও লক্ষ্মণ গৃহীত-বিদ্য হইয়া মহর্ষির অনুজ্ঞানুসারে সেই সরযূতীরেই এক রাত্রি যাপন করিলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইল। তখন মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ প্রাতঃস্নান ও তর্পণাদি সম্পাদন পূর্ব্বক সরযূর অনতিদূরে ত্রিপথগামিনী দেব-নদী গঙ্গা দর্শন করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই গঙ্গাতীরে দুশ্চর-

তপঃপরায়ণ পুণ্যশীল ঋষিগণসেবিত পরম রমণীয় পবিত্র আশ্রমপদ রহিয়াছে, দর্শন করিয়া কাহার আশ্রম অবগত হইবার জন্য মহাত্মা কৌশিককে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তিনি বলিলেন, কামনামে বিখ্যাত কন্দর্প পূর্ব্বকালে মূর্ত্তিবিশিষ্ট ছিলেন। তৎকালে মহেশ্বর এই স্থানে কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহার সমাধি ভঙ্গ না করিলে তাঁহার দ্বারা পৃথিবীর কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইতেছে না দেখিয়া কামদেব দেবরাজের অনুরোধে তাঁহাকে কুসুম-শায়কে বিদ্ধ করিবার জন্য কুসুমশর পরিত্যাগ করেন। সেই সময় মহাত্মা শঙ্কর হুঙ্কার পূর্ব্বক সর্ব্বসংহার-কারী তৃতীয় নেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কন্দর্প তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। সেই হইতে কন্দর্প অনঙ্গ হইয়াছেন। তখন হইতে এই দেশ অনঙ্গ দেশ নামে পরিচিত হইয়াছে।

অতঃপর তাঁহারা এই পবিত্র নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সেই রজনী অতি-বাহিত করিলেন। অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে তাঁহারা গঙ্গা সমুত্তীর্ণ হইয়া ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। * সেই উপকূল আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন রাম ও লক্ষ্মণ কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটি ভয়ঙ্কর বন দেখিতে পাইলেন। পরে তাঁহারা ঐ মেঘসদৃশ ঘোর ও দুর্গম বনের নাম পরিজ্ঞাত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই অরণ্য মধ্যে ভয়াল সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, কুম্ভীর প্রভৃতি জন্তু ও ধবল, শাল, কুটজ, পাটল, তিন্দুক (গাব) প্রভৃতি তরুরাজি বিরাজিত রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে খদির, মদন, গোক্ষুর ও বদর প্রভৃতি কণ্টক বৃক্ষে আকীর্ণ রহিয়াছে। মহর্ষি কৌশিক তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, পূর্ব্বকালে এই স্থানে মলজ ও করূষ নামে মহাসম্পৎসম্পন্ন দেবনির্ম্মিত শোভাশালী সুরম্য দুইটি জনপদ ছিল। উক্ত জনপদ দুইটিতে ইন্দ্র নমুচিনিধনজনিত পাপ হইতে (ঋষিগণ দ্বারা) মুক্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ সহস্রাক্ষ মল ও করূষ অর্থাৎ পাপ ও কলুষ হইতে এই স্থানে শুচি হইয়াছিলেন বলিয়া ইহা মলজ ও করূষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

* They crossd the Ganges and landed near the fortress of Buxar in the District of Sahabad or Arrah, Calcutta Review vol XXIII Page 176.

ঋষিগণ শচীপতির মুখে এবম্প্রকার নামকরণ শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" বলিয়াছিলেন। সেই হইতে এই দুই জনপদ মলজ ও করূষ নামে বিখ্যাত ও অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও সর্ব্বদাই আনন্দ কোলাহল পূর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর তাড়কানাম্নী রাক্ষসী সেই দুই জনপদ উৎসন্ন করিয়া ফেলে। এই স্থান হইতে ছয় ক্রোশ দূরে তাড়কার বাস। রাম সেই উৎসাদিত প্রদেশের অধিকারিণীকে বিনাশ করিলেন। সে রজনী সেই অরণ্য মধ্যে যাপন করিয়া বিভাবরী প্রভাত হইলে তাঁহারা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া শুচি হইলে মহর্ষি রামচন্দ্রকে সমুদায় দিব্য অস্ত্র প্রদান করিলেন।

দুই ভ্রাতা তপোধনের সহিত গমন করিতে করিতে এক সুরম্য অরণ্য দৃষ্টিগোচর করিয়া কহিলেন, "ত্রিদশপ্রভ! মহীধরের অনতিদূরে সুঘন ঘনঘটা সদৃশ ঐ একটি যে বিস্তীর্ণ অরণ্য দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কোন্ বন?" তখন মহাতেজা মহর্ষি বলিলেন, "ইহা প্রাচীনকালে মহাত্মা বামনের আশ্রম ছিল। ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ করিয়া এই স্থানে তপশ্চরণ দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই অবধি ইহা সিদ্ধাশ্রম নামে খ্যাত।" উক্ত আশ্রমে বিশ্বামিত্র যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ যজ্ঞরক্ষার্থ ছয় রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ দিবসে মহর্ষিগণ বেদীস্থাপনা করিলেন। যজ্ঞধূম সন্দর্শন করিয়া যথাকালে রাক্ষসগণ গগনপটে সমুদিত হইল। রামচন্দ্র মারীচকে বাণবিদ্ধ করিয়া বিতাড়িত ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। তথা হইতে তাঁহারা মিথিলাভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন। উক্ত আশ্রম হইতে বিশ্বামিত্র ভাগীরথীর উত্তর তীরে গমন করিবেন স্বীকার করিলেন। অতএব মিথিলা উক্ত আশ্রমের উত্তর দিকে অবস্থিত সন্দেহ নাই। তাঁহারা বহুদূরে গমন করিলে দিনকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন তাঁহারা শোণ নদের তীরে গমনপূর্ব্বক বাসযোগ্য স্থান নিরূপণ করিলেন। তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আমরা কোন্ দেশে আসিয়াছি? এখানে অনেক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির বাস দেখিতেছি।" মহর্ষি বলিলেন, "পূর্ব্বকালে কুশ নামে এক নরপতি ছিলেন। ইনি ব্রহ্মার পুত্র। তাঁহার চারি পুত্র—কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজা ও বসু। তাঁহারা তাঁহাদের নামানুসারে চারিটি নগরী স্থাপন করেন, তন্মধ্যে কুশাশ্ব কৌশাম্বী ও কুশনাভ মহোদয় নগর স্থাপন করেন

অমূর্ত্তরজা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর স্থাপন করিলেন। চতুর্থ পুত্র বসু ধর্ম্মারণ্য সমীপস্থিত গিরিব্রজ নামক নগর নির্ম্মাণ করেন। বসুর নামানুসারে এই দেশ বসু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। গিরিব্রজপুরীও বসুমতী বলিয়া কথিত হয়।

ঐ সম্মুখে যে পাঁচটি পর্ব্বত দেখিতেছ, উহার মধ্যে সুমাগধী নামে একটি নদী, মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই সুমাগধী নদী এই দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়াতে নদীর নামানুসারে এই দেশ মগধ দেশ এবং পুরী মাগধীপুরী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে মহাত্মা বসু এই সুক্ষেত্রা শস্যশালিনী মাগধীপুরীতে বাস করিতেন। এক্ষণে সেই সুমাগধী নদী শোণ নদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

রাজর্ষি কুশনাভের একশত কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। একদা তাঁহারা উপবনে গমন করিয়া বিদ্যুন্মালার ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সর্ব্বতোগামী প্রভঞ্জন সেই উদ্যান ভূমিতে আগমন করিয়া কহিলেন, "আমি প্রার্থনা করিতেছি যে তোমরা আমার ভার্য্যা হও।" তখন কুশনাভের কন্যাগণ বলিলেন, "জগৎপ্রাণ, আমাদের মর্য্যাদা হানি করা আপনার উচিত হইতেছে না। আপনি পিতার নিকট গমন করিয়া প্রার্থনা করুন।" মারুত কন্যাগণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রোষপরবশ হইলেন এবং বলপূর্ব্বক তাঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলেরই মধ্যদেশ ভগ্ন করিয়া দিলেন। রাম! পূর্ব্বকালে সেইস্থানে এইরূপে বায়ু কন্যাগণকে কুব্জ করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই অবধি সেই দেশ (কন্যাকুব্জা, এই শব্দ হইতে) কান্যকুব্জ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

সোমদাতনয় রাজর্ষি ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্যা নামে নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ হিমালয় হইতে বহির্গতা সত্যবতী রূপিণী কৌশিকী নদী প্রবাহিতা হইতেছে, সেই সত্যবতী বিশ্বামিত্রের ভগিনী এবং তাঁহারই অপর নাম কৌশিকী। উক্ত সরিদ্বরা অধুনা এই স্থলে বিদ্যমান আছে।

মহর্ষিগণ রাম ও লক্ষ্মণের সহিত শোণ নদের তীরে অবস্থান করিয়া রজনী প্রভাতা হইলে শোণ নদ উত্তীর্ণ হইয়া বহুদূর গমন করিলেন। তখন দিবা অবসান হইল। তাঁহারা সম্মুখে সরিদ্বরা ভাগীরথী দেখিতে পাইলেন। সেই হংস-সারস-সুশোভিতা বিশুদ্ধসলিলা জাহ্নবী দর্শন করিয়া তাঁহারা সেই দিন নদীতীরেই আবাস গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর রাম তাঁহাদের সহিত গৌতমা-

শ্রমে গমন পূর্ব্বক অহল্যাকে উদ্ধার করিলেন। তথা হইতে মহর্ষিগণ, রাম ও লক্ষ্মণ মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা ক্রমশঃ উত্তর পূর্ব্বদিকে গমন পূর্ব্বক রাজর্ষি জনকের যজ্ঞবাট সন্দর্শন করিলেন। সুতরাং তাঁহারা যে মিথিলা যাইতে উত্তর পূর্ব্বদিকে গমন করিয়াছিলেন তাহাতে অনুমিত হয় যে মিথিলা পূর্ব্ব বর্ণিত স্থানের ঈশান কোণে অবস্থিত।

রাজর্ষি জনকের পূর্ব্ব পুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠ তনয় দেবরাত নামক নরপতি ছিলেন। উক্ত নরপতির উপর সন্তুষ্ট হইয়া দেবদেব মহাদেব এক বিশাল শরাসন প্রদান করেন। সেই শরাসনে যিনি জ্যারোপণ করিতে পারিবেন তিনিই সীতাদেবীকে লাভ করিবেন। একদা জনক ক্ষেত্র সংস্কারের নিমিত্ত ভূমিকর্ষণ করিতেছেন, এমন সময় ভূগর্ভ হইতে সীতামধ্যে এক কন্যারত্ন উত্থিত হইল। এই অযোনিজা কন্যার তদনুসারেই নাম হইল 'সীতা'।

অষ্টশত সুদীর্ঘকায় মহাবল পুরুষ অতি প্রযত্ন সহকারে, অষ্টচক্রসুশোভিত লৌহনির্ম্মিত মঞ্জুষা মধ্যে সন্নিবেশিত হরকার্ম্মুক সেস্থলে আনয়ন করিল। মন্ত্রিগণ রাজর্ষি জনককে যথাসময়ে তাহা বিজ্ঞাপিত করিলেন। রামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও বিদেহাধিপতি জনকের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দিব্য শরাসন উত্তোলন ও জ্যাযোজনা পূর্ব্বক আকর্ষণ করিবামাত্র তাহার মধ্যদেশ ভগ্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহারাজ দশরথকে আনয়ন করিবার জন্য অযোধ্যায় দূত প্রেরিত হইল। যথাকালে মহারাজ দশরথ মিথিলায় আগমন করিয়া চারি পুত্রকে চারি কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। জগতের নরপতিবৃন্দ সীতাদেবীর বিবাহপ্রার্থী হইয়া হরকার্ম্মুক ভগ্ন করিতে আগমন করিয়া বিফলমনোরথ হইলে জনক তাঁহাদিগকে কন্যাদান বিষয়ে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তাঁহারা তখন ক্রোধে মিথিলাপুরী অবরোধ করিলেন। উক্ত নৃপতিবৃন্দ এক বৎসর পর্য্যন্ত মিথিলাপুরী অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতঃপর মহর্ষি জনক চতুরঙ্গ বল দ্বারা মহীপতিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। ইহাতে অনুমিত হয় তখনও জনকের অমিত বল ছিল। তখনও তাঁহার সামর্থ্যের হ্রাস হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগণপতি রায়।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায়, ৫ম খণ্ড।] ১৩২৩ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা।

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের

"চারুচর্য্যা।"

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

৯১। অভিচারের অবৈধতা।

ন কুর্য্যাদভিচারোত্থ-বধ্যাদি-কুহকাঃ ক্রিয়াঃ।
লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিৎকৃত্যাদ্যভিচারময়ো হতঃ॥

অন্যের অনিষ্ট অভিসন্ধি করিয়া অবৈধ অভিচার (মারণ ও উচাটন প্রভৃতি) ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা বিহিত নহে। মায়াবী ইন্দ্রজিৎ অভিচার ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন।

"অবিদূরং ততো গত্বা প্রবিশ্য তু মহদ্বনম্।
অদর্শয়ত তৎকর্ম্ম লক্ষ্মণায় বিভীষণঃ॥
নীলজীমূতসংকাশং ন্যগ্রোধং ভীমদর্শনম্।
তেজস্বী রাবণভ্রাতা লক্ষ্মণায় ন্যবেদয়ৎ॥
ইহোপহারং ভূতানাং বলবান্ রাবণাত্মজঃ।
উপহৃত্য ততঃ পশ্চাৎ সংগ্রামমভিবর্ত্ততে॥
ঐন্দ্রাস্ত্রেণ সমাযুজ্য লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
তচ্ছিরঃ সশিরস্ত্রাণং শ্রীমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্।
প্রমথ্যেন্দ্রজিতঃ কায়াৎ পাতয়ামাস ভূতলে॥" (রামায়ণ)

বিভীষণ লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নীলবর্ণ মেঘের ন্যায় ভীষণ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, এই বৃক্ষমূলেই ভূতগণকে বলি প্রদান পূর্ব্বক তৎপরে ইন্দ্রজিৎ কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

অভিচার ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। অবিলম্বেই ঐন্দ্র অস্ত্র প্রয়োগে ইন্দ্রজিৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন।

৯২। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ স্যাদ্বানপ্রস্থো যতিঃ ক্রমাৎ।
আশ্রমাদাশ্রমং যাতা যযাতি-প্রমুখা নৃপাঃ॥

সনাতন আর্য্যধর্ম্মের অনুশাসন অনুসারে প্রথম বয়সে বিদ্যাভ্যাসের সময়ে ব্রহ্মচারী, তৎপরে সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইবে। অনন্তর পঞ্চাশত্তমবর্ষ বয়ঃক্রমে বানপ্রস্থ ব্রত গ্রহণ করিয়া কালপরিণামে ভিক্ষু হইবে। যযাতি প্রভৃতি নরপতিগণ এইরূপ আশ্রম ধর্ম্ম পরিপালনপুণ্যেই পরলোকে সদ্গতিভাজন হইয়াছিলেন।

"এবমুক্ত্বা স রাজর্ষিঃ সদারঃ প্রবিশদ্বনম্।
কালেন মহতা চাপি চচার বিপুলং তপঃ॥
ভৃগুতুঙ্গে তপস্তীর্ত্বা তপসো হন্তে মহাযশাঃ।
অনশ্নন্ দেহমুৎসৃজ্য সদারঃ স্বর্গমীযিবান্॥"

(হরিবংশ।)

জরাগ্রস্ত নৃপতি যযাতি পুত্রদিগকে ভিন্ন ভিন্ন রাজপদে (১৭ শ্লোক) প্রতিষ্ঠিত করিয়া পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। তিনি ভৃগুতুঙ্গে কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে অনাহার ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দেহাবসানে সস্ত্রীক স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন।

৯৩। কৃপণের ধনের পরিণাম।

কুর্য্যাদ্ব্যয়ং স্বহস্তেন প্রভূতধনসম্পদাম্।
অগস্ত্যগ্রস্তে বাতাপৌ কোশস্থাস্তৈঃ কৃতো ব্যয়ঃ॥

অতুল ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া নিজের হস্তেই তাহা সৎকার্য্যে ব্যয় করা কর্ত্তব্য। বাতাপি অসুর অগস্ত্য কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া গেলে, বিপুলধনসম্পদ্ দ্বারা তাহার নিজের আর কোন উপকার হয় নাই; অপরে অধিকারী হইয়া সেই সম্পত্তি যথেচ্ছ ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিল।

"অগস্ত্য এব কৃৎস্নস্তু বাতাপিং বুভুজে ততঃ।
ভুক্তবত্যসুরোঽহ্বানমকরোত্তস্য চেল্বলঃ॥
ততো বায়ুঃ প্রাদুরভূদগস্ত্যস্য মহাত্মনঃ।
শব্দেন মহতা তাত গর্জ্জন্নিব যথা ঘনঃ॥
বাতাপে নিষ্ক্রমস্বেতি পুনঃপুনরুবাচ হ।
তং প্রহস্যাব্রবীদ্রাজন্নগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ॥
কুতো নিষ্ক্রামিতুং শক্তো ময়া জীর্ণস্তু সোঽসুরঃ।
গবাং দশসহস্রাণি রাজ্ঞামেকৈকশোঽসুর॥
তাবদেব সুবর্ণস্য দিৎসিতং তে মহাসুর॥
মহ্যং ততো বৈ দ্বিগুণং রথশ্চৈব হিরণ্ময়ঃ॥
মনোজবৌ বাজিনৌ চ দিৎসিতং তে মহাসুর।
ততঃ প্রব্যথিতো দৈত্যো দদাবভ্যধিকং বসু॥"

(মহাভারত।)

ইল্বল ও বাতাপি নামক মায়াবী দানবদ্বয় অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিল। উভয়ে কপট মায়ায় ভুলাইয়া অতিথিরূপে গ্রহণপূর্ব্বক অনেক মানবের প্রাণসংহার করিয়াছিল। কালক্রমে মহর্ষি অগস্ত্যকে যাচকরূপে প্রাপ্ত হইয়া উভয়ে হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিল। উভয়ের মন্ত্রণা অনুসারে বাতাপি পশুর রূপ ধারণ করিলে, ইল্বল তাহাকে সংহারপূর্ব্বক পশুরূপধারী বাতাপির সমগ্র মাংস রন্ধন করিয়া অগস্ত্যকে ভক্ষণ করাইল। অগস্ত্য এই সকল বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি সহর্ষে তৃপ্তির সহিত সমস্ত মাংসই ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অনন্তর অগস্ত্য স্বীয় যোগবলে এইরূপ বিকট গর্জ্জনে অধোবায়ু নিঃসরণ করিয়াছিলেন, যে সেই আকস্মিক ভৈরব নিনাদ শ্রবণ করিয়া অকুতোভয় ইল্বলও ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া পড়িয়াছিল! ইল্বল পুনঃ পুনঃ

ভীতিবিহ্বল হইয়া তারস্বরে ডাকিতে লাগিল, "বাতাপে, শীঘ্র বাহিরে আগমন কর ; বাতাপে, শীঘ্র বাহিরে আগমন কর" ;—কিন্তু মহর্ষি অগস্ত্য সহাস্যে প্রত্যুত্তর করিয়া তাহাকে বলিলেন—'অরে মূঢ়, বাতাপি আর পূর্ব্বের ন্যায় বাহিরে আসিতে সমর্থ হইবে না, আমার জঠরানল প্রভাবে সে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এখন যদি নিজের প্রাণের আশা থাকে, আমি যাহা আদেশ করিতেছি, তাহা প্রতিপালন কর। নৃপতিদিগের প্রত্যেককে দশ সহস্র গাভী ও দশ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা, আর আমাকে উহার দ্বিগুণ সংখ্যক গাভী ও সুবর্ণমুদ্রা এবং বেগগামী অশ্বযুগলসহ সুবর্ণমণ্ডিত রথ প্রদান কর।' ইল্বল বাতাপের দশাবিপর্য্যয়ে নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং মুনি যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, অবলীলাক্রমে সকলই প্রদান করিল।

৯৪। কুকার্য্যের গ্লানি মরণ পর্য্যন্ত থাকে।

জন্মাবধি ন তৎ কুর্য্যাদন্তে সন্তাপকারি যৎ।
সস্মারৈকশিরঃশেষঃ সীতাক্লেশং দশাননঃ ॥

যাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য মরণ পর্য্যন্তও আত্মগ্লানি ভোগ করিতে হয়, জন্ম হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কখনও সেইরূপ সন্তাপজনক পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। লঙ্কাধিপতি রাবণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের একটি মাত্র মস্তকও দেহে অবশিষ্ট রহিয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সীতার কথা স্মরণ করিয়া তীব্র মানসিক সন্তাপ ভোগ করিয়াছিলেন।

"মৈথিলীং রূপসম্পন্নাং প্রত্যবেক্ষস্ব পার্থিব।
তস্মিন্নেব সহাস্মাভিরাহবে ক্রোধমুৎসৃজ ॥"

(রামায়ণ।)

সুপার্শ্ব রাক্ষস রাবণকে বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ, আপনি এই মহাযুদ্ধ ব্যাপারে মিথিলারাজদুহিতা সীতার অসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন। এই ভীষণ সংগ্রামে আমাদিগের সহিত সংমিলিত হইয়াই এক্ষণে নিজের ক্রোধের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন।

৯৫। "বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাম্।"

জরাশুভ্রেষু কেশেষু তপোবনরুচির্ভবেৎ।
অন্তে বনং যযুর্বীরাঃ কুরুপূর্ব্বা মহীভুজঃ॥

বয়ঃ পরিণামে যখন কেশকলাপ্ জরানিবন্ধন শুভ্রবর্ণ ধারণ করিবে, তখন বিষয় সুখ পরিহার পূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া তপোবন গমনে আসক্তি করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা নিজ নিজ ভুজবল প্রভাবে ধরিত্রীর উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই বীরাগ্রগণ্য কুরুপ্রভৃতি নৃপতিগণ অন্তিম বয়সে তপোবন আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মকার্য্য করিয়াছিলেন।

"ঋক্ষাৎ সংবরণঃ, সংবরণাৎ কুরুঃ ;—য ইদং
ধর্ম্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং চকার।" (বিষ্ণুপুরাণ)।
"ঋক্ষাৎ সংবরণো জজ্ঞে কুরুঃ সংবরণাত্তথা।
যঃ প্রয়াগাদতিক্রম্য কুরুক্ষেত্রং চকার হ॥
পুণ্যঞ্চ রমণীয়ঞ্চ পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতম্।
তস্যান্বয়ঃ সুমহান্ যস্য নাম্নোঽথ কৌরবাঃ॥"
(ব্রহ্মপুরাণ।)

চন্দ্রবংশে ঋক্ষ হইতে সংবরণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সংবরণের পুত্র প্রসিদ্ধ "কুরু," যিনি প্রয়াগ অতিক্রম পূর্ব্বক ধর্ম্মক্ষেত্র "কুরুক্ষেত্র" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র পুণ্যজনক ও রমণীয় শোভাসম্পদ্‌বিশিষ্ট বলিয়া সেখানে পুণ্যাত্মগণ মোক্ষলাভের উদ্দেশে অধিবাস করিতেন। অতঃপর কুরুর প্রসিদ্ধ বংশই কৌরব নাম ধারণ করিয়াছিল।

৯৬। মুক্তিকামনাই জীবের অন্তিম লক্ষ্য।

পুনর্জ্জন্মজরাছেদকোবিদঃ স্যাদ্বয়ঃক্ষয়ে।
বিদুরেণ পুনর্জ্জন্মবীজং জ্ঞানানলে হুতম্॥

জীবনের অন্ত হইলে যাহাতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া জরা ও সাংসারিক ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিতে না হয়, সেই জন্য নিজ বুদ্ধিবৃত্তিকে সমাহিত

করিবে। বিবেকী বিদুর পরমার্থ অবলম্বন পূর্ব্বক নিজের জ্ঞানরূপ অগ্নিতে পুনর্জ্জন্মের বীজরূপ অজ্ঞানতাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

"বিদুরশ্চ মহাপ্রাজ্ঞো যযৌ সিদ্ধিং তপোবলাৎ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ সমাসাদ্য ব্যাসঞ্চৈব তপস্বিনম্॥"

(মহাভারত।)

মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর নিজ তপোবলে মোক্ষরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি ব্যাসদেবের উপদেশ অনুসারে সংসারপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

৯৭। অন্তে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই অবলম্বনীয়।

পরমাত্মানমন্তে হৃস্তজ্যোতিঃ পশ্যেৎ সনাতনম্।
তৎপ্রাপ্ত্যা যোগিনো যাতাঃ শুকশান্তনবাদয়ঃ॥

যিনি সনাতন, যিনি জীব মাত্রের অন্তরে জ্যোতিঃ স্বরূপ; সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে যাহাতে সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইতে পারা যায়, তদ্রূপ যোগাক্ষি সম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। শুক ও ভীষ্ম প্রভৃতি অন্তিমকালে যোগবলে পরমাত্মার সত্তা প্রত্যক্ষ করিয়া অপুনরাবৃত্তি মুক্তিভাজন হইয়াছিলেন।

"ভগবান্ উবাচ।

ব্যাসপুত্র মহাভাগ প্রীতোঽস্মি তব সুব্রত।
নিত্যমুক্তস্বরূপস্ত্বং পূজ্যমানঃ সুরৈর্নরৈঃ॥

* ব্যাসের ঔরসে শূদ্রাগর্ভে বিদুরের এবং মহাবংশপ্রসূতা সুক্ষত্রিয়া মহিষীদ্বয়ের গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হইয়াছিল। এই স্থানে মহাত্মা বিদুরের সমুজ্জ্বল মুক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভগবান্ বেদব্যাস অহংজ্ঞানরূপ অন্ধতামিস্রবিহতদৃষ্টি ব্যক্তির জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য সুতীব্র জ্ঞানশলাকার প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর "শূদ্রাগর্ভজাত বিদুরেরও যোগবলে মুক্তিলাভ হইল"—এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া নারায়ণের সাক্ষাৎ অবতার, ব্যাসদেবও "দাসকন্যার গর্ভজাত" বলিয়া "ব্রহ্মণ্য" হইতে পরিচ্যুত হইয়া পড়িবেন কিনা, বর্ত্তমান প্রত্নশীলতার বিচারে তাহাও নিবিড় অজ্ঞান গুহাগহ্বরে নিহিত রহিল!

"নিরপেক্ষঃ শুকো ভূত্বা নিঃস্নেহো মুক্তবন্ধনঃ।
মোক্ষমেবানুসঞ্চিন্ত্য গত এব পরং পদম্॥"

(নারদ পুরাণ।)

ভগবান্ বলিলেন, হে মহাভাগ ব্যাসপুত্র, শুকদেব, তোমার তপশ্চরণে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি নিত্যই মুক্তস্বরূপ, এইজন্য দেববৃন্দও তোমাকে প্রণতি করিতেছেন।

বিষয়ের প্রতি শুকের কোন আসক্তিই ছিলনা, কাহারও প্রতি তাঁহার স্নেহ বা মমতা ছিলনা; ফলতঃ তিনি সংসারের সকল পাশ হইতে সংপূর্ণ নির্মুক্ত হইয়াছিলেন। এইজন্য অনুক্ষণ মুক্তিমার্গের অনুধাবন করিয়া শুক পরমপদ মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"এবমুক্ত্বা কুরূন্ সর্ব্বান্ ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা।
তূষ্ণীং বভূব কৌরব্যঃ স মুহূর্ত্তমরিন্দম॥
ধারয়ামাস চাত্মানং ধারণাসু যথাক্রমম্।
তস্যোর্দ্ধমগমন্ প্রাণাঃ সন্নিরুদ্ধা মহাত্মনঃ॥

(মহাভারত।)

উপস্থিত যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কৌরবদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া শরতল্প-শায়ী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মুহূর্ত্তকাল মৌন অবলম্বন করিয়া রহিলেন; কিন্তু তখনই তিনি যোগমার্গের ক্রম অনুসরণ পূর্ব্বক হৃদয়স্থিত পরমাত্মায় সমাহিত হইলেন। অনন্তর সাধনাবলে ভীষ্মের প্রাণবায়ু সংনিরুদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধদেশে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রস্থান করিল।

৯৮। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

প্রাপ্তাবধিরজীবেঽপি জীবেৎ সুকৃতসন্ততিঃ।
জীবন্ত্যদ্যাপি মান্ধাতৃমুখাঃ কায়ৈর্যশোময়ৈঃ॥

ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক শরীরের অবসানেই জীব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন আর এই সংসারে কোন বিষয়ের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই বর্ত্তমান থাকে না; ইহা যথার্থ বটে; কিন্তু কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তির সুকৃতি

সমূহ দেহ অবসানের পরে "অমরত্ব" লাভ করিয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহার আর ধ্বংস হয় না। মান্ধাতা প্রভৃতি সৎকীর্ত্তিশালী নৃপতিবর্গ এক্ষণে আর বর্ত্তমান নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা অক্ষয় যশোরূপ শরীর পরিগ্রহ করিয়া এখনও এই নশ্বর জগতে "অনশ্বর" ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

"মুচুকুন্দোঽথ মান্ধাতা মরুত্তশ্চ মহীপতিঃ।
কীর্ত্তিং পুণ্যামবিন্দন্ত যথা দেবাস্তপোবলাৎ॥"

(মহাভারত।)

মরুত, মান্ধাতা ও মুচুকুন্দ প্রভৃতি নরপতিগণ সৎকার্য্য দ্বারা পুণ্যকীর্ত্তির ভাজন হইয়াছিলেন, যেরূপ দেবতারা তপস্যা দ্বারা সুকীর্ত্তিশালী হইয়াছিলেন।

৯৯। অন্তে বিষ্ণুর স্মরণে মুক্তিলাভ।

অন্তে সন্তোষদং বিষ্ণুং স্মরেদ্ধন্তারমাপদাম্।
শরতল্পগতোভীষ্মঃ সস্মার গরুড়ধ্বজম্॥

যাঁহার স্মরণে সকল বিপদ্ হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারা যায় এবং একমাত্র যিনি অক্ষয় "সন্তোষ" রত্ন প্রদান করিতে সমর্থ,—অন্তিমকালে কেবল সেই ভগবান্ 'বিষ্ণুকে'ই স্মরণ করা কর্ত্তব্য। মহাবীর ভীষ্ম শরতল্পে শয়ান থাকিয়াও গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর স্মরণে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

"ভীষ্ম উবাচ।

ভগবান্ দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত।
ত্রিবিক্রম নমস্তেঽস্তু শঙ্খচক্রগদাধর॥
স মাং ত্বমনুজানীহি কৃষ্ণ মোক্ষে কলেবরম্।
ত্বয়াঽহং সমনুজ্ঞাতো গচ্ছেয়ং পরমাং গতিম্॥

বাসুদেব উবাচ।

অনুজানামি ভীষ্ম ত্বাং বসূন্ প্রাপ্নুহি পার্থিব।
ন তেঽস্তি বৃজিনং কিঞ্চিদিহ লোকে মহাদ্যুতে॥
পিতৃভক্তোঽসি রাজর্ষে মার্কণ্ডেয় ইবাপরঃ।
যেন মৃত্যুস্তব বশে স্থিতো ভৃত্য ইবানতঃ॥' (মহাভারত।)

ভীষ্ম বলিলেন, হে ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণদেব, তুমি দেবতাদিগেরও কর্ত্তা, তাহাতে সুর ও অসুর সকলেই তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন। ত্রিবিক্রম রূপধারণ করিয়া তুমি দানবীর অসুররাজ বলির দানগর্ব্ব বিহত করিয়াছিলে। তুমি শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়া জীবগণের মঙ্গল নিদান হইয়াছ;—অতএব আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে কৃষ্ণ, এক্ষণে আমি বন্ধনভূত এই পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছি, অতএব আমার এই শুভকার্য্যে তুমি অনুজ্ঞা প্রদান কর। হে কেশব, আমার অন্তরে ও বাহিরে উভয়ত্রই তুমি বিরাজ করিতেছ, অতএব তোমা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলেই আমি একমাত্র কাম্য পরমপদ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হইব।

তখন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে বলিলেন;—হে মহাবীর ভীষ্ম, আমি তোমার পরলোক গমনে অনুমতি প্রদান করিতেছি; হে পার্থিব, তুমি স্বীয় "বসু" লোক প্রাপ্ত হও। হে শান্তনুনন্দন, তুমি নিজের অপঙ্কিল পুণ্য প্রভায় এইক্ষণ পর্য্যন্ত মর্ত্তের পাপরাশি অপসারিত করিতেছ; কারণ, হে মহাত্মাতে, তুমি নিজের এই দীর্ঘজীবনে সর্ব্ববিধ পাপের সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত থাকিয়া অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অটলভাবে অবস্থিতি করিয়াছ! হে রাজর্ষে, তোমার ন্যায় প্রকৃত পিতৃভক্ত, এই ধরণীমণ্ডলে কখনও দেখা যায় নাই! সেই পিতৃভক্তির পুণ্য প্রভাবেই তুমি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় অবহেলে মৃত্যুকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছ, তাহাতেই মৃত্যু বিনীত ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাবহ হইয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছে! (ইহার পরের বৃত্তান্ত ৯৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।)

১০০। গ্রন্থের শ্রবণ মাহাত্ম্য।

শ্রব্যা শ্রীব্যাসদাসেন সমাসেন সতাং মতা।
ক্ষেমেন্দ্রেণ বিচার্য্যেয়ং চারুচর্য্যা প্রকাশিতা॥

যে সদাচার পরম্পরা সাধুব্যক্তিগণ অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীব্যাসদেবের দাস "ক্ষেমেন্দ্র" কর্ত্তৃক অভিনিবেশ সহকারে সংকলিতা এই "চারুচর্য্যা", ইহ ও পারলৌকিক মঙ্গল বিধায়ক বলিয়া—সকলেরই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

ইতি শ্রীপ্রকাশেন্দ্রাত্মজ-ব্যাসদাসাপরাখ্য মহাকবি শ্রীক্ষেমেন্দ্রকৃতা চারুচর্য্যা সমাপ্তা।

"চারুচর্য্যা" সমাপ্ত হইল। মহকবি শ্রীক্ষেমেন্দ্র ইঁহার প্রণেতা, তিনি শ্রীপ্রকাশেন্দ্রের কৃতীপুত্র। ভগবান্ বেদব্যাসের ছায়া অবলম্বন পূর্ব্বক এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, এইজন্য গ্রন্থকার সম্মানের সহিত "ব্যাসদাস" এই উপাধি গ্রহণ করিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি।

পাঁচফুলের সাজি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় স্তবক।

ভোলা পাগলা ওরফে ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী বহুদূর পর্য্যটনের পর মালিনীর সন্ধান পাইয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। মালিনী সাজিটী ভোলানাথ চক্রবর্ত্তীর হস্তে অর্পণ করিয়া নিরস্ত হইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। আর তাহার আপাততঃ কোন আবশ্যক কার্য্য ছিল না বটে, কিন্তু ঘরমুখো বাঙ্গালী গৃহাভিমুখে রওনা হইলে যেরূপ দ্রুতভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করে, মালিনী সেরূপ ত্রস্তভাবে না আসিয়া বরং মন্থরগমনে সহজ-মনে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল। সহসা পদশব্দে পশ্চাৎ ফিরিয়া চক্রবর্ত্তীকে দ্রুতপদে তাহারই অনুসরণ করিতে দেখিয়া একটু থমকাইয়া দাঁড়াইল। ভোলানাথ সাজিটী মালিনীর সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কহিল, "মালিনী, তুমি তো ফুলের ব্যবসা লইয়া প্রবীণা হইলে, তোমাকে আমার তো বুঝাইবার নাই। তবে কেন সাজিটী আজ এমন অসম্পূর্ণভাবে সাজাইলে? যখন বিদ্বৎ-সমাজে এই উৎকৃষ্ট ফুলের নমুনা পাঠাইতেছ, তখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্মফুলটীকে বাদ দেওয়া ঠিক হয় নাই।"

মালিনী সাশ্চর্য্যে কহিল, "ও হরি! এই জন্য তুমি এতদূর দৌড়ে এসেছ? তোমার মতন অর্ব্বাচীন ব্রাহ্মণ একালে তো দেখি না। পূর্ব্বকালে যখন আর্ক-ফলার পসার ছিল, তখন পদ্মের আদর ছিল, ইংরাজিনবিশ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে পদ্মের আদর নাই। পদ্ম এখন বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ থেকে সরে পড়ে,

কালিঘাটে ডালার দোকানে আড্ডা নিয়েছে; আর না হয় বড় জোর পদ্মকে কখন কখন সাহেবদের ডিনার টেবিলের শোভাসম্বর্দ্ধিনীরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সামান্য বিষয়টী নিজে মীমাংসা না করতে পেরে, আমার নিকট আসা, তোমার বুদ্ধির পরিচয় হয় নাই। এখন বুঝলে? যাও, বঙ্গীয় পাঠকের হাতে সাজিটী শীঘ্র পৌঁছে দাও গিয়ে। নতুবা বিলম্বে ফুলগুলি শুকাইয়া যাইবে।” এই বলিয়া মালিনী মন্থরগমনে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, ভোলানাথও রাজপথ-পার্শ্বস্থিত এক সুরম্য উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যস্থিত এক সুন্দর সরসীর মর্ম্মর-প্রস্তরনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত সোপানরাজির সর্ব্বোচ্চ সোপান-চত্বরে উপবিষ্ট হইয়া শ্রান্তিদূর করিলেন। উদ্যানবাটিকার চতুষ্পার্শ্বে তরুশাখে সুবাসিত কুসুমচয় প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যানের মনোহর শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুমবৃক্ষে মল্লিকামালতীযাতিযুথী-বেলাদি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া বাগানের শোভা বৃদ্ধি করিয়া মধুর সৌরভে উদ্যান সুরভিত করিয়া তুলিয়াছে। মধুমক্ষিকা দলে দলে আসিয়া ক্ষুদ্রবৃহৎ কুসুম বৃক্ষগুলি ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের মধুর গুঞ্জনে উদ্যান মুখরিত। কোথাও প্রস্ফুটিতা রজনীগন্ধা আপন সৌরভে আপনি বিভোর হইয়া কুসুমস্তবকসহ ঈষৎ নমিতাঙ্গী; যেন নমিতভাবে সুকুমার অঙ্গ হেলাইয়া মধুপদলকে আহ্বান করিতেছে। মধুপদল তাহাদের সেই প্রেমের আহ্বানে কুসুমিত গোলাপরাজি পরিহার করিয়া যেন তাহাদেরই সহিত যোগদিবার জন্য দলে দলে সমাগত।

ভোলানাথ কুসুম সৌরভ-বাসিত সান্ধ্যসমীরণ সেবনে প্রফুল্ল তাহাতে আবার নানাবর্ণের কুসুমশোভায় চিত্ত বিমোহিত, যেন তিনি ভাবময় নন্দনকাননে প্রবিষ্ট। ভোলানাথের চিত্ত ভাবঘোরে জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সেই স্বপ্নরাজ্যে ভোলানাথ যেন এক অভূতপূর্ব্ব শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। যেন তিনি মধুপগুঞ্জন বুঝিতে পারিতেছিল। যেন তরুলতাগণের সূক্ষ্ম প্রাণসঞ্চার অবগত হইতেছিলেন। ভোলানাথ যেন অমানুষী শক্তিতে শক্তিমান্। ভোলানাথ শুনিলেন, যেন একটি মধুকর প্রেমোন্মত্ত ভাবে কুসুমিতা রজনীগন্ধার নিকট সবেগে উড়িয়া যাইয়া কহিতেছে, “অয়ি ধবলাঙ্গি প্রেমময়ি রজনীগন্ধে! কেন তুমি অধোবদনে বিমর্ষভাবে অবস্থান করিতেছ? আমি প্রেমসৌরভভরা সুন্দরী গোলাপরাণীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তোমার বিমল

প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তোমার প্রেম যাচ্ঞা করিতেছি। আমাকে অনাদর করিও না। তোমাভিন্ন আমি অন্য কুসুমে রত নহি। বসন্তানিলসংস্পর্শে যৌবনভারে তুমি প্রস্ফুটিতা। অয়ি মধুরগন্ধে! আর আমায় বিরহানলে দগ্ধ করিও না। ঐ শোন সহকারের নবপল্লবে দেহ আবৃত করিয়া কোকিল পঞ্চম স্বরে কুহরিতেছে অতএব একবার মুখ তুলিয়া প্রেমোন্মাদে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখ।” সহসা সেই সময় ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া কুসুম স্তবকটিকে বলে সঞ্চালিত করিয়া বৃন্তচ্যুত করিয়া দিল; সুতরাং তাহার ভাগ্যে রজনীগন্ধার সুমধুর মধুসঞ্চয় ঘটিল না।

প্রেমাস্বাদনে প্রতিহত হইয়া মধুকর গুণ গুণ রব তুলিয়া সন্নিহিত একটি চামেলি কুসুমবৃক্ষ আশ্রয় করিল। ভোলানাথ সেই গুণ গুণ রবের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিল। মধুকর কহিতেছে, “চামেলি! তোমার মধু ত্রিগুণসম্পন্ন, অর্থাৎ ত্রিগুণরসাত্মক! ত্রিগুণরসাত্মক অর্থে ভোলানাথ বুঝিল মধু, অম্ল ও কটু এই তিন গুণের মিশ্রণ চামেলিতে আছে। কিন্তু চামেলির সৌরভে মধুরতার মাত্রাইত অধিক। তাহাতে অম্ল বা তিক্ত রসের মিশ্রণ আছে বলিয়া অনুমিত হয় না। চামেলিতে অম্লরস বিদ্যমান থাকিলে বাবুদিগের পলান্নের চাটনিতে বিরাজ করিত; কটু বা তিক্তরস থাকিলে ভিষকগণ পিত্তাধিক্যে তাহার ব্যবস্থা করিতেন। এই উভয় স্থলে চামেলির তো ব্যবস্থা দেখিনা; বরং স্নিগ্ধকারিতা গুণের জন্য সুগন্ধিতৈল ব্যবসায়িগণ চামেলি ফুলের তৈল চোলাই করিয়া চামেলি তৈল মস্তিষ্ক শীতলের জন্য বিক্রয় করিয়া থাকেন ও সৌখিন বাবুরা আদরের সহিত তাহা ক্রয় করিয়া ব্যবহার করেন। তবে ইহাকে মধুকর ত্রিগুণরসাত্মক আখ্যা কেন দিল? ভাবিতে ভাবিতে ভোলানাথের মস্তিষ্ক ভাবের আলোক দেখিল। সহসা ভোলানাথ বলিয়া উঠিল “হরি, হরি! আর না এবার বুঝিয়াছি। তিনরসের পাকে তোমার তিনগুণ সমুৎপন্ন। মিষ্টরস সাত্ত্বিকগুণের পরিচায়ক; অম্লরস রাজসিক গুণের ও কটুতিক্তরস তামসিক গুণের পরিচায়ক। সুতরাং তিন গুণেই তুমি ভূষিতা। তোমার সৌগন্ধে সত্ত্বগুণ; শ্বেতরূপের শিখায় রজোগুণ, এবং তোমার স্নিগ্ধকারিতায় তামাসিক গুণ বিরাজিত। তাই তোমায় মধুকর ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া গাহিল গুণ গুণ গুণ। তুমি রূপে ঈষল্লোহিতাভাসমন্বিত ধবলবরণা, রজোগুণ সম্পন্না। সুরভিবাসে মধুরতাময়ী তাই সত্ত্বগুণ বিভূষিতা। তুমি স্নিগ্ধ-

কারিণী, তুমি সম্মোহিনী অথচ মানিনী, কারণ ঈষৎ করসংস্পর্শে তুমি মলিনা হও, তাই তুমি অভিমানিনী, সুতরাং তমোগুণসম্পন্না। এমন ত্রিগুণাত্মিকা কুসুম-রাণীকে মালিনী বাদ রাখিল কেন? ইহাই এখন বিবেচ্য! চামেলি তমোগুণ সম্পন্না বিধায় সহজে অভিমানিনী এবং মরণশীল বলিয়া সহজেই বিবর্ণা হয়, তাই মালিনী তাহার নির্ব্বাচিত কুসুমের মধ্যে ইহাকে বাদ রাখিয়াছে। মধুকর চামেলি কুসুমে বসিতে না বসিতে চামেলি বিবর্ণা হইল। সুমিষ্ট সৌরভ লুপ্ত হইল। ভোলানাথ ভাবিল কত বিবেচনা করিয়া চামেলিকে মালিনী সাজিতে স্থান দেয় নাই।

মধুকর আবার গুণ গুণ রব তুলিয়া প্রস্ফুটিতা মল্লিকা কুসুম আশ্রয় করিল, চামেলি বিবর্ণা হইয়া বৃন্তচ্যুত হইয়া গেল। মধুকরের গুণ গুণ ঝঙ্কারের অর্থ ভোলানাথ বুঝিল। মধুকর বলিতেছিল "ধিক্ ধিক্ চামেলি! তোমার রূপের গরব ক্ষণস্থায়ী, যৌবনের জলতরঙ্গবৎ আপাত মুগ্ধকারী, যৌবন গত হইলে রূপের শিখা নির্ব্বাণ হয়, তখন যে তমসা সেই তমসা, অতএব তোমায় লইয়া কি করিব? তোমার সৌরভ গিয়াছে আমারও প্রয়োজন শেষ হইয়াছে।"

মল্লিকা অমলধবল শ্বেতাঙ্গী, তাই মল্লিকা সন্ধ্যাগায়ত্রীর সহিত তুলনীয়া এবং পবিত্রা। দলে দলে মধুকর আসিয়া শিশিরস্নাত মল্লিকা সমূহ আশ্রয় করিল ও সুমধুর মধুপানে উন্মত্ত হইয়া পরাগপিসঙ্গ দেহে গুণ গুণ রব তুলিয়া উড়িয়া গেল। ভোলানাথ শুনিল, মধুকর কহিয়া গেল, "মল্লিকে! তোমার হৃদয় মধুভরে ঢলঢল, যে মধুকর তোমার সুমধুর মধু আস্বাদন করিয়াছে সে আর ভুলিবে না। তুমি বাঙ্গালীর সুন্দরী যুবতী ও গুণবতী ললনার তুল্যা। তোমার মধু আস্বাদনে বঙ্গে জয়দেবের মত কবির জন্ম। তুমি বাঙ্গালীর আদরের ধন। তুমি বঙ্গীয় উদ্যানে প্রস্ফুটিত থাকিলে বাঙ্গালী চিরকালই সুকবি হইবে। ধন্য তোমার রূপগরিমা! ধন্য তোমার মধুরিমা! এই পূত মল্লিকা ছাড়িয়া, হে বঙ্গীয় যুবক, মাঝে মাঝে কেন রূপের ভ্রান্তিতে বিজাতির কুসুমে রত হও! মল্লিকার ন্যায় রূপে গুণে রমণী জগতে দুর্লভ! রূপের চটক আছে অথচ সহজে বিবর্ণা হয় না। কুকভরা মধু অথচ স্নিগ্ধ, উগ্রতা নাই। ভোলানাথের দৃষ্টি সহসা সরসীর সোপানচত্বরের পার্শ্বস্থ বংশমঞ্চে নিপতিত হইল। ভোলানাথ দেখিল বংশমঞ্চ-

সমাবৃত করত অপরাজিতালতা বায়ু সঞ্চালনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে ও অপরাজিতা প্রস্ফুটিতা হইয়া মঞ্চদেশ রূপমাধুরীতে সুশোভিত করিয়া রহিয়াছে। মরি মরি! অপরাজিতার কিবা নীলিমময় মাধুরি! ভোলানাথের মন নীলিমা রূপসাগরে নিমজ্জিত হইল।

ভোলানাথ উদ্ভিদের প্রাণ সঞ্চার অবগত ছিল। তাহাদের প্রতি স্পন্দন অনুভব করিতে পারিত। সে দিব্যচক্ষে দেখিল যেন বঙ্গীয় রমণী অপরাজিতায় রূপান্তরিত হইয়া যৌবনভরে প্রস্ফুটিতা হইয়া মঞ্চপৃষ্ঠ সুশোভিত করিয়া রহিয়াছে। মাল্যাকারে জগদম্বার কণ্ঠ বিভূষিত করিবার জন্যই যেন তাহার সৃষ্টি। নীলিমারূপে বঙ্গীয় যুবকের নয়ন মুগ্ধ করিবার জন্যই যেন মঞ্চপৃষ্ঠ সুশোভিত করিয়া অবস্থান করিতেছে। তাই মালিনী বাছিয়া বাছিয়া অপরাজিতায় তাহার সাজি সাজাইয়াছে। মরি মরি! কিবা স্নিগ্ধ নীলোজ্জ্বল তাহার রূপের মাধুরী! অপরাজিতা কেবলমাত্র বঙ্গীয় রমণীরই তুলনা। অপরাজিতা কোমলাঙ্গী সুকুমার হরিতপত্রে অঙ্গ আবরিত করিয়া মঞ্চদেশ ঘনাবৃত করিয়া রহিয়াছে। প্রভাত বায়ু সুমন্দ সঞ্চালনে কুসুমকোরক ফুটাইয়া দিয়াছে। মধুলোভে মধুকরদল ঝাঁকে ঝাঁকে গুণ গুণ রবে ফুলে ফুলে মধুসঞ্চয় করিতেছে। এখনি অপরাজিতা আতপতাপে মুদিতা হইবে, আর তাহার যৌবনভরা পূর্ব্বমধুর সৌরভ থাকিবে না। তুমি জগৎব্যাপি আকাশের নীলমাধুরী অঙ্গে মাখিয়া নীলাম্বরে শোভিত হইয়া উদারতার পরিচয় দিতেছ। আকাশ যেরূপ উদার অনন্ত তুমিও তেমনি উদার অনন্ত। অনন্তের রূপ অঙ্গে মাখিয়া তুমি অনন্ত শক্তি প্রকৃতির এত আদরের প্রিয় কুসুম। থাক থাক! অনন্ত শক্তির আদরের কুসুম হইয়া মহাশক্তির বক্ষসুশোভিনী হইয়া তাঁহারই বক্ষে চিরকাল অবস্থান কর। মায়ের অনন্ত নীলবরণে নিজ বরণ মিলাইয়া পবিত্র ভাবে চিরকাল প্রকৃতির বক্ষে অবস্থান কর। তুমিও প্রকৃতির নিয়মাধীন থাকিয়া কালে বিশীর্ণা হও বটে। কিন্তু নীলিমাবরণ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় না। তুমি পবিত্র কুসুম, তাই তুমি নীলবরণা বঙ্গীয় রমণীর রূপান্তর মাত্র। তাই তোমায় বাছিয়া লইয়া মালিনী সাজিটী ভরিয়াছে। তাই কবি গাহিয়াছেন "মরি কি অপরাজিতা নীলিমার মাধুরী।" কোমলতাগুণে ও নীলমাধুরিতে বঙ্গীয় রমণী চির অতুলনীয়া;

কেবল মাত্র তোমারই তুলনা। মধুকর সতত সংযত থাকিয়া তোমার মধুপান করে।

বঙ্গীয় কুসুমের মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া বঙ্গে এত বহু কবির জন্ম, এত সুললিত কবিতার ছড়াছড়ি। তাই বঙ্গদেশ কাব্যরসাপ্লুত। তাই বঙ্গে কবিতায় শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশিত, রমণীর রোদনে কবিতার উচ্ছ্বাস, আনন্দে কবিতার প্রবাহ। ইতিহাস কাব্যে প্রণীত; জ্যোতিষ কাব্যে রচিত; ধর্ম্মগ্রন্থ ছন্দোবন্ধে গ্রথিত; ধর্ম্মশাস্ত্র বা নীরস আইন পর্য্যন্ত কবিতায় লিখিত। বঙ্গে কেন, ভারতে সমস্তই কাব্যময়।

মালিনী কবি নহিলে ফুলের ব্যবসা কেন করিবে? ফুলের ব্যবসা করিয়া ফুল চিনিয়া, তাহাদের বাছিয়া লইয়াই পাঁচ ফুলের সাজিটী সাজাইয়াছে। আমি মালিনীর কাছে হার মানিলাম। কাব্যরসামোদে মালিনীকে শ্রেষ্ঠা মানিয়া লইলাম।

একটী করবীর বৃক্ষ ভরিয়া করবীর কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া বৃক্ষটীকে সুশোভিত করিয়া যেন হাসিতেছে। ইত্যবসরে একটী কৃষ্ণকায় ভ্রমর বেগে করবীর বৃক্ষ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া একটী কুসুম স্তবকে উপবিষ্ট হইল। ভ্রমর গাহিল গুন্ গুন্ গুন্। ভোলানাথ বুঝিল, ভ্রমর কহিতেছে—হে করবীর! তুমি গুণসম্পন্ন, তোমার সকলই গুণ। আবার গাহিল গুন্ গুন্ গুন্, অর্থাৎ তোমার গুণে প্রকৃতি বশ। তাই সাধক অঞ্জলি ভরিয়া তোমাকে মহামায়ার চরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে।

সরসীর সোপানচত্বরের পার্শ্বস্থিত একটি চম্পক বৃক্ষে চম্পককোরক সান্ধ্য বসন্তানিলসংস্পর্শে প্রস্ফুটিত হইতেছিল। তাহাদের সুদূরব্যাপি সুগন্ধে ভোলানাথের চিত্ত প্রশান্ত হইল, তাহার মন যেন তদানীন্তন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। উদ্যান চম্পক সৌরভে সুরভিত, রূপের প্রভায় উজ্জ্বলিত, যেন প্রাণ সঞ্চারে মুখরিত। তখন রজনী পূর্ণভাবে সমাগত হয় নাই। তখনও অস্তমিতপ্রায় রবির হেমাভ কিরণ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই, উচ্চ বৃক্ষশিরে পত্রে পত্রে সেই ক্ষীণ কিরণ তখনও বিদ্যমান। সান্ধ্যগগনে পাপিয়ার সপ্তগ্রামোত্থিত সুমধুর স্বর কোকিলের পঞ্চমস্বরে মিলিত হইয়া এক মনোহর

শ্রুতিসুখকর স্বরের জমাট বাঁধাইয়া দিয়াছে। যেন অনবরত স্বরস্রোত প্রবাহিত হইয়া জীবজন্তুগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যেন ভগবানের মহিমা প্রচার করিবার জন্যই এ সুমধুর স্বরের সংবর্দ্ধনা। চম্পক সৌরভে মধুকর-নিকর দিগ্‌দিগন্ত হইতে চম্পক বৃক্ষাভিমুখে প্রধাবিত হইয়া গুন্ গুন্ রবে চম্পক কুসুমের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ফিরিয়া ভোঁ ভোঁ শব্দে একবার কোরকসন্নিধানে, একবার প্রস্ফুটিত কুসুমগাত্র স্পর্শ করিয়া কুসুম সুরভি বাসে বিভোর হইয়া উন্মত্তবৎ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। হে চম্পক, বঙ্গীয় যুবক তোমার উজ্জ্বল পীত গৌরবর্ণে বিমুগ্ধ বটে, কিন্তু তোমার উগ্র-সুরভি বাসে তাহাদের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত। তাই বঙ্গীয় মধুকর নিকটে থাকিয়াও তোমাকে সহজে স্পর্শ করিতে পারে না। ফিরিয়া ঘুরিয়া গুন্ গুন্ ভোঁ ভোঁ শব্দে আবার প্রত্যাবৃত্ত হয়। দূর হইতে তোমার মধুবাসে আকৃষ্ট হইয়া নিকটে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসে বটে, কিন্তু আসিয়াই তোমার তীব্রগন্ধে আবার প্রত্যাবৃত্ত হয়। চম্পককুসুম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা রমণীর সদৃশ। রূপে পুরুষের মন বিমোহিত করে বটে, কিন্তু উগ্রতায় ও আত্মগরিমায় পুরুষসিংহের অদম্য মনকেও সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। রমণী যখন সুকুমার কুসুমের পবিত্রতা, কোমলতা ও সৌরভানুকরণে পুরুষের মন বিমোহিত করে তখন রমণী দেবী। কালিদাসের অতুলনীয় তুলিতে সেই রমণীরত্ন শকুন্তলা চিত্রিত, সেক্সপিয়ারের অপূর্ব্ব তুলিকায় ডেস্‌ডেমনা চিত্রিত। সীতা দময়ন্তী ও সাবিত্রীরূপ রমণীরত্নের গুণে বিজন অরণ্যও এক সময় সুখ নিকেতনে পর্য্যবসিত ছিল। কিন্তু এই রমণী যখন আবার তাহার রূপ ও গুণের গর্ব্বে উন্মত্তা হয়, তখন সে সুখের সংসার জ্বালাইয়া দিয়া, অশান্তির হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়া, গুণবান্ পুরুষকেও সয়তান করিয়া তোলে। জহরার ন্যায় রমণী সিরাজের ন্যায় সুচতুর নরশার্দ্দূলকেও বিনষ্ট করিতে সমর্থা হইয়াছিল। ক্লিওপেট্রার ন্যায় রমণী রাজ্যে বিদ্রোহানল জ্বালাইয়া দিয়া রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল। তাই বলি, রমণি, তোমার সুরভি বাসে হৃদয় মুগ্ধ করিও, কিন্তু নিকটে আসিও না। পুরুষপতঙ্গ তোমার রূপবহ্নিতে পুড়িয়া মরিবে। অয়ি চম্পক! বৈশাখে তুমি নারায়ণের বড় প্রিয়, তোমাকে নমস্কার। তুমিও মালিনীর নির্ব্বাচিত কুসুম। তুমি শিক্ষিতা, উগ্র বাসে গর্ব্বিতা, তুমি বাঙ্গালীর আদরের ধন।

এবার ভোলানাথের চমক ভাঙ্গিল; সে সবেগে সাজিটী লইয়া গিয়া প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবিগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া মালিনীর আদেশ প্রতিপালন করিল। পাঁচফুলের নাম বঙ্গীয় সংবাদ পত্র সমূহের স্তম্ভে প্রচারিত হইল। মালিনী আপন শ্রম সার্থক হইয়াছে জানিয়া প্রীত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়।

মহাগীত।

(হাফেজ হইতে)।

বেজেছে কি সুর হৃদয়-বীণায় প্রেমিকের হাতে পড়ি;
জীবন ফুরায়—তথাপি সে গীতে রয়েছে পরাণ ভরি!
কালি নিশীথেও ছিনু নির্ব্বাক্ বসি উপাসনা-কালে,
শুধু সেই গান মধু-গুঞ্জনে বাজিয়াছে তালে তালে!
গত যামিনীর সে তন্ময়তা রহিয়াছে হৃদি-মাঝে,—
এ মনোনিলয়ে সে মহাগীতের ধ্বনি অহরহ বাজে!

প্রেম-নিলয়।

(হাফেজ হইতে)।

এ হৃদয় তাঁর প্রেমের আবাস
এ আঁখি-মুকুরে প্রতিমা তাঁর;
পাই অযাচিত করুণা যখন
ইহ-পরকাল ভাবিনা আর।
নিবিড় প্রেমের ঠাঁই যে হৃদয়
মৃত্যুর মিছে ভ্রকুটি সার!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

"বিন্দু।"

(গল্প)

আকাশ ঘনঘটাময়। "বিন্দু বিন্দু" বারি বর্ষণ হইতেছিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইয়া বিশ্বসংসারকে করাল কালের মূর্ত্তিমান্ ছবি দেখাইয়া দিতেছিল। বোধ হইতেছিল যেন প্রকৃতি সংক্ষুব্ধ হইয়া এই জগৎকে একটা বিরাট্ আন্দোলনে আন্দোলিত করিবার জন্য সংহারকর্ত্তা শঙ্করের দক্ষিণ বাহুতে পরিণত হইতে চেষ্টা করিতেছিল।

তখন বরষা কাল। সজল জলদজাল আকাশকে বিশ্রামলাভের অবসর দিত না, প্রায় সকল সময়েই তাহাকে আপনার কৃষ্ণবর্ণ বিপুল অন্ধকারময় আবরণে আবৃত করিয়া রাখিত। এমনই গাঢ় সে অন্ধতামস আবরণ যে, তাহার দারুণ প্রভাবে প্রভাকরকর-উদ্ভাসিত দিবসকেও অমাবস্যার ভীম রজনী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এ হেন বরষার কোনও অমাবস্যার গভীর রজনীতে দুইটী বন্ধু রাজপুতনার যশল্মীর রাজ্যের অন্তর্গত মরুপ্রদেশের একটী সঙ্কীর্ণ রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া যেন একটা কিসের প্রতীক্ষা করিতেছিল। পথের চারিপার্শ্বে বিরাট্ অরণ্যাণী। একে বর্ষাকাল; প্রাবৃটের কৃষ্ণাঙ্গ জলদপটল গগনকে আবৃত করিয়া ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাতে আবার অমাবস্যার নিশীথিনী; তাহার উপর আবার বনপথ। ভীষণ বিটপশ্রেণী সঙ্কীর্ণ পথের দুই ধারে; যেন ভীমাকার দৈত্যগণ মাথা তুলিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে।

পথিক দুই জন নিস্তব্ধ। বোধ হয় যেন তাহারা কোনও একটা অভাবনীয় ব্যাপারের জন্য শ্বাস রোধ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। প্রকৃতি যেমন প্রলয় ঝড়ের পূর্ব্বে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, পথিকদ্বয়ও তদ্রূপ নিশ্চেষ্ট।

বরষার বারিধর "গুর্ গুর্" শব্দে চতুর্দ্দিক্ বিকম্পিত করিয়া বিরাট্ গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিল। কুলায়স্থিত পেচক চকিতে চমকিত হইয়া

ডাকিয়া উঠিল। ফেরুপাল আর্ত্তস্বরে বনরাজি প্রতিধ্বনিত করিয়া ফুকারিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পথিক কি জানি কেন হঠাৎ চমকিত হইল। তাহার সেই চমকিত ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রথম পথিকের বদনমণ্ডলে হাসির রেখা দিল। কিন্তু সে হাসি কি ভীষণ! বোধ হয় যেন প্রাণহীনের বিকট দন্ত বিকাশ মাত্র। সে হাসিতে যেন ভীষণ সঙ্কল্পের ভয়ানক প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত; তাহাতে হাসির সত্ত্বগুণ তিরোহিত, রজোগুণ কলুষিত—আর তমোগুণ পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত।

মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রথম পথিক বিপরীত দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তার পর বজ্রগম্ভীর স্বরে ক্ষণপূর্ব্বের পেচকের স্বরকেও উপহাস পূর্ব্বক কহিল—

"কি বন্ধু! তোমার সঙ্কল্প কি পরিবর্ত্তিত হইবে না? এইবার তোমায় শেষ জিজ্ঞাসা করি, তুমি তার আশা ত্যাগ করিবে কি না?"

দ্বিতীয় পথিক কাতরনেত্রে প্রথম পথিকের মুখপানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল—

"সে কি ভাই দুর্জ্জনশাল! আশা কি কেউ কখন ত্যাগ করিতে পারে? আশাতেই যে জগৎ চল্‌ছে।"

"অত কথা রেখে দাও, আশা ত্যাগ কর্ব্বে কি না বল? তার প্রণয়প্রার্থী দুইজনের এ যশল্মীর রাজ্যে স্থান হইবে না। হয় তুমি এই রাজ্য হতে এই দণ্ডে চলে যাও, নয় মর।"

এই বলিয়া দুর্জ্জনশাল তাহার বক্ষোমধ্য হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিল। বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল; বিদ্যুতের আলোকে দুর্জ্জনশালের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া দ্বিতীয় পথিক শিহরিয়া উঠিল ও ভীতি-বিহ্বল স্বরে বলিল—

"আচ্ছা ভাই, আমি চিরজীবনের মত চলে যাব! কিন্তু তুমি একবার তার সঙ্গে দেখা করিতে দাও।"

"না—না—তা হবে না। ওঃ! আমি স্পষ্টই বুঝেছি, পৃথিবীতে তোমার আর স্থান নাই।"

যেমনই কথা তেমনই সঙ্গে সঙ্গে দুর্জ্জনশালের হস্তস্থিত ছুরিকা নররক্তপানে লোলুপ হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল; ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোকে ছুরিকার

অগ্রভাগ ঝলসিয়া উঠিল। দ্বিতীয় পথিক আর্ত্তস্বরে প্রার্থনা করিল, "না ভাই, মের না; আমি এখনই চলে যাব।"

"না। আর তা হ'তে পারে না।"

সঙ্গে সঙ্গে ছুরিকার উগ্র ভয়ানক ভাব দ্বিতীয় পথিকের রক্তপানে প্রশমিত হইল। গগন বিকম্পিত করিয়া জলধর ডাকিয়া উঠিল। "বিন্দু বিন্দু" বারি বর্ষণও থামিয়া গেল।

দ্বিতীয় পথিক ব্যথিত নয়নে বিশ্রান্ত প্রকৃতির পানে ক্লান্তভাবে চাহিয়া রহিল। দেখিয়া দুর্জ্জনশাল অদ্ভুত বিকৃত মুখভঙ্গি পূর্ব্বক কহিল—

"কি বন্ধু? বড় বড় গাছকে না 'বিন্দু বিন্দু' বারিকে সাক্ষী মান্‌ছ? ওরা অচেতন পদার্থ, কেউ তোমার জন্য সাক্ষী দিতে যাচ্ছে না।"

দ্বিতীয় পথিক অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিল—"ভয় হয় ভাই! এই—এই 'বিন্দু বিন্দু' বারিই বুঝি—" আর কথা বাহির হইল না। মৃত্যু আপনার ক্রোড়ে দ্বিতীয় পথিকের অশান্ত আত্মাকে টানিয়া লইল। বারিবাহ বিপুলবেগে বারি বর্ষণ করিয়াই যেন পথিকের শ্রান্ত দেহকে শান্ত করিয়া দিল। আর দুর্জ্জনশাল সেই ভীমা নিশীথিনী ও ভীষণা রক্তকৃষ্ণময়ী প্রকৃতির মাঝে নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ।

(খ)

দুর্জ্জনশাল ও কিরণলাল পরস্পর বন্ধু। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুইজনেই যশ-ল্মীর রাজকর্ম্মচারী ভজনলালের একমাত্র দুহিতা যমুনা বাঈএর পাণিপ্রার্থী হয়। কিন্তু যমুনা দুর্জ্জন অপেক্ষা কিরণের পক্ষপাতিনী ছিলেন। তাই দুর্জ্জন তাহার প্রণয়পথের প্রতিদ্বন্দ্বী কণ্টকস্বরূপ বন্ধু কিরণলালকে অতি জঘন্য উপায়ে সংসার হইতে সরাইয়া দিল।

মানব অনেক সময় বুঝিতে না পারিয়া এমন অনেক কাজ করিয়া ফেলে, যে অবশেষে তাহার অনুশোচনায় আপন জীবনকে আপনিই মরুময় করিয়া তোলে। দুর্জ্জনশাল ক্ষণিক উত্তেজনায় বন্ধু কিরণলালের হত্যা-সাধন করিয়া যমুনার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক সুখী হইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরের অনির্দ্দেশ্য শাসনে অনুশোচনার তীব্র বিষ তাহার হৃদয়ে অহর্নিশি জ্বলিতেছিল।

তাহার মোটেই সুখ ছিল না। "বিন্দু বিন্দু" বারি বর্ষিত হইতে দেখিলে

মনে মনে ভাবিত.. ওই বুঝি 'বিন্দু' তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আসিতেছে। বড় বড় বৃক্ষ তাহার নয়নগোচর হইলে সততই তার মনোমাঝে উদিত হইত, যেন বৃক্ষ অব্যক্ত ভাষায় তাহার হীন কার্য্যের জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতেছে। ক্ষুদ্র বনপথে গমনকালে স্বতঃই কে যেন তাহাকে বলে যে, বাক্‌শক্তিহীন পথ নিশব্দে তাহার শোচনীয় পাপের ভার বহিয়া ক্ষয় হইয়া যাইতেছে।

যার মনে সতত কুচিন্তা তাঁহার সুখ কোথায়? কাজেই দুর্জ্জনও সুখী হইতে পারিল না। যদিও সে যমুনার পাণিগ্রহণে সমর্থ হইয়াছিল, তথাপি সে সুখী না হইয়া স্মৃতির তীব্র তাড়নে পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছিল। স্মৃতির মর্ম্মঘাতিনী তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় সে-আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না। স্মৃতি যেমন অনেক সময় সুখময়ীরূপে মানবের চোখের সম্মুখে সুখের ছবি ধরিয়া মরুময় জীবন সরস করিয়া তোলে, তেমনই আবার কখন কখন সুখময় জীবনকে দুঃখের আবর্ত্তে ফেলিয়া দেয়।

যমুনাও স্বামীর এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া নানারূপ দুশ্চিন্তায় আপনার জীবনকে দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছিল। যদিও সে নানা উপায়ে স্বামীকে সুখী করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু কখনও পূর্ণরূপে সুখী করিতে পারিত না। আর নিজের অপটুতায়, মানসিক দৈন্যে, আপনি গুমরিয়া কাঁদিয়া ফাটিয়া মরিত। তাহার অবস্থা দেখিয়া দুর্জ্জনের হৃদয়ের ব্যথা আরও দ্বিগুণতর হইয়া উঠিত, এবং মধ্যে মধ্যে সুখী হইতে ও যমুনাকে সুখিনী করিতে সঙ্কল্প করিত।

কিন্তু সুখ কোথায়? সুখ যে মনের মাঝে। বাহ্যিক ক্রিয়াতে সুখ হয় না। সুখের মধুর আস্বাদন লাভে অভিলাষী হইলে মনকে পবিত্র রাখিতে হয়। কুকর্ম্মে জটিল অন্তরমাঝে সুখ প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কাজেই দুর্জ্জনলাল সুখী হইতেও পারিল না এবং সুখী করিতেও পারিল না।

(গ)

দেখিতে দেখিতে একটী বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।

আবার বরষা কাল সমাগত। পুনরায় "বিন্দু বিন্দু" বৃষ্টি পড়িতেছে। জলধর মণ্ডলে আকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছে ও ভীষণ জীমূতগর্জ্জনে সমস্ত জগৎ কাঁপিয়া উঠিতেছে।

প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে দুর্জ্জনশালের হৃদয়গগনও চিন্তার কাল মেঘে আবৃত হইয়াছে। দুঃখের ঘনঘটায় তাহার অন্তস্তল মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে বিজলীর মত যমুনা-প্রেম তাহার হৃদয়ের অন্ধকারকে আরও ভীষণ করিয়া তুলিতেছে!

কিন্তু কে জানে কোথায় বসিয়া বিশ্বনিয়ন্তা কালচক্র বিঘূর্ণিত করিতেছেন। আবার অমাবস্যা আসিল। সেই প্রাবৃট্, সেই 'বিন্দু' 'বিন্দু' বারিপাত, সেই অমাবস্যা-নিশীথিণী, সেই দুর্জ্জনশাল! দুর্জ্জনশাল একটী প্রকোষ্ঠে উপবেশন পূর্ব্বক একখানি পুস্তিকাপাঠে মনোনিবেশ করিল। নিকটেই যমুনা গৃহকার্য্য করিতেছিল। কিন্তু দুর্জ্জন কিছুতেই অভিনিবিষ্ট হইতে পারিতেছিল না। কি যেন একটা বেদনা সতত তাহার অন্তরকে মথিত করিতেছিল। এইরূপ একটা ঘনঘটাময় রজনীতে সে তাহার বন্ধু কিরণলালের হত্যা সাধন করিয়াছিল না? তাহার প্রাণের ভিতরটা কম্পিত হইয়া উঠিল। তাহার কপোলদেশে স্বেদ বিন্দু নক্ষত্রের মত শোভা ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে "কড়্ কড়্" শব্দে গগন মণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া বজ্র ডাকিয়া উঠিল। কে যেন তাহার প্রাণের ভিতর হইতে বলিয়া দিতে লাগিল—"সে দিনও এইরূপ বাজ ডাকিয়া উঠিয়াছিল। সে দিনও এমনি অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ছিল।" ক্রমশঃ বৃষ্টির বেগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। গবাক্ষের ছিদ্র দিয়া সলিল প্রবাহ "বিন্দু বিন্দু" করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্জ্জনশালের প্রাণও অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার অধরপ্রান্তে একটা ভীষণ জ্বালামাখা বেদনা-পূর্ণ হাসির ক্ষীণ রেখা দেখা দিল। সেই হাসি দেখিয়া যমুনা শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"তুমি অমন করিয়া হাসিয়া উঠিলে যে?"

দুর্জ্জনশালের বদনমণ্ডল সহসা শবের ন্যায় পাণ্ডুর হইয়া গেল। সে মৃদু-গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—"এইরূপ একটী অমাবস্যার রাত্রিতে আমি কিরণকে হত্যা করিয়াছিলাম। কেন জান? তোমাকে পাব বলে। সে তখন এই 'বিন্দু' 'বিন্দু' বারিকে সাক্ষী মানিয়াছিল।"

যমুনা চমকিয়া উঠিল। কিন্তু দুর্জ্জনের প্রাণের বেদনা যেন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। সে প্রাণ ভরিয়া স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, আর মন যেন আপনা আপনি বলিয়া উঠিল "আঃ! বাঁচিলাম!"

(ঘ)

দুর্জ্জনশাল বাঁচিল ; কিন্তু যমুনা অগ্নিগর্ভ শমীর ন্যায় পলে পলে দগ্ধ হইতে লাগিল। সেই অমাবস্যার ভীষণ রজনীতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল, তাহা তাহাকে ক্রমে পাগল করিয়া তুলিল। সে স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে তাহার কথা বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিল। কিন্তু স্বামীর প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া তাহার জীবন সংশয় উপস্থিত হইল। যমুনা আর থাকিতে পারিল না। একদিন সহোদরার নিকট হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করিয়া, সে স্বর্গে চলিয়া গেল !

ক্রমে কথা রাজার কানে উঠিল। রাজা দুর্জ্জনশালকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

সে দিনও বর্ষার বারিধরমালা প্রভাকরের প্রভা ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছিল ; এবং মাঝে মাঝে "বিন্দু বিন্দু" বারি বর্ষিত হইতেছিল। এই দুর্দ্দিনে সেই দুর্য্যোগের ঘটনায় দুর্জ্জনের হৃদয়-গগন সমাবৃত ছিল। রাজা যখন দুর্জ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দুঃখভারাক্রান্ত দুর্জ্জন তখন অপরাধ অস্বীকার করিতে পারিল না।

দুর্জ্জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তখন বন্ধুর প্রাণভয়ে ভীত বিষাদমলিন মুখ খানি তাহার মনে পড়িয়া গেল ; আর মনে পড়িল—"আমার ভয় হয় এই বিন্দু—" তাইত "বিন্দু" আসিয়াই সাক্ষ্য দিল !

দুর্জ্জন হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিল। মরিবার সময় বলিল—"আঃ বাঁচিলাম !"

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

পিতৃনারায়ণের প্রতি।

জীবনের পূর্ব্বভাগে অরুণের রক্তিমা-রঞ্জিত
স্নেহের কিরণ-পাতে উজলিল হৃদয়-গগন;
বিলাস-মদিরা-তীব্র জীবনের প্রথম যৌবন,
মধ্যাহ্নের উগ্র জ্যোতিঃ, আজি পুনঃ করি অন্তর্হিত,
বাল্যের সে সরলতা, ক্রমে ক্রমে হ'ল প্রতিষ্ঠিত।
বিগত কুটিলালাপ, কোথা দূরে কিশোর স্বপন?
জীবন-রঙিন-নেশা নীলাকাশে কুটীর-স্থাপন?
সায়াহ্নে পশ্চিম রবি ঢলি বুঝি পশ্চিমে পতিত।
তখন মানসপটে দেখা দিল অতীতের জপ—
ওগো "পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাই পরমন্তপ।"
দূরে গেল যৌবনের চিরোদ্দাম বিলাসবাসনা;
হৃদে এল শৈশবের অনাবিল সরল কামনা।
তখন চিনিয়া নিল চিরারাধ্য প্রাণের সবিতা,
বুঝি "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।"

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

মহাকবি বাণভট্ট। *

(কাদম্বরীতে জন্মান্তরবাদ)

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥"

ইতিহাসের উপকারিতা।

আমরা কুলার্ণবাতন্ত্রে উদয়নাচার্য্যধৃত একটী বচনে দেখিতে পাই,—

"চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিরিতিহাসং পুরাতনম্।
সংকীর্ত্তয়েৎ সদা ভক্ত্যা দেব-ঋষি-স্বধাভুজাম্॥"

অনন্ত রত্নপ্রসূ হইয়াও ভারত জাতীয় ইতিহাসে বড়ই দরিদ্র। এ দরিদ্রতার কারণ রত্নাভাব নহে, রত্ন অন্বেষণের অভাব। আমরা ঘরের ছেলের অপেক্ষা পরের ছেলেকে চিনিতে বেশী চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিনা যে, যথার্থ জাতীয় ইতিহাস জাতীয় উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃষ্ট সোপান। যে জাতির জাতীয় ইতিহাসে তাহার "আত্মমর্য্যাদা" যতই প্রকট, সে জাতি নিশ্চয়ই ততই উন্নত।

আজ আমি কোন প্রাচীন সংস্কৃত মহাকবির জীবন বৃত্তান্ত হইতে এ বিষয়ে যথাসাধ্য গবেষণা করিতে চেষ্টা পাইব। মহাত্মা 'এডিসন্'ও বলিয়াছেন, কাব্য বুঝিতে হইলে কবিকেও চিনিতে হয়। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রও যথার্থই বলিয়াছেন—"কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে বটে; কিন্তু

---

* রংপুর উত্তরবঙ্গসাহিত্য সম্মিলনীর নবম অধিবেশনে দর্শন শাখায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত। (১৩২২, ২০শে চৈত্র)।

কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা কবির কীর্ত্তি, তাহা ত আমাদের হাতেই আছে, পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তিনি কি গুণে, কি প্রকারে এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন তাহাই বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অবস্থা প্রভৃতি জানিতে না পারিলে গ্রন্থের প্রকৃত বিশ্লেষণ অসম্ভব হইয়া উঠে।

গ্রন্থকারের বংশপরিচয়।

কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া (৬০৭ খৃঃ) ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন। মহাকবি বাণভট্ট তাঁহারই সভাপণ্ডিত ছিলেন, উক্ত মহারাজের জীবনীই বাণের "হর্ষচরিত" নামে সুপ্রসিদ্ধ। সুতরাং বাণভট্টেরও জন্ম ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহা নির্ব্বিবাদ। শোণ নদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী "প্রাতিকূট" গ্রাম বাণভট্টের জন্মস্থান। ইঁহার পুণ্যকীর্ত্তি পিতা 'চিত্রভানু,' রত্নগর্ভা মাতা রাজদেবী, পিতামহ 'অর্থপতি,' প্রপিতামহ 'পাশুপত,' এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহ "কুবের ভট্ট।" ইনি বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ইহা বাণভট্ট তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি কাদম্বরীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন। প্রবন্ধকলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সেই সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। সুনিপুণ গ্রন্থকার, মহর্ষি জাবালির আশ্রমবর্ণনচ্ছলে স্বকীয় চতুষ্পাঠী, সতীর্থ ও অধ্যাপকগণেরই বর্ণনা করিয়াছেন ইহাই অনুমিত হয়।

গ্রন্থাবলী।

"কাদম্বরী," "হর্ষচরিত," "চণ্ডী শতক," "পার্ব্বতী-পরিণয় রূপক," "মুকুট তাড়িত নাটক," ও "সর্ব্বস্ব চরিত" এই সকল গ্রন্থাবলী মধ্যে বাণের অক্ষয় কীর্ত্তি কাদম্বরী-কথা-কাব্যই তাঁহার সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। তিনি যদি আর কোন গ্রন্থ না লিখিয়া মাত্র কাদম্বরীই লিখিয়া যাইতেন তাহা হইলেও তিনি সংস্কৃত কাব্যাকাশের প্রোজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্ররূপে চির দেদীপ্যমান থাকিতেন। আমরা কাদম্বরী হইতে দার্শনিক, ঐতিহাসিক, নৈতিক ও সামাজিক তথ্যগুলির বিশ্লেষণে যথামতি যত্ন করিব; কারণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও ঐতিহ্য এই প্রমাণ পঞ্চকের মধ্যে ঐতিহাসিক প্রমাণও অন্যতম।

গ্রন্থোক্ত বিষয়ের সহিত গ্রন্থকারের অবস্থা সমন্বয়।

বাণভট্টের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার শিশুকালেই মাতৃবিয়োগের এবং যৌবনের প্রারম্ভেই পিতৃবিয়োগের উল্লেখ আছে। এই মাতা-পিতৃ-ব্যসন, তিনি কাদম্বরীর প্রারম্ভে, সূতিকারোগে শুকশিশুর মাতৃবিয়োগ ও কালান্তরূপী বৃদ্ধ শবর কর্তৃক পিতৃহত্যায় যেন স্পষ্টতঃ সূচিত করিয়াছেন। মহর্ষি জাবালির পুত্র, কৌমার ব্রহ্মচারী, স্বভাবসদয় হারীত মুনির অপ্রার্থিত শুকশিশুপালনব্যপদেশে যেন বাণভট্ট, নিজের কোন মহর্ষিপ্রতিম অধ্যাপকের নিকট আশ্রয়প্রাপ্তির কথা অতীব নিপুণতার সহিত প্রকটিত করিয়াছেন। হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ ভাব স্বভাবতঃই অতি করুণ ভাষায় প্রকাশ পায়, ইহা ভুক্তভোগী মাত্রই বুঝিতে পারেন।

দার্শনিকতত্ত্ব।

সাহিত্যে যা কিছু চাই তিনি স্বীয় গ্রন্থে একাধারে সে সকলেরই সমাবেশ করিয়াছেন। তিনি জন্মান্তরবাদটি নখদর্পণের ন্যায় দেখাইবার জন্যই যেন শুকনাশপুত্র বৈশম্পায়নকে পুণ্ডরীক ও শুকপক্ষিরূপে, চন্দ্রদেবকে চন্দ্রাপীড়রূপে, কপিঞ্জল ঋষিকে ইন্দ্রায়ুধ অশ্বরূপে, কমলাকে মাতঙ্গকুমারী রূপে, এবং চন্দ্রপত্নী রোহিণীকে তমালিকা রূপে পুনঃ পুনঃ ইহাদের বিভিন্ন জন্ম দেখাইয়াছেন, সর্ব্বোপরি আরও দেখাইয়াছেন—সর্ব্বদর্শনের অতি নিগূঢ় তত্ত্ব "জন্ম মৃত্যু রহস্য।"—কঠশ্রুতিতে দেখিতে পাই—

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাবর মন্যেঽনুসংযান্তি যথাকর্ম্ম যথা শ্রুতম্॥"

সর্ব্ব উপনিষদের সারসংকলন গীতায় তাই স্পষ্টতঃ দেখি—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ" ॥৮।৬॥ (শ্লোকগীতা॥)

বৈশম্পায়ন ও চন্দ্রাপীড়ের অঙ্গুষ্ঠমাত্র সূক্ষ্মদেহের চন্দ্রলোকে অবস্থিতি,—সম্পূর্ণ শ্রুতি-সম্মত। পুণ্ডরীক, মহাশ্বেতা-বিরহে অচ্ছোদতীরে মরিয়া জন্মান্তরে অমাত্যপ্রবর শুকনাশবিপ্র-পুত্র বৈশম্পায়ন রূপে পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিয়া পরম পণ্ডিত হইলেও, অচ্ছোদ তীরে পূর্ব্বজন্মাকাঙ্ক্ষিত ব্রহ্মচারিণী মহাশ্বেতা-

রূপানলে পতঙ্গবৎ পতিত হইয়া, যেরূপ শুকপক্ষিরূপ তির্য্যগ্‌জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা মৃত্যুকালীন মনোভাবেরই প্রাক্তন পূর্ণ অভিব্যক্তি।

"কো নাম পাকাভিমুখস্য জন্তো
দ্বারাণি দৈবস্য পিধাতুমিষ্টে।"

তবেই দেখুন, মৃত্যুকালের মনোভাবই যে জন্মান্তরে প্রারব্ধ কর্ম্মরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারে পরিণত হয়, এই দার্শনিক তত্ত্বটী কেমন স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইয়াছে। তাই মহাকবি "মাঘ"ও দর্শনের সুরে বলিয়াছেন—

"সতীব যোষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা
পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি॥"

আবার যোগবলে সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি জাবালি কর্তৃক শুকশিশুর বিভিন্ন জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনে পাতঞ্জল যোগ দর্শনের বিভূতি পাদের কি অপূর্ব্ব তত্ত্বই উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

সমাজ শাসনের ইঙ্গিত।

স্বর্গবাসী ঋষি শ্বেতকেতু ও কমলবনাধিষ্ঠাত্রী কমলার ব্যভিচারোৎপন্ন পুণ্ডরীক সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াও জন্মদোষে নীচপ্রকৃতি। ইহার বর্ণনে আর্য্যবিবাহ-বিধি লঙ্ঘনের কি বিষময় পরিণামই প্রকটিত হইয়াছে।

কন্যান্তঃপুর বর্ণনচ্ছলে তাৎকালিক ক্ষত্রিয় রাজকুমারীগণের যৌবন বিবাহ সমর্থন অপ্রাসঙ্গিক নহে। কুমার চন্দ্রাপীড়ের গুরুগৃহে বাস, সমাবর্ত্তন ও দিগ্বিজয় বর্ণনাদিতে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনেরই তত্তৎঅবস্থাবলি কৌশলে চিত্রিত হওয়াই স্বাভাবিক।

বিদ্যা-জাতি-বয়োবৃদ্ধ, ব্রাহ্মণমন্ত্রী শুকনাশের উপদেশরত্নাবলী, শুধু চন্দ্রাপীড়ের কেন, জগতের সর্ব্বশ্রেণীর জনগণেরই আদর্শনীতিরূপে, সর্ব্বথা বরণীয়। বিশেষতঃ যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকতা-যুক্ত জনগণের পক্ষে সেইগুলি অমোঘ মহৌষধ স্বরূপ।

হিন্দু স্ত্রীগণের সহমরণ প্রথা অথবা পতিগতৈকচিত্তা হইয়া চিরব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন এই শাস্ত্রীয় বিধিদ্বয়েরই সমর্থন এই গ্রন্থে উপলব্ধি হয়।

তখন দেশান্তরে জলপথে যাতায়াতের পরিচয়ে, হিন্দুপরিচালিত জলযানে দেশান্তর যাতায়াত দূষিত ছিল না বলিয়া অনুমিত হয়।

মহাশ্বেতার রূপবর্ণনচ্ছলে "শ্বেতদ্বীপবাসীদের ন্যায় শুভ্র" এই বর্ণনায় তৎকালের পাশ্চাত্য জাতির সহিত সাক্ষাৎ বা পরিচয় অনুমান করা অসঙ্গত নহে। বাণভট্ট তদীয় "হর্ষচরিতে" কালিদাসের প্রশংসাচ্ছলে লিখিয়াছেন—

"নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসান্দ্রাসু মঞ্জরিষ্বিব জায়তে॥"

ইহা হইতে কালিদাস যে বাণের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। "সোমদত্ত"-প্রণীত "কথাসরিৎ-সাগরের" একটী ক্ষুদ্র গল্প, এই অপূর্ব্ব আখ্যায়িকার আদর্শ।

এই গ্রন্থের নাম মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী। ইহাদের মধ্যে কেন কাদম্বরীর নামেই কবি স্বীয় গ্রন্থের নামকরণ করিলেন? ইহার উত্তরে ইহাই দেখা যায় যে, মহাশ্বেতার যোগাবলম্বন স্বার্থমূলক, পতির জীবনলাভই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য; তাই মহাশ্বেতা সকামসাধিকা। কিন্তু কাদম্বরীর কৌমার্য্যব্রতাবলম্বন সম্পূর্ণ পরার্থমূলক, সুহৃদ্-সহানুভূতির চরমাদর্শ, তাই কাদম্বরীতে কাদম্বরীরই শ্রেষ্ঠত্ব।

কাদম্বরী নামের ব্যুৎপত্তি।

কু (কুৎসিৎ) + অম্বরম্ (বস্ত্রং) যস্যাঃ, "কোঃ কদাদেশঃ"; অথবা কাদম্ববৎ (কলহংসবৎ) রৌতি (শব্দায়তে) ইতি; অথবা কাদম্বং (মদিরাং) রাতি (দদাতি) ইতি, কাদম্বরী।

গ্রন্থবিঘ্ন।

কাদম্বরীর পূর্ব্বার্দ্ধ রচনার পরেই বাণভট্ট মিশ্র পরলোক গমন করেন। তৎপুত্র ভূষণভট্ট (ভূষণ বাণ) পিতৃ-কীর্ত্তি-রক্ষাচ্ছলে অতি বিনয় ও নিপুণতার সহিত শেষার্দ্ধ সম্পূর্ণ করেন। ইহারই নাম পুত্র—

"পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণং॥"

কাদম্বরীতে ইতিহাস পুরাণ ও, অলঙ্কার শাস্ত্রের দোষগুণ ও অলঙ্কার প্রভৃতির এতাদৃশ যুগপৎ সমাবেশ আছে যে এমন আর কোন গ্রন্থে লিপিকুশলতার সহিত প্রকটিত হয় নাই।

অলঙ্কারাদির সমাবেশে কাদম্বরী অপার্থিব ললামভূতা হইয়াছে। প্রত্যেক অলঙ্কারের যুগপৎ বহুত্রপ্রয়োগেও দ্বিরুক্তি বা অত্যুক্তির লেশমাত্রও প্রকাশ পায় নাই। বরং ভাব-গাম্ভীর্য্যে এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে।

নিসর্গবর্ণন পাঠকালে যেন কিম্পুরুষ বর্ষ প্রভৃতি, পাঠকের নিকট জীবচ্ছবি বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইহার পৌরাণিক প্রসঙ্গাবলী বহুত্র যেন শাস্ত্রভ্রম জন্মাইয়া দেয়, ফলতঃ তখন ইহা যেন কোন শাস্ত্র গ্রন্থ বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে ইহা এক অদ্বিতীয় পার্থিব কল্পদ্রুম; এ কল্পতরুর ছায়াতলে ভাবের সাধক—সাহিত্যের উপাসক—তন্ময়-চিত্তে উপবিষ্ট হইলে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইবে। সাহিত্যের দ্বারা সমাজের যে নিরতিশয় হিতসাধন হইতে পারে, সাহিত্যিক, ইহাতে অন্বেষণ করিলে, নিঃসন্দেহে তাহা পাইতে পারিবেন।

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম বিদ্যালঙ্কার, কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

কৃত্তিবাস-স্মৃতিচিহ্ন-স্থাপন-সভায়

সভাপতির অভিভাষণ।

ব্যাস, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস—সামান্য প্রণিধান সহকারে দৃষ্টি করিলেই যেমন উপলব্ধ হয় যে, সংস্কৃত অনার্য্য কাব্যাবলীর অধিকাংশের উপরেই ব্যাস বাল্মীকির প্রভাব সুপরিস্ফুট, কেহ মহর্ষি ব্যাস-বিরচিত কবিতা-কুঞ্জের পথিক, কেহ বা রত্নাকরের নানারত্নসমুদ্ভাসিত কবিতা-মন্দিরের যাত্রী; এক-ভাবে না এক ভাবে যেমন ব্যাসবাল্মীকি এই উভয়ের একতরের কাব্যের আদর্শ, পরবর্ত্তী অনার্য্য কবিকুলের কাব্যাবলীর উপজীব্য, তদ্রূপ, বাঙ্গালায় মহাকবি কৃত্তিবাসের প্রভাব,—তাঁহার ভাষার প্রভাব, ভাবের প্রভাব, রচনাভঙ্গির প্রভাব, তৎপর-বর্ত্তী বঙ্গীয় কবিকুলের উপর সম্যক্‌রূপে সুপরিস্ফুট। কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী কবিবৃন্দ, যে সমুদয় সুরভিকুসুমে বীণাপাণির পাদপূজা করিয়াছেন, তাহার

অধিকাংশই তদীয় কবিতারূপী কল্পনাকানন হইতে সংগৃহীত। এই হিসাবে, সংস্কৃত কাব্যাবলীর সহিত ব্যাসবাল্মীকির যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার কাব্যাবলীর সহিত কৃত্তিবাসের সেই-ই সম্বন্ধ।

কালিদাস ও কৃত্তিবাস—আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের পর কালিদাস আবার সেই রামচরিতেই পুনর্ব্বর্ণন করিলেন। রামায়ণ শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য, কালিদাসের রঘুবংশও শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য। কালিদাসের আবির্ভাবের বহু-পূর্ব্ব হইতে রামায়ণ ভারতের সকল সমাজে কীর্ত্তিত, গীত, অধীত ও ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রুত হইত। তথাপি কালিদাসের রঘুবংশ ভারতের বিদ্বদ্বৃন্দ সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহার হেতু কি? একান্ত সুপরিচিত, সর্ব্বদা শ্রুত বৃত্তান্তের পুনঃ পঠন-পাঠনে এই যে আগ্রহ, এত যে আদর, তাহার একমাত্র কারণ কালিদাসের প্রাঞ্জল ভাষা ও ভাবের সুস্পষ্টতা। যদি ভাষা এত সুন্দরী এবং সম্পত্তি-শালিনী না হইত, তাহা হইলে, কেবল ভাবের তরঙ্গলীলায় বা কল্পনার ক্রীড়ায় কালিদাসের কাব্য সুধী-সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত না। কল্পনা বিষয়ে বাল্মীকির সহিত কালিদাসের তুলনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তবুও যে, কালিদাস এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার সুমধুর ভাষা। কালিদাস ব্যতীত আরও অনেকে রামায়ণকে উপজীব্য করিয়া কাব্যাদি বিরচন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ জন-সমাজে রঘুবংশাদির ন্যায় আদৃত হয় নাই। এই আদর-অনাদরের একমাত্র নিদান—ভাষাগত প্রাঞ্জলতার উৎকর্ষাপকর্ষ এবং ভাবের সুস্পষ্টাস্পষ্টতা। কালিদাস এমন মনোহারিণী ভাষায় তদীয় কাব্যাবলী নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, যে কোন সময়ে, যে কোন সমাজের লোকেই তাহা পাঠ করুক না কেন, বিমুগ্ধ হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ভাষাগত উৎকর্ষের জন্য যেমন কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা, বঙ্গীয় সাহিত্যেও তেমনই ভাষাগত উৎকর্ষের নিমিত্ত কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠতা। যে ভাষা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য উপনিবদ্ধ, অর্থাৎ কেবল শিক্ষিত বা কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত, ধনী নির্দ্ধন পণ্ডিত মূর্খ, ইহার একতরের উদ্দেশ্যে যে ভাষা গ্রথিত, তাহা কদাচ স্থায়ী বা সকলজনসম্মত উৎকৃষ্ট ভাষা হইতে পারে না। তাদৃশী ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থাদি কখনও কালজয়ী হইতে পারে না। তাহাকে প্রকৃত ভাষা বলা যায় না। তাদৃশী ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাদি কালের

তরঙ্গে দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া যায়। অল্পকাল মধ্যেই তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

যে ভাষা কোনও সম্প্রদায়বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, সকল সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে, সমাজ-দেহের প্রত্যেক শিরা ধমনী কৈশিকায় যে ভাষা প্রবেশ করিতে পারে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাষাকে "আমার" বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত অপণ্ডিত, সকলে সমানভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয়েন, তাহাই যথার্থ ভাষা। কালিদাস যেমন তাদৃশী সর্ব্বতোগামিনী সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তদীয় কাব্য, সকল সম্প্রদায়, সকল সময়ে সকলের প্রিয় পদার্থ, মহাকবি কৃত্তিবাসও তদীয় রামায়ণ কাব্য সেইরূপ সর্ব্বকালানুযায়িনী সর্ব্বতোগামিনী ও সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া, তদীয় রামায়ণ এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে সমুদয় কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল নহে, বা ভাবও সুস্পষ্ট নহে, সেই কাব্যাদির প্রভাব সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ভাষা ও ভাব উভয় সম্পদে সম্পন্ন বলিয়াই কৃত্তিবাসের রামায়ণ কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃতে কালিদাস এবং বঙ্গভাষায় কৃত্তিবাস এই দুই জন একই কারণে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

কৃত্তিবাস ও অন্যান্য রামায়ণকারগণ। কৃত্তিবাসের পর আরও অনেক কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি রামায়ণ রচনাপূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের দ্বারাই যে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা কঠিন।

এপর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে কৃত্তিবাসই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় রাম-চরিত নিবদ্ধ করেন। তাহার পরে আরও চতুর্দ্দশ ব্যক্তি রামায়ণী কথায় পুস্তক রচনা করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। কালে হয়ত, আরও অনেক নাম পাওয়া যাইবে। এ প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার ইতিহাসলেখক অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। এতদুভয়ের সমবেত চেষ্টার ফলেই আমরা আজ কৃত্তিবাসকে প্রকৃত ভাবে চিনিবার অবসর পাইয়াছি।

রামায়ণে যে প্রকার পাঠ-বৈষম্য ঘটিয়াছে, তাহাতে কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও দুর্লভ। তবুও যতটা পাওয়া যাইতেছে, তজ্জন্য, সাহিত্য-পরিষদ এবং দীনেশ বাবু বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কৃত্তিবাস এবং তৎপরবর্ত্তী অনেকে একই রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্য আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয়, সকল সমাজের আদরণীয় হইল, ইহার প্রকৃত কারণ কি?

কৃত্তিবাস মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণমাত্র অবলম্বন করিয়াই কাব্য লিখেন নাই। আমাদের দেশে কথকতায়, যাত্রায়, গোষ্ঠীবন্ধনে, সর্ব্বত্রই নানা ভাবে ও নানা আকারে রামবিষয়ক বৃত্তান্ত বহুকাল হইতে, কৃত্তিবাসের বহু পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ফলতঃ লোকমুখে স্ত্রীপুরুষ সমাজে রামসীতার কথা কীর্ত্তিত হইত, এখনও হইতেছে। কৃত্তিবাস তদীয় গ্রন্থরচনায় এই লোক-পরম্পরাগত গাথার অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেবল অনুবাদে মহর্ষি-চিত্রিত আলেখ্যাবলীর পুনশ্চিত্রণেই যদি কৃত্তিবাস রত থাকিতেন, তাহা হইলে, তদীয় কাব্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। তাঁহারা পরবর্ত্তী রামায়ণ-লেখকগণের অনেকের গ্রন্থে কৃত্তিবাসোচিত মৌলিকতা নাই। অধি-কাংশ স্থানেই অনুবাদ মাত্রে পর্য্যবসিত। কোনও রামায়ণকার স্বকীয় কল্প-নার চঞ্চল বৈদ্যুতী প্রভায় গ্রন্থের ক্বচিৎ ভাস্বর করিয়াছেন, সত্য, কিন্তু পর-ক্ষণেই আবার কল্পনামান্দ্য দোষে গ্রন্থের শ্রীহানি ঘটিয়াছে। এই স্থলে কবি-চন্দ্রের নাম উল্লেখ্য। কবিচন্দ্র স্বীয় রামায়ণে অঙ্গদ রায়বার নামে যে অধ্যায় লিখিয়াছিলেন, যাহা আজ কৃত্তিবাসের বলিয়া বঙ্গের অধিকাংশ গৃহে আদৃত, সেই অধ্যায়টি বাস্তবিকই অনেকটা কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই অনুপাতে কবি-চন্দ্রের গ্রন্থের অপরাংশ সমূহ গ্রহণ করা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত অনেকে যেমন দু'একটি মনোহারিণী কবিতা রচনা করিয়া থাকেন, প্রাচীন-কালেও করিতেন; যে কবিতাগুলি "উদ্ভট" আখ্যায় জন-সমাজে প্রচারিত, কিন্তু ঐ উদ্ভট-কর্ত্তাদের কোনও বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য কবিতা গ্রন্থ পাওয়া যায় না, চঞ্চল কল্পনার ক্ষণিক অনুগ্রহে মাত্র দু'চারিটি হৃদয়াকর্ষিণী কবি-তাতেই তাঁহাদের কবিত্ব পরিসমাপ্ত, তদ্রূপ অন্যান্য রামায়ণকারগণের অনে-কেরই দুই একটি, বা কাহারও দু'চারিটি রসভাবপূর্ণ অধ্যায় রচনার পরই

কবিত্বের পর্য্যবসান ঘটিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে কবিতায় উচ্ছলিত তরঙ্গলীলা একমাত্র কৃত্তিবাসেই পরিদৃষ্ট হয়।

কৃত্তিবাস জানিতেন যে, যাহাদের জন্য তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি চান, কতটুকু বা কতটা তাঁহাদের অভিলষিত? কিরূপ আলেখ্যে তাঁহাদের নয়ন রঞ্জন হইবে? কবিত্বের সার্থকতার এই মূলমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়া তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্ব্বদা এই মন্ত্রের স্মরণ পূর্ব্বক কাব্য লিখিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্য এত জমিয়াছে। এই জন্যই কেবল বাল্মী-কির আদর্শই তাঁহার উপজীব্য ছিল না, তিনি প্রয়োজনমত অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কালিকাপুরাণ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ প্রভৃতি হইতেও তিনি আদর্শ সঙ্কলন করিয়াছেন।

অনেক কাব্য কবির সমসাময়িক সমাজের রুচি এবং ছায়ার অনুসারে নির্ম্মিত হওয়ায়, সেই নিয়মিত সমাজে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই কাব্য আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তী ও পরিবর্ত্তিত সমাজে তাহার আদর ক্রমেই কমিয়া যায়। যে কবির কাব্য, যত অধিক পরিমাণে এইরূপ সাময়িক ভাবে পরিপূর্ণ সে কবির কাব্য, ততই অল্পকালস্থায়ী। অন্যান্য অনুবাদকগণের রামায়ণ গ্রন্থের অপ্রসিদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহাদের রামায়ণের যে যে অধ্যায়গুলি এই প্রকার কোন বিশেষভাবে লিখিত নহে, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে, সকল সময়ের অনুগত করিয়া লিখিত. সেই সেই অধ্যায়গুলির মর্য্যাদা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দৃষ্টান্তরূপে কবিচন্দ্রের "অঙ্গদরায়বার" ও রঘুনন্দন গোস্বামীর "রামরাবণের" অশোকবনবর্ণন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সরল ভাষা এবং সুস্পষ্ট ভাব,—এই দুই দুর্লভ সম্পদে কৃত্তিবাসের কাব্য বঙ্গসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতি সরল কথায়, সকলের বোধগম্য ভাষায়, তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব অতি স্পষ্টরূপে সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেন। ভাষার দীনতায় বা ভাবের জড়তায় তাঁহার কাব্য কুত্রাপি দুষ্ট হয় নাই। তিনি যখন যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা রাখেন নাই। যে কবি, যত অধিক পরিমাণে প্রাঞ্জলভাষায় মনের ভাবরাশি, তদীয় সমাজের সম্মুখে অতি সুস্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরিতে পারিবেন, সেই কবি তত অধিক আদৃত হইবেন।

কৃত্তিবাস সেইটি অতি উত্তমরূপে পারিতেন বলিয়াই, তাঁহার "রামায়ণ" অপরাপর "রামায়ণ" অপেক্ষা ভাবুক সমাজে, অথবা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সমাজেই এত প্রিয় হইয়াছে।

দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে মানব দেবতা হয়, আবার এইগুলির অভাবে মানব দানব হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস এই মহানীয় গুণাবলীর এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন. যে, পাঠকালে, হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। মহাকবি ভবভূতি যেমন তাঁহার উত্তর চরিতের নিরবদ্য ও নয়নরঞ্জন চিত্রগুলির আদর্শ কালিদাসের কাব্যাবলী হইতে গ্রহণ করিয়া, পরে, সেই আদর্শের উপর নৈপুণ্য সহকারে বর্ণসংযোগ করিয়া আনন্দময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে মূর্ত্তির গরিমায় সংস্কৃত সাহিত্য গৌরবিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসও সেইরূপ মহর্ষিকৃত আদর্শের উপর সতর্ক হস্তে বর্ণসংযোগপূর্ব্বক, তৎ তৎ চিত্রাবলী বঙ্গীয় সমাজের অনুগত ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, অলঙ্কারের গুরু ভারে বা ভাষার আড়ম্বরে তদীয় কবিতাসুন্দরী ক্লিষ্ট হন নাই। তাঁহার কবিতা সর্ব্বত্র একভাবে ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় তর তর করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে কবিতার প্রবাহ দুষ্ট হয় নাই, বা ভাবের জড়তায় সে কবিতার অমর্য্যাদা ঘটে নাই। অন্যান্য কবি অপেক্ষা তদীয় প্রাধান্যের এইটিই মুখ্য কারণ। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতার সহিত তাঁহার আশ্চর্য্যচিত্রনৈপুণ্যের সম্মিলনে তদীয় কাব্য ত্রিবেণীসঙ্গমের ন্যায় পবিত্র ও সর্ব্বজনসেব্য হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে প্রক্ষেপ—কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার প্রায় এক শত বৎসর পরে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। চৈতন্যের আবির্ভাবের এবং তদীয় প্রেম-বন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হস্তলিখিত কোন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুস্তক এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যদি কখনও পাওয়া যায়, তবে তখন কৃত্তিবাসের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির সমাধানের উপায় অনেকটা সহজ হইবে। চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বঙ্গদেশে যে ভক্তির স্রোত, প্রেমের "বাণ" বহিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালের রামায়ণ সমূহে তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যে সময়ে যে ভাব দেশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দেশটাকে বিভোর করিয়া ফেলে, সেই সময়ের জাতীয় সাহিত্যাদিতে

ও সেই ভাবের প্রভাব প্রবিষ্ট হইয়া, তাবৎ সাহিত্যকে 'তদ্ভাবভাবিত' করিয়া তোলে। তাই পরবর্ত্তী কালের কৃত্তিবাসে আমরা কি বীর, কি করুণ, সকল রসেই নদিয়ার ভক্তির তরঙ্গের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। লিপিকারগণ, সুবিধা পাইলেই রামের স্থলে শ্যাম করিয়াছেন। পরিবর্ত্তিত কৃত্তিবাসের অনেক অনাবশ্যক স্থলে আতর্কিত বৈষ্ণবী দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত বীরবাহু, পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব লিপিকারগণের কৃপায়, দীনাতিদীন বৈষ্ণব সেবক-গণের ন্যায়, করযুগল জুড়িয়া ধরণীতে লুটায়। তুলসীতলার মৃত্তিকায় অঙ্গরাগ করিয়া বৈষ্ণব যেমন "শ্রীবাসের আঙ্গিনায়" মহাপ্রভুর ভক্তগণকে প্রণাম করেন, সেইরূপ রাক্ষসগণও কপিগণকে গললগ্নবাসে প্রণাম করে। এইরূপ অনেক স্থলেই বৈষ্ণবীয় কোমলতার ও দীনতার চরম দেখিতে পাই। এ সমস্তই চৈতন্যের পূর্ণ প্রকটের পর, কৃত্তিবাসে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সংক্রামক রোগের পরিচয় আমরা অন্যত্রও দেখিতে পাই। অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের দুই একটি স্থলের ঈষৎ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক, কোথাও বা প্রমাণ সূত্রটিকে বদলাইয়া, সমগ্র গ্রন্থখানিকে "হিন্দু" করিয়া তোলা হইয়াছে। কৃত্তিবাসে পাঠবৈষম্যের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। বহুকাল পূর্ব্বের হস্তলিখিত যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের ত মিল নাই-ই, এমন কি ১৮০৩ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের দ্বারা প্রথম যে "কৃত্তিবাস" মুদ্রিত হয়, তাহার সহিতও বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে আদৌ মিল নাই। মিশনারিদের পুস্তকে যেখানে আছে।

"পাকল চক্ষে রামেরে পানে চাহিলেক বালি।
দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি॥"

সেই স্থানে—পরবর্ত্তী কালের সংশোধিত বটতলার সংস্করণে আছে।—

রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি।
দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি॥

পরবর্ত্তী কালে ভাষার পরিমার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার আদিকবি কৃত্তিবাসও "পরিমার্জ্জিত" হইয়াছেন! কবির বাক্য পরিস্কৃত করিতে যাইয়া, সংশোধকগণ আবর্জ্জনারাশির দ্বারা কৃত্তিবাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন! এই ব্যাপারের মূলে, আর একটি সত্যও নিহিত আছে। আমাদের দেশে, যখন

যে কোনও নূতন জিনিষের আবির্ভাব হইয়াছে, আমরা তাহাকে ধীরে ধীরে পুরাতনের সহিত মিশাইয়া নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করিয়া "আপন" করিয়া লইয়াছি। আমাদের এই adaptability আছে বলিয়াই আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সাহিত্য এখনও টিকিয়া আছে। নবীন নানাবিধ ভঙ্গিরাগবিভূষিতা, শ্রুতিমোহিনী বঙ্গভাষার যেমন আবির্ভাব হইল, অমনি আমরা আমাদের প্রাচীন, দুর্ব্বোধ্য শব্দসঙ্কুল ভাষাকে তাহার অনুগত করিয়া লইলাম, তাই আমরা প্রাচীন।

"অমিয় সায়ারে শিনান করিতে সকলি গরল ভেল" ইহার স্থলে "অমিয় সাগরে শিনান করিতে সকলি গরল হলো" করিয়া ফেলিলাম। প্রতিমার মূল পঞ্জরের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করিলাম না বটে, কিন্তু একটু নূতন ভঙ্গিতে বর্ণযোজনা করিয়া, প্রাচীনাকে নবীনা করিয়া তুলিলাম। প্রাচীনার অঙ্গহানি ঘটিল। এইরূপে মূল কৃত্তিবাসের অর্দ্ধসংস্কৃত, অর্দ্ধ হিন্দি অনেক শব্দ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে ক্রমে বর্ত্তমান বাঙ্গালায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাই প্রাচীন কৃত্তিবাসের "মুঞি" "ভিলন্ত" "কর‍্যা" "থুয়্যা" "পাকল" প্রভৃতি অধুনা অপ্রচলিত শত শত শব্দের পরিত্যাগ সাধিত হইল। ইহা কালের নিরঙ্কুশ বিধান। ইহার উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব তত অধিক নাই। যাহা গ্রাহ্য, কাল তাহার গ্রহণ করিবে। যাহা বর্জ্জনীয়, কাল তাহার বর্জ্জন করিবে।

ভক্তি এবং বৈষ্ণব—এই দুই সম্প্রদায়ের লিপিকারগণের কল্যাণে কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে যেমন শাক্ত প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, তেমনই বৈষ্ণব-প্রভাবও পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া, অন্যান্য পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতি হইতে অনেক মনোরম অংশও লিপিকারগণ বাছিয়া আনিয়া কৃত্তিবাসে জুড়িয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেক নূতন কবিতার প্রণয়ন করিয়া কৃত্তিবাসের গ্রন্থে পূরিয়া দিয়া, স্ব স্ব আত্মাভিমানের পূজা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কৃত্তিবাস হইতে শত শত স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, ঐতিহাসিকের সে কার্য্য হইতে আমি বিরত হওয়াই সঙ্গত মনে করি।

কৃত্তিবাসের কল্পনা তাহার গন্তব্য পথ—রামায়ণী কথার আশ্রয়ে কালিদাস ভবভূতি রঘুবংশ উত্তরচরিত প্রভৃতির রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে স্থানে

যেরূপ প্রয়োজন, তাঁহারা নূতন মূর্ত্তিও গঠন করিয়াছেন। কবিরা কল্পনার বৈদ্যুতিক শক্তিতে শক্তিমান্। সেই সতত চঞ্চলা শক্তি কদাচ কোন নির্দ্দিষ্ট পথে, কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট রেখা বাহিয়া চলিতে পারে না, জানেও না। তাই কবিকৃত সৃষ্টিতে, অনেক স্থলে মূল আদর্শেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ তাই মহর্ষিক্ষুণ্ণপথ কল্পনার দৌত্যে অন্নবিস্তর ছাড়িয়া অন্য পথেও গিয়াছেন। কৃত্তিবাসও সেইরূপ অনেক স্বকল্পিত আলেখ্যের অঙ্কনপূর্ব্বক, তদীয় গ্রন্থ সুচারুতর করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। বীরবাহু তরণীসেন প্রভৃতির সৃষ্টি তাঁহার আত্মকল্পনার উপর চরম উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছে। কবিগণ কাহারও অঙ্গুলিসঙ্কেতে চলেন না। কল্পনা কাহারও দাসীত্ব করিতে জানে না। কল্পনা কখনও কবিকে মেঘের উপর লইয়া গিয়া সৌদামিনীর বিলাসচঞ্চলা মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, কখনও আবার তুষারমণ্ডিত কমলের কেশরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া কবিকে কত নিভৃত সৌন্দর্য্য দেখায়। উন্মাদিনী চঞ্চলার ন্যায় কবির উন্মাদিনী কল্পনা কাহারও অঙ্গুলিসঙ্কেতে পরিচালিত বা ভ্রূকম্পনে বিকম্পিত হয় না। সে আপনার ভাবেই আপনি বিভোর হইয়া ছুটে, পরের ভাবে ভুলে না। কৃত্তিবাসের স্বৈরচারিনী কল্পনা কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই। কোথাও প্রাচীন পথে, কোথাও বা নূতন পথে যেখানে যেমন ইচ্ছা, সে কল্পনা চলিয়া গিয়াছে। তরণীসেন বীরবাহু প্রভৃতির সৃষ্টি এই নূতন পথে যাত্রারই ফল।

কবির পরিচয়।—আনুমানিক ১৩৫৩ শক ১৪৩২ খৃষ্ট অব্দের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের প্রতিগৃহে যে দিন বীণাপাণির চরণকমল অর্চ্চিত হইতেছিল, "সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ" বলিয়া যেদিন ভক্তি-গদ্গদকণ্ঠে স্তব করিতে করিতে হিন্দু তাহার চির-প্রার্থিত দেবতার চরণে মস্তক স্থাপন করিতেছিল, সেই শুভক্ষণেই যাঁহার জন্ম, তাঁহার জীবন যে সেই বাগ্‌দেবতার অনুগ্রহে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবে তাহাতে আর কথা কি?

৭৩২ খৃষ্ট অব্দে আদিশূর কনোজ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে এ দেশে আনয়ন করেন, তাঁহাদের অন্যতম ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে সপ্তদশ পুরুষ

অধস্তন নরসিংহ ওঝা বেদানুজ রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই বেদানুজ সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের স্বর্ণগ্রামের রাজা ছিলেন। আন্দাজ ১২৪৮ অব্দে এই নরসিংহ অরাজক স্বর্ণগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে বাস করিবার সঙ্কল্পে ফুলিয়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ফুলিয়ার তখন বড় স্পর্দ্ধার দিন। কৃত্তিবাস নিজেই স্বীয় বংশ পরিচয়ের সময়ে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে এখানে "মালঞ্চ" ছিল নানাবিধ ফুলের বাগান ছিল, তাই ইহার নাম হয়—"ফুলিয়া"। এই ফুলিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বীচিমালিনী ভাগীরথী রজতধারায় প্রবাহিত ছিলেন। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্যের ইহা লীলানিকেতন ছিল। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ নরসিংহ তাঁহার তদানীন্তন পদোচিত বিভবাদির সহিত এই মনোহর স্থানে আসিয়া একেবারে জুড়িয়া বসিলেন। কৃত্তিবাসের ভাষায়—

"ফুলিয়া চাপিয়া হইল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥"

ফুলিয়া "চাপিয়া" তাঁহার বসতি হইল। এই নরসিংহের পরমদয়ালু পুত্র গর্ব্বেশ্বর কৃত্তিবাসের প্রপিতামহ। গর্ব্বেশ্বরের পুত্র মুরারি ওঝা, কৃত্তি-বাসের পিতামহ এক অতি প্রধান কবি ছিলেন। তাঁহার কোন গ্রন্থাদির পরিচয় পাই না সত্য, কিন্তু কবি কৃত্তিবাস স্বয়ং তাঁহাকে ব্যাস মার্কণ্ডেয়াদির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

এই মুরারি ওঝার পৌত্র কৃত্তিবাসের নিজের উক্তিতেই দেখিতে পাই, বাল্যে প্রথমতঃ চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাভ্যাস করেন। এই চতুষ্পাঠীর শিক্ষাই তদীয় সংস্কৃত রামায়ণ পাঠের সোপান। পাঠ সমাপ্তির পর, তদানীন্তন প্রথা অনুসারে তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় আত্ম-পরিচয়ার্থ উপস্থিত হন। রাজা তাঁহার গুণ-গ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন। "তথাস্তু" বলিয়া কৃত্তিবাস যখন সগর্ব্বে বাহির হইলেন, তখন সকলে "ধন্য ধন্য" বলিয়া কবির অভ্যর্থনা করিলেন।

"সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।
মুনিমধ্যে বাখানি' বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী"

বলিয়া সহস্র মুখে কৃত্তিবাসের প্রশস্তি সঙ্গীত উচ্চারিত হইল। কৃত্তিবাস

স্বয়ং এই প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছিলেন, আত্মবংশের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি যে কত বড় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাহার পরিচয় আমি আর বিশেষ কি বলিব। এখনও "ফুলিয়ার মুখটি" বলিয়া আমরা তাঁহারই বংশের স্পর্দ্ধা করি। রাঢ়ীয় শ্রেণীর প্রধান এবং মুখ্য বংশ "ফুলিয়ার মুখটি"—কৃত্তিবাসেরই অনুস্মৃতি মাত্র।

মাহেন্দ্রক্ষণে রাজা কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার অরুণ-রাগ-রঞ্জিতা ঊষার প্রথম আলোকচ্ছটা কৃত্তিবাসের মস্তকে প্রথম স্বর্ণকিরীট পরাইয়া দিয়াছিল,—বঙ্গভূমি, বঙ্গভাষা ও সেই সঙ্গে বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইয়াছে। পল্লী-প্রান্তরের স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ায়, জন-পদ-বধূর গোষ্ঠীবন্ধনে, বর্ষীয়সী ললনাদিগের বিশ্রামকক্ষে, কৃত্তিবাসের বিরচিত গাথা গীত ও ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রুত হইতেছে। ভাষায় যাহার সম্যক্ অধিকার নাই, সেই প্রাকৃত ব্যক্তিও প্রেম ভরে রামায়ণ গান করিয়া আত্মহারা হইতেছে, আর সেই সঙ্গে, নিরক্ষর সরল কৃষক সাশ্রুনয়নে ও তন্ময়হৃদয়ে সে গান শুনিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতেছে। এখনও একাদশীর অপরাহ্নে ধূসরবসনা বিধবারা সমবেৎ হইয়া, কোন ললিতকণ্ঠ বালকের দ্বারা রামায়ণ পড়াইয়া শুনিতেছেন, তাঁহা-দের উপবাস-ক্লিষ্ট হৃদয়ের ভক্তির রস উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছে। মনোহর কল্পনা, মধুরভাব, অনুপম সৃষ্টিকৌশলে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্রূপে পরিগণিত। কৃত্তিবাসের পর, আজ পর্য্যন্ত যত ব্যক্তি বঙ্গ-বাণীর পদ পূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই পূজার উপকরণ—ফুল, ফল, পল্লব,—কৃত্তিবাসের ঐ রামায়ণরূপী কল্পকানন হইতে রচয়িত ও সংগৃহীত কৃত্তিবাস ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর পাঁচশত বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে, বটে কিন্তু আজও প্রতিক্ষণে তাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে, বিপণির পণ্য-কুটীরে, চাষার আশার কৃষিক্ষেত্রে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইতেছে। আজ আর

"দক্ষিণে পশ্চিমে যা'র গঙ্গা তরঙ্গিণী"

সে "ফুলিয়া" নাই, সে ফুলিয়ায়" কৃত্তিবাসের সেই "চাপিয়া বসতি"র চিহ্নও নাই, কিন্তু সেই "ফুলিয়া পণ্ডিতের" মোহন বাঁশরীর ঝঙ্কার এখনও বাঙ্গালীর "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিতেছে, বাঙ্গালীকে উন্মত্ত করিয়া, বিভোর করিয়া রাখিয়াছে।

কৃত্তিবাসের এই সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধির অপর কতিপয় কারণও পরিদৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা বড়ই কোমল, বড়ই উর্ব্বর। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, ভীষ্ম, দধীচি, শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, ঔশীনরী প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেরই চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, নয়নে ভক্তির অশ্রু, ভারত-বাসীরা তাহাকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করে, প্রাণ দিয়া পূজা করে। কৃত্তিবাস এ রহস্য বুঝিতেন। তিনি আরও বুঝিতেন যে, নিশীথে নিস্তব্ধ রজনীর সৌম্য-মূর্ত্তি যাহার চিত্তকে অভিভূত, বা অনুভূতির বিমলকরধৌত করিতে না পারে, সে কদাচ ঐ নৈশ নীরবতার মাধুর্য্য অপরকে বুঝাইতে পারে না; সায়ংকালের শ্যামায়মানা বনভূমির প্রাঞ্জল মূর্ত্তি যাহার প্রাণে আকুলতা জন্মাইতে অসমর্থ, সে কখনও সান্ধ্য-সুষমার পবিত্র আলেখ্য অঙ্কন করিতে পারে না। সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই। সমস্ত বিষয়েই মগ্ন হওয়া চাই, প্রাণ অকৃপণ-ভাবে ঢালিয়া দেওয়া চাই, অন্যথা সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। কৃত্তিবাস অকৃপণ-ভাবে, আত্মপ্রাণ কবিতাদেবীর পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে আর কিছুই ছিল না, সমস্তই ঐ চরণে অঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাই তদীয় কবিতার কুত্রাপি কোনরূপ বাধা দেখিতে পাই না। সর্ব্বত্রই সমান এবং অপ্রতিহত গতি। অসম্ভব হইলেও মনে হয় যেন, এক সময়ে, এক স্থানে বসিয়া, অন্য-চিন্তা-বিযুক্ত হইয়া, মহাকবি, তাঁহার সাধের রামায়ণ গান গাহিয়া-ছেন। তিনি নিজে সে গানে মজিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার শ্রোতৃবর্গও মজিয়াছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে, আচন্দ্র-দিবাকর করিবেও।

তুমি যখন অভ্রভেদী, শুভ্রতুষারশীর্ষ, হিমাচলের পাদদেশে বসিবে, বিধাতার কৃপায়, তখন যদি তোমার হৃদয়ে, কোন প্রশান্ত ছবির ছায়াপাত হয়, কোন বিরাট্ শক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়, তবেই তুমি ঐ বিরাট্ হিমাচলের প্রশান্ত ভাবের, প্রশান্ত মূর্ত্তির কিয়দংশ হয়ত তোমার কল্পনা-দর্পণের সাহায্যে অন্যকে প্রদর্শন করিতে পার। অন্যথা, তোমার সাধ্য কি যে তুমি হিমাচলের ঐ গম্ভীর-মাধুর্য্যের বর্ণন করিবে। তুমি যে স্থানে, যে সময়ে, যে অবস্থায় বর্ত্তমান, যদি সেই স্থানের, সেই সময়ের, সেই অবস্থার সহিত, নিজকে মিশাইতে না পার, "তদ্ভাব-ভাবিত" করিতে না পার, তবে কদাচ, তদ্দেশীয়

ও তৎকালীন ভাবের স্ফুরণ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তোমার দ্বারা তদ্দেশবাসিগণের হৃদয় কদাচ বিমোহিত হইতে পারে না। দীপক-রাগের সময়, তুমি বেহাগ পূরবীতে আলাপ করিলে, তাহা কখনও জমিতে পারে না। সে আলাপে শ্রুতির সুখ হয় না, বরং পীড়াই জন্মে। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীরা কি চায়, কি ভালবাসে, এ তত্ত্ব মহাকবি কৃত্তিবাস বুঝিতেন। এদেশের লোকের হৃদয় কি উপাদানে গঠিত, কোন্ উপকরণ তাহাতে অধিক, তাহা কৃত্তিবাস জানিতেন, তাই তাঁহার দেশবাসিগণের হৃদয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, তিনি তদীয় কল্পনার মোহন বীণায় ঝঙ্কার করিয়াছিলেন। তাই সে ঝঙ্কার বসন্তের পিকঝঙ্কারের ন্যায় বঙ্গবাসীদিগকে বিমুগ্ধ, একেবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই হিসাবেও সংস্কৃতে কালিদাস ও বাঙ্গালায় কৃত্তিবাস একই মন্ত্রে দীক্ষিত, একই পথের যাত্রী। তোমার পাঠকগণ কি চান, কতটুকু চান্, তোমার বীণার কোন্ তার স্পর্শ করিলে তাহার ধ্বনি তোমার পাঠকের হৃদয়ে অনুরণিত হইবে, তাহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে,—এ জ্ঞান যদি তোমার না থাকে, তবে তুমি যত বড় শক্তিশালী লেখকই হও না কেন, যত বড় কাব্যবিদ্যাবিশারদই হও না কেন, তোমার লেখায় বা তোমার অঙ্কিত আলেখ্যে তোমার সামাজিক বর্গের বা তোমার দর্শকবৃন্দের পরিতৃপ্তি হইবে না। তোমার সে লেখায় বা সে চিত্রে, ত্বদীয় দেশবাসী সহৃদয়বর্গের হৃদয় আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইবে না। যে সমুদয় লেখকের এই জ্ঞান আছে, তাঁহাদের লেখাই কালজয়ী হয়, থাকিয়া যায়; আর যাহাদের এই জ্ঞান নাই, তাহাদের লেখা ছিন্ন তুষারের ন্যায় অতি অল্পকাল মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। আর্ষ রামায়ণ অবলম্বন পূর্ব্বক অন্য অনেক কবি বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণ তন্মধ্যে যে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রায় পাঁচশত বৎসরেরও অধিক কাল সমানভাবে বা উত্তরোত্তর ক্রমেই অধিকতরভাবে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, ইতর ভদ্র সকল সমাজেই পূজিত হইতেছে, ইহার কারণ হইল, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান। কৃত্তিবাসের ঐ জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে ছিল। যে দেশে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই দেশের অধিবাসীরা কি ভালবাসে, কি চায়, তাহা তিনি জানিতেন এবং তিনিও তাহাই চাহিতেন ও

ভালবাসিতেন। তাই, তিনি যদি কখনও সামান্ত একটু গুণ্‌গুণ্‌ করিয়া স্বরবিলাস করিয়াছেন, অমনি সেই গুণ্‌গুণ্‌ ধ্বনি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াই যেন, তদীয় দেশবাসীদিগের হৃদয় বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। দিবাবসানে সাগরগামিনী তটিনীর প্রাণের আকুল গীতিকা, কুলকুল ধ্বনিতে যেমন শ্রান্ত পথিকের চিত্তে একটা জড়তা, একটা তন্দ্রা আনিয়া দেয়, পথিক একপদে তাঁহার দীর্ঘ দিবসের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া যান, কেমন একটা ঘুমের ঘোরে তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসে, সেইরূপ, প্রেমিক কবি কৃত্তিবাসের মোহিনী বীণার ঝঙ্কারেও বঙ্গবাসীর হৃদয় বিমোহিত আনন্দালস হইয়া রহিয়াছে। কবে কোন্ দিন্ কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে "মা নিষাদ" বলিয়া বাল্মীকি গান ধরিয়াছিলেন, আর আজও যেন সেই গানের ধ্বনির বিরাম হয় নাই। সে স্বরলহরী যেন বাতাসে এখনও ভাসিয়া বেড়াইয়া, ভারতবাসীদের প্রাণে কেমন একটা তন্দ্রা জন্মাইয়া দিতেছে, সেইরূপ কবে কোন্ দিন্, শুভমুহূর্ত্তে পতিতোদ্ধারিণীর তীরে বসিয়া, তাঁহারই কুল কুল গীতির সুরে সুর মিশাইয়া ফুলিয়ার পণ্ডিত তান ধরিয়াছিলেন, আজ সে ফুলিয়া নাই, সে ভাগীরথীও দূরে সরিয়া গিয়াছেন, —কিন্তু সেই স্বপ্নময়, আবেশময় তানের এখনও যেন শেষ হয় নাই। সে রাম, সে অযোধ্যা, কিছুই নাই. তবুও সেই রামের কথা, রামের স্মৃতি যেমন ভারতের নরনারীর প্রাণে প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, আজীবন থাকিবেও, তদ্রূপ আজ সে ফুলিয়া নাই,. সে জাহ্নবী নাই, সে কৃত্তিবাস নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসের কথা, কৃত্তিবাসের স্মৃতি বঙ্গবাসী কদাচ বিস্মৃত হইবে না। রামসীতার পাদস্পর্শে অযোধ্যা চিরকালের মত তীর্থ হইয়া রহিয়াছে, কৃত্তিবাসের পাদস্পর্শে ফুলিয়া বঙ্গের সাহিত্যসাম্রাজ্যের প্রধান তীর্থ হইয়াছে। ফুলিয়ার মুখটী, শুধু ফুলিয়ার নহে, বাঙ্গালার গৌরব স্থান, পরমস্পর্দ্ধার ভাজন হইয়াছেন। জন্ম জন্মান্তরে কৃত্তিবাস কত তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে তপস্যার ফলে তিনি ত অমর হইয়াছেনই, তাঁহার মাতৃভাষাকেও অমরী করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের স্বর্ণমন্দিরের তিনিই ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। যে দেশে এবং যে জাতিতে কৃত্তিবাসের ন্যায় কবি আবির্ভূত হন, সে দেশ ধন্য, সে জাতি বরেণ্য। কৃত্তিবাস বাঙ্গালী জাতিকে

বড় করিয়া দিয়াছেন ; তিনি যে সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন, আজ এই পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া যিনি যতটুকু পারেন, সেই সঙ্গীতের "তান প্রদান" করিতেছেন। তাঁহার সাধনার ফলে, তাঁহার স্বজাতীর জাতীয় সাহিত্য ধীরে ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। বাঙ্গালীর যতই চক্ষু ফুটিতেছে, ততই তাহারা তাঁহার আদর করিতে শিখিতেছে।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং বন্ধুবর সতীশচন্দ্র, আপনারা মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে অদ্য এই যে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন,—পূজ্য মহাপুরুষের পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এজন্য আপনারা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যে সমুন্নতবংশের কৃত্তিবাস অলঙ্কার ছিলেন, সেই ফুলিয়ার মুখটীর একজন কবিতারসবঞ্চিত অভাজনকে আপনাদের অদ্যকার উৎসবে আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যে কুলে আমার জন্ম, সেই কুলের একজন প্রধান পুরুষের এবং বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান মহাকবির স্মৃতিবাসরে আমি উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি বলিয়া নিজেকেও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি।

এস কৃত্তিবাস, তোমার বড় সাধের ফুলিয়ায় একবার ফিরিয়া এস, এই দেখ, তোমার উদ্দেশ্যে, কত শত ভক্ত আজ সজলনেত্রে ফুলিয়ায় উপস্থিত, তুমি তাহাদিগের সারস্বতভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্ন দিয়া গিয়াছ, সেই রত্নের গৌরবে তাহারা আজ গৌরবিত, কৃত্তিবাসের স্বজাতি বলিয়া আদৃত। এস কবি, আবার আসিয়া—

"পবন নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীম বলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কাণে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত লহরী ;
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকীকে তপে তুষ্ট করি।"

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনে

সভাপতির অভিভাষণ।

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনা স্বদেশের ভাষা—পূরে কি আশা?"

বঙ্গভাষা আজ আর উপেক্ষিত নহে, বাঙ্গালী বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের নিকট বঙ্গভাষা বরং অপেক্ষিত। যখন বাঙ্গালীর ছেলে, বঙ্গভূমির বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা, বা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ অধ্যয়ন করাকে লজ্জাজনক, কতকটা বা প্রত্যবায়জনক মনে করিতেন, সে দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে, সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে।

মহাকবি কৃত্তিবাস হইতে কবিবর ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বহু মনস্বী বঙ্গসন্তান, বঙ্গবাণীর স্বর্ণমন্দির রচনায় সাহায্য করিয়াছেন, রাজা রামমোহন, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, অমর বঙ্কিমচন্দ্র, চিন্তাশীল অক্ষয় কুমার প্রভৃতি বহু প্রতিভাশালী সারস্বতগণ সেই মন্দিরগাত্র নানাবিধ শিল্পসৌন্দর্য্যে খচিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষা এখন বাঙ্গালীর একটা প্রকৃত স্পর্দ্ধার পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই, বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী ভারতের যে প্রাচীন মহা বংশের ভগ্নাংশ, সেই প্রাচীন আর্য্যজাতির ভাষা এবং সাহিত্য-ভাণ্ডার অনন্ত ও অমূল্য রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং বাঙ্গালীকে নিজের জাতীয়-সাহিত্য গঠনে সম্পূর্ণ রূপে পরের প্রত্যাশী হইতে হয় নাই। জগতের অপর অপর শিক্ষিত ও সমুন্নত জাতির সমক্ষে, নিজের জাতীয় সাহিত্য লইয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতায় বাঙ্গালী এখন বঞ্চিত নহে, একথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানে বঙ্গভাষার যতটা শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ইহাই যে বর্দ্ধিষ্ণু বঙ্গবাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত, একথা আমি কদাচ স্বীকার করিতে পারি না।

ক্ষেত্রকর্ষণ পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য হইলেও, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ বপন ও উপযুক্ত সেচনাদির দ্বারা অঙ্কুরিত বীজের লক্ষণ পরিবর্ত্তন, অধিকতর পরিশ্রমসাধ্য

ও বিবেচনা-সাপেক্ষ। অঙ্কুরিত শস্তের আপদ্ অনেক। সেই সমস্ত আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া শস্যকে ফলোন্মুখ করিয়া তোলা বড়ই দক্ষতা-সাপেক্ষ। যে সময়ে জলসেচনের প্রয়োজন তখন জল, যখন আতপ নিবারণের প্রয়োজন তখন ছায়ার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই সমুদয়ের কোন একটির অভাবেই কর্ষিত ভূমি শস্য-শালিনী হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও ঐ রীতির অনুসরণ বিধেয়। বহুকাল, বহুশত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কৃত্তিবাস প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহাদের আরাধ্য বঙ্গভাষার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, সেই কর্ষিত ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধনের নিমিত্ত নানা আয়াস করিয়াছেন। দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের এখন, সেই ভূমির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; সকলেই সুফলের আশায় সেই ভূমির দিকে লোলুপনয়নে চাহিতেছেন; কত উচ্চ আশায় উৎফুল্ল হইয়া নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি ও আদর সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এমন সময়ে, দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ, উৎকণ্ঠাপূর্ণ সময়ে ঐ কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপন করিতে হইবে। সুতরাং তাহাতে যে কত সতর্কতার প্রয়োজন, কত পূর্ব্বাপর বিবেচনার প্রয়োজন, তাহা বঙ্গবাসিমাত্রেরই বিশেষ বিবেচ্য। এতদিনের চেষ্টায় যে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্র পরিপাটীরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের অবিবেচনার ফলে, তাহা যেন নষ্ট না হয়, তাহার উর্ব্বরতা যেন কতগুলি আবর্জ্জনাজনিত ক্ষারদাহে দগ্ধীভূত না হয়, ইহাই আমার অভিলাষ।

"বিশেষ বিবেচ্য" কেন বলিলাম, তাহাই বিবৃত করিতেছি। এতকাল অর্থাৎ প্রায় গত সার্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গভাষা যে ভাবে, যে গতিতে বঙ্গীয় জনসমাজে প্রসারলাভ করিতেছিল, এখন বঙ্গভাষার সেই গতির ক্ষিপ্রতা ক্রমেই বাড়িতেছে। পূর্ব্বে ছিল, যাহারা শিক্ষিত, কি প্রতীচ্য কি প্রাচ্য, উভয়বিধ শিক্ষার কোন একটিতে যাহারা সম্পন্ন, বঙ্গভাষায় কতিপয় কমনীয় গ্রন্থ সেই অল্প সংখ্যক ব্যক্তির অবসরবিনোদনের উপাদানমাত্র হইত। কার্য্যান্তরব্যাপৃত চিত্তকে কদাচিৎ প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বঙ্গভাষার গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে যাঁহাদের লইয়া বঙ্গদেশ, যাঁহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমস্তই বাদ পড়ে, সেই বঙ্গের আপামর সাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষার আদর কতটা ছিল? একপ্রকার ছিলই না, বলিলেও অত্যুক্তি হয়

না। কৃত্তিবাস, কাশীরাম ব্যতীত অপর কয়জন বঙ্গসাহিত্য-রথীর নাম বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সাত কোটি বঙ্গবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও অতিরঞ্জন হয় না। এই মুষ্টিমেয় সমাজে যে বঙ্গভাষা এত দিন আবদ্ধ ছিল, এখন সেই বঙ্গভাষা অতি ক্ষিপ্রগতিতে বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে। সুতরাং এই সময়ে ভাষা যাহাতে সংযত-চরণে চলে, যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, সে পক্ষে বঙ্গের জাতীয় জীবনের উদ্বোধন-কর্ত্তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর সেই সঙ্গেই, আমাদের সুন্দরী মাতৃভাষা কি উপায়ে সুন্দরী-তমা হইতে পারে, তাহাও ভাবিতে হইবে। কেবল গীতিকাব্য, মহাকাব্য, বা গল্প-গুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যের বিরাট্ সৌধের চত্বরে শিল্প, বিজ্ঞান, বার্ত্তাশাস্ত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি—সর্ব্বপ্রকার রত্নের সমাবেশ আবশ্যক। সর্ব্ববিধ কলার বিলাসে জাতীয় সাহিত্য-মন্দির বিকসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা তাহাকে অসঙ্কোচে "জাতীয় সাহিত্য" বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান কালে, যখন বঙ্গভাষার প্রতি জন-সাধারণের দৃষ্টি অল্প বিস্তর ভাবে নিপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ ভাষার গতিকে, বঙ্গবাসীর ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অনুকূলভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। জাতীয়তা গঠন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য গঠন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সেই জাতীয় সাহিত্য কিরূপ ভাবে গঠিত হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে, কি প্রকারে, কোন্ দিকে জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে, সেই সম্বন্ধেই আমি দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে "শিক্ষিত" বলিতে আমরা কি বুঝি? সর্ব্বসাধারণে কোন্ সম্প্রদায়কে "শিক্ষিত" বলিয়া স্বীকার করে? বর্ত্তমান কালে, আমাদের দেশে শিক্ষার কেন্দ্র মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, দেশবাসিগণ অসঙ্কোচে তাঁহাদিগকেই শিক্ষিত আখ্যা এবং শিক্ষিতের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেন। ভারতবর্ষের নানা বিপ্লবের মধ্যেও যাঁহারা পরম যত্নে বুকে বুকে রাখিয়া, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্ররাজি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অধ্যাপকবর্গের আসন দেশবাসী এখনও অনেক উচ্চে প্রদান করিয়া থাকেন; যদি অধ্যাপকবৃন্দ আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তবে উত্তরকালেও সে উচ্চাসনে তাঁহারা অধিকারী থাকিবেন,

সত্য, কিন্তু সংখ্যাগত হিসাব ধরিলে, বঙ্গের প্রতি পল্লীতেই প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। যেখানে হয়ত পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার আদৌ প্রচার ছিল না, বর্ত্তমানে, সেস্থানেও উক্ত শিক্ষার প্রতি লোকের আদর দেখা যাইতেছে। যেরূপ ভাবে, গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার ভূয়ঃপ্রচার ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অদূরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গে, যথায় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব এমন পল্লী থাকিবে না। সুতরাং বঙ্গের ভবিষ্যৎ জন-মত পরিচালনের এবং জন-সাধারণের মত-গঠনের ভার উক্ত শিক্ষিতগণের হস্তেই ক্রমে ন্যস্ত হইবে। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, যদি অকপট ভাবে ইচ্ছা করেন, তবে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশীদিগের, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবেন। তাঁহাদের পল্লীবাসিগণ তাঁহাদিগের নিকটে অনেক আশা করেন। যে যে পল্লীতে তাঁহাদের বাস, সেই পল্লীর এবং তৎ তৎ সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষাপকর্ষের জন্য তাঁহারাই অনেকটা দায়ী। আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় অনেকটা দায়ী, কেন না লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাদ দিলে মানুষের আর কিছুই থাকে না, সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণপূর্ব্বক, যদি তাঁহারা বিবেচনা সহকারে লোক মত পরিচালনা করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রতিবেশীরা অম্লানমনে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবে। যে যে গুণ থাকিলে, মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাজন হওয়া যায়, শিক্ষিত-গণের শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই গুণে সম্পন্ন হইতে হইবে। দয়া, সমবেদনা, পরদুঃখকাতরতা, সত্যপ্রিয়তা, বিনীতভাব প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে হৃদয়কে সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার ফল ফলিয়াছে, বলা যাইতে পারে। অন্যথা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতাকেই শিক্ষার চরমফল প্রাপ্তি বলিতে পারি না। স্বজাতিকে আত্মমতের অনুকূল করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে স্বজাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ আবশ্যক, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল সামাজিক, বা কেবল রাষ্ট্র-নৈতিক আন্দোলনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন হয় না। প্রাত্যহিক কার্য্যের যেমন একটা তালিকা অন্ততঃ মনে মনে থাকিলেও কার্য্যের শৃঙ্খলা হয়, সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, তদ্রূপ

জাতীয় সাহিত্য যদি সুগঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়তা গঠনের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় সাহিত্য গঠনের প্রকৃত ভার এখন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হস্তেই ন্যস্ত হইতেছে। অবকাশ মত, কোন ভাবুক, ভাবের স্রোতে ভাসিয়া দু'একটি কবিতা রচনা করিলেন, বা চিন্তাপূর্ণ দু'একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহাতে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত গঠন হইবে না। তপস্যার ন্যায় একাগ্রতা-পূর্ণ চেষ্টায় ঐ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায়ও বঙ্গভাষার অধ্যাপনা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন। বঙ্গভাষায়ও তাঁহারা পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন হইতেছেন। এই ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির ভার নিহিত। সুতরাং তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দু'একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই ইংরাজী শিক্ষিতগণ যদি, একটু আদরের সহিত স্ব স্ব মাতৃভাষার আলোচনা করেন, মাতৃভাষারই হিতকল্পে মাতৃভাষার আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফলের আশা অনেক। দেশের যাহারা উচ্চশিক্ষাবর্জ্জিত, সেই জনসাধারণকে তাঁহারা অতি অল্প আয়াসেই মাতৃভাষার প্রতি অধিকতর আগ্রহ-সম্পন্ন করিতে পারিবেন। কেন না,—তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মত গঠনের ও সাধারণ সদনুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ বা এক হিসাবে কর্ত্তা হইবেন। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে, ঐ মাতৃভাষাকে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বরেণ্য করিয়া তোলা ইংরাজী শিক্ষিতগণের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। কেননা, তাঁহারা প্রতীচ্য ভাষায় পারদর্শী হইয়া, সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন; লোকসমাজের স্পৃহণীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছেন,—তাঁহাদের কথার, তাঁহাদের আচার ব্যবহারের, তাঁহাদের আচরিত রীতিনীতির উপর জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই সাধারণকে স্বমতের বশবর্ত্তী করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্য বড়ই গুরুতর। তাঁহাদের সামান্য স্খলনে, সামান্য উপেক্ষায়, একটি মহতী জাতির—উদীয়মান জাতির—স্খলন বা অধঃপতন হইতে পারে।

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।"

এই মহাকাব্য স্মরণপূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে পাদক্ষেপ করিতে হইবে। তরণীর কর্ণধারের অনেক সতর্কতা আবশ্যক। অন্যথা নিমজ্জনের আশঙ্কা বলবতী।

যাহারা বঙ্গের অশিক্ষিত, বা অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারা যে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া, পরে আবার বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, এরূপ আশা কদাচ করা যায় না। তাহাদিগকে, সেই mass অর্থাৎ সাধারণ জনসঙ্ঘকে, সৎপথে পরিচালিত করিতে যেমন দেশের শিক্ষিতগণই একমাত্র সমর্থ, সেইরূপ, তাহাদিগকে অসৎপথে—উৎসন্নের পথে অধঃপতিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদেরই হস্তে। সরলবিশ্বাস-সম্পন্ন, জনসঙ্ঘের চিত্ত, শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাক্‌চিক্যে বশীভূত করিয়া, যে দিকে ইচ্ছা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষিতগণের হস্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ্ এবং বিপদ্ এই উভয়েরই হেতু নিহিত রহিয়াছে। এক হিসাবে ইহাও এক মহা আতঙ্কের কথা, চিন্তার কথা! যাঁহাদের উপর দেশের সম্পদ্ বিপদ্ উভয়ই নির্ভর করিতেছে,—তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে কত গুরুতর, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দেশের জনসঙ্ঘকে যদি সৎপথেই লইয়া যাইতে হয়,—মানুষ করিয়া তুলিতে হয়,—বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহাজাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও, যাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ,—আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে, আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ, আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয়, আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, পাশ্চাত্য আয়ুধেও সম্পন্ন হইতে হইবে। দু'একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ ইউরোপের ইতিহাস। ইতিহাস অল্পবিস্তর প্রায় সকল জাতিরই কিছু না কিছু আছে। বর্ত্তমান কালে, ইউরোপ জগতের অভ্যুদিত দেশসমূহের শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং ইউরোপের ইতিহাস আলোচনাপূর্ব্বক দেখিতে হইবে যে, কেমন করিয়া, কোন্ শক্তির বলে, বা কোন্ গূঢ় কারণে ইউরোপের কোন্ জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, কোন্ পথে পরিচালিত হওয়ায়, কোন্ জাতির কি উন্নতি হইয়াছে, সেই উন্নতির কারণ এবং পথ আমাদের এ দেশীয়গণের পক্ষে প্রযোজ্য কি না, তাহার প্রয়োগে আমাদের এদেশে কতটা মঙ্গলের সম্ভাবনা,—ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া যদি সঙ্গত মনে হয়, এদেশের পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে, সেই পথে, আমাদের জাতিকে ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সেই প্রবর্ত্তনের একমাত্র সহজ পথ,—ঐ সকল কারণ, ঐ সকল উপায় প্রণালী, অতি বিশদরূপে আমাদের মাতৃভাষার দ্বারা, সাধারণের মধ্যে প্রচার করা; এই প্রচারের একমাত্র কর্ত্তা, যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায়ও যাঁহাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ইউরোপীয় ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা। মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রচারকর্ত্তাদের সামান্য ক্রটীতে আমাদের অভ্যুদয়োন্মুখ জাতির মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

যেমন এই অভ্যুদয়ের কথা বলিলাম, তেমনই এই সঙ্গে দেখিতে হইবে, কোন্ পথে যাওয়ায়, কোন্ দুর্নীতির আশ্রয় বশতঃ, ইউরোপীয় জাতির অধঃপাত ঘটিয়াছে, বা ঘটিতেছে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কোন্ জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াও কোন্ কর্ম্মের দোষে অধঃপাতের অতলতলে নিপতিত হইয়াছে,—পতনের সেই সেই কারণনিচয় অতি সুস্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করিয়া, সেই সেই সর্ব্বনাশের হেতুগুলি পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষার স্বচ্ছদর্পণে এই ভাবে দোষগুণের প্রতিবিম্বন পূর্ব্বক দোষের পরিহার ও গুণের গ্রহণের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য জন্মাইতে হইবে।

ইহকালই জীবনের সর্ব্বস্ব নহে। এই ইহকালকেই একমাত্র সার ভাবিয়া কার্য্য করার ফলে, ঐহিকবাদী ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব আদৌ নাই বলিলেই হয়, ধর্ম্মভাবের অত্যন্ত অভাবের ফলেই বর্ত্তমান শোণিততরঙ্গিণী রণভূমিতে ইউরোপ বিপর্য্যস্ত। ইউরোপের ঐ ঐহিকবাদিতার প্রতি লক্ষ্য না

করিয়া, বরং যতটা সম্ভব, উহা হইতে দূরে সরিয়া যাইয়া আমাদিগের জাতীয়তা ও চিরস্পৃহণীয় ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি, ধর্ম্মভাবের উপর স্থাপিত করিয়া, উহাতে পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য বিষয়ের সমাবেশ পূর্ব্বক, সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। জাতীয়-সম্পদের যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বপ্রকারে, তাহা করিতে হইবে।

তার পর ইউরোপের সাধারণ সাহিত্য অর্থাৎ কাব্য নাটকাদি। আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই অংশে বিশেষ মনোনিবেশের প্রয়োজন। দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত, প্রভৃতি জটিল বিষয় সমূহের আলোচনা অপেক্ষা, এই সমুদয় আপাতরম্য কাব্য নাটকাদির আলোচনায় ইংরাজী শিক্ষিতগণের অনেকেই কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তারুণ্যের অরুণ আভায় এই সকল বিদেশীয় চিত্র প্রথমতঃ বড়ই সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়। হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। আমাদের বিশেষ প্রণিধান সহকারে দেখা আবশ্যক যে, পাশ্চাত্য সমাজের চিত্র তদীয় জাতীয় কাব্য নাটকাদিতে কি ভাবে প্রতিফলিত। ইউরোপের সামাজিক চিত্রাবলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাবভাব, বিন্যাস কৌশল প্রভৃতি আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে গ্রহণযোগ্য কিনা,—ঐ ঐ চিত্রাবলীর আদর্শে যদি আমরা স্বকীয় সমাজচিত্রের ছায়াপাত করি, তবে তাহাতে আমাদের জাতীয়তা অক্ষুন্ন থাকিবে কিনা, অথবা ঐ বিদেশীয় চিত্র আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য্য কি না,—এই চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়া ইউরোপীয় কাব্যনাটকাদি পাঠ করিয়া, উহার যে সকল অংশ উৎকৃষ্ট, অনুকরণীয় এবং কল্যাণ-জনক, তাহা আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে সাধারণের গোচর করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে, মাতৃভাষার লাবণ্য বর্দ্ধিত হইবে। যাহা সৎ, যাহা সাধু, নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ তাহা যে জাতির বা যে সমাজেরই হউক না কেন, সাগ্রহে গ্রহণ করিতে হইবে।

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।"

এইভাবে জাতীয় সাহিত্য যদি গঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের সাহায্যেই, আমাদের নব-জাগ্রত জাতীয়তা সুগঠিত হইবে, এবং জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত আমরা সমকক্ষতা করিতে পারিব। অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। ইতিহাস এবং কাব্য-নাটক উপন্যাসাদি সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, ইউরোপীয়

দর্শন এবং অপরাপর কলা (art) প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। যাহা কিছু বিদেশীয়, তাহাই উত্তম, সুতরাং আমাদের গ্রাহ্য, বা যাহা কিছু বিদেশীয়, তাহাই অস্পৃশ্য, সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য,—এরূপ কথা বলিতে আমি সাহস করি না। বিদেশীয় বা স্বদেশীয় বুঝি না, যাহা উত্তম, তাহা, যে দেশীয়ই হউক না সর্ব্বথা গ্রাহ্য, আর যাহা সর্ব্বথা দোষমুক্ত নহে, তাহা, আত্ম-পরজ্ঞান-বর্জ্জনপূর্ব্বক, পরিত্যাগ করিতে হইবে। এমন অনেক প্রথা থাকিতে পারে, অথবা আছেও, যাহা ইউরোপীয় সমাজের কতকটা অনুকূল হইলেও আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সেরূপ প্রথার প্রচলনে প্রয়াস করা যে কেবল পণ্ডশ্রম, তাহাই নহে; তাহাতে, আমাদের স্মরণাতীত কাল হইতে সুসংবদ্ধ সমাজেরও বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। যেমন ইউরোপীয় বিবাহপদ্ধতি। পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে উহা যতই সুন্দর ও আপাতরম্য মনে হউক না কেন,—এদেশের অস্থিমজ্জার সহিত যে সংস্কার অবিভাজ্যরূপে বিজড়িত, ঐ বিবাহপদ্ধতি সেই সংস্কারের এবং সেই সংস্কারপরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত সমাজের পক্ষে কদাচ হিতকরী হইতে পারে না। সুতরাং তাদৃশী পদ্ধতির ঐন্দ্রজালিক চিত্রে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করা অনুচিত। যাহা তোমার সমাজের বা জাতীয়তার পরিপন্থী, তাহাকে আড়ম্বর-পূর্ণ সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া, সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে তোমার স্বজাতির আপামর সাধারণকে মজাইও না। মনে রাখিও, তুমি যে পথ আজ নির্ম্মিত করিয়া যাইতেছ, উত্তরকালে তোমারই দেশের শত সহস্র যাত্রী সেই পথে গমনাগমন করিবে। সুতরাং আপাত প্রশংসার ও যশের প্রতি উদাসীন থাকিয়া, যাহা তোমার স্বজাতির এবং স্বসমাজের হিতকর, তাদৃশ চিত্র অঙ্কিত কর, তাদৃশ আদর্শ তোমার সাহিত্যের মন্দিরে স্থাপিত কর, যাহার অনুকরণে তোমার ভবিষ্যৎ জাতি সমুন্নত হইবে। তোমার যে বিবাহপদ্ধতি আছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির পদ্ধতি অপেক্ষা উহা নিকৃষ্ট নহে, প্রত্যুত অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, সুতরাং ঐ উৎকৃষ্ট পদ্ধতির যে যে অংশ অশিক্ষিত, সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ জনসমাজে এখনও সম্পূর্ণরূপে অনুবোধিত হয় নাই, তাহা তোমার বঙ্গসাহিত্যের সাহায্যে ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে, সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত কর। এবং পার ত তোমার সেই উৎকৃষ্ট চিত্রের সম্মুখে, বিদেশীয় চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া তুলিয়া

ধর, তুলনায় তোমার স্বজাতিকে বুঝাইয়া দাও, যে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা তোমার পক্ষে গ্রাহ্য ও তোমার সমাজের অনুকূল। মোহের ঘোরে যাহার মস্তিষ্ক বিকৃত, তাহার যাহাতে মস্তক শীতল হয়, সেইরূপ ভৈষজ্যের বিধান কর। যাহাতে রোগ বৃদ্ধি হয়, তোমার জাতীয় চিকিৎসা গ্রন্থে তাদৃশ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া সমাজকে উৎসন্ন করিও না। তোমার প্রাচীন শাস্ত্রভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য রত্নরাজি স্তূপীকৃত রহিয়াছে, এখনও যাহাদের আবরণ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় নাই, মাত্র কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণে এখনও যে সমুদয় রত্নের অতুল কান্তি নিরীক্ষণ করে নাই, তোমার জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে, সেই সেই রত্নের মালা গাঁথিয়া তোমার স্বজাতির কণ্ঠে পরাইয়া দাও, তাহাদিগকে বুঝিতে দাও, শিখিতে দাও, দেখিতে দাও, এবং দেখিয়া, তুলনা করিয়া ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে দাও; দেখিবে, তাহারা এদেশের অপরাজিতা বা শেফালিকা ফেলিয়া, অন্যদেশের ভায়লেট্‌ মাথায় করিবে না। নিজেদের কি আছে, কি ছিল, ইহা যাহারা না জানে, তাহারাই পরের দ্বারে উপস্থিত হয়। তোমার স্বদেশবাসীদিগকে তোমার প্রাচীন সম্পদের পরিচয় দাও, বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও, তাহাদের মনে আত্ম-সম্মান উদ্বুদ্ধ করিয়া তোল। তবেই ত তোমার জাতীয়তা গঠিত হইবে। সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন কর, তবে ত জাতির গঠন হইবে নতুবা সমস্তই আকাশ-কুসুম।

মনে কর, বিলাতের ব্যবস্থাপক সভা (বা পার্লিয়ামেণ্ট)। তোমার দেশের পক্ষে, বর্ত্তমান সময়ে, ঐরূপ সভার উপযোগিতা কতদূর, তাহা বিশেষ বিবেচ্য। কিন্তু বিলাতের লোকতন্ত্র যেরূপ ভাবে গঠিত, তাহার পক্ষে, ঐ সভার উপযোগিতা প্রচুর। সে দেশের পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহাই যে এ দেশেরও আবশ্যক, ইহা বলা বড়ই দুষ্কর। দেশভেদে, দেশবাসিভেদে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাভেদে, এবং দেশের শিক্ষা-দীক্ষার ভেদে দেশের পরিচালক সভাসমিতির ভেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তোমার দেশের পক্ষে তোমার প্রাচীন পদ্ধতিই অনুকূল, বা বিদেশীয় পদ্ধতি অনুকূল, তাহা বিশেষ বিচার করিয়া, তোমার জাতীয় সাহিত্যের দর্পণে, ঐ উভয় ছবিরই দোষগুণের আলোচনা কর, এবং দেশবাসীদিগকেও বুঝিয়া লইতে দাও যে, কোন্‌টা তাহাদের গ্রাহ্য। মুক্ত পুরুষের ন্যায় আর্ষ প্রকৃতির ন্যায় নিরপেক্ষ হইয়া, লোকের হিতকামনায় সাহিত্য গঠন কর, দেশের ও জাতির

মঙ্গল হইবে। ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের আদর্শে যদি তোমার স্বদেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে চাও, মনে রাখিও, বর্ত্তমান সময়ে তোমার বিফলাশ হওয়াই সম্ভব। হৈমন্তিক শস্যের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত, তাহাতে আশু ধান্যের বীজ বপনে, মাত্র কৃষকের মনস্তাপের বৃদ্ধি হয়, আর সেই সঙ্গে বীজ ধ্বংস ও ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যে দেশের শাস্ত্রে, শিক্ষায় দীক্ষায় ও রাজনীতিতে রাজা মানব নহেন, দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই ভারতবর্ষে, পাশ্চাত্য রাজনীতির ছায়াপাতে সেই দেবতাকে আবার মানবের আসনে অধঃপাতিত করিও না। তোমার প্রাচীন রাজনীতির উজ্জ্বলচিত্র উত্তমরূপে নিরীক্ষণপূর্ব্বক, প্রতিভার সাহায্যে তাহা তোমার মাতৃভাষায় আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য রাজনীতির সহিত তুলনায় সর্ব্ব-সাধারণকে বুঝিতে দাও, যে, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের রাজনৈতিক ধারণা কত উচ্চ ছিল। গুপ্তহত্যা, রাজবিদ্বেষ এবং রাজদ্রোহ, কেবল ঐহিক নহে, পারত্রিক অকল্যাণেরও আকর, একথা তোমার ধর্ম্মশাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছে। যদি এই সকল কঠিন সমস্যা, মাতৃভাষার সাহায্যে সমাধান করিতে পার, তবেই, প্রকৃতপক্ষে, তোমার মাতৃভাষার সেবা সার্থক হইবে, তোমার জ্ঞানার্জ্জন সার্থক হইবে, আর সেই সঙ্গে, বঙ্গভাষার সেবা করিয়া তোমার জন্ম সার্থক হইবে। অবশ্য এই কঠিন কার্য্য এক সময়ে, বা একের দ্বারা কদাচ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এই পথে যদি একবার তোমার জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পার, তবে দেখিবে, আরও কত পথিক, তোমার প্রদর্শিত পথে যাত্রা করিবে। এই গুরুতর কার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠাতৃগণের মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদে বা মাত্র তাহার উজ্জ্বল অংশের প্রদর্শনেই, আমাদের ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না; প্রত্যুত, তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনাপূর্ব্বক, তাহার অসদংশের বর্জ্জন করিয়া সদংশ, যাহা দোষ লেশ শূন্য ও এদেশের অনুকূল, আমাদের মাতৃভাষার কমনীয় আভরণে অলঙ্কৃত করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে হইবে। এই ভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের গ্রাহ্য অংশগুলি যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তবেই ক্রমে আমাদের বঙ্গভাষা আশাতীত ভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিবে। ইউরোপীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ থাকিয়াও এদেশবাসীরা ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষার উত্তম

ফলে বঞ্চিত থাকিবে না। প্রাচীন জাপান এই উপায় বলেই অধুনাতন নবীন জাপানে উন্নীত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই একটা বিষয়ে সর্ব্বদা আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অশ্বের উপরে নর্ত্তনাদি করিয়া, যাহারা দর্শকদিগের প্রীতি ও কৌতুক উৎপাদন করে, তাহারা যেমন, প্রথমতঃ সর্ব্বদাই সতর্ক থাকে যে, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে যেন স্খলিত হইয়া না পড়ে—তদ্রূপ, আমাদিগকেও সর্ব্বদা সাবধান হইতে হইবে যে, আমরা এই কার্য্য করিতে যাইয়া যেন স্খলিত না হই। অর্থাৎ আমাদের যাহা মজ্জাগত সংস্কার, সেই পবিত্র ধর্ম্মভাব হইতে যেন বিচ্যুত না হই। আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির কোনটিই ধর্ম্মভাবশূন্য নহে। ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় এমনই একটা গুণ আছে যে, এখানে ধর্ম্মভাববর্জ্জিত কোন বস্তুই স্থায়ী হইতে পারে না, এপর্য্যন্ত পারে নাই। যাহাদের আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান, তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের কোন চিত্র যদি ধর্ম্মভাব-ব্যঞ্জক না হয়, তবে তাহা কদাচ বাণীর পাদপদ্মে অর্পণ করা যাইবে না। সে চিত্র, গোধূলি-গগনের লোহিত মেঘখণ্ডের মত, অতি অল্পকাল মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী প্রভৃতি যাহাদের জাতীয় সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; রাম, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দধীচি, কর্ণ যাহাদের সাহিত্যের আদর্শপুরুষ, কবিগুরু রত্নাকর, মহর্ষি দ্বৈপায়ন, কবিকুলরবি কালিদাস, ভবভূতি যাহাদের জাতীয়-সাহিত্য-সঙ্গীতের গায়ক, আর সর্ব্বোপরি, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যাহাদের শ্রৌতসঙ্গীতরূপ অমৃতের নির্ঝর, তাহাদের নবীন জাতীয় সাহিত্যে কোনরূপ অপবিত্র ভাব বা আচার যেন প্রবেশ না করে, তৎপক্ষে সর্ব্বদাই প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজন। সকল জাতিরই এক একটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। লক্ষ্যহীন জাতি কদাচ অভ্যুদয়শালী ও কালজয়ী হইতে পারে না। এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে যে জাতি অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা স্থির লক্ষ্য ছিল; এবং সেই লক্ষ্য ধরিয়াই তাহারা ক্রমে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে পারিয়াছে। লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে, কিছুই অসম্ভব নহে। অতি দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। এই যে ইউরোপ এত অতুল ঐহিক শ্রীবৃদ্ধিতে সম্পন্ন, ইহার কারণ কি? অর্থ বা অর্থকর বাণিজ্য উহাদের একমাত্র লক্ষ্য। আজ যে

জাপান এত উন্নত, ঐ অর্থকর বাণিজ্য উহার একমাত্র লক্ষ্য। ঐ লক্ষ্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি আছে বলিয়াই, অন্য কোন বাধাবিপত্তিতে উহাদিগকে ব্যাহত করিতে পারে না। লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য, প্রাণকেও উহারা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে। লক্ষ্য স্থির ছিল বলিয়াই, ধর্ম্মপ্রাণ অগ্নি-উপাসকগণ অম্লানবদনে, ইরাণ ছাড়িয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন,—আমেরিকার পিউরিটানেরা মাতৃভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক, গহনবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যে যে জাতি যে যে বৃহৎ কার্য্যই করুক না কেন, তাহার মূলে কিন্তু একটা স্থির লক্ষ্য থাকা চাই। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের এই জাতীয় সাহিত্যের মন্দির-নির্ম্মাণেও একটা স্থির লক্ষ্য আবশ্যক। অন্যথা আমরা সফলকাম হইতে পারিব না। আমাদের সেই লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? কোন্ লক্ষ্যে স্থিরচিত্ত থাকিয়া, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারিয়াছিলেন? কোন্ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই আমরা ক্রমে অধঃপতিত হইতেছি? ইহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য ও বিবেচ্য।

ভারতবর্ষ যে এত উন্নত হইয়াছিল, সে একমাত্র ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া। যদি ভারতকে আবার বড় করিতে চাও, যদি আবার তোমাদের লুপ্ত সম্পদ্, বিনষ্টসম্মান পুনরধিকার করিতে চাও, তবে সেই পিতৃপিতামহের লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির কর। একাগ্রচিত্ত হও, অবাধে তোমার অভিপ্রেত মৎস্যচক্র ভেদ করিতে পারিবে। ধর্ম্মভাব হিন্দুজাতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ধর্ম্মভাবকেই তোমার বর্ত্তমান জাতীয়তারও প্রধান লক্ষ্য কর। তোমার সাহিত্য, তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার, ব্যবহার, সর্ব্বত্রই ভারতস্পৃহণীয় ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ কর। দয়া, সমবেদনা, পরার্থপরতা, সত্য, তিতিক্ষা, প্রেম প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে তোমার সাহিত্য-কানন যদি সম্পন্ন করিতে পার, তবেই তোমার জাতীয় অভ্যুদয় হইবে; অন্যথা যাত্রার দলের প্রহ্লাদের ন্যায়, তুমি ভক্তের ভাণ করিবে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তোমার কোনই শ্রীবৃদ্ধি হইবেনা। অন্তরের সমস্ত আবেগ, উৎসাহ ও নির্ভর একত্র করিয়া, যদি জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে পার, দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে।

এইভাবে অন্যের সুচারু ও সদ্ভাবপূর্ণ পদার্থ লইয়া নিজের জাতীয় সাহিত্যের নির্ম্মাণ ও জাতীয় আদর্শের গঠন ইতঃপূর্ব্বেও হইয়াছে। বরঞ্চ ইতঃপূর্ব্বে, অতি প্রবলরূপেই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল বলিয়া সন্ধান পাওয়া

যায়। প্রাচীন রোমের নিজের জাতীয় সম্পদ্ আমাদের প্রাচীন সম্পদের ন্যায় এত অধিক পরিমাণে ছিল না; আমাদের সহিত তুলনা করিলে, রোমের প্রাচীন সম্পদ্ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। রোমে যখন জাতীয় জীবনের প্রথম উন্মেষ হইল, তদানীন্তন প্রধান জাতির অভ্যুদয় দর্শনে, রোমবাসীদের হৃদয়েও যখন জাতীয়তাগঠনের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল, জগতে বরণীয় হইবার আকাঙ্ক্ষায় রোমবাসিগণের অন্তঃকরণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন তাহারা মাত্র নিজের পরিমিত প্রাচীন সম্পদেই আর পরিতুষ্ট থাকিতে পারিল না। পিপাসার্ত্ত হইয়াই যেন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তখন গ্রীসের চরম উন্নতির সময়। সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বাংশে গ্রীস তখন জগতের একটা আদর্শ জাতি। বীরত্বে, ধীরত্বে, জ্ঞানে, সম্মানে, গ্রীস তখন সকলের শ্রেষ্ঠ। গ্রীসের সেই চরম অভ্যুদয়ের সময়ে, রোমের লোলুপ দৃষ্টি গ্রীসের প্রতি পতিত হইল। গ্রীসের শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, গ্রীসের কলাবিদ্যা, গ্রীসের শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি সমস্তই রোম ক্রমে স্বীয় জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইতে লাগিল। গ্রীসের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, সে সমস্তই রোম নিজের জাতীয়তা গঠনের প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে, রোম গ্রীসের সমকক্ষ, এমন কি, অনেকাংশে গ্রীস অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। গ্রীসের অনুকরণ করিতে যাইয়া কিন্তু রোম স্বীয় জাতীয়তা বিসর্জ্জন করে নাই। গ্রীসের যাহা কিছু উত্তম পরিচ্ছদ, যাহা কিছু সুন্দর অলঙ্কার; তাহা রোমের জাতীয় ছাঁটে ছাঁটিয়া, জাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিয়া রোম পরিধান করিল, এবং নবীন সাজে সাজিয়া, রোম যখন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, তখন, রোমের সেই নানারত্নখচিত কিরীটের প্রভায়, প্রাচীন গ্রীস যেন কতকটা হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। প্রাচীন গ্রীসের অঙ্গে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে সমুদয় জরাজনিত পলিতভাব জন্মিয়াছিল, যাহা কিছু অসুন্দর ছিল, তাহার পরিবর্জ্জন করিয়া, রোম গ্রীসকে যেন একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল।

কিন্তু এই গ্রীস-রোমের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না। রোমীয়দিগের নিজের প্রাচীন দ্রব্যসম্ভার তত অধিক ছিল না, তাহাদের গৃহ একপ্রকার শূন্য ছিল, হয়ত গৃহের কোন এক কোণে, দু'একটি প্রাচীন পদার্থের কঙ্কাল মাত্র পড়িয়া ছিল, তাই রোমীয়গণ দু'হাতে গ্রীসের যতটা

পারিয়াছে, দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া নিজের শূন্যপ্রায় গৃহ পরিপূর্ণ করিয়াছে। তত সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিতে হয় নাই।

আমাদের প্রাচীন সম্পদ্ প্রচুর। তাহার ভাণ্ডার অক্ষয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। আমাদের যাহা আছে,—তাহার কোন একটিরও মর্য্যাদার হানি হইতে পারে, এমন কোন পরস্ব আমরা কদাচ গ্রহণ করিব না। অথচ, আমাদের যাহা নাই, অন্যের প্রচুর আছে, সেইরূপ পদার্থ যদি আমাদের জাতীয়তার পরিপন্থী না হয়, তবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিব না। রোমের ন্যায় আমাদের গৃহ শূন্য নহে যে, যে ভাবে পারি, গৃহ পূর্ণ করিব; আমাদের ঘর পরিপূর্ণ, সেই পরিপূর্ণ গৃহের শোভা বৃদ্ধির পক্ষে যাহা অনুকূল, সেই পরিপূর্ণ গৃহের অনুরূপ যে সাজ সরঞ্জাম তাহা যদি অন্য কোন জাতির নিকটে পাই, তবে অম্লানহৃদয়ে গ্রহণ করিব। যাহা আমার জাতীয়তার অনুকূল নহে, তাহা কদাচ স্পর্শ করিব না। আমার নিজের জাতীয়তায় কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ হইতে পারে, এরূপ আবর্জ্জনা কদাচ আমার জাতীয়-সাহিত্যের অঙ্গে জন্মিতে দিব না। এই ভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিবেচনার সহিত পাদক্ষেপ করিতে পারি, কিংশুক পরিহারপূর্ব্বক কমল চয়ন করিতে পারি, তবেই আমাদের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় সম্পদ্, এই দুইই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিবে।

আমাদের যাহা নিজস্ব, যাহা লইয়া আমরা গৌরব করি, আমাদের সেই জাতীয় গৌরবের বস্তু, প্রাচীন শিক্ষা দীক্ষা, শিল্পকলা, দর্শন, ইতিহাস, প্রভৃতির যাহাতে কোনরূপে অঙ্গহানি ঘটে এরূপ কার্য্য যেন আমরা কদাচ না করি, কদাচ যেন জাতীয়তার বিসর্জ্জন না দিই। অথচ যে ভাবে হউক, যদি ঐ ঐ বস্তুর কোন ক্রমে কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি, তবে তাহাতে যেন বদ্ধ-পরিকর হই। নিজের যাহা আছে, তাহাত আছেই, কেহ তাহা অপহরণ করিতেছে না, সুতরাং সে পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকিয়া, যাহা অন্যের আছে, অন্যে যাহার বলে বলীয়ান্, অথচ আমার নাই, তাহা পাইবার জন্য যদি আমার আন্তরিক আগ্রহ না জন্মে, তবে কদাচ আমি ঐ বলবানের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিব না। কেবল পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া, পূর্ব্বের অতীত সম্পদের আলোচনা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে কোনই ফলোদয় হয় না। নিজের জাতীয় জীবনের শক্তি যাহাতে

বর্দ্ধিত হয়, তাহার প্রয়াস স্বতঃপরতঃ করিতে হইবে। শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। আমার এই ছিল, আমি এই ছিলাম, এরূপ ব্যর্থ ও অলস চিন্তায় কোনই লাভ নাই, বরং ক্ষতিই অধিক। এই ভাবে, লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যদি আমরা আমাদের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করিতে পারি, তবেই আমাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, আমরা এই ঘোর দুর্য্যোগেও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিতে পারিব। অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা কিছু নীচ, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, যাহা কিছু অসৎ, ধর্ম্মভাব-বর্জ্জিত, তাহা উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় পরিহার করিয়া, যাহা সুন্দর, নির্ম্মল, নিষ্পাপ, মনোহর, যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, তাদৃশ সদ্ভাবপুষ্প চয়ন করিব, এবং সেই সদ্ভাব-কুসুমে আমার জননী, অনাদৃতা, উপেক্ষিতা বঙ্গবাণীকে অলঙ্কৃতা করিব, মায়ের সন্তান আমরা, মাতৃপূজা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব। যে বায়ু মধুকণা বহন করে না, তাহা আমরা আঘ্রাণ করিব না, যে নদী মধুমতী নহে, যে লতা মধুময় কুসুমে কুসুমিত নহে, তাহার প্রতি আমরা চাহিব না। এই ভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের অনুকূল হইবে, সহায় হইবে। নিঃসপত্নভাবে আমরা পূর্ব্বোদিত চন্দ্রমার ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিব। হিমাচল যে দেশের পর্ব্বত, জাহ্নবী যমুনা যে দেশের প্রবাহিণী, সাম যে দেশের সঙ্গীত, রামায়ণ মহাভারত যে দেশের ইতিহাস, আমরা সেই দেশের অধিবাসীর যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব। আপনারা আজ আমাকে যে উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন,—বঙ্গবাণীর চরণপ্রান্তে বসিবার সুযোগ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশপূর্ব্বক আমি আবার বলি, আপনাদের ভাষা, আপনাদের ভাব, আপনাদের চিন্তা—এ সমস্তই সুন্দর হউক, অন্যের অনুরঞ্জক হউক, যাহারা আপনাদের সন্নিকর্ষে আসিবে, তাহাদিগকেও উন্নতির পথে লইয়া, আপনারা নিজে ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায়, অবাধ গতিতে, উন্নতির অমৃতময় পারাবারে মিশিয়া যাউন। নিজের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগতের বরেণ্য হউন। বিধাতার কৃপায়:—

মধু ক্ষরতু তে চিত্তং মধু ক্ষরতু তে মুখম্।
মধু ক্ষরতু তে শীলং লোকো মধুময়োঽস্তু তে॥

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায়, ৫ম খণ্ড।]   ১৩২৩ সাল, ভাদ্র।   [৫ম সংখ্যা।

মধুসূদনের নাট্যসাহিত্য

এবং

বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে তাঁহার স্থান।*

মধুসূদন যে সময়ে নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, সে সময় বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের নিতান্ত শৈশবকাল এমন কি জন্মকাল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল নাটক বঙ্গের সাহিত্য আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাদিগের দ্বারা আমাদিগের নাট্যলালসা তৃপ্তিলাভ করে নাই। উহাদিগের প্রত্যেকটীর পাঠ বা অভিনয়ের পর 'উহা ঠিক মনোমত হয় নাই' এইরূপ একটা অতৃপ্তি থাকিয়া গিয়াছিল। ঐ নাটকগুলির মধ্যে কতকগুলি তৎকালপ্রচলিত যাত্রার ঢঙ্গে রচিত এবং অবশিষ্টগুলি সংস্কৃত বা ইংরাজি নাটকের বঙ্গানুবাদমাত্র। যেগুলি যাত্রার ঢঙ্গে রচিত হইয়াছিল সেই গুলির মধ্যে নাট্যবীজ বিদ্যমান থাকিলেও তাহাদিগকে আধুনিক নাটক পর্য্যায়ের মধ্যে গণ্য করা যায় না। কারণ সে গুলির প্রাণ সঙ্গীত এবং সেই সঙ্গীতের রাগ, তাল, মান, মূর্চ্ছনার ভিতর দিয়াই তাহাদিগের যাবতীয় চেষ্টা বা ব্যবহার প্রকাশ পাইয়াছিল। নায়ক নায়িকার মনোভাবের সহিত যাহাদিগের সুর বা তালের সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হইত তাহারাই অধিক পরিমাণে সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারিত। এই জাতীয় কাব্যগুলি গীতিকাব্যেরই উৎকর্ষসাধক; উহাদিগকে আধুনিক দৃশ্যকাব্যের পর্য্যায় হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া গীতিকাব্যের

* সাহিত্য সভার মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

পর্য্যায়ভুক্ত করিলে সেই কাব্যবিশেষেরই সৌন্দর্য্যবিধান করে, আমাদিগের নাট্যলালসা চরিতার্থ করিতে পারে না। সংস্কৃত বা ইংরাজী নাটকের বঙ্গানুবাদরূপে যে নাটকগুলি অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাদিগের নিজেদের গর্ব্ব করিবার কিছুই ছিল না, কারণ অনুবাদের কৃতিত্বাকৃতিত্ব ব্যতীত অপর সমুদায়ই মৌলিক নাট্যকারেরই প্রাপ্য ছিল। সুতরাং এই জাতীয় দৃশ্যকাব্যের দ্বারাও আমাদের নাট্যপিপাসা মিটে নাই। মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ব্বে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ও ভদ্রার্জ্জুন নামে দুইখানি মৌলিক নাটক আবির্ভূত হইয়াছিল। প্রাচীনত্বের হিসাবে উহাদের মূল্য থাকিলেও আমাদিগের নাট্যপিপাসা তাহাতেও নিবারিত হয় নাই। ভদ্রার্জ্জুনে পাশ্চাত্যরীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, কিন্তু আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে রচিত হওয়ায় কাব্যাংশই স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, নাটকাংশ স্ফূর্ত্তি পায় নাই। এরূপ পদ্ধতিও দৃশ্যকাব্যের রীতি নহে; সুতরাং ভদ্রার্জ্জুন দ্বারাও আমাদের নাট্যাকাঙ্ক্ষা মিটিল না। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব প্রাচীন সংস্কৃতরীতির প্রকরণবন্ধানুক্রমে রচিত হইয়াছিল এবং উহার আভ্যন্তরিক গঠনপ্রণালী দৃশ্যকাব্যানুমোদিত হয় নাই, কারণ দৃশ্যকাব্যে নাট্যক্রিয়ার ঐক্য থাকে এবং উহা স্রোতস্বতীর ন্যায় কতকগুলি ক্ষুদ্র অসমাপিকা ক্রিয়া আপনার অঙ্গে মিশাইয়া লইয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। কুলীনকুলসর্ব্বস্বের নাট্যক্রিয়া এরূপ পরস্পরাপেক্ষিভাবে সম্পাদিত হয় নাই, সেইজন্য উহার প্রত্যেক ঘটনা পৃথক্ চিত্র বলিয়াই অনুমিত হয় এবং একটী উঠাইয়া লইলে অপরের অঙ্গহানি হয় না। সুতরাং উহা দ্বারাও আমাদের নাটকের আশা ফলবতী হয় নাই।

নাট্যসাহিত্যের পূর্ব্বোক্ত গঠনরীতি যখন সার্ব্বজনীন সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিল না, এবং কতকটা ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় উপনীত হইয়া রহিল, তখনই এক শুভ মূহূর্ত্তে মধুসূদন বাঙ্গালা নাটকের ভাগ্যনিয়ন্তৃরূপে নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহার গঠনরীতি নির্ণীত করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠাই তাঁহার অবলম্বিত রীতির প্রথম ফল। যদিও তাঁহার অবলম্বিত রীতি পরবর্ত্তী কালের ভূয়োজ্ঞানের পরিমাপে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই এবং তজ্জন্য উত্তরকালের নাটকের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তথাপি তাহা এত সামান্য যে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা নাটকসমূহ তাঁহারই গঠনাদর্শে রচিত হইতেছে। ইহা

তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। এই হিসাবে নাট্যসাহিত্যে তাঁহার স্থান খুব উচ্চে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার গ্রন্থসমালোচকেরা তাঁহার এই বিশিষ্টতার কথা উপেক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রব্যকাব্যের ইতিহাসে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া তাঁহার নাম যেরূপ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, দৃশ্যকাব্যেরও ইতিহাসে তাঁহার নাম, বাঙ্গালা নাটকের জনকরূপে না হইলেও, আধুনিক নাট্যসাহিত্যের প্রবর্ত্তক স্বরূপ, লিখিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

মধুসূদনের প্রতিভা শ্রব্যকাব্যের উৎকর্ষ সাধন করিলেও দৃশ্যকাব্যকে অনুপভোগ্য করে নাই; আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাঁহার নাটকের যথাশক্তি সমালোচনা করিয়া এই কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

মধুসূদনের প্রথম নাটক শর্ম্মিষ্ঠা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে উহার প্রথম অভিনয় হয়। আমাদিগের প্রথম জাতীয় নাটক হিসাবে ইহার একটু বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহার গঠন প্রণালী আধুনিক রীত্যনুমোদিত হইলেও ইহার ভাব বা রুচি প্রাচীন প্রথার অনুবর্ত্তী ছিল। প্রাচীন প্রথানুমোদিত নান্দী, নান্দ্যন্তে সূত্রধার ইত্যাদির সমাবেশ ইহাতে ছিল না বটে, তবে মধুসূদন তাঁহার প্রথম নাটক প্রস্তাবনাহীন করিতে সাহসী হন নাই। সেই জন্য একটা নূতন কিছু করিতেছেন ইহার বিজ্ঞাপন দিবার মানসেই স্বকপোলকল্পিত রীতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবনাটী সংযোগ করিয়াছিলেন—

"মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়।
যে সময়, দেশময়, নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারত ভূমি   কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর   হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস   কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্যরঙ্গে   মজে লোক রাঢ়ে, বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

সুধারস অনাদরে বিষবারি পান করে
তাহে হয় তনু, মন ক্ষয়।
মধু কহে, জাগো মাগো, বিভু স্থানে এই মাগো
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক তব তনয় নিচয়॥"

এই ধরণের প্রস্তাবনা পরবর্ত্তী কালের দুই একজন নাটককার তাঁহাদের কোন কোন নাটকে ব্যবহার করিয়াছিলেন। একটা নূতন কিছু বিজ্ঞাপিত করিবার উদ্দেশ্যেই উহার ব্যবহার হইত।

শর্ম্মিষ্ঠার আরম্ভ অতিশয় চিত্তাকর্ষক। বিদ্যাসুন্দর, কুলীনকুলসর্ব্বস্ব এবং রত্নাবলীর অভিনয়ে দর্শকেরা সে অভিনব চিত্র দেখিতে পান নাই। প্রথম দৃশ্যটী হিমালয় পর্ব্বত, দূরে ইন্দ্রপুরী অমরাবতী। শর্ম্মিষ্ঠার ভাষায় এই দৃশ্যটীর পরিচয় দিতেছি:—"স্থানে স্থানে তরুশাখায় নানা বিহঙ্গমগণ মধুস্বরে গান কচ্চে, চতুর্দ্দিকে বিবিধ বনকুসুম বিকশিত, ঐ দূরস্থিত নগর হ'তে পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধসহকারে মৃদুমন্দ পবন সঞ্চার হচ্চে, আর কখন কখন মধুরকণ্ঠী অপ্সরী-গণের তাল লয় বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকুহর শীতল কচ্চে, কোথাও ভীষণ সিংহের নাদ, কোথাও ব্যাঘ্র মহিষাদির ভয়ঙ্কর শব্দ, আবার কোথাও বা পর্ব্বতনিঃসৃতা বেগবতী নদীর কুলকুলধ্বনি হচ্ছে ইত্যাদি।" এই সমুদায় দৃশ্যটী দৃশ্যপট, অভিনেতা ও তদুপযুক্ত সাজসরঞ্জামের সাহায্যে এক অভিনব চিত্রে চিত্রিত হইয়া বাঙ্গালী দর্শকের মানসনেত্রে অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোহর সামগ্রীরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। শর্ম্মিষ্ঠায় রত্নাবলীর সাদৃশ্য অনেক আছে। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে বারংবার রত্নাবলীর অভিনয় দর্শন করিয়া মধুসূদনের হৃদয়ে উক্ত নাটিকার ভাব এরূপ দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল যে কিছুতেই তিনি তাহা অপসারিত করিতে পারেন নাই। সেইজন্য উভয় গ্রন্থে এতাদৃশ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যোগীন্দ্রবাবু মধুসূদনের জীবন চরিত গ্রন্থে এই সাদৃশ্য অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"উভয় গ্রন্থেই দুইজন নায়িকা, জ্যেষ্ঠা অভিমানিনী ও কোপনা, কনিষ্ঠা অভিমানশূন্যা ও মুগ্ধস্বভাবা, রূপগুণে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার নিকট পরাভূতা। উভয় গ্রন্থেই কনিষ্ঠা কিছুদিনের জন্য জ্যেষ্ঠার দাসী; কিন্তু পরিণামে কনিষ্ঠারই জয়। উভয় গ্রন্থেই জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে স্বামীর দৃষ্টিপথ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা

করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রাজার রূপে উভয় গ্রন্থের নায়িকাই সমান মুগ্ধা। যতদিন কনিষ্ঠাকে না দেখিয়াছিলেন, ততদিন উভয় গ্রন্থের নায়কই জ্যেষ্ঠার প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্ত, কিন্তু কনিষ্ঠাকে দেখিবামাত্র উভয়েরই প্রেম শরতের মেঘের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে।"

এই সাদৃশ্য রক্ষার আরও এক কারণ আছে। মধুসূদন প্রতীচ্যরীতির পক্ষপাতী হইলেও সংস্কৃত রীতির নাট্যাভিনয় দর্শনে অভ্যস্ত প্রাচীন সম্প্রদায়ের সম্মুখে, তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায়, তাঁহার প্রথম নাটক শর্ম্মিষ্ঠাকে আমূল বিলাতী পরিচ্ছদে বাহির করিতে পারেন নাই। সেইজন্য রত্নাবলীর সহিত তুলনা করিলে নিম্নলিখিত প্রভেদগুলি দেখিতে পাই। শর্ম্মিষ্ঠার নায়ক রত্নাবলীর নায়কের ন্যায় কেবলমাত্র আদিরসের একান্ত সাধক ছিলেন না; দস্যু হস্তে নিপীড়িত দরিদ্রব্রাহ্মণের উদ্ধারার্থে বীররসের অভিনয়েও পশ্চাৎপদ হন নাই। ইহার নায়িকাও সাগরিকার ন্যায় প্রণয়াস্পদের বিরহে বিধুর হইয়াও হৃদয়বিহীনা ছিলেন না। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পরিচারিকা দেবিকার সহিত কথোপকথনে শর্ম্মিষ্ঠার সহৃদয়তার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। রত্নাবলীর বিদূষক বসন্ত উৎসবের আমোদে উন্মত্ত হইয়া মদনিকার হস্তধারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠার বিদূষক তাহার উপর মাত্রা চড়াইয়া রাজার চিত্তবিনোদনার্থ আনীত নটীর চুম্বনপ্রয়াসীও হইয়াছিলেন। শ্রীহর্ষদেব বসন্ত উৎসবের ব্যপদেশে এই কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার সাত খুন মাপ, মধুসূদনের কিন্তু সেরূপ কোন কৈফিয়ৎ নাই। এইরূপ স্থানে স্থানে ভাব ও রুচির-ইতরবিশেষ থাকিলেও শর্ম্মিষ্ঠা প্রাচীন রুচিরই অনুবর্ত্তিনী ছিল।

শর্ম্মিষ্ঠা প্রকাশিত হইবার পর তৎকালীন সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতমণ্ডলী ইহা কিছুই হয় নাই একবাক্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। যোগীন্দ্রবাবু তাঁহার মধুসূদনের জীবন চরিত গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী নির্দ্দেশিত 'দুঃশ্রবত্ব', 'চ্যুতসংস্কারত্ব', 'নিহতার্থত্ব', 'অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ' প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত দোষ নিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদিগের মনে হয় শর্ম্মিষ্ঠা পাঠ করিয়া তাঁহারা এই মত প্রকাশ করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণজ্ঞানশূন্য মধুসূদন নাটক লিখিতে অক্ষম এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকিবেন। কারণ আমরা অলঙ্কার শাস্ত্রের সাহায্যেই দেখাইতে চেষ্টা

করিতেছি যে মধুসূদন বাঙ্গালাভাষায় বর্ণজ্ঞানশূন্য হইয়াও কিরূপ দক্ষতার সহিত শর্ম্মিষ্ঠা রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন কোন কালেই অলঙ্কার শাস্ত্র-প্রণেতা বিশ্বনাথের পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারেই অলঙ্কার শাস্ত্রানুমোদিত দৃশ্যকাব্যের লক্ষণচয় শর্ম্মিষ্ঠায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বোধ হয়, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের রত্নাবলীর অভিনয়ই তাঁহাকে উক্ত রীতি অনুকরণ করিতে শিখাইয়াছে।

মধুসূদন তাঁহার শর্ম্মিষ্ঠাকে নাটক নামে অভিহিত করিলেও ইহা অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত নাটিকালক্ষণাক্রান্ত। সাহিত্যদর্পণকার নাটিকার লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন—

"নাটিকা কৢপ্তবৃত্তা স্যাৎ স্ত্রীপ্রায়া চতুরঙ্কিকা।
প্রখ্যাতো ধীরললিতস্তত্র স্যান্নায়কো নৃপঃ॥
স্যাদন্তঃপুরসম্বন্ধা সঙ্গীতব্যাপৃতোঽথবা।
নবানুরাগা কন্যাত্র নায়িকা নৃপবংশজা॥
সম্প্রবর্ত্তেত নেতাঽস্যাং দেব্যাস্ত্রাসেন শঙ্কিতঃ।
দেবী পুনর্ভবেজ্জ্যেষ্ঠা প্রগল্ভা নৃপবংশজা॥
পদে পদে মানবতী তদ্বশঃ সঙ্গমোদ্বয়োঃ।
বৃত্তিঃ স্যাৎ কৌশিকী স্বল্পবিমর্ষাঃ সন্ধয়ঃ পুনঃ॥"

শর্ম্মিষ্ঠা যদিও মহাভারতের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে তথাপি মধুসূদন তাহা আমূল গ্রহণ করেন নাই। ইচ্ছামত গ্রহণ করায় ইহা কবিকল্পিত হইয়াছে। শর্ম্মিষ্ঠা যে স্ত্রীচরিত্রপ্রধানা সে বিষয়ের পরিচয় অনাবশ্যক। মধুসূদন ইহা পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত করিয়াছেন; সুতরাং সাহিত্য-দর্পণকারের হিসাবে ইহাতে এক অঙ্ক বেশী আছে, কিন্তু এ ত্রুটী নগণ্য। ইহার নায়ক যযাতি প্রখ্যাতচরিত এবং ধীরললিত লক্ষণাক্রান্ত (অর্থাৎ নিশ্চিন্ত, মৃদু এবং গীতবাদ্য-পরায়ণ)। যদিও দস্যুদমন করিবার নিমিত্ত ধীরোদ্ধতের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা কেবল সমস্ত নাটকের মধ্যে একটীমাত্র স্থানে, সুতরাং তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইঁহার নবানুরাগিণী কুমারী নায়িকা শর্ম্মিষ্ঠা নৃপবংশজা, অন্তঃপুর-চারিণী এবং সঙ্গীতব্যাপৃতা। জ্যেষ্ঠা পত্নী দেবযানীও উচ্চবংশসম্ভূতা, প্রগল্ভা এবং পদে পদে অভিমানিনী। সেই পত্নীর ত্রাসে যযাতি সর্ব্বদা সশঙ্ক। শর্ম্মিষ্ঠা

এবং যযাতির মিলন জ্যেষ্ঠাপত্নীর কর্তৃত্বে সম্পাদিত হইয়াছিল। কৌশিকী বৃত্তি নাটিকাতে থাকা আবশ্যক এবং পঞ্চসন্ধির মধ্যে বিমর্ষসন্ধি নাটিকায় কম থাকে।

সামান্য ইতর বিশেষ থাকিলেও শর্ম্মিষ্ঠা প্রধানতঃ উল্লিখিত লক্ষণক্রান্তা হওয়ায় ইহার স্থান নাটিকাপর্য্যায়ের ভিতরে অবিসংবাদিত রূপে দেওয়া যাইতে পারে। আমাদিগের এই মত দৃঢ়ীভূত করিবার মানসে অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত লক্ষণের আরও একটু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। কৌশিকীবৃত্তি এবং সন্ধি শর্ম্মিষ্ঠায় কিরূপ ভাবে আছে প্রথমে তাহারই আলোচনা করিতেছি। সাহিত্য-দর্পণকার কৌশিকীবৃত্তির লক্ষণ দিয়াছেন—

"যা শ্লক্ষ্ণনেপথ্যবিশেষচিত্রা
স্ত্রীসঙ্কুলা পুষ্কলনৃত্যগীতা।
কামোপভোগপ্রভবোপচারা
সা কৌশিকী চারুবিলাসযুক্তা॥"

মনোরম সাজসজ্জাশোভা, স্ত্রীসঙ্কুলতা, নৃত্যগীতবাহুল্য, কামভোগোপচার এবং চারুবিলাস যে সব ব্যাপারে অর্থাৎ নায়কাদির চেষ্টাবিশেষে বর্ত্তমান থাকে তাহাই কৌশিকীবৃত্তি।

নর্ম্ম, নর্ম্মস্ফূর্জ্জ, নর্ম্মস্ফোট এবং নর্ম্মগর্ভ নামে কৌশিকীবৃত্তির চারিটী অঙ্গ আছে।

প্রথম নর্ম্ম—বৈদগ্ধক্রীড়াই নর্ম্ম—যযাতি দেবযানীকে দর্শন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কোন নির্জ্জন গৃহে চিত্তবিকারজনিত চিন্তায় চিন্তিত আছেন। সেই সময় বিদূষকের সহিত নানাবিধ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দেবযানীর প্রতি মহারাজের অনুরাগ জানিতে পারিয়া সহাস্য বদনে বিদূষক বলিতেছেন—

"এমন কিছু নয়, তবে তা' হ'লে রাজলক্ষ্মীর নিকট বিদায় হোন, রাজদণ্ড পরিত্যাগ ক'রে বীণাগ্রহণ করুন, আর রাজবৃত্তির পরিবর্ত্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন।"

রাজা—"কেন? কেন?"

বিদূ—"বয়স্য! আপনি কি জানেন না লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী! অতএব ভূমণ্ডলে সপত্নীপ্রণয় কি সম্ভব?" ইত্যাদি।

বিদূষকের এইরূপ বাক্‌চাতুর্য্যই এখানে শুদ্ধহাস্য নর্ম্ম হইয়াছে। দ্বিতীয় নর্ম্মস্ফূর্জ্জ—আরম্ভে সুখ ও ভয়ে সমাপ্ত নায়ক নায়িকার যে প্রথম মিলন তাহাই

নর্ম্মস্ফূর্জ্জ। শর্ম্মিষ্ঠার সহিত মিলনে যযাতির যে সুখ হইয়াছিল দেবযানী সেই সুখের বিষয় অবগত হওয়াতে চতুর্থাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে বিদূষকের সহিত রাজার ভীতিসঙ্কুল যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই নর্ম্মস্ফূর্জ্জ।

তৃতীয় নর্ম্মস্ফোট—লেশমাত্র ভাবে অনুরাগের অল্পসূচনা নর্ম্মস্ফোট। গোদাবরীতীরস্থ পর্ব্বতমুনির আশ্রমে অশোক বৃক্ষতলে চিন্তামগ্ন শর্ম্মিষ্ঠাকে দেখিয়া যযাতির মনে যে প্রথম অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল তাহাই নর্ম্মস্ফোট। চতুর্থ নর্ম্মগর্ভ—ছদ্মবেশী নায়কের রসানুকূল ব্যবহার নর্ম্মগর্ভ নামে অভিহিত। শর্ম্মিষ্ঠার নর্ম্মগর্ভ অঙ্গের কোন অস্তিত্ব নাই। শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যযাতির প্রণয় অবগত হইয়া দেবযানী ছদ্মবেশে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নায়ক ছদ্মবেশে কোনরূপ রসানুকূল ব্যবহার না করায় উহাকে ঠিক নর্ম্মগর্ভ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কৌশিকী বৃত্তির উল্লিখিত চারি অঙ্গ ব্যতীত মনোরম সাজসজ্জাশোভা, স্ত্রীসঙ্কুল নৃত্যগীত বাহুল্য, কামভোগোপচার এবং চারুবিলাস প্রভৃতি অবশিষ্ট অঙ্গবিশেষও ওতপ্রোতভাবে শর্ম্মিষ্ঠায় বিজড়িত আছে। উহারা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই উহাদিগের উদাহরণ প্রয়োগে বিরত হইলাম। অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত নাটিকার অন্যান্য লক্ষণও শর্ম্মিষ্ঠায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। আমরা পরে পরে সেগুলি দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। শর্ম্মিষ্ঠা পঞ্চসন্ধি-সমন্বিত। সমগ্র গ্রন্থাংশই এক প্রয়োজন সিদ্ধির অভিমুখে ধাবিত হইবে এবং সেই মুখ্য প্রয়োজনের যে সকল অবান্তর প্রয়োজন আছে তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকিবে, তাহাই সন্ধি। এই সন্ধি মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ এবং উপসংহৃতি বিভাগে পাঁচ প্রকার।

মুখ—যে ঘটনায় মুখ্যফলের বীজ উৎপন্ন হয় তাহাই মুখসন্ধি। পর্ব্বতমুনির আশ্রমে যযাতি ও শর্ম্মিষ্ঠার প্রথম দর্শন জনিত পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বীজোৎপত্তিমূলক মুখসন্ধি।

প্রতিমুখ—স্পষ্টাস্পষ্টভাবে বীজোদ্ভেদই প্রতিমুখ সন্ধি। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে যযাতি ও শর্ম্মিষ্ঠার প্রণয় দেবিকার নিকট স্পষ্টভাবে উদ্ভিন্ন হইয়াছিল; কিন্তু বিদূষক ও দেবযানীর নিকট তখনও অস্পষ্টভাবে উদ্ভিন্ন ছিল। এইরূপ স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ভাবে বীজোদ্ভেদই শর্ম্মিষ্ঠার প্রতিমুখ সন্ধি।

গর্ভ—একাধিকবার হ্রাস এবং অন্বেষণ মিশ্রিত অনুরাগ সমুদ্ভেদই গর্ভসন্ধি। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রাজান্তঃপুরস্থ উদ্যানমধ্যে যযাতির সহিত শর্ম্মিষ্ঠার প্রথম প্রেমালাপ রাজমহিষীর ভয়ে কথঞ্চিৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং চতুর্থাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে শর্ম্মিষ্ঠার গোপন প্রণয়ের ব্যাপার দেবযানীর কর্ণগোচর হওয়ায় রাজা ও বিদূষকের শঙ্কাসূচক কথাবার্ত্তা দ্বারা উহা পুনরায় হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। গোদাবরীতীরে শর্ম্মিষ্ঠাকে দর্শনানন্তর রাজার পুনরায় তাহাকে দেখিবার সাধ হয়; এবং সেই সাধপূরণার্থে তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শর্ম্মিষ্ঠার জন্য যযাতির অন্বেষণ আছে। এইরূপ একাধিকবার হ্রাসান্বেষণমিশ্রিত অনুরাগ সমুদ্ভেদই শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভসন্ধি।

বিমর্ষ—গর্ভসন্ধি অপেক্ষা অধিক উদ্ভিন্ন অনুরাগাদি মুখ্যফলোপায় অভিশাপ ইত্যাদি বিঘ্নে অভিভূত হইলে বিমর্ষসন্ধি স্থির করিতে হয়। চতুর্থাঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে যখন শর্ম্মিষ্ঠার অনুরাগ রাজার ক্ষণবিরহজনিত বিলাপদ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত গর্ভসন্ধি অপেক্ষা অধিক স্ফুরিত হইয়াছিল তখন দেবযানীর গৃহত্যাগের সংবাদে উভয়ের মন মহাতেজস্বী শুক্রাচার্য্যের অভিশাপাদি ত্রাসে শঙ্কিত হইয়াছিল, এবং পরে যযাতি অভিশাপ প্রভাবে জরাগ্রস্তরূপ বিঘ্নেও অভিভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই ক্রিয়াদ্বারা বিমর্ষ সন্ধি হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন "নাটিকা স্বল্পবিমর্ষা"। নাটিকায় বিমর্ষসন্ধি স্বল্প থাকিবে। কিন্তু মধুসূদন বিশ্বনাথের এই আদেশ সম্যক্ প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। যযাতির জরাপ্রাপ্তি এবং তাঁহার সন্তানদিগের উপর অভিশাপ ইত্যাদি ঘটনাপরম্পরায় এই বিমর্ষসন্ধি স্বল্প না হইয়া প্রভূতই হইয়াছে। মধুসূদন উত্তরকালে কৃষ্ণকুমারীর ন্যায় যে বিষাদান্ত নাটক রচনা করিবেন বিমর্ষসন্ধির প্রতি তাঁহার অনুরাগেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

উপসংহৃতি—বীজবান্ মুখাদি অর্থ যথাযথভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া একার্থরূপ প্রয়োজনে প্রতিপাদ্য হইলে উপসংহার সন্ধি হয়। শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে মুখাদি সন্ধ্যর্থ যথাযথভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শর্ম্মিষ্ঠার মিলনরূপ একার্থে প্রতিপাদ্য হইয়া উপসংহার সন্ধি হইয়াছে।

বিষ্কম্ভক—অতীত বা ভবিষ্যৎ ঘটনার সূচনা ইহাতে হয়। অঙ্কের প্রথমেই ইহার সন্নিবেশ থাকে। মধ্যম পাত্র বা মধ্যম পাত্রদ্বয় অথবা একজন মধ্যম ও

একজন অধম পাত্র বিষ্কম্ভকে প্রবেশ্য। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের বকাসুর ও দৈত্যের কথোপকথনে শর্ম্মিষ্ঠার অতীত এবং দেবযানীর দাসীত্বরূপ তাঁহার ভবিষ্যৎ ঘটনারও সূচনা ইহাতে আছে। বকাসুর ও দৈত্যরূপ মধ্যম পাত্র দ্বারাই ইহা সূচিত হইয়াছে; সুতরাং শুদ্ধ বিষ্কম্ভক হইয়াছে।

প্রবেশক—ঠিক বিষ্কম্ভকের মত, কেবল প্রথম অঙ্কে প্রবেশক হয় না এবং প্রবেশকের পাত্র অধম। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমেই নাগরিকেরা দেবযানীর জন্য অধীরচিত্ত যযাতিকে লক্ষ্য করিয়া যে কথোপকথন করিয়াছিল তাহাতে যযাতির দেবযানী-প্রণয় সূচিত হইয়াছে। এখানে নাগরিকেরা সাধারণ লোক, সুতরাং পাত্রও অধম।

পতাকাস্থান—"সহসৈবার্থসম্পত্তির্গুণবত্যুপচারতঃ।
পতাকাস্থানকমিদং প্রথমং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

কোন এক বিষয়ের চিন্তামূলক ব্যবহার বা বাক্যপ্রয়োগ' চিন্তিত বিষয়ের সাধর্ম্ম্যসম্পন্ন অতর্কিত বিষয়ান্তরের সহিত সম্বদ্ধ হইলে প্রথম পতাকাস্থান বুঝিবে। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিদূষক ও মহারাজের কথোপকথনের মধ্যে দেবযানীকে লক্ষ্য করিয়া "ক্ষত্রিয়দুষ্প্রাপ্যা মহর্ষিকন্যা প্রাপ্তি" ইত্যাদি চিন্তামূলক ব্যবহার বা বাক্যপ্রয়োগ এই চিন্তিত বিষয়ের সাধর্ম্ম্যসম্পন্ন। "আহা সখে! তাঁর সহকারীদের মধ্যে একটী যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপ লাবণ্যের কথা কি বলিব" ইত্যাদি অতর্কিত বিষয়ান্তরের সহিত সম্বদ্ধ হওয়ায় পতাকাস্থান হইয়াছে।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত বিশ্লেষণে দেখা যাইতেছে যে ঈষৎ পরিবর্ত্তন ব্যতীত শর্ম্মিষ্ঠা সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত নাটিকারই লক্ষণোপেত। পূর্ব্ব বর্ণিত সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতগণ কেবলমাত্র অলঙ্কার শাস্ত্রের সপ্তম পরিচ্ছেদান্তর্গত দোষবিভাগের কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়া শর্ম্মিষ্ঠার দোষ-নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। অষ্টম পরিচ্ছেদ-বর্ণিত গুণবিভাগ স্পর্শ করেন নাই। আমরা কিন্তু অনুসন্ধান করিয়াও 'নিহতার্থত্ব', 'অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ' এবং 'চ্যুতসংস্কারত্ব' দোষের বেশী সন্ধান পাই নাই। বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে অতি অল্প স্থানেই 'দুঃশ্রবত্ব' দোষের সন্ধান পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সমুদায় রচনাই প্রসাদগুণসম্পন্ন; এবং স্থানে স্থানে মাধুর্য্যগুণও বেশ ফুটিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থল—তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেবযানী ও যযাতির কথোপকথন এবং চতুর্থাঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শর্ম্মিষ্ঠা ও

যযাতির বাক্যালাপ। উক্ত পণ্ডিতগণ নাটক সমালোচনা করিতে বসিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদকে কেন যে পরিত্যাগ করিলেন তাহা বোধগম্য হইল না। বোধ হয় শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় নগণ্য নাটকের সমালোচনায় অলঙ্কার শাস্ত্র কলঙ্কিত হইবে এই আশঙ্কায় ঐরূপ করিয়া থাকিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাধারণের সহানুভূতি হারাইবার ভয়ে মধুসূদন একেবারে বিলাতী পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারেন নাই। যখন দেখিলেন যে শর্ম্মিষ্ঠা সাধারণের উপেক্ষার সামগ্রী হয় নাই, বরং তাঁহাদের তৃপ্তিকরই হইয়াছে, তখন তাঁহার দ্বিতীয় নাটক পদ্মাবতীকে আসরে নামাইলেন। ইহার রচনা কাল আনুমানিক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ। বটতলায় জয়মিত্র মহাশয়দিগের এক ভবনে এই নাটক খানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। শর্ম্মিষ্ঠার সাফল্যে সাহসী হইয়া পদ্মাবতীর উপন্যাসভাগের জন্য মধুসূদন হিন্দু পুরাণ পরিত্যাগ করিয়া গ্রীক পুরাণ অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভাবলে সেই গ্রীক উপাখ্যানকে এরূপ হিন্দু আকার প্রদান করিয়াছিলেন যে, গ্রীক পুরাণানভিজ্ঞের সাধ্য নাই যে ইহার হিন্দুত্বে সন্দিহান হন। বৈচিত্র্যের আধার বিলাতী নাটকের আদর্শে মধুসূদন পদ্মাবতীকে শর্ম্মিষ্ঠা অপেক্ষা বৈচিত্র্যময়ী করিয়াছিলেন। পদ্মাবতীর পূর্ব্ববর্ত্তী নাটক সমূহের মধ্যে বোধ হয় সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস এবং হরিশ্চন্দ্র ব্যতিরেকে কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালা কোন ভাষারই দৃশ্য কাব্যের এরূপ বৈচিত্র্য ছিল না। শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় পদ্মাবতী স্ত্রীচরিত্রপ্রধান। তবে শর্ম্মিষ্ঠা মাত্র দুইজন নায়িকার লীলানিকেতন। আর পদ্মাবতী নিজে নায়িকাপদবাচ্যা হইলেও তিনজন দেববালার ক্রীড়াপুত্তলী। এই দেববালাদিগের মধ্যে শচীদেবীর চরিত্র মধুসূদন বিলাতী ছাঁচে ঢালিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা বা সংস্কৃত নাটকে এরূপ প্রকৃতির চরিত্র দৃষ্টিগোচর হয় নাই। স্ত্রীসুলভ কোমলতাই সংস্কৃত নাট্য কবির স্ত্রীচরিত্রের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ছিল; কিন্তু মধুসূদন সেই কোমলতার অন্তরালে যে কঠোরতা থাকিতে পারে এবং সরলতার পরিবর্ত্তে কুটিলতাও যে তাহাদিগের আভরণ হইতে পারে, তাহারই একটী মূর্ত্তিমতী ছবি ঐ শচীদেবীর চরিত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। শর্ম্মিষ্ঠায় যেমন পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীচরিত্র অধিক ফুটিয়াছিল, পদ্মাবতীতেও

সেইরূপ ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। নিজের মনীষাবলে এবং রামনারায়ণ তর্করত্ন অনুবাদিত স্ত্রীচরিত্রপ্রধান শকুন্তলা, রত্নাবলী, প্রভৃতি নাটক নাটিকার ভূয়োভূয়ঃ অভিনয় দর্শনের ফলে মধুসূদন স্ত্রীচরিত্রচিত্রণে সমধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা বা পদ্মাবতীতে মধুসূদন নিপুণতার সহিত দৃশ্যবিভাগ দেখাইতে পারেন নাই। দুই বা ততোধিক দৃশ্যের বর্ণনীয় বিষয় একই দৃশ্যে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এরূপ করায় একজন পাত্র পাত্রী যখন কথোপকথনে নিযুক্ত থাকেন তখন অপর দলের চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। ইহাতে নাটকের সজীবত্তা নষ্ট হয় এবং পাঠক বা দর্শকমণ্ডলীর কৌতূহল উদ্দীপ্ত না হইয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আমাদের মনে হয়, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের অনুকরণে মধুসূদন তাঁহার নাট্যগ্রন্থে দৃশ্যযোজনা করিয়া থাকিবেন। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে অঙ্কের মধ্যে পৃথক্ দৃশ্যযোজনা নাই এবং অঙ্কের প্রারম্ভেও কোন স্থান নির্দ্দেশ নাই। অঙ্কের মধ্যে পাত্রপাত্রীরা প্রয়োজনমত প্রবিষ্ট এবং প্রয়োজন মত নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। তাহাদের বর্ণনার মধ্য হইতেই ক্রিয়ার স্থান ও সময় নিরূপণ করিয়া লইতে হয়। এই কারণেই বোধ হয় সংস্কৃত দৃশ্য কাব্য বিবিধগুণে বিভূষিত হইয়াও কৃত্রিমতাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। অনেকস্থলে এইটী দোষের কারণ হইলেও সকলস্থলে সেরূপ হয় নাই। রত্নাবলী নাটিকায় আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার ক্রিয়া প্রথম দিবসের সন্ধ্যার প্রাক্কালে আরম্ভ হইয়া তৃতীয় দিবসের কিয়দংশ কালের মধ্যে নির্ব্বাহিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার সংযোগস্থল রাজার প্রাসাদাভ্যন্তরস্থ কদলীগৃহ, উদ্যান, রাজান্তঃপুর প্রভৃতি কয়েকটী নির্দ্দিষ্টস্থান মাত্র। সেইজন্য ঐ স্থানগুলি পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত না হইলেও সাধারণের বুঝিবার কোন অসুবিধা হয় না।

অঙ্কবিভাগে মধুসূদন যে সংস্কৃত নাট্য কবিদিগের অন্ধ অনুকরণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি তাঁহার নাটকান্তর্গত অঙ্কগুলিকে গর্ভাঙ্করূপ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক খণ্ডের উপরিভাগে সেই গর্ভাঙ্কের সংযোগ স্থলেরও নাম করণ করিয়াছিলেন। এ সকল অনুষ্ঠান সত্ত্বেও তিনি দৃশ্যযোজনায় পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। কারণ তাঁহার দৃশ্য মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যাহা দৃশ্যান্তরে দেখাইলেই ভাল হইত। দৃশ্য এই পদের স্থানে ‘গর্ভাঙ্ক’ পদ তিনি তাঁহার অগ্রগামী নাট্যকার রামনারায়ণের নিকট হইতে

পাইয়াছেন। সুতরাং ইহার জন্য তিনি দায়ী নহেন, তিনি কেবল অনুকারী-মাত্র। শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে যযাতির শাপোৎসর্গ ব্যতীত অপর সকল বিষয়েই মধুসূদন সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের অনুমোদিত পথে বিচরণ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতীতে কিন্তু সেরূপ করেন নাই। স্থায়ী রসের বিরোধী রসেরও আশ্রয় লইয়াছিলেন। সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন "আদ্যঃ করুণবীভৎসরৌদ্রবীরভয়ানকৈঃ।" করুণ বীভৎস, রৌদ্র বীর এবং ভয়ানকরস আদিরসের বিরোধী। সুতরাং আদিরসের বর্ণনায় ইহারা স্থান পাইবে না। পদ্মাবতী আদিরসপ্রধান নাটক। ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী দেববালার ক্রোধে পড়িয়া যেরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন তাহাতে করুণরসের উদ্দীপনা প্রভূতই হইয়াছিল; এবং শচীদেবী ও কলিদেব তাহাদিগের উপর যেরূপ রুদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে রৌদ্ররসেরও অভিনয় কম হয় নাই। মধুসূদনের এই সকল প্রাচীন নাট্যরীতি সম্বন্ধীয় ব্যভিচার দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি ধীরে ধীরে আলঙ্কারিক শৃঙ্খল পরিত্যাগ করিতেছিলেন।

পদ্মাবতীতে যেটুকু বাঁধাবাঁধি ছিল কৃষ্ণকুমারীতে তাহাও রহিল না। ইহাতে নাট্যকবির অগাধ কল্পনা বিস্তৃতপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় উন্মুক্ত আকাশে পরিভ্রমণ করিয়াছে এবং ইহার নাটকীয় চরিত্রগত ভাবরাজিও অম্বরের ন্যায় উদার হইয়া রাজান্তঃপুররূপ গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার নায়ক নারীসেবা পরিত্যাগ করিয়া দেশমাতৃকা ও কুলগৌরবের সেবা করিয়াছেন। ইহার নায়িকা প্রণয়-বিধুর হইয়াও পিতৃলাঞ্ছনাকারী প্রণয়াস্পদের অঙ্কশায়িনী হইবার পূর্ব্বেই পিতৃ-কুলের সম্মান রক্ষার্থ জীবন বলি দিয়াছেন। ইহার প্রতিনায়কদ্বয়ের মধ্যে একজন যোদ্ধৃবেশে নেপথ্যেই দণ্ডায়মান ছিলেন, রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইবার অবসর পান নাই। অপর জনও নায়িকালাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আবাল্যসেবিত লাম্পট্য পরিত্যাগ করিয়া রাজোচিত বীরত্বে বিভূষিত হইয়াছিলেন। ইহার মন্ত্রিদ্বয় স্বধর্ম্মনিরত এবং রাজা ও রাজত্বের মঙ্গলকামী। ইহার বিলাসবতী ও মদনিকার চরিত্র মৃচ্ছকটিক নাটকের বসন্তসেনা ও মদনিকার ছায়াপাতে সৃষ্ট হইলেও কার্য্যস্রোতে বিভিন্নপথে গমন করিয়াছে। বসন্তসেনার চারিত্রিক কোমলতা ব্যতীত অপর কোন গুণই বিলাসবতীতে প্রতিফলিত হয় নাই। বসন্তসেনার লালসা গুণজ, বিলাসবতীর লালসা কামজ; বসন্তসেনা গ্রন্থশেষে হত্যাপরাধ হইতে চারুদত্তকে উদ্ধার করিয়া নিজের অভীষ্টবস্তু লাভ করিয়াছিল। বিলাসবতী গ্রন্থারম্ভ

হইতেই জগৎসিংহের উপভুক্ত। তবে স্ত্রীসুলভ কোমলতার অভাব তাহার ছিল না। ধনদাস যখন জগৎসিংহের ক্রোধে পড়িয়া জীবন হারাইতে বসিয়াছিল, সে সময়ে বিলাসবতীরই আন্তরিক যত্নে তাহার জীবনরক্ষা হয়। মদনিকার চরিত্র এক অপরূপ কৌশলে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহারই কুহকজালে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উদয়পুররাজ ভীমসিংহ স্নেহের প্রতিমা কৃষ্ণাকে অকালে বিসর্জ্জন দিয়াছেন; মহামতিময়ী সাধ্বী রাজ্ঞীকে কন্যাশোকে মুহ্যমান অবস্থায় হারাইয়াছেন; এবং অবশেষে নিজেও রাজনৈতিক এবং পারিবারিক দুশ্চিন্তায় বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া জীবন্মৃত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র ধনদাসকে দমন করিবার জন্য মদনিকা যে কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে পড়িয়া ধনদাস পতঙ্গ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে উদয়পুর রাজপরিবারও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। নাট্যকার মদনিকা-চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এরূপ নিপুণতার সহিত এই শোক-পরম্পরা চিত্রিত করিয়াছেন যে, কোন স্থানে নাটকীয় সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই। নাটকটী বিষাদান্ত হইবে বলিয়া আরম্ভ হইতেই বিষাদের রেখা অন্তঃসলিলা ভোগবতীর ন্যায় উদয়পুররাজগৃহে বিদ্যমান ছিল। ইহার তপস্বিনী মালতীমাধবের সংসারত্যাগিনী কামন্দকীর ন্যায় সংসারাশ্রমের বহির্ভাগে থাকিয়াও সংসার লইয়াই বিব্রত। এই চরিত্রের অনুপাতে ভবিষ্যৎ নাটকে অনেক চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার ধনদাস ওথেলোর ইয়্যাগো চরিত্রের ছায়া অবলম্বনে রচিত, তবে ইহার নৃশংসতার ক্ষেত্র তাহার ন্যায় বিশাল ছিল না। কৃষ্ণকুমারীর আত্মহত্যা পাপ-কলুষিত নহে। বংশের মর্য্যাদা রক্ষা যে আত্মত্যাগের মূলে বর্ত্তমান, সে আত্মঘাতীর নিকট সর্ব্ববিধ বিসর্জ্জনই মূল্যবান্, প্রাণ ত তাহারই চরম দান। নাট্যকার এক অভিনব কৌশলে নায়িকার প্রাণনাশের কৌশল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে কৌশল মন্ত্রী-মহাশয়-আনীত এক পত্র। পত্রমধ্যে কৃষ্ণার প্রাণনাশের কথা ছিল। এই পত্রখানি যেরূপ ভীমসিংহ ও বলেন্দ্র সিংহকে যুগপৎ চমৎকৃত করিয়াছিল, কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণাও স্বপ্নযোগে তাঁহাদের বংশের নারী পরলোকগতা পদ্মিনীর আহ্বানে সেইরূপ বা ততোধিক চমৎকৃতা হইয়াছিলেন। মধুসূদন কিন্তু এই দুই ঘটনা এরূপ কৌশলের সহিত সম্পন্ন করাইয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকুমারীর দেহ বিসর্জ্জনের বা ভীমসিংহের তাহাতে সম্মতিদানের বিরুদ্ধে কেহ কোন ইঙ্গিত করিতে সাহস করেন নাই। কৃষ্ণকুমারীর রচনাকাল ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ।

তিনখানি নাটক ও দুইখানি প্রহসন লইয়াই মধুসূদনের নাট্য সাহিত্য পূর্ণ হইয়াছে। আমরা তাঁহার তিনখানি নাটক সম্বন্ধে যথোচিত আলোচনা করিয়াছি এবং ঐ আলোচনার মধ্যে উহাদিগের গুণই দেখাইয়াছি, দোষের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। এক্ষণে তাহাদিগের দোষ ও তাঁহার দুইখানি প্রহসন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই আজিকার প্রবন্ধ শেষ করিব।

মধুসূদনের নাট্যশিক্ষার হাতে খড়ি শর্ম্মিষ্ঠায় হইয়া ছিল; কৃষ্ণকুমারীতে তাহারই পরিণতি। তাঁহার নাট্যকলাকৌশল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া কৃষ্ণকুমারীতে উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। কি শর্ম্মিষ্ঠায়, কি পদ্মাবতীতে, এবং কি কৃষ্ণকুমারীতে নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্রসৃষ্টি মধুসূদন দক্ষতার সহিত দেখাইতে পারেন নাই। কৃষ্ণকুমারীতে উহার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র, কৃতকার্য্যতা লাভ হয় নাই। অপরিণত কুসুমস্তবক যেমন আলোক ও অন্ধকারের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া লোকলোচনের আনন্দপ্রদ হয়, নাটকীয় চরিত্রও সেইরূপ নানারূপ বৈধ এবং অবৈধ ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে বিকশিত হইয়া পাঠক বা দর্শকের প্রীতিবর্দ্ধন করে। মধুসূদনের কোন নাটকীয় চরিত্র এইরূপ ধরণে বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। সকলগুলিই যেন ফুটিতে ফুটিতে ফুটিল না এরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছে। যোগীন্দ্র বাবুর ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয়, "অতি কমনীয় মূর্ত্তি ক্ষীণাঙ্গ দেখিলে যেমন ক্লেশ বোধ হয়, মধুসূদনের নাটকীয় চরিত্রগুলিও আলোচনা করিলে, সেইরূপ ক্ষোভ জন্মে। মনে হয় যেন পরিবর্দ্ধিত হইতে হইতে হইল না,—যেন আরও দুই একটী কথা বলিলে, আরও দুই একটী ঘটনার সমাবেশ করিলে তাহাদিগের পূর্ণতা হইত।"

শর্ম্মিষ্ঠা পৌরাণিক নাটক। পৌরাণিক ভিত্তির উপরেই উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠার দেবযানীর দাসীত্বলাভ হইতে আরম্ভ করিয়া যযাতির জরাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ঘটনাবলিরই উল্লেখ করিয়াছিলেন; সুতরাং উহার পরিসর নিতান্ত অল্প এবং এই অল্প পরিসরের মধ্যে নাটকীয় চরিত্রের উন্মেষ প্রদর্শন প্রভৃত নাট্যশক্তির পরিচায়ক। মধুসূদন তাঁহার সাহিত্যসেবার প্রথম উদ্যমে সে নিপুণতা দেখাইতে পারেন নাই। ইহার পরবর্ত্তী নাটক পদ্মাবতীতে আখ্যায়িকা বিষয়ে পৌরাণিক বন্ধন না থাকিলেও বিষয় বৈচিত্র্যের দিকে নাট্যকারের লক্ষ্য থাকায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারীতে কিন্তু

চরিত্রসৃষ্টির দিকে লক্ষ্য থাকিলেও পূর্ণাবয়বসম্পন্ন চরিত্র একটীও সৃষ্ট হয় নাই। গ্রন্থের নায়ক ভীমসিংহের সুর বিষাদান্ত নাটকের সুরের সহিত বেশ মিলিলেও তাঁহার চরিত্রের একদেশই প্রদর্শিত হইয়াছিল। যে ঘটনার উপপ্লবে ভীমসিংহ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, এবং যাহাতে তাঁহার সুখশান্তি চিরদিনের জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই ঘটনার কোন চিত্র নাটকের মধ্যে স্থান পায় নাই। আমাদের মনে হয়, সেইরূপ কোন চিত্রের সমাবেশ থাকিলে তাঁহার অপর মানসিক বৃত্তির সহিত আমাদিগের পরিচিত হইবার সুযোগ থাকিত এবং তাহা তাঁহার চরিত্রোন্মেষের সহায়ক হইত। কৃষ্ণাচরিত্র বেশ ফুটিয়াছে, কিন্তু যে শিক্ষার ফলে পরলোকগতা পদ্মিনীর "যে যুবতী এ বিপুলকুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না" এই বাণীর অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে, সে শিক্ষার কোন নিদর্শন আমরা কৃষ্ণাচরিতে দেখিতে পাই নাই। এক স্থানে কৃষ্ণার সঙ্গীতবিদ্যা শিখিবার ইঙ্গিত আছে মাত্র। কিন্তু যে হৃদয়বল থাকিলে ঐ উক্তির ইঙ্গিত কার্য্যে পরিণত করিবার সাহস জন্মে সেরূপ কোন সাধনার বা সাধনকারী ঘটনার সমাবেশ দ্বারা কৃষ্ণার হৃদয়বলের পরিচয় দিবার কোন কৌশল দেখা যায় নাই। এরূপ কোন কৌশল থাকিলে কৃষ্ণাচরিত্রে মধুসূদন আরও পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেন। এইরূপ বিশ্লেষণ দ্বারা অন্য চরিত্রেরও অঙ্গহানিত্ব দেখান যাইতে পারে; কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে মাত্র নায়ক নায়িকা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। দৃশ্যবিভাগের দোষ আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি; সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। আর একটী দোষ মধুসূদনের প্রথম দুইখানি নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহার শেষ নাটক কৃষ্ণকুমারীতে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। মধুসূদন পাত্র পাত্রীর স্বগতচিন্তার মধ্যে দর্শক বা পাঠকদিগকে পরিচয় দিবার জন্য অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এটী নাট্যপ্রথানুমোদিত নহে। পাত্র বা পাত্রীর মনে স্বাভাবিক যে চিন্তার উদয় হয় তাহাই স্বগত উক্তির মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। শর্ম্মিষ্ঠা বা পদ্মাবতীতে মধুসূদন এ নিয়ম সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণকুমারীতে কিন্তু এ দোষ পরিহার করিয়াছিলেন।

এইবার তাঁহার প্রহসনের প্রসঙ্গ। নাটকবিভাগ অপেক্ষা প্রহসনবিভাগে

মধুসূদন অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রহসন সমাজদেহের দূষিতাঙ্গের প্রদর্শক। যখন কোন বিরুদ্ধাচার সমাজদেহে প্রবেশ করিয়া কোন অঙ্গবিশেষকে বিকৃত বা দূষিত করে, তখন প্রহসনরূপ দৃশ্যকাব্যই সেই বিকৃতাঙ্গ বা দূষিতাঙ্গকে লোক-লোচনের বিষয়ীভূত করিয়া সেই বিরুদ্ধাচারের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দেয়। ইহাই প্রহসনের কার্য্য। মধুসূদন এই জাতীয় দৃশ্যকাব্যের জনক ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মধুসূদনের পূর্ব্বে কুলপালকদিগের হৃদয়হীনতায় এবং কুলীন-কামিনীদিগের দুর্দ্দশায় তৎকালীন সমাজদেহে যে ব্রণ উদ্গত হইয়াছিল তাহার অস্ত্রচিকিৎসার জন্য তর্করত্ন মহাশয়ের কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক অবতারিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার চিত্রগুলি সজীব হয় নাই। সজীব চিত্রগুলি অভি-নয়ান্তে মানবমনের উপর যতটা কার্য্য করে নির্জীব চিত্র সেরূপ করে না। তর্করত্ন মহাশয়ের চিত্রগুলি নির্জীব—অভিনয়ের পর সেগুলির কথা কাহারও মনে থাকে না। মধুসূদন ব্যঙ্গচিত্রের আস্বাদ কুলীনকুলসর্ব্বস্ব হইতে পাইলেও তাঁহার অভিনব প্রণালীতে ইহার অবতারণা করিয়াছিলেন। মধুসূদনের প্রহসনে চিত্রিত চরিত্রগুলি সজীবও ক্রিয়াশীল হওয়ায় অধিক কার্য্যকরী হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে এই শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য-প্রণেতৃগণ মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ'কেই আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। মধুসূদনের সমকালীন ইয়ং বেঙ্গলের দল এবং ভণ্ডকপটাচারী হিন্দুর দল তৎকালীন হিন্দুসমাজের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। মধুসূদন তাহাদিগের কার্য্যকলাপ এই দুই গ্রন্থে অতি দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়া-ছেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় মধুসূদনেরপ্রহসন সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "হিন্দু জমিদারের মুসলমান রমণীর প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক নয়।" যে হিন্দু কপটাচারী, যাহার ভিতরে একরূপ বাহিরে অন্যরূপ, যে বিধিনিষেধের অতীত; সঙ্গোপনে যবনীগমন অপেক্ষাও গুরুতর কার্য্য করিতে সে সমর্থ। সুতরাং মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের দিক্ হইতে বিচার করিলে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই প্রতিবাদ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। মাইকেলের জীবন চরিত প্রণেতা যোগীন্দ্র বাবু একস্থানে বলিয়াছেন "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়ার শেষ অঙ্কে ভক্তপ্রসাদের সহিত ফতিমার ও হানিফের ধীরতার সহিত ব্যঙ্গ * * * * অস্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়।" আমাদিগের বিবেচনায় ইহা স্বাভাবিকই

হইয়াছে, কারণ পূর্ব্বমীমাংসিত বিষয়ই ধীরতার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। হানিফ ও ফতিমা উভয়েই জানে ভক্তপ্রসাদবাবুর এই কার্য্যের প্রতিফল তাহারা কিরূপে দিবে। সুতরাং তাহাদের ব্যঙ্গ ধীরতার সহিত সম্পাদিত হওয়ায় আরও তীব্র হইয়াছে। অধিকন্তু বাচস্পতি মহাশয়ের শিক্ষার ফলে হানিফ উগ্রতা ত্যাগ করিয়া ধীরতা অবলম্বন করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিল, গ্রন্থমধ্যে এ বিষয়েরও উল্লেখ আছে। যোগীন্দ্র বাবু কেন যে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন বুঝিতে পারিলাম না।

মধুসূদনের কালেই আমাদিগের জাতীয় নাটক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভাব ও রুচির পরিবর্ত্তনও এই কালের বিশেষত্ব। শুধু নাটক কেন, আধুনিক বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্য-মন্দিরে নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসনরূপে যে তিনটী বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন মধুসূদন ঐ সকলগুলিরই প্রতিষ্ঠাতা, পূজক এবং সাধক ছিলেন। পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত নাটকমূর্ত্তি, শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহারই কৃত গীতিনাট্যমূর্ত্তি—কারণ এইরূপ ধরণের নাটকই পরবর্ত্তী কালে গীতবহুল হইয়া গীতিনাট্যে প্রকটিত হইয়াছিল, সেইজন্য প্রত্যক্ষভাবে তিনি ইহার জনক না হইলেও উহার প্রবর্ত্তক ছিলেন—এবং একেই কি বলে সভ্যতা, ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া তাঁহারই সংকল্পিত প্রহসনমূর্ত্তি। সুতরাং বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসে তাঁহার আসন কত উচ্চে তাহা প্রমাণিত হইল। অধুনা তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নাট্যগ্রন্থ সকল পূর্ব্বোক্ত ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজিত আছে।

আসুন নাট্যভক্তবৃন্দ! সেই নাট্যপীঠে উপস্থিত হইয়া বাণীর একনিষ্ঠ সাধক মধুসূদনের উদ্দেশে আমাদিগের শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করি।

শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায়।

মিথিলার প্রাচীন কাহিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

রাজর্ষি জনক স্বয়ং তদীয় বংশাবলীর কীর্ত্তন করিয়াছেন। নিম্নে তাহা যথাযথ প্রদত্ত হইল :—

"অনন্তর রাজর্ষি জনক মহর্ষি বশিষ্ঠ ও নরপতি দশরথকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! মহারাজ! সৎকুলসম্ভূত আর্য্য ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে কন্যাসম্প্রদান সময়ে আপনার বংশাবলী সমুদায় আনুপূর্ব্বিক যথাযথ বর্ণন করেন, অতএব আমার বংশাবলীকীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা অবহিত হৃদয়ে শ্রবণ করুন।

স্বকর্ম্ম দ্বারা ত্রিভুবনবিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক মহাবল পরাক্রান্ত নিমি নামক এক নরপতি ছিলেন। নিমির পুত্রের নাম মিথি। মিথি অসীম তেজঃসম্পন্ন হইয়াছিলেন। এই মিথির নামানুসারে মিথিলা নগরী প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মিথির তনয়ের নাম জনক, জনকতনয়ের নাম উপাবসু; উপাবসুর ঔরসে সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত নন্দিবর্দ্ধন জন্ম পরিগ্রহ করেন। নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র রাজা সুকেতু। সুকেতুর পুত্র মহাবল দেবরাত; দেবরাতের তনয় বৃহদ্রথ; বৃহদ্রথের তনয় মহাবীর্য্যশালী মহাবীর্য্য। মহাবীর্য্যের তনয় ধৃতিমান্ সুধৃতি; সুধৃতির তনয় পরমধার্ম্মিক ধৃষ্টকেতু; ধৃষ্টকেতুর তনয় হর্য্যশ্ব; হর্য্যশ্বের তনয় প্রসিদ্ধক; প্রসিদ্ধকের তনয় ধর্ম্মাত্মা কীর্ত্তিরথ; কীর্ত্তিরথের তনয় দেবমীঢ়; দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ; বিবুধের তনয় অন্ধক; অন্ধকের তনয় কৃতিরাত; কৃতিরাতের তনয় কৃতিরোমা; কৃতিরোমার তনয় স্বর্ণরোমা; স্বর্ণরোমার তনয় মহাবল হ্রস্বরোমা; ধর্ম্মশীল মহাত্মা হ্রস্বরোমার দুইটি পুত্র হইয়াছিল; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ আমি ও কনিষ্ঠ এই কুশধ্বজ।

পিতা কৌলিক প্রথানুসারে আমাকে জ্যেষ্ঠতা নিবন্ধন রাজ্যে এবং কুশধ্বজকে কনিষ্ঠতা নিবন্ধন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনগমন করেন। পরে তিনি বার্দ্ধক্য অবস্থায় পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন

করিয়াছিলেন্। আমি দেব সদৃশ এই অনুজ ভ্রাতাকে আত্মশরীরের ন্যায় দেখিতে লাগিলাম।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে সাঙ্কশ্য নগরের অধিপতি মহাবল মহাবীর্য্য সুধম্বা এই মিথিলা নগরী অবরোধ করিলেন। তিনি দূত দ্বারা আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনার গৃহে যে দিব্য শঙ্করশরাসন আছে, আপনি প্রতিদিন যাহার পূজা করিয়া থাকেন, তাহা আমাকে প্রদান করুন। আমি নরপতি সুধম্বার প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে তিনি বলগর্ব্বে মত্ত হইয়া আমার সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। আমি মহীপতি সুধম্বাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া আমার প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজকে সকাশ্য নগরের রাজপদে অভিষিক্ত করিলাম। আমার দুই কন্যা সীতা ও উর্ম্মিলা রাম ও লক্ষ্মণকে প্রদান করিয়াছি।

পুরাকালে ভারতবর্ষের মধ্যে মিথিলার ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও শিক্ষা-প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট স্থান আর কুত্রাপি দৃষ্ট হ'ত না। বহু দূর দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ সেখানে সমাগত হইতেন। জনকের রাজসভা শিক্ষার একটি কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। বস্তুতঃ তাঁহার সভা ভারতের প্রধান প্রধান শিক্ষিত এবং বিবিধ ভাষাবিশারদগণ দ্বারা পূর্ণ থাকিত। মিথিলা বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায় পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকবৃন্দে মিথিলা সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত। তথাকার প্রধান আচার্য্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য। ইনি যজুর্ব্বেদ প্রযোক্তা ও সংহিতাকার। রাজার বহুকালের ঈপ্সিত পবিত্র উপনিষৎ গ্রন্থাদি এই সময় সঙ্কলিত হয়। উক্ত গ্রন্থাদি অধুনা হিন্দুগণের ঐশ্বর্য্য ও সম্মানের দ্রব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বস্তুতঃ বিদেহরাজ্যের কেন্দ্র ত্রিহুতে। উহার রাজধানী মিথিলা। কেহ কেহ মিথিলাই জনকপুরের নামান্তর বলিয়া অনুমান করেন। অন্য কেহ বলেন, জনকপুর রাজর্ষি বিদ্যানুরাগী জনকের নামানুসারেই নেপালরাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব দিগ্‌বর্ত্তী স্থানের কিঞ্চিৎ দূরে একটি সহর বিশেষ। উক্ত জনকপুর যে বিদ্যোৎসাহী মহাত্মা রাজর্ষি জনকের নামানুসারেই স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, ফুলহার (Phulhar) পল্লী বেণীপতি থানার ঈশানকোণে অবস্থিত। ঐ স্থানে রাজার

পুষ্পোদ্যান ছিল। তথায় যাজকগণ দেবপূজার্থে পুষ্প আহরণ করিতেন। জনকপুরে যেমন দেবী গিরিজার মন্দির ছিল, এই স্থানেও উক্ত নামে একটি সুরম্য মন্দির বিরাজিত। কথিত আছে, তথায় জনক-কন্যা সীতাদেবী কুমারী অবস্থায় উক্ত পুষ্পোদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া গিরিজার অর্চ্চনা করিতেন। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় তথায় কতিপয় ঋষি বাস করিতেন। সুপবিত্রা যমুনা ও কমলানদীর সঙ্গমস্থলে এক মহাপ্রভাব ঋষি বাস করিতেন। তাঁহারই নাম জৈমিনি ঋষি। তিনি দেবোপাসনার রীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত আরও গ্রন্থ আছে। কমলা ও কারাই নদীর সঙ্গম স্থলে কাকরাউল নামক গ্রামে অপর একজন মহর্ষি বাস করিতেন। তাঁহার নাম কপিলদেব। তিনিই জগদ্বিখ্যাত সংখ্যযোগপ্রণয়নকর্ত্তা কপিল।

বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গা থানার উত্তর পশ্চিমকোণে আহিরারী (Ahirari) নামে একটি গ্রাম আছে। তথায় কেবল ব্রাহ্মণের বাস। উক্ত গ্রামে একজন ঋষি বাস করিতেন। তাঁহার নাম গৌতম। এই তিন জন ঋষির নামানুসারেই ত্রিহুত বা তৈরহুত নাম হইয়াছে। * গৌতম সুবিখ্যাত ন্যায় শাস্ত্রের প্রণয়নকর্ত্তা ও অহল্যার ভর্ত্তা। তাঁহার নামানুসারেই গ্রামের নাম আহিরারী হইয়াছে। এই গৌতম ঋষির আশ্রম ও অহল্যার বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার সন্নিকটেই বিশাউল। এইস্থানে বিশ্বামিত্র ঋষির আশ্রম। কমতোউল রেলওয়ে ষ্টেসনের সন্নিকটবর্ত্তী জাগবান নামক স্থানে সুবিখ্যাত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের আশ্রম ছিল।

কতিপয় শতাব্দী পরে ব্রিজ্জানগণের কতিপয় উচ্চব্যক্তির হস্তে সাম্রাজ্যের শাসনভার পতিত হয়। উক্ত প্রজাতন্ত্র অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। অনন্তর বিদেহ রাজবংশেরই পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। মধ্যভাগে রাজধানী মিথিলা হইতে বৈশালী নগরে লইয়া যাওয়া হয়। উক্ত বৈশালী বর্ত্তমান মজঃফর পুর জেলার মধ্যবর্ত্তী বসাঢ় (Basarh) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। উক্ত ব্রিজ্জা-গণকে সর্ব্বশুদ্ধ আটটি বংশে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে লিচ্ছবিগণ সর্ব্বাগ্রে

* Mithila identified with the modern Tirhut by J. Talboys Wheeler vol. I. p. 563 and page 64 note and Wilson's Vishnupuran, p. 186.

উল্লেখযোগ্য। লিচ্ছবিগণ ক্ষমতাশালী হইলে মগধরাজের সঙ্গে তাহাদের বিসম্বাদ আরম্ভ হয়। তৎকালে মগধরাজ্য বলিলে বর্ত্তমান পাটনা ও গয়া জেলা লইয়া বুঝিতে হইত।

বিম্বিসার মগধরাজ্য ৫১৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দে স্থাপন করেন। তিনি মাতামহ রাজ্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। উক্ত রাজ্য ত্রিহুতের পশ্চিম দিকে বিরাজিত ছিল। উহাই কোশল রাজ্য নামে চির প্রসিদ্ধ। উক্তরাজবংশ লিচ্ছবিবংশের সহিত আদান প্রদান অর্থাৎ বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি লিচ্ছবিগণ বৈশালীর রাজবংশ হইতে উদ্ভূত। যাহা হউক, অজাতশত্রু উপযুক্ত পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া সিংহাসনাধিকার করিলেন। সেই হেতু বৃদ্ধ কোশলরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। বিম্বিসারমহিষী বৃদ্ধ কোশলরাজের ভগিনী। তিনি পুত্রহস্তার ভীষণ কার্য্য দর্শন করিয়া অতি বিষাদে তনুত্যাগ করিলেন। এই যুদ্ধে অজাতশত্রু জয়লাভ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার দৃষ্টি ত্রিহুতে পতিত হইল। তিনি উক্ত রাজ্যগ্রহণে নিতান্ত লোলুপ হইয়া পড়িলেন। এই স্থলে লিচ্ছবিগণ ত্রিহুত রাজের প্রধান নেতা ও অজাতশত্রু বিশেষ শত্রু হইয়া উঠিলেন। ইহা ৪৯০ খৃঃ পূঃ সংঘটিত হয়। অজাতশত্রু এই আক্রমণেও ফললাভ করিলেন। লিচ্ছবিরাজধানী বৈশালী অজাতশত্রুর করতলগত হইল। অজাতশত্রু ত্রিহুতের রাজা হইলেন। তখন মগধ রাজ্য গঙ্গা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিল। এই সময় পাটলীপুত্র নগর স্থাপিত হইল। পাটলীপুত্র বর্ত্তমান পাটনা। তখনও লিচ্ছবিগণের ক্ষমতা প্রশমিত হয় নাই। সুতরাং তাঁহাদিগকে শাসন করিবার জন্য গঙ্গানদীর উপর অবস্থিত পাটলী গ্রামে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হয়।

বুদ্ধদেব বৈশালী নগরে বসিয়া অনুমান খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪৯০ অব্দে ধর্ম্মপ্রচার করেন। দ্বিতীয় সুবৃহৎ বৌদ্ধসংঘ খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সমবেত হইলে ত্রিহুত তাহার কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। তদনন্তর কতিপয় শতাব্দী ত্রিহুতের কোন বিবরণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অবশেষে যখন লিচ্ছবিগণ ও ব্রিজ্জাগণগণ মৌর্য্য রাজগণের করদ রূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন হইতে পুনরায় ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। পরে গুপ্তবংশের অভ্যুত্থান হইলে তাঁহারা তীর-

ভুক্তি বা ত্রিহুতে সম্ভবতঃ রাজধানী স্থাপন করেন। ত্রিহুত গুপ্তরাজ্যের জেলা বিশেষ ছিল। বসাঢ়ের বর্ত্তমান খনন কার্য্যের ফলে আবিষ্কৃত প্রস্তরফলকাদিতে চতুর্থ ও পঞ্চম খৃষ্টাব্দের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূগর্ভ হইতে কতিপয় রাজার শিলমোহরও বহির্গত হইয়াছে। * উক্ত মোহর সকল কোন পত্রে অঙ্কিত ছিল। তাহাতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে বৈশালীতে অবস্থিত কতিপয় প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে রাজপ্রতিনিধি বা স্বয়ং নরপতি তাঁহাদের আদেশ নামা প্রেরণ করিতেছেন। উক্তপত্রে তৈরভুক্তি প্রদেশের কর্ম্মচারিগণকে কোন আদেশ প্রদান করা হইতেছে তাহাও উল্লিখিত আছে। সুতরাং তৈরভুক্তি বলিয়া কোন প্রদেশ ছিল, সন্দেহ নাই। উক্ত প্রদেশ বৈশালীর সন্নিকটবর্ত্তী হইবে। অধিকন্তু মোহরাঙ্কিত পত্রাদিতে পাটনা ও অন্যান্য প্রদেশের বণিক্ ও সার্থবাহ শ্রেণীর কথা আছে। ইহাতে অনুমিত হয় যে সেই প্রাচীনকালে উত্তর ভারতবর্ষে বর্ত্তমান বণিক্ সভার ন্যায় (Chamber of Commerce) বৃহৎ সভা ছিল। তাহাতে বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা প্রণীত হইত। সামন্তবর্গ, শাসনকর্ত্তৃগণ, জঙ্গিলাট, পুলিসের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী, রাজগৃহাধ্যক্ষ, সৈন্যবিভাগীয় খাজাঞ্চীখানার খাজাঞ্চী নাগরিক শাসনকর্ত্তা, প্রাদেশিক মন্ত্রী প্রভৃতির উপাধি দৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে, তৎকালে আধুনিক সুসভ্য সমাজের ন্যায় রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্য্য সকল সুনিয়মে পরিচালিত হইত।

হুয়েন সঙের সময় হইতে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে মিথিলার কথঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ত্রিহুত বৈশালীর অধীন ছিল, দেখিয়াছেন। অর্থাৎ বৈশালীর দক্ষিণে ত্রিহুত ও উত্তর পূর্ব্বে বিজ্জান রাজ্য ছিল। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ ৬৩৫ খৃঃ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি বলেন, বৈশালীর কালী করিয়া দেখিলে সহস্র মাইল বা পঞ্চশত ক্রোশ অথবা ৫০০০ লী হয়। উহার ভূমি উর্ব্বরা। ফুল ফল শস্যদ্বারা দেশ পূর্ণ। আম্র ও রম্ভা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। জল হাওয়া উৎকৃষ্ট ও মনোরম। অধিবাসিগণ ধার্ম্মিক, ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ এবং বিদ্বান। তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষার আদর করে। বিজ্জান রাজ্যের কালী চারিশত ক্রোশ বা চারিহাজার লী। উহা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে দীর্ঘ।

* Report Arch. Surv. Ind. 1903-04.

জনকপুরের ধ্বংসাবশিষ্ট এখনও বিদ্যমান। তথাকার অধিবাসিবৃন্দ কৃত-কার্য্যক্ষম, ধার্ম্মিক এবং সংসারে অনাসক্ত ছিল। তাহারা বৌদ্ধ ছিল না। হুয়েন সাঙ্গ বলেন, শত শত বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ প্রথায় বিদ্যমান। পরন্তু তথায় তিন চারি জন মাত্র বৌদ্ধ ভিক্ষু বসতি করিতেন। অধিকন্তু, লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ তথায় মন্দিরাদিতে দেবার্চ্চনায় নিরত থাকিতেন। *

হুয়েনসাঙ্গের সময় হইতে উত্তর বিহারের বিশেষ কোন ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনন্তর পালবংশের অভ্যুদয় হইলে (৮০০—১২০০ খৃীঃ) উক্তস্থানের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হুয়েন সঙ্গের সময় রাজা হর্ষ উত্তর ভারতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্ব কাল খ্রীঃ ৬০৬—৬৪৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত। পশ্চিম বঙ্গ তাঁহার অধীন ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজন্যবর্গ দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল। ত্রিহুত সেই সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ দ্বারা শাসিত হইত। নবম শতাব্দীতে পাল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল সমগ্র বঙ্গ শাসিত করেন। তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে অনুমান ৮৫০ খ্রীঃ বিহারের পশ্চিমভাগ পর্য্যন্ত তাঁহার অধীন ছিল। একাদশ শতাব্দীতে উক্ত রাজ্য পালবংশের হস্ত হইতে চেদীবংশের হস্তে পতিত হয়। অবশেষে ১০১৭ খ্রীঃ গাঙ্গেয়দেব উত্তর ভারতের অধিপতি হন। সেনরাজগণের সময়ে শিমরাউন গড় স্থাপিত হয়।

৫৬ পুরুষ অধস্তন মহারাজ কৃতি হইতেই জনক বংশের বিলোপ সাধন হয়। উক্ত বংশের পর ১১৪৬ সংবতে (১০৮৯ খৃষ্টাব্দে) নান্যদেব নামক জনৈক ক্ষত্রিয় তীরহুতে রাজত্ব করেন। নেপাল তরাইএর মোতিহারীর পর গণার শিমরাউনগড় নান্যদেবের রাজধানী ছিল। আমরা নিম্নে তাহার যথাযথ বিবরণ প্রদান করিব।

---

* In describing the seals of the 4th and 5th centuries recently found at Basarh, Dr. Bloch remarks—Turning to the emblems on the seals, the first thing that strikes one is total absence of any symbol of Buddhism. * * The evidence of the emblems on the seals, so far as they have any connection with religious worship, together with the names occurring in the inscriptions and the seals bearing benedictory formulas rather led me to conclude that most of the persons to whom the seals belonged were followers of the Brahminical creed or Jainas or both."

হিন্দু বিজ্ঞান, ন্যায় এবং সংস্কৃত সাহিত্য চর্চ্চায় একবালে প্রাচীন মিথিলা অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে মিথিলা বা মৈথিল দেশ বিহারের উত্তর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। উক্ত মিথিলার ধ্বংসাবশেষ কেবল যে ইংরাজাধিকৃত বিহার প্রদেশেই বিদ্যমান ছিল তাহা নহে। উহা কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন নেপাল রাজ্যের "তেরাই" প্রদেশেরও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উহা বিহারের মধ্যেও আংশিক বিদ্যমান আছে এবং হিমালয়ের পাদদেশের কতিপয় মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। অধুনা এ প্রদেশ ভয়াল কেশরী, ব্যাঘ্র, বন্যমহিষ ও বরাহাদির নিবাস ভূমি হইয়াছে। বৎসরে প্রায় নয় মাস তথায় ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রতাপ। নেপালী তরাই প্রদেশের মিথিলাভূমিও ভীষণ বনাকীর্ণ, তাহা পীড়ার আগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই মিথিলার কোন রাজা পাঠানরাজ তোগলক সার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণকরত তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মিথিলার রাজচক্রবর্ত্তী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

পরন্তু জনকপুর ও শিমরাউনের ধ্বংসাবশেষ অধুনা নেপাল রাজ্যের নিম্নভূমিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে যাঁহারা মিথিলার বিবরণ অবগত আছেন, তাঁহাদের আমরা রাধীয় ও মাথীয়ের স্তম্ভাদি সন্দর্শন করিতে অনুরোধ করি। রাধীয় ও মাথীয় স্তম্ভাদি অধুনা ইংরাজ-রাজত্বের অংশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু, জনকপুর ও নান্য উপনহরের বিস্ময়োৎপাদক ভগ্নাবশেষ নেপাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

পঞ্চশত বর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর অবিশ্রান্ত ঘাত প্রতিঘাতে এবং শোণিত স্রোতে বর্ত্তমান সীমান্ত প্রদেশ শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়। রাজলক্ষ্মী সে স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন। এই প্রকারে মিথিলার ধ্বংস সাধন হইল। ইহা ইংরাজরাজ্যভুক্ত মিথিলা। পরন্তু নেপালী তরাই ১৮১৬ খৃঃ পর্য্যন্ত স্বীয় প্রভাব সমভাবেই অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল। ইতোমধ্যে নেপাল ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সুবন্দোবস্তে সীমান্তপ্রদেশে শান্তি স্থাপিত হইলেও নেপাল তরাইয়ে কোন বিভিন্ন জাতির গমনাগমন নিষেধ ছিল। অপিচ, অপর কোন জাতিই তথায় পদার্পণ করিতে সাহসী হয় নাই। যাহা

হউক, অধুনা আমরা শিমরাউন গড়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে সাড়ে সাত ক্রোশ দূরে একটি স্থান বিদ্যমান আছে; বাগমতী নামক স্থান হইতেও উক্ত স্থান সমদূরবর্ত্তী। পূর্ব্ব কথিত স্থানের দক্ষিণ এবং শেষোক্ত স্থানের পশ্চিম দিকে আমাদের আলোচ্য শিমরাউন গড় ও সহর। উহাই তৎকালে মিথিলার রাজধানী বলিয়া কথিত ছিল। উক্ত রাজধানী নেপাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রোতাহত জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী। প্রাগুক্ত শিমরাউন ইংরাজ রাজ্যভুক্ত ত্রিহুত বিভাগের সারণ জেলার বিপরীত দিকে অবস্থিত।

উক্ত ধ্বংসাবশেষ নেপালের দক্ষিণে এবং যমুনা নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহার ঠিক পূর্ব্বদিকে কাচোরবা (Kachorwa) গ্রাম এবং উত্তরদিকে ভগবান্‌পুর। উভয়স্থানই নেপালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই স্থানের বিজন অরণ্য মধ্যে চক্রাকারে দ্বাদশ মাইল গ্রহণ করিতে হইবে। উহাই আমাদের পূর্ব্ব কথিত ম্যালেরিয়ার আবাস ভূমি। তথায় ব্যাঘ্র, বন্যবরাহ এবং কৃষ্ণসার হরিণ বসতি করিয়া প্রাচীনতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহার চতুর্দ্দিকের স্থান সমূহ কর্ষিত হইয়া নিয়মিত রূপে কৃষিকার্য্য চলিতেছে। ইংরাজ এবং নেপাল গভর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত স্থান কর্ষিত হইতেছে। পরন্তু, এই প্রাচীন শিমরাউনের কোন স্থান কোন কৃষক খনন করিতে সাহসী হয় না। এখানকার কৃষকগণ বলে ঐ স্থান খনন করিলে ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইবেন। যাহা হউক, আমাদের আলোচ্য বিজন অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পঞ্চবিংশতি ফিট বা সার্দ্ধ অষ্ট হস্ত পরিমিত উচ্চস্থানে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহার শিলাফলকে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক দৃষ্ট হয়—

"নন্দেন্দুবিন্দুবিধু সম্মিতশাকবর্ষে
তৎ শ্রাবণে সিতদলে মুনিসিদ্ধিতিথ্যাম্।
স্বাতিশনৈশ্চরদিনে করিবৈরিলগ্নে

রাজা নান্যদেব ১০১১ শকে অর্থাৎ ১০৮৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিহুতে আগমন করেন।

তদনন্তর ১০১৯ শকাব্দে শ্রাবণ মাসে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে স্বাতি নক্ষত্রে শনিবারে সিংহ লগ্নে এই গড় নির্ম্মাণ করেন।

নান্যদেব মিথিলার রাজধানী শিমরাউন গড়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার পূর্ব্বে মিথিলায় (১) রাজা রাম, (২) নল, (৩) পুরূরবা এবং (৪) অলর্কদেব রাজত্ব করেন। তাঁহারা রাজ্যের ধনরত্নাদি ঈশ্বর পুষ্করিণী নামক জলাশয়ে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে, উক্ত ধনরত্নাদি একটি সর্প দ্বারা রক্ষিত হইত। নান্যদেব উক্ত সর্পকে হত্যা করিয়া রাম রাজা প্রভৃতির লুক্কায়িত রত্নাদি আত্মসাৎ করেন। সেই ধন দ্বারা তিনি নেপালের তরাই প্রদেশে এক মনোহর গড় নির্ম্মাণ করেন। তাহাই শিমরাউন গড় বলিয়া কথিত। উক্ত গড় নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত খোদিত অনুশাসন দৃষ্ট হয়—

"রামস্য বিত্তং নলরাজবিত্তং পুরূরবোবিত্তমলর্করাজঃ।
উদ্ধৃত্য সর্ব্বং ফণিসাৎ সযত্নং শ্রীনান্যদেবো নিরমাৎস্বগর্ত্তম্॥"

অর্থাৎ রাজা রাম, নল, পুরূরবা এবং অলর্করাজ রাজ্যলব্ধ ধনরত্নাদি ঈশ্বর পুষ্করিণী নামক জলাশয়ে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে, একটি সর্প তাহার রক্ষক ছিল। নান্যদেব নামক জনৈক নরপতি উক্ত সর্পকে হত্যা করত লুক্কায়িত ধনরত্নাদি গ্রহণ করেন। সেই অর্থ দ্বারাই তিনি শিমরাউন গড়ে মিথিলার রাজধানী স্থাপন করেন।

অন্যচ্চ, "রামো বেত্তি নলো বেত্তি বেত্তি রাজা পুরূরবাঃ।
অলর্কস্য ধনং প্রাপ্য নান্যোরাজা ভবিষ্যতি॥"

উক্ত লিপিদৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে নান্যদেব কর্ত্তৃক ১০৯৭ খৃঃ শিমরাউন গড় নির্ম্মিত হয়। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মিথিলারাজগণের নাম যথাস্থলে উক্ত হইয়াছে। অধুনা আমরা তাঁহার পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গের নাম প্রদান করিব। (১) নান্যদেব, (২) গঙ্গা, (৩) নরসিংহ, (৪) রামসিংহ, (৫) শক্তিসিংহ এবং (৬) হরিসিংহ। প্রত্যেক নামের শেষভাগে "দেব" শব্দ সংযোজিত আছে। তাঁহাদের রাজত্বকাল যথা—

---

* B. H. Hodgson's description of Simroun.

রাজার নাম	খৃষ্টাব্দ
(১) নান্যপদেব বা নান্যদেব	১০৮৯—১১২৫ = ৩৬ বৎসর
(২) গঙ্গাদেব	১১২৫—১১৩৯ = ১৪
(৩) নরসিংহ দেব	১১৩৯—১১৯১ = ৫২
(৪) রামসিংহদেব	১১৯১—১২৮৩ = ৯২
(৫) শক্তিসিংহ দেব	১২৮৩—১২৯৫ = ১২
(৬) হরিসিংহ দেব	১২৯৫—১৩২৪ = ২৯

*

কোন্ সময়ে হরিসিংহ দেব তাঁহাদের মনোহর রাজধানী শিমরাউন পরিত্যাগ করেন, তাহা নিম্নলিখিত শিলালিপিপাঠে অবগত হওয়া যায়।

"বাণাব্ধি যুগ্মশশি সম্মিতে শাকবর্ষে
পৌষস্য শুক্লনবমী রবিসূনুবারে।
ত্যক্ত্বা স্বপট্টন পুরীং হরিসিংহদেবো
দুর্দ্দৈবদেশিতপথোহি গিরিং বিবেশ॥"।

হরিসিংহ দুরদৃষ্টবশতঃ এই মনোহর নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ১২৪৫ শকে (অর্থাৎ ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে) পৌষ মাসের শুক্ল নবমী রবিসূতবারে পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ (প্রবেশ) করেন। অতএব ১৩২৪ খ্রীঃ হইতে উক্তরাজ্য পাঠানাধিকৃত হয়। এই রাজ্যের অভ্যুদয় সময়ে ইহা কুশী হইতে গণ্ডকনদ পর্য্যন্ত ও গঙ্গা হইতে নেপাল রাজ্যের পার্ব্বত্য ভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কালের গতি কে রোধ করিতে পারে? এক সময়ে যে স্থান রাজধানী রূপে শোভমান হইত অধুনা তাহা হিংস্র জন্তুর নিলয় ভূমি হইয়াছে। আনুমানিক পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে শিমরাউন রাজ প্রাসাদ দুর্গাদি দ্বারা রক্ষিত ছিল। বিগত নেপাল যুদ্ধের অবসানে ইংরাজ পক্ষীয় কোন ব্যক্তি † এই ধ্বংসাবশেষ পরিমাপ করিয়া ইহার একখানি নক্সা প্রস্তুত করেন। তদনন্তর আর সেই নক্সা বা তৎসম্বন্ধে অপর কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মিথিলার উত্তর দিকের প্রাচীরের চিহ্ন লক্ষিত হয়। তন্মধ্যস্থিত বিশাল

---

* Mr. B. H. Hodgson's Report.

† Lieutenant Boileau বোধ হয়।

পোক্‌রা” বা পুকুর, যাহার অপর নাম ঈশ্‌রা—তাহার পরিমাপ করা হইয়াছে। পোক্‌রা” শব্দ হিন্দী পোকরা শব্দের অপভ্রংশ। উহাই বাঙ্গালা ভাষায় পুকুর বা পুষ্করিণী। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা বারাণসীতে গমন করিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই “মিছরী পোকরা”’র নাম শ্রুত হইয়া থাকিবেন। উহার অর্থ মিষ্ট পুকুর। উক্ত পুষ্করিণীর জল অতীব স্বাদু ছিল; পরে উক্ত পুকুর কালের পরিবর্ত্তনে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কেবল উহা নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যাহা নগরস্থ দুর্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল অধুনা তাহা ইষ্টক স্তূপ মাত্র। তদুপরি কষ্টে আরোহণ করা যায়। সেই স্থানেই “রাণী বাস’ বা “মহল সরাই” অবস্থিত। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে ও বৈশাখের প্রথমে এই স্থানে যখন অরণ্যানী পীতবসন পরিধান করে ও পত্র সকল বৃক্ষ হইতে স্খলিত হইয়া থাকে তখন উক্ত ধ্বংসাবশেষ স্পষ্টরূপে নয়ন পথে পতিত হয়। উক্ত সহরের আকার সমান্তরাল সমচতুষ্কোণ বলিয়া অনুভূত হয়।

উক্ত রাজধানীর বহির্ভাগ ও মধ্যভাগ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। অর্থাৎ বহির্ভাগে একটি প্রাচীর ও তন্মধ্য ভাগও অপর একটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। বহির্ভাগের প্রাচীরের ইষ্টক দগ্ধ করা নহে। পরন্তু মধ্যবর্ত্তী প্রাচীরের ইষ্টক পাকা বা দগ্ধ করা। বহিঃ প্রাচীরের পরিধি সপ্তক্রোশ ও মধ্যবর্ত্তী প্রাচীরের বৃত্ত পঞ্চক্রোশ।

রাজধানীর পূর্ব্বদিকে ৬।৭ টি গড়খাই অধুনা বিদ্যমান আছে। উক্ত গড়খাই পাকা ইষ্টকে নির্ম্মিত প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী। পশ্চিম দিকেও ঐ প্রকারের তিন চারিটি গড়খাই আছে। উহাও পাকা প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী। ঈশরা পুকুর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অবিকৃতাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত পুষ্করিণী ৩৩৩ ফিট দীর্ঘ এবং ২১০ ফিট প্রশস্ত। উহার চতুর্দ্দিকে বিবিধ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য খচিত ইষ্টক প্রাচীর। উহার প্রত্যেক ইষ্টক ওজনে একমণ। রাজ প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে ৫০ হইতে ৬০ গজ উচ্চ বাঁধা রাস্তা আছে। উহা দগ্ধ ইষ্টক বা টাইল দ্বারা প্রস্তুত। উক্ত পাকা রাস্তা রাজ প্রাসাদের সন্নিকটেই দৃষ্ট হয়। অন্যান্য স্থানেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার রাস্তার নিদর্শন লক্ষিত হয়। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, নাগরিক রাজবর্ত্মাদি এই প্রকারে বহুব্যয়ে ইমারতাদির ন্যায়

প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এবং দেবদেবীর মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দর্শনে উপলব্ধি হয় যে উহা ও বহুব্যয়ে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। অতি সুন্দররূপে ছাঁচে ঢালা মসৃণ ইষ্টক দ্বারা একতালা গৃহের মেজে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহাতে বিবিধ কারুকার্য্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান। ইহাদ্বারা নেপাল উপত্যকার রাজপ্রাসাদাবলী ও দেবমন্দিরাদির যশঃসৌরভ অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শিমরাউনগড়ের কতিপয় ভাস্কর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। এক একখানি বৃহৎ প্রস্তর অন্তত ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আনীত হইয়াছে। তাহা আবার বহু পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আনয়ন করা হইয়াছে।

জনৈক ধর্ম্মপ্রবণ গোস্বামী সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে বিংশতি দেবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উহার সকলগুলিই প্রস্তর মূর্ত্তি। বর্ত্তমান যুগের ভাস্কর্য্যের অনুপাতে উক্ত মূর্ত্তি গুলি উৎকৃষ্টতম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহার অধিকাংশেরই অঙ্গ ভগ্ন যে সকল মূর্ত্তি অক্ষত শরীরে বর্ত্তমান তাহাদের অবলোকন করিলে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ যুগের মূর্ত্তি বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই বিগ্রহসন্নিকটে কোন শিলালিপি এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইহার সান্নিধ্যেই ৪।৫টি পাকা কূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। কূপগুলির উপরের প্রাচীর ভূমধ্য হইতে আনুমানিক দুই হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ। তাহাও বিবিধ কারুকার্য্যখচিত।

নগরস্থ দুর্গেই কোতালী চৌতারা। তথায় "রাণীবাস" বলিয়া কোন স্থান ছিল। তথায় একটি জলাশয় আছে। লোকে তাহাকেই "ঈশ্‌রা পোক্‌রা" বলে। উক্ত পুষ্করিণী সহরের উত্তর পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ ঈশানকোণে আনুমানিক পৌনে এক মাইল বিস্তৃত। উহার চতুর্দ্দিকের 'পাহাড়' ২০ হইতে ২৫ ফুট উচ্চ। তাহার উপর স্বল্পবিস্তর মৃত্তিকাস্তূপ ও বিটপী শ্রেণী।

মিথিলা ও শিমরাউন গড়ের হিন্দুসভ্যতা ও ইতিহাস অধুনা বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

১০১৯ খ্রীঃ গাঙ্গেয়দেব উত্তর ভারতের অধিপতি হইলেন। একথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত শতাব্দী শেষ হইতে না হইতে সেনবংশের অভ্যুত্থান হয়। তাঁহারা পালরাজগণের নিকট সমুদায় রাজ্য কাড়িয়া লয়েন, এবং উত্তর

বিহারও জয় করেন। সেন রাজগণের শাসনকালে মিথিলা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে ছিল। সেই সময়ে অর্থাৎ ১১১৯—২০ খ্রীঃ লক্ষ্মণসেন লক্ষ্মণ-সংবৎ নামে এক সাল প্রচলিত করেন। ইনিই সেনবংশের শেষ রাজা।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বিহারে মুসলমান আধিপত্যের সূচনা হয়। কিন্তু তাহারা গঙ্গানদীর অধিক উত্তরে অগ্রসর হইতে পারে নাই। বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্ত্তা গিয়াসুদ্দিন ১২১১—১২২৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ত্রিহুত রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে করদ রাজার মধ্যে গণ্য করেন। চম্পারণ জেলার উত্তর পূর্ব্ব কোণে শিমরাউন অবস্থিত। এই নৃপতিগণ ত্রিহুতে কতিপয় শতাব্দী আধিপত্য করিতেছিলেন। অবশেষে ১৩২৩ খ্রীঃ তোগলক সাহ শেষ রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। উক্ত শিমরাউন রাজবংশের বিবরণ এবং শিমরাউন দুর্গাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইতিহাস যথা স্থানে উক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ত্রিহুত অধিকার করিলেও প্রকৃত পক্ষে ত্রিহুত রাজগণ পাঠানগণকে বার্ষিক কর প্রদান করিয়া অন্য বিষয়ে স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজ্য শাসন করিতেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই রাজা। ১০৮৯ খৃষ্টাব্দে নান্যদেব শিমরাউনের রাজধানী ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাজত্ব আরম্ভ করেন। তাঁহার বংশের শেষ রাজা হরিসিংহদেব ১৩২৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অতএব উক্ত দেববংশ ২৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগণপতি রায়।

দ্রাবিড় উপমা।

(তেলেগু ভাষার কবি 'ভিমানা' হইতে)

(১)

উদ্যোগ ও পরামর্শ রূপা ব্যতিরেকে
কোন (ও) কার্য্যে নরবর ! নহেক সফল ;
সুবীজ (ও) হইলে উপ্ত অনুর্ব্বর-স্থানে
আশা-অনুরূপ তাহে ফলেনাক ফল।

(২)

অতীব নীচের শুধু আড়ম্বর সার,
সুজন যে—মৃদুভাষী অল্প কথা কহে ;
কাংস তা'র শব্দে করে পল্লী নিনাদিত
গুণ সে যে কনকের—মৌনব্রতী রহে।

* * * *

(৪)

অর্থাগমে অপরে (ও) করি' সম্ভাষণ
নিকট আত্মীয় বলি' দেয় পরিচয় ;
বর্ষণের সনে পূর্ণ সরসীর পাশে
লক্ষাধিক মণ্ডুকের সহসা উদয়।

(৫)

লবণ, কর্পূর দুই তুল্যবর্ণধারী,
বিভিন্নতা বুঝা যায় স্বল্প মনোযোগে ;
মানুষ (ও) সমানাকৃতি ; ধার্ম্মিক সুজন—
সাধারণ লোক হ'তে বুঝি 'অনুরাগে'।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

বৰ্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে

ক্ষয়রোগের আধিক্য ও তৎপ্রতিকারোপায়।

আজকাল বঙ্গদেশ তিনটি রোগের আক্রমণে প্রপীড়িত। এই রোগত্রয় দেশের অনেক জনপদ, সমৃদ্ধিশালী গ্রাম শৃগাল কুকুরাদির লীলাভূমি করিয়া তুলিতেছে, এই রোগের আক্রমণে ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবক সকলেই জর্জ্জরিত। এই রোগত্রয়, ম্যালেরিয়া, ক্ষয় ও ডায়েবেটীশ। যদিও এই তিনটী রোগই শরীরের ধাতু সমূহের (মাংসাদির) ক্ষয় করে, তথাপি ইহাদের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। প্রায় ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে এই রোগত্রয় নগরে প্রবল হইতে পারে নাই, বিশেষতঃ শেষ দুটী রোগ ছিল না বলিলেও চলে। ক্ষয় বা যক্ষ্মা রোগ গ্রামে কদাচ দুই একটা দেখা যাইত, প্রস্রাবের পীড়া একরূপ সাধারণের ভিতর অপরিজ্ঞাত ছিল। এই পীড়া দুইটী ৩০।৪০ বৎসর মধ্যে এত প্রবলাকার ধারণ করিল কেন? প্রায় প্রত্যেক পরিবারে স্ত্রী পুরুষ মধ্যে এই দুইটী রোগের আক্রমণ হইতেছে কেন? ইহা বাস্তবিক ভাবিবার বিষয়। কেহ কেহ বলেন যে স্থান বীজাণুদুষ্ট হওয়ায় ক্ষয় অর্থাৎ যক্ষ্মারোগ এবং অত্যধিক মানসিক শ্রমে শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে ডায়েবেটীশ রোগ অধিকতর বৰ্দ্ধিত হইতেছে। কথাটা আংশিক সত্য; কিন্তু ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে উহা ব্যতীত আরও কতকগুলি বিশিষ্ট কারণ দেখা যায়। অদ্য আমরা এই প্রবন্ধে কেবল যক্ষ্মা রোগের সন্নিকৃষ্ট কারণ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রাদির অভিমত আলোচনা করিব। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র কত সূক্ষ্মভাবে দেহ ও মনের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের উপদেশ দিয়াছেন তাহা একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিলে বাস্তবিকই বিস্ময় জন্মে। আমরা বুঝি যে, এই সমস্ত রোগবীজ আমাদের সংযমের অল্পতায় বা অভাবে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রও বলেন—

রোগঃ শোকঃ পরীতাপঃ বন্ধনং ব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধ-বৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্‌।

এই আত্মাপরাধ ছাড়া আরও কারণ আছে। মহাত্মা চরক বলেন—

অসাত্মেন্দ্রিয়ার্থ-সংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধপরিণামশ্চেতি—

অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ এই কথাটির প্রতি, আমাদের বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে, ইহাতেই আমরা দেখিতে পাইব অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই বা ক্ষয় রোগ কম এবং শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে ক্ষয় রোগ প্রবল কেন।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র দেশ, কাল, জাতি, বয়স অনুসারে কতকগুলি বিধি নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুপাতে রোগের আক্রমণ দেখাইয়াছেন। এখন এই অসাত্ম্য কথাটি হইতেই সকলে দেখিবেন যে সাত্ম্যের অভাব বা ব্যতিক্রমই অসাত্ম্য। সাত্ম্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে, যাহা শরীর ও মনের উপাদানের অনুকূল তাহাই সাত্ম্য। ইহার বিপরীত অসাত্ম্যসংযোগ। "অযোগাতিযোগ-মিথ্যাযোগযুক্তারূপরসাদয়ঃ।" রূপরসাদির অযোগ অর্থাৎ যেখানে উহার প্রয়োজন সেখানে অব্যবহার, যেখানে উহার পরিমিত সেবা আবশ্যক তথায় অত্যধিক ভোগ এবং যেখানে উহার অপ্রয়োজন সেখানে উহার পরিচালনা। এখন এই সূত্রটির উপর নির্ভর করিয়া আমরা দেহীর পীড়ার কারণ বুঝিতে পারি। তবে একথাও যুক্তিযুক্ত যে আজকাল আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত বিধি নিষেধ পালন করা অসম্ভব বা সুকঠিন। তবে ইহাও আমরা দেখাইব যে, ক্ষয়রোগের যে সকল কারণ তাহা আমরা ইচ্ছা করিলেই পরিহার বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। হয়ত আমরা বাল্যে দুগ্ধ ও শাক সব্‌জি খাইয়া পুষ্টি লাভ করিয়া যৌবনে, মাংস, ডিম্ব ও হোটেলের দূষিত খাদ্য প্রভৃতি খাইতে আরম্ভ করিলাম, ক্রমে বদ্‌ হজম হইয়া রোগ প্রকাশ পাইল। ক্ষয়রোগের কারণ সম্বন্ধে দেখা যায়—

"যদা পুরুষঃ ভয়াৎ প্রসঙ্গাৎ হ্রীমত্বাৎ ঘৃণিত্বাদ্বা নিরুণদ্ধি আগতানি বাতমূত্রপুরীষাণি তদা তৎসন্ধারণাৎ বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে। স প্রকুপিতঃ পিত্তশ্লেষ্মাণৌ সমুদীর্য্য ঊর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ চ বিহরতি। ততশ্চাংশবিশেষেণ পূর্ব্ববৎ শরীরাবয়ববিশেষং প্রবিশ্য শূলং জনয়তি ভিনত্তি পুরীষমুচ্ছোষয়তি বা। পার্শ্বে চাতিরুজতি গুহ্যাত্যংসৌ কণ্ঠঞ্চাবধমতি শিরশ্চোপহন্তি। কাসং, শ্বাসং জ্বরং স্বর-ভেদং প্রতিশ্যায়ঞ্চোপজনয়তি" চরক। উক্ত সংস্কৃতের ভাবার্থ এই যে যখন কোন ব্যক্তি লজ্জায় ঘৃণায় বা ভয়ে কিম্বা গল্প করিবার সময় মলমূত্রাদির বেগ ধারণ

করে, তখন বায়ু প্রকুপিত হইয়া শ্লেষ্ম ও পিত্তকে স্বস্থান হইতে আকর্ষণ করিয়া উর্দ্ধ অধঃ ও বক্রভাবে চালিত করে, এই কুপিত দোষ হেতু কাস, শ্বাস, জ্বর, স্বরভেদ, প্রতিশ্যায় ও শূল রোগাদি জন্মিয়া থাকে।

এখন মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, সহরে যাঁহারা থাকেন প্রায় অনেকেরই ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা চাকুরী করেন, স্কুল কলেজের ছাত্র, অধ্যাপক প্রভৃতি অনেকেই উক্ত লজ্জা ঘৃণা ইত্যাদি হেতু মলমূত্রের বেগ ধারণ করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় ক্রমে Dyspepsia জন্মিয়া থাকে। ক্ষয়রোগ সম্বন্ধে মহাত্মা বাগ্ভট বলেন—

সাহসং বেগসংরোধঃ শুক্রৌজস্নেহসংক্ষয়ঃ।
অন্নপানবিধিত্যাগশ্চত্বারস্তস্য হেতবঃ।

২য় কারণ অসময়ে আহার, অপরিমিত আহার, অনশন বা ক্ষুধার বেগরোধ। এ সম্বন্ধেও শাস্ত্র সতর্ক করিতেছেন—

"বিবিধান্যন্নপানানি বৈষম্যেণ সমশ্নতাং।
জনয়ন্ত্যাময়ান্ ঘোরান্ বিষমা মারুতাদয়ঃ॥
রুদ্ধা স্রোতাংসি ধাতূনাং বৈষম্যাদ্বিষমং গতাঃ।
দোষা রোগায় কল্পন্তে পুষ্যন্তি ন চ ধাতবঃ॥"

যাহারা বহু প্রকার অন্নপানাদি বিষম ভাবে ভোজন করেন, তাঁহাদের বায়ু কফ বিকৃত হইয়া নানা প্রকার ভয়ঙ্কর পীড়া জন্মে। এইরূপে ধাতু বৈষম্য হওয়ায় শীরা স্নায়ু প্রভৃতিও বিকার প্রাপ্ত হয়; এজন্য উহাদের স্রোত রুদ্ধ হয়, ভুক্ত দ্রব্যের সার ভাগ রস যথাস্থানে চালিত হইতে পারে না, কাজেই শরীরের পোষণ না হইয়া ঐ রস ভাগ এক স্থানে কিংবা অযথা স্থানে থাকিয়া রোগের আকর হইয়া থাকে।

এখন এই বিষম ভোজন সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্র বলিতেছেন—

"বহুস্তোকমকালে চ তজ্জ্ঞেয়ং বিষমাশনং"।

পরিমাণে বেশী, কিংবা অল্প ভোজন অথবা অসময়ে ভোজনই বিষম ভোজন, এই বিষম ভোজন শরীরকে পুষ্ট না করিয়া ক্ষয় করে।

দেখা যায় অনেকে খুব তাড়াতাড়ি খাইয়া থাকেন, কেহ বা সময়াভাবে অল্প আহার করিয়াই স্বকার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন, কেহ বা খুব উদর পূর্ণ

করিয়া খাইয়া শেষে উঠিতে বসিতেও কষ্ট বোধ করেন। এ সমস্তই বিষম ভোজন। বিষম ভোজনে শরীরপুষ্টি কি প্রকারে হইতে পারে? এখন দেখুন এই বিষম ভোজনে আমাদের কত অনিষ্ট হয়। বিষম ভোজনের তিনটি অবস্থা, অল্প বেশী ও অকাল ভোজন।

অল্প ভোজনে দেহের কিরূপ অনিষ্ট হয় তদ্বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রকারগণের মত—

ভোজনং হীনমাত্রন্তু ন বলোপচয়ৌজসে।
সর্ব্বেষাং বাতরোগাণাং হেতুতাঞ্চ প্রপদ্যতে॥

অল্প ভোজন বল, মাংস ও ওজ ধাতুর ক্ষয় এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের নিদান। এইরূপ বহুভোজনে—

অতিমাত্রং পুনঃ সর্ব্বানাশু দোষান্ প্রকোপয়েৎ।
পীড্যমানাহি বাতাদ্যা যুগপত্তেন কোপিতাঃ॥
আমেনান্নেন দুষ্টেন তদেবাবিশ্য কুর্ব্বতে।
বিষ্টম্ভয়ন্তোঽলসকং চ্যাবয়ন্তো বিসূচিকাম্॥

অধিক ভোজনে বাতাদি কুপিত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকে ব্যাঘাত জন্মায়, আর সেই অপক্ক আহার উদরাধ্মান প্রভৃতি রোগ জন্মায় এবং ক্রমে এই অবস্থা হইতে পিত্তের প্রবলতা হেতু—

পিত্তাজ্বরাতিসারোন্তর্দ্দাহ তৃট্ প্রলয়াদয়ঃ।
কফাচ্ছর্দ্দ্যঙ্গগুরুতাকফসঙ্গষ্ঠীবনাদয়ঃ॥

পিত্তবিকার হেতু জ্বর অতিসার দাহ তৃষ্ণা এই সকল রোগ এবং কফ জন্য বমি; শরীর ভাব, স্বরভেদ ও মুখ হইতে থু থু উঠিতে থাকে।

মাধবকর সংগ্রহেও দেখা যায় যে—

বেগরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সাহসাদ্বিষমাশনাৎ।
ত্রিদোষা জায়তে যক্ষ্মা গদো হেতুচতুষ্টয়াৎ॥

মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন—

জ্বরো দশবিধশ্চৈব বিজ্ঞাতব্যো ভিষগ্বরৈঃ।
শ্রান্ত্যা ভারাদ্ বিষমশয়নৈ দীর্ঘমার্গাক্রমৈর্ব্বা
ভুক্তের্দ্দোষাদতিশয়গুরৈস্তৈঃ সেবনাদ্বৈ জ্বরশ্চ

জ্বরেণাতিক্রান্তো বিষমাশনাৎ কুটনপরৈঃ
জাতা রোগা মনুজবপুষঃ ক্ষীণতাং সংনয়ন্তি।

অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত ভারবহন, বিষম শয়ন (দিবা নিদ্রাদি), অনেক দূর হাঁটাহাঁটি, আহার দোষ, অত্যন্ত স্ত্রীপ্রসঙ্গ, বহুদিন জ্বরভোগ ক্ষয়রোগের কারণ।

বেগ রোধ ও বিষম ভোজন ব্যাপার আজকাল শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় মধ্যে অধিক, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

ক্ষয়ও একটি কারণ। এই ক্ষয় শুক্র ও ওজনাশ বা অপব্যবহার। এই জন্য প্রায়ই ছাত্রদের মধ্যে এই ক্ষয়রোগ জন্মে, ইহা সংযমের অভাবে ঘটে। সাহসজনিত যক্ষারোগ নানা প্রকারে হয়, সাধ্যের অতিরিক্ত শ্রম, অত্যন্ত ব্যায়াম ইত্যাদি। দেখা যায়, ছাত্রগণ অনেক সময় বর্ত্তমান ফুটবল খেলায় অত্যধিক পরিশ্রমে শীর্ণ ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

এই ভাবে দেখা যায়, সংযমের অভাবে, লজ্জা বা সময়বিশেষে মলমূত্রাদির বেগ ধারণে এবং আহারের অনিয়ম হেতু ক্ষয় রোগ জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কারণ গুলি কমাইতে বা নষ্ট করিতে পারিলে কার্য্যের নাশ হয়। এজন্য এই তিন প্রকার ক্ষয় রোগের সূত্রপাতে আহারাদি নিয়ন্ত্রিত করিলেও প্রতীকার হইতে পারে। যাহা সহজপাচ্য ও ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি করে তদ্রূপ আহার আবশ্যক। আমাদের বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ভাত, টাট্‌কা মাছের ঝোল, ও দুগ্ধই বিধেয়। তবে স্থান বিশেষে ছাগমাংসাদিও মিষ্টরসযুক্ত ফলাদিও ভাল। কিন্তু শুক্রক্ষয়াদিতে এ সমস্ত আহার ব্যতীত শুক্রকর ঘৃতাদিও ব্যবহার আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যথার্থ দুগ্ধ ও গব্যঘৃত পাই না।

এরূপ স্থানে শাস্ত্রোক্ত শুক্রল আহার আবশ্যক। আমরা বর্ত্তমান সময় সহরে বসিয়া যে সকল দ্রব্য আহার করি তাহার মধ্যে ভাত, দ্বাইল, তরকারী, শাক, সব্জি, মাছ ও মাংস এবং ঘৃতপক্ক মিঠাই প্রভৃতিই মুখ্য। এই আহার্য্য মধ্যে শাকসব্জির অধিকাংশই মলকর, মাংস মধ্যে সাধারণতঃ ছাগ মাংসই বাজার হইতে ক্রীত হইয়া থাকে, এই ছাগ মধ্যে অধিকাংশই রোগজীর্ণ ও স্বচ্ছন্দ আহারাভাবে শীর্ণকায়। ঘৃতাদি মধ্যে বহুল পরিমাণে চর্ব্বি প্রভৃতির মিশ্রণ। এখন এই সকল দ্রব্য খাইলে কি অপকার বা উপকার হয়

তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, আমরা প্রতিনিয়ত বিষ ভক্ষণে শরীরকে পলে পলে ধ্বংস মুখে আনিতেছি। আমাদের শাস্ত্র শুষ্ক মাংস সম্বন্ধে বলেন যে, শুষ্ক মাংস বিগতবীর্য্য, সে জন্য বক্ষ্যমাণ দোষকর—

অরোচকং প্রতিশ্যায়ং গুরু শুষ্কং প্রকীর্ত্তিতম্।
কাসশ্বাসকরং বৃদ্ধং ত্রিদোষং ব্যাধিদূষিতম্।
ক্লিন্নমুৎক্লেশজননং কৃশং বাতপ্রকোপনম্। সুঃ

শুষ্ক মাংস অরুচি, প্রতিশ্যায় জন্মায়, এবং পাকে গুরু, ব্যাধিদুষ্ট মাংস কাস, শ্বাস এবং ত্রিদোষজনক ও বর্দ্ধক, আর কৃশ পশুর মাংস শরীরের ক্লেদজনক এবং বমি ও বাতকর।

বড়মাছ—গুরুপাক, কিন্তু শুক্রকর এবং মল রুদ্ধ করে।

ছোটমাছ—পেটের অসুখে উপকারক।

জিয়োল মাছ (কাল মাছ)—লঘু, অগ্নিকর, বাতনাশক ও শরীর স্নিগ্ধ করে।

সাদামাছ—ত্রিদোষ বর্দ্ধক, মলভেদক ও স্নিগ্ধকর।

এ সমস্ত টাট্‌কা মাছের বিষয়। কিন্তু আজকাল সহরে টাট্‌কা মাছ দুর্ল্লভ। মৃত মাছ শরীরের অনিষ্টকর।

তারপর নাদেয় অর্থাৎ নদীর মাছ—শ্লেষ্মকর, হজম হইলে বৃষ্য, স্বাদে মধুর কিন্তু মলভেদ করে।

পুকুরের মাছ—স্নিগ্ধকর।

এইরূপে দেখা যায় যাহাদের অপাক বা অগ্নিমান্দ্য আছে তাহাদের পক্ষে মাছ অপকারী, কারণ উহা কফ ও পিত্তকর। অথচ অপাক হইলেই শরীরে কফ ও পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া কাস, আমাশয় জনিত রোগ বা পাণ্ডুরোগ জন্মে। এই ভাবে ক্রমে ক্ষয় রোগ জন্মে।

ঘৃত—বুদ্ধ্যগ্নিশুক্রৌজো মেদঃস্মৃতিকফকারিত্বম্
বাতপিত্তবিষোন্মাদরোগশোথালক্ষ্মী জ্বরনাশিত্বম্
কিঞ্চ মাংসাদষ্টগুণগুরুত্বঞ্চ।

উক্ত গুণ ব্যতীত গব্যঘৃতের বিশেষ গুণ এই—শুক্রাগ্নিস্বাদুপাক মেধালাবণ্য কান্ত্যোজস্তেজবৃদ্ধিবয়ঃস্থিতিবলায়ুর্হিতকারিত্বম্। গুরুত্বম্ রসায়ণত্বঞ্চ।

মাহিষ ঘৃত—বাতশ্লেষ্মগুল্মগ্রহণীবিকারনাশিত্বমমন্দানলোদ্দীপনত্বঞ্চ পিত্ত-রক্তনাশিত্বংশ্লেষ্মশুক্রবৃদ্ধিকারিত্বম্ গুরুত্বঞ্চেতি।

উক্ত সংস্কৃতাংশের ভাবার্থ—শুক্র ওজ মেদ ও কফকর আর বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি বর্দ্ধক। এইজন্য বায়ুপিত্ত, বিষদোষ, উন্মাদ, শোথ ও জ্বরনাশক। কিন্তু মাংসের আটগুণ গুরু। গাওয়া ঘিরও ঐ সব গুণ, তবে উহা পাকে স্বাদু এবং বলকর। মাহিষ ঘৃত বাত শ্লেষ্ম-গ্রহণীনাশক অগ্নিদীপক পিত্ত ও রক্তনাশক শ্লেষ্ম ও শুক্রবর্দ্ধক ও গুরুপাক।

বিশুদ্ধ ঘৃতই গুরুপাক ও শ্লেষ্মকর, তারপর ভেজাল অর্থাৎ বসা মিশ্রিত ঘৃত অত্যন্ত অপকারী ও পাক যন্ত্রের নানা প্রকার বিকার জন্মায়। এ অবস্থায় আমরা অপাক জনিত ক্ষয়রোগে ঐ সব দ্রব্য বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার না করিতে পারিলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল জন্মিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। দেখা যায়, অনেক ক্ষয় রোগীকে ঘৃতপক্ক দ্রব্য আহার একাদিক্রমে করিতে দিলে অরুচি আনে, ঐ অরুচি অত্যন্ত শ্লেষ্মবৃদ্ধি সূচিত করে। ক্ষয়রোগীর আর একটি পথ্য দুধ; তাহারও বিশুদ্ধি এখন সহরে দুর্লভ; তবে যাহাদের মন্দানল জনিত ক্ষয় তাহাদের কেবল মাত্র দুধ সহ্য হয় না।

বাসী দুধ—গুরুপাক ও আধ্মানকর।

বিবৎসা ও বালবৎসা গাভীর দুধ—ত্রিদোষবর্দ্ধক।

এই দুধও আবার সহরে মাহিষ দুধের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এই মাহিষ দুধ অতি স্নিগ্ধ, নিদ্রাকর, অগ্নিনাশক, খুব ঠাণ্ডা, নিদ্রাকর ও পাকাগ্নিনাশক অর্থাৎ পরিপাক (হজম) শক্তি বিনষ্ট করে। এ পর্য্যন্ত আলোচনায় দেখা গেল যে খাদ্য দ্রব্যের কৃত্রিমতায় অপাক হইয়াও ক্ষয়রোগ জন্মে; এতদ্ব্যতীত কাস রোগাদি হইতেও ক্ষয় জন্মে, এই কাসেরও প্রবল কারণ সহরে বর্ত্তমান। তন্মধ্যে রাস্তার ধূলা ও ধোঁয়াই প্রধান, তাহা ছাড়া বাসীদ্রব্য খাওয়াও অপর কারণ।

সাধারণ কাস রোগের হেতু—

ধূমোপঘাতাদ্রজসস্তথৈব ব্যায়ামরুক্ষান্ন নিষেবণাচ্চ।
বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য বেগাবরোধাৎক্ষবথোস্তথৈব।

ক্ষয় কাসের কারণ—

বিষমাসাত্ম্যভোজ্যাতিব্যবায়াদ্বেগনিগ্রহাৎ।
ঘৃণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপন্নেঽগ্নৌ ত্রয়োমলাঃ।

নাসারন্ধ্র ও মুখ বিবরাদিতে ধূম ও ধূলা প্রবিষ্ট হইলে, ব্যায়াম, রুক্ষ আহার, দ্রুত আহার হেতু খাদ্য ভ্রমে বিপথে চালিত হইলে এবং মল মূত্র ও হাঁচির বেগ ধারণ করিলে, প্রাণবায়ু ও উদান বায়ু কুপিত হইয়া কাস রোগ জন্মে। এই উদান বায়ুর স্থান কণ্ঠদেশে, সুতরাং উহা কুপিত হইলে কণ্ঠ দেশ হইতে অন্যত্র যাইতে চেষ্টা করে তাহাতেই কাসের উদ্বেগ হয়। সেই সঙ্গে প্রাণ বায়ুরও ক্ষয় ঘটে কাজেই শরীর দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয়। ইহাই সাধারণ কাস রোগ। ক্ষয়জ কাসে উহা ছাড়া আরও বিশেষ কারণ আছে।

বিষম ও অনাত্ম ভোজন, স্ত্রী সেবার আধিক্য ও মল মূত্রাদির বেগ ধারণ কিম্বা ঘৃণা বা শোক হেতু যথেষ্ট আহার গৃহীত না হইলে ত্রিদোষ কুপিত হইয়া ক্ষয়জ কাস জন্মায়।

এইরূপে দেখা যায়, বেগ ধারণ, যে সব আহার্য্য দ্রব্য সহ্য হয় না ও অধিক মলকর সেই সব ভক্ষণ, অতিরিক্ত চলা ফেরা ও পরিশ্রম, তার পর অত্যধিক স্ত্রীপ্রসঙ্গ এই গুলিই ক্ষয় রোগের কারণ। সাধারণতঃ শরীরের ক্লেদ (উহা মল মূত্র বা স্ত্রীরজঃ যাহাই হউক) যথা সময় নির্গত না হইলে, শারীরিক ও মানসিক শ্রম জনিত ক্ষয়ের যথারূপ পূরণ না হইলে, আবার তদ্বিপরীতে অত্যধিক শুক্রাদির ক্ষয় হইলে, এই দুর্দ্দান্ত ক্ষয়রোগ জন্মে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে দুই প্রকার উপায় অবলম্বন আবশ্যক। যাহাদের পাকাগ্নি দুর্ব্বল তাহাদের সহজ পাচ্য লঘু অথচ পুষ্টিকর আহার একান্ত বিধেয়, সে স্থলে কেবল বলকর আহারে অনিষ্ট হইবে। এই বিষয় আমাদের বাঙ্গালীর পক্ষে দিবসে ক্ষুধার অনুপাতে সরু চাউলের ভাত, মুগের যূষ ও ক্ষুদ্র মাছের ঝোল, শাক্তে, বেতাগ, বেতোশাক, কচি মূলা, পুরাতন কুমড়া ও ছোট কাঁচকলা, সজিনা পটোল কচি বেগুন, করলা ও আমরুল, সামুক গুগলী, লেবু ও দাড়িম ও যবের ছাতু প্রভৃতি ব্যবহার্য্য; রাত্রেও সদ্য প্রস্তুত ঘোল, যবের ছাতু, খৈর মণ্ড প্রভৃতি খাওয়া বিধেয়।

পুই শাক, বেশী জল পান, পিষ্টকাদি, আম, বড় মাছ ও মাংস মাষকলাই, ঘৃত দুধ, ছানা, তালশাঁস ও শীতল জল এবং বর্ত্তমান সময়ের প্রথামত বরফ জল একবারেই নিষিদ্ধ। তবে দুধ ও ঘৃত ব্যবহার করিতে হইলে উহা দ্রব্যান্তরে সুসংস্কৃত ও সহজ পাচ্য করিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য। এই সব কারণে নব্যমতে

Skimmed milk প্রদত্ত হইয়া থাকে, আমাদের আয়ুর্ব্বেদ মতে শর্করা সংযুক্ত দুধ সহজ পাচ্য।

কাস ও শুক্র ক্ষয়াদি জনিত ক্ষয় রোগ হইলে ও সহজ পাচ্যও বলকর আহার আবশ্যক, তবে যাহাদের হজমশক্তি ভাল তাহারা গুরু-পাক অথচ বলকর আহার গ্রহণ করিতে পারেন।

সাধারণত কাস রোগেও দাদ্খানি ও বাকতুলসী চাউলের ভাত, মুগ ও মাষকলাই যুষ, ছাগমাংস, কচ্ছপ মাংস, ছাগদুধ, গম ও যবের প্রস্তুত খাদ্য এই সমস্ত উপকারী।

আর শাক মধ্যে কেবল কচিমূলা, বেতোশাক, বেগুন ও সুশুনী শাক ব্যবহার্য্য।

কাস রোগে মাছ, আলু, গাঁজর প্রভৃতি কন্দ, লাউশাক পুঁইশাক, বাসী ভাত নিষিদ্ধ।

শ্রীবিনোদলাল দাস গুপ্ত।

পুনর্জ্জন্ম।

পূর্ব্ব জন্ম কি এই বিষয়ে মীমাংসা করা বড়ই কঠিন। নানা মুনি উহা নানা ভাবে মীমাংসা করিতে সাধ্য মত চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহাদের যেরূপ অভিরুচি তাঁহারা উহা তদনুসারেই অনুসরণ করিয়া থাকেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের এক মত আর মুসলমানদের আর এক মত। যাহাদের যেরূপ মতই হউক না কেন, প্রত্যেক হিন্দুরই উহা হিন্দুভাবে মীমাংসা করা উচিত। হিন্দুদের ভিতরে যাঁহারা উহা বিশ্বাস করেন না তাঁহারা উহা বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা-প্রসূত বলিয়াই মনে করেন। তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধ করা আমার অভিপ্রায় নয়। পূর্ব্ব জন্ম কি আমি যতটা উপলব্ধি করতে সমর্থ হইয়াছি তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিব।

পরমাত্মা, অব্যক্ত, অক্ষর ও শব্দময় অর্থাৎ অক্ষর ও শব্দ দ্বারাই পরিচিত। উহা ব্যতিরেকে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কিন্তু তিনি সৃষ্টির

ভিতরে সত্যস্বরূপ সকলেই উহা বিশ্বাস করেন। স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের প্রকাশক, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, নির্ধূম, জ্যোতির্ম্ময়, অলীক দেহ চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত রাখিয়াছেন। তাহাই জাগ্রদবস্থা সৃষ্টি সুষুপ্তাবস্থার লয়। অণু পরমাণু সকলই তাহার অবিদ্যা ও মায়া শক্তি (creative power) হইতে জাত। উহা সাঙ্খ্যমতে চিদাকাশ বলিয়াই অভিহিত হইয়াছে। এই চিদাকাশই অসংখ্য জীবাত্মা বা পরাপ্রকৃতির মূলাধার। এই জীবাত্মাকেই প্রাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা infinitessimal ultimate living atoms নাম দিয়াছেন। তাই চিদাকাশ হইতে মহাকাশ এবং মহাকাশ হইতে আকাশের উৎপত্তি। শেষোক্ত মহাকাশ ও আকাশও অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। এই পরমাণু গুলিই জড় প্রকৃতির মূলাধার। এই পরমাণু গুলিকেই বৈজ্ঞানিক মতে electrons নাম দেওয়া হইয়াছে। এই electrons এর বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণে নানা প্রকারের জড় দেহ বিশিষ্ট atoms বা অণু গঠিত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়। One atom hydrogenতে প্রায় ৭০০ সাতশ ও one atom radiumতে প্রায় ১৫০০শ electrons দৃষ্ট হয়। সুতরাং electron এর বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণে অতি সূক্ষ্ম হইতে অতিস্থূল যাবতীয় জড় প্রকৃতির মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি। অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরাপ্রকৃতি জড়া প্রকৃতির প্রত্যেক রেণুর প্রাণ ও শক্তি স্বরূপ। এই পরাপ্রকৃতি জড়প্রকৃতির ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ। জড়াপ্রকৃতি ক্ষেত্র স্বরূপ। তাই জড়াপ্রকৃতি হইতেই লিঙ্গ দেহ বা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাদির উৎপত্তি। যদি তাহাই হয় তবে স্পষ্টই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, দুই প্রকার লিঙ্গ দেহ জড়া প্রকৃতি হইতে জাত। সুতরাং পরাপ্রকৃতি সমন্বিত জড়াপ্রকৃতি দ্বিবিধ—male germs and female germs অথবা male nucleus or female nucleus. উক্ত বিষয়ের সত্যতা স্ত্রী ও পুরুষের দৈহিক গঠন হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইবে। ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। আর এই জড়া প্রকৃতির অতি সূক্ষ্মাংশই মন বুদ্ধি অহঙ্কার। জীবাত্মা উহার ভিতরে থাকিয়া অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে এই বিষয়ে আমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ—
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা।

উপরোক্ত শ্লোক হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সমুদয়ই জড়াপ্রকৃতি হইতেই জাত।

আর এক প্রকার প্রকৃতি আছে। তাহা এই অপরা এবং নিত্য চেতনা শক্তি দ্বারা এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে। এই পরা প্রকৃতিই জীবাত্মা ও প্রত্যেক জড়া প্রকৃতির রেণু দেহে প্রাণ স্বরূপে অবস্থিত ও protoplasm দ্বারা বর্দ্ধিত।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

গীতার উপরোক্ত বিষয় গুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জড়া প্রকৃতি পরাপ্রকৃতি হইতে বিভিন্ন ও তাহার পৃথক্ সত্ত্বা আছে। সে যাহা হউক কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বোধ হয় কাহারও আপত্তির কারণ নাই যে জড়া প্রকৃতি পরা প্রকৃতিকেই আশ্রয় করত অবস্থান করিতেছে; সুতরাং জীবাত্মা প্রত্যেক জীবেরই আত্মা ও প্রাণ স্বরূপ। পুরুষ দেহস্থ বীজ নির্দ্দিষ্ট কালে প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এবং স্ত্রী বীজ নীত হইলে embryo হইয়া থাকে। পুরুষ ও স্ত্রীবীজ সংস্পর্শজাত embryo তিনটী layer বা ভাঁজ বিশিষ্ট ও অনেক গুলি nucleus বা জীবাণুর সমষ্টি মাত্র। এই জীবাণুর সমষ্টি হইতেই পুত্র সন্তান কিংবা কন্যা সন্তানের জন্ম হইয়া থাকে। যদি পুরুষ জাতীয় জীবাণুর সংখ্যা অধিক হয় তবে পুত্র সন্তান আর তাহার অন্যথা হইলে কন্যা সন্তানের জন্ম হইয়া থাকে। উক্ত জীবাণু গুলির কেন্দ্রস্থলেস্থিত পরমাণুটীই প্রাণ স্বরূপ ও অন্যান্য অণু ও পরমাণুগুলি তাহারই চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। সমস্ত শক্তি জীব পরমাণুটীতে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে, অন্যান্য অণু পরমাণু গুলি তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে সমর্থ হয়। সূর্য্য যেমন একটী সৌর জগতের প্রাণ ও আত্মা স্বরূপ এবং গ্রহ ও উপগ্রহাদি তাহার জীবাণু স্বরূপ সেই প্রকার পরমাণু সমষ্টিতে গঠিত দেহের কেন্দ্রস্থলস্থিত পুষ্ট পরমাণুটীই সমস্ত প্রাণ ও আত্মা স্বরূপ এবং হৃদয়কাশে অধিষ্ঠিত—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোমধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি—
ঈশানো ভূত ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥

এত বৈত্য কাঠকোপনিষৎ।

ব্রহ্ম অঙ্গুষ্ঠমাত্র প্রমিত, কেন না হৃদয় পুণ্ডরীক অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পরিমাণ, পুরুষ ও হৃদয় পুণ্ডরীকের ছিদ্র মধ্যগত অন্তঃকরণ উপাধিযুক্ত তাই তাহাকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমিত বলিয়া নিরূপণ্ করা হয়। এই পুরুষ দ্বারা নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ। এখানে ব্রহ্ম জীব অর্থবাচক।

এই পুরুষ জন্ম জন্মান্তরে পুরুষ ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া স্ত্রী ক্ষেত্রে গমনাগমন করিয়া থাকে। এই বিষয়টীর সমর্থনার্থ—আমি নিম্নলিখিত শ্লোকটী কাঠকোপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ
স্থাণু মন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্।

দেহধারণার্থ শুক্রবীজ সমন্বিত হইয়া কতকগুলি অবিদ্যা মোহেও প্রাণী যোনি দ্বার প্রাপ্ত হয়। আবার কতকগুলি অধমজীব মরণান্তে স্থাবরতা লাভ করে। এই প্রকার বিরুদ্ধ উৎপত্তির পূর্ব্বজন্মীয় সঞ্চিত কর্ম্ম এবং জ্ঞানই কারণ। যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে সে তদ্রূপ শরীরই লাভ করে। ইতি শাঙ্করভাষ্য।

কর্ম্ম ও বাসনানুসারে জীব ক্রমশঃই উন্নত দেহ প্রাপ্ত হয় ইহা ঠিক। কিন্তু উহা আবার নীচকর্ম্ম দ্বারা নীচ জীবদেহ লাভ করে কিংবা উহা উচ্চ দেহের ভিতরই কর্ম্মফল ভোগ করে কিনা তাহাই জিজ্ঞাস্য। কিন্তু জীব একবার উচ্চদেহ লাভ করিলে, সেই উচ্চ জীবদেহের ভিতরেই কর্ম্মফল লাভ করে বলিয়াই বিশ্বাস। অর্থাৎ পশুর জীব ক্রমোন্নতিতে যখন মনুষ্য জীবে পরিণত হয় তখন মনুষ্যরূপ দেহের ভিতরেই নিজ কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিয়া থাকে। আবার কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যজীবন উন্নত হইলেই আরও উচ্চতর জীবের দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে বলিয়াই অনুমিত হয়। আবার সেই উন্নত দেহেও নিজ কর্ম্মাকর্ম্ম জনিত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ইহাই আমার উপরোক্ত বিষয়ের বক্তব্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হৃদয়ের মধ্যস্থিত অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ব্রহ্মই আত্মা স্বরূপ। সূর্য্য যেমন সৌর জগতের প্রাণ জগতের হৃদয়স্থিত পুরুষই সেই হৃদয়ের আত্মা ও প্রাণ স্বরূপ। জীবাণুগুলি সেই আত্মাকে বেষ্টন করত ঘুরিতে থাকে। অঙ্গুষ্ঠ প্রমিত পুরুষই পরে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

যেমন Zoospore গমনকালে নিজ শ্রেণীস্থ জীবকেই গ্রহণ করে সেইরূপ জীবও মৃত্যুর পরে নিজ শ্রেণীস্থ পুরুষ দেহের ভিতর দিয়া স্ত্রীদেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। নিজ জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা এই দেহকেই মনোনীত করিতে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এক একটী পরমাণু এক একটী জীব বিশেষ। এই জীবের তিনটী দেহ স্থূলদেহ বা লিঙ্গদেহ, সূক্ষ্ম ও জ্ঞানাত্মক দেহ। মৃত্যুর পরে অর্থাৎ প্রত্যেক রেণুর মৃত্যুর পরে কেবল স্থূলদেহই বর্ত্তমান থাকে। সূক্ষ্ম ও জ্ঞানাত্মক দেহ রেণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। আত্মা এই ত্রিবিধ দেহের ভিতরে বিচরণ করে। মৃত্যুর পর কেবল সূক্ষ্ম ও জ্ঞানাত্মক দেহে বিচরণ করিয়া থাকে বলিয়াই প্রত্যেক হিন্দুর বিশ্বাস।

পুনশ্চ জন্মান্তর কর্ম্মযোগাৎ
সএব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ
পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীব-
স্ততশ্চ জাতং সকলং বিচিত্রং
আধার মানন্দ সখণ্ড বোধং
যস্মিন্‌লয়ং যাতিপুরত্রয়ঞ্চ। ১৪ কৈবল্যোপনিষদ—

আত্মা উল্লিখিত ত্রিবিধ দেহের ভিতরে বিচরণ করে।

On the evolution and the transmigration of soul—

জীবাত্মা বিভিন্ন বাসনা লইয়া বিভিন্ন পরমাণুতে বিদ্যমান। সেই পরমাণুর প্রাণ স্বরূপ জীবাত্মা। সুতরাং এক একটী পরমাণু যেন এক একটী জীব স্বরূপ। ইহার শ্বাস প্রশ্বাসের শক্তি আছে এবং তদ্দ্বারা প্রাণবায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে এবং protoplasm দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। প্রকৃতির ভিতরে বহুদিন অবস্থান হেতু ও জন্মজন্মান্তরে বাসনার পরিতৃপ্তি দ্বারা একই প্রকারের জীব অন্য প্রকারের জীবে পরিণত হয়। ক্রমশঃ বাসনার পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিম্নতর জীব উচ্চতর জীবে অথবা নিম্নতর জীবাত্মা উচ্চতর জীবাত্মাতে পরিণত হইতেছে। এই প্রকারে ক্রমশঃ উদ্ভিদ্ জগৎ হইতে প্রাণী জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, একথা সকলেই বিশ্বাস করেন। কারণ উদ্ভিদ জগতের জীব ক্রমশঃ protoplasm দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া প্রাণিজগতের জীবে পরিণত হয়।

এখন দেখা যাইতে পারে কি প্রকারে উদ্ভিদ্ জগৎ হইতে প্রাণিজগতের সৃষ্টি হইয়াছে। Matter is indestructible অর্থাৎ জড় পদার্থের ধ্বংস নাই। কেবল উহা আকার পরিবর্ত্তন করে। বৃক্ষাদির ধ্বংস হইলেই ইহার পরমাণুগুলি আকাশের ভিতরেই বিদ্যমান থাকে। আকাশ ভিন্ন ইহারা আর কোথায় যাইবে? ক্রমশঃ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ পরমাণু অন্য প্রকার পরমাণুতে পরিণত হয়। এই জন্যই প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন অনেক নীচ জাতীয় জীব এই পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইয়াছে।

এই প্রকারে ক্রমশঃ উদ্ভিদ্ জগতের জীব protoplasm দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া প্রাণি জগতের জীবে পরিণত হইয়াছে। এই জন্যই প্রাণিতত্ত্ববিদেরা প্রাণিজগতের জীবদিগকে তৃণভোজী, মাংসভোজী ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই প্রকারে প্রাণী ক্রমশঃ উন্নত দেহ লাভ করত অবশেষে ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়।

পুনশ্চ প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা জীবাত্মার সূক্ষ্ম ও জ্ঞানাত্মক দেহ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে থাকে। সেই নিমিত্তই মানব জাতীয় জীবে জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ দেখা যায়। অনেকে বলেন নীচ জাতীয় জীব জন্তু ইত্যাদির জ্ঞান বুদ্ধি নাই। ইহা তাহাদের ভুল বিশ্বাস। কারণ তাহাদের জীবের জ্ঞানাত্মক ও সূক্ষ্মদেহ অস্ফুটাবস্থায় থাকে। এই জন্যই তাহাদের ভিতরে উহা সুষুপ্তাবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।

প্রত্যেক জীবই কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। তাহাদের দেহমধ্যস্থিত developed বা পুষ্ট পরমাণুটাই আবার সেই জীবের জীব স্বরূপ। তাহাই মৃত্যুর পর সেই জাতীয় জীবের পুরুষ দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই পুরুষ দেহে জাত জীবটীর সঙ্গে একত্র অবস্থান করে। জীব প্রত্যেক জীবেরই হৃদয়রূপ গুহাতে অবস্থান করে।

পূর্ব্বে দুই প্রকার প্রকৃতির বিষয় বলা হইয়াছে। পরা প্রকৃতি ও জড়া প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি জড়া প্রকৃতির প্রাণ ও আত্মা স্বরূপ। ইহা পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম। কতকগুলি পরমাণুর শক্তি একটী নির্দ্দিষ্ট ও পুষ্ট এবং অধিক শক্তি বিশিষ্ট পরমাণুতে কেন্দ্রীভূত হইয়াই এক একটী দেহ গঠিত হয়। এক একটী দেহ অনেকগুলি ও অনেক প্রকারের পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। কেন্দ্রস্থলে

অবস্থিত নির্দ্দিষ্ট পরমাণুটী জীব। ইহা প্রত্যেক দেহের হৃদয়স্থলে অধিষ্ঠিত। এই জীবই ব্রহ্মরূপে প্রত্যেক প্রাণীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করিয়া দেহের সমস্ত পরমাণুগুলিকে আকর্ষণ শক্তি দ্বারা আবদ্ধ রাখিয়াছে; সুতরাং এই জীবের অন্তর্ধানেই অণু ও পরমাণুগুলি ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

এখন এই কথা সহজেই বলা যাইতে পারে একটী প্রাণিদেহ কতকগুলি জীবাণুর সমষ্টিমাত্র। প্রত্যেক জীবাণুই তাহাদের খাদ্য protoplasm দ্বারা বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়। জীব খাদ্য বস্তুর সঙ্গের protoplasm সংগ্রহ করিয়া জীবাণুগুলিকে বিতরণ করিয়া থাকে। সেই protoplasmএর অভাব হইলেই জীবাণুগুলি নিস্তেজ ও সুষুপ্তাবস্থায় মৃতবৎ অবস্থান করে। এ জন্যই বার্দ্ধক্য অবস্থায় উপযুক্ত protoplasmএর অভাবে শরীরের জীবাণুগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কারণ সেই সময়ে পাকযন্ত্রের ক্রিয়া হ্রাস হওয়াতে খাদ্যবস্তু হইতে উপযুক্ত পরিমাণে protoplasm বাহির হয় না। এই জন্যই বার্দ্ধক্যাবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শিথিল হইয়া পড়ে। জীব বাহ্যজগৎ হইতেই দেহের পুষ্টি-সাধনোপযোগী পরমাণুগুলি গ্রহণ করিয়া থাকে। আর অনেক খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যে সমস্ত পরমাণু গ্রহণ করে সেই সমস্ত পরমাণুর ভিতরে যেগুলি আমাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল সেই গুলিই আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন করে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জীবাণু হইতে কেবলমাত্র protoplasm গৃহীত হয়। protoplasm-গুলি মৃত দেহে থাকিয়া যায়। রেণুগুলি দেহ হইতে বহিষ্কৃত হয়।

সকলেই জানেন মৃত্যুর পরে জীবাণুগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং কতক দিনের জন্য এই জীবাণুগুলি অসংখ্য কীটাণুতে পরিণত হয়। এই কীটাণুগুলির জীবিতকাল মাত্র ২৪ ঘণ্টা। তৎপরেই ইহারা ইহাদের infinitesimal living particleএর conditionতেই পরিণত হয়। ইহা প্রাকৃতিক দৃশ্য। অল্প পর্য্যবেক্ষণ করিলেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং প্রত্যেক organic substanceএর রেণুতে রেণুতেই অতি সূক্ষ্ম জীবাত্মা বর্ত্তমান। এই জীবাত্মাগুলির প্রত্যেক রেণু স্থূল দেহ। স্থূল দেহের ভিতরে যে পর্য্যন্ত উহারা protoplasm পাইতে পারে ঠিক সেই সময় পর্য্যন্তই উহারা এই রেণুর ভিতরে থাকে। ভ্রমর যেমন প্রত্যেক রেণুর ভিতরে থাকিয়া মধু অন্বেষণ করিয়া থাকে এবং শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা প্রাণবায়ু গ্রহণ করে, protoplasmএর

অভাব হইলেই উহারা এই রেণু দেহকে ছেড়িয়া দেয় এবং অন্য রেণু দেহে নিজ বাসনানুসারে আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রত্যেক জীবাত্মার দেহান্তর ও দেহ প্রবেশ ও সেইরূপ। আবার প্রত্যেক পরমাণুস্থিত জীবাত্মার স্থিতি কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। এই জন্য মোটামোটি হিসাবে বিভিন্ন প্রাণীর জীবিত কাল নির্দ্দিষ্ট আছে।

কোনও দেহস্থিত জীবের দেহত্যাগের সঙ্গে তদানুসঙ্গিক জীবাণুগুলিরও মৃত্যু বা দেহান্তর ঘটিয়া থাকে। এবং তাহারা নিজ বাসনোপযোগী দেহাবলম্বন করে। এই প্রকারে প্রতিদিনই জীব জীবাণুর দেহ প্রাপ্তি ও দেহান্তর।

জন্মান্তর ও সুখ দুঃখ—জীবাত্মা ক্রমশঃই বাসনার পরিতৃপ্তি দ্বারা একই প্রকারের জীবাত্মা হইতে অন্য প্রকারের জীবাত্মাতে পরিণত হয়; সুতরাং দেখা যায় মানব জাতির জীবাত্মা বাসনার সম্পূর্ণ বিকাশাবস্থায় মানবজাতি নিজ বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অনেক গুরুতর পাপ কাজ করিবে মনে করিয়াই বোধ হয়, পরম পিতা পরমেশ্বর বাসনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বুদ্ধি ও যুক্তি ইত্যাদিরও সম্পূর্ণ বিকাশাবস্থার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং হিতাহিত বিবেচনা শক্তি দ্বারা চালিত বাসনাজাত কাজই পুণ্য ও ইহার অন্যথা হইলেই পাপ। তাই পাপ পুণ্যের জন্যই জীবাত্মা জন্মান্তরে ফল ভোগ করিয়া থাকে। মানসিক অশান্তিই পাপের শাস্তি, মানসিক শান্তি পুণ্যের ফল। দাসদাসীপরিবেষ্টিত দুগ্ধ ফেননিভ শয্যাস্থিত অট্টালিকাবাসী ধনীর মানসিক অশান্তিই পূর্ব্বজন্মের কিংবা বর্ত্তমান জীবনের পাপের ফল, আর পর্ণ কুটীরবাসী দরিদ্রের মনের শান্তি সুকৃতির ফল। পার্থিব বৈষম্য শুধু কেবল জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত কিংবা অনুপযুক্তরূপে চালিত বুদ্ধিবৃত্তির জয় পরাজয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায়, ৫ম খণ্ড।] ১৩২৩ সাল, আশ্বিন। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের স্ত্রীবিয়োগের কবিতা। *

ঘটনা চক্রে বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগের তিন জন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রৌঢ় বয়সে পত্নী-বিয়োগ-দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের শোকোচ্ছ্বাস কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তুল্যাবস্থায়, একই বিষয়ে লিখিত সেই কবিতাগুলির অনুশীলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কবিত্রয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় এক হইলেও তাঁহাদের প্রকৃতিগত বৈষম্য, প্রতিভার বিশিষ্টতা ও রচনাভঙ্গীর পার্থক্য অনুযায়ী, কবিতাগুলি স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে। কখনও তাঁহাদের চিন্তাস্রোত একই নির্ঝর হইতে নিঃসৃত হইয়া পৃথক খাতে প্রবাহিত হইয়াছে, কখনও বা বিপরীত মার্গ অবলম্বন করিয়া পরিণামে একই গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়াছে। কবিতাগুলির সেই সাম্যের মধ্যেও বৈষম্যের—রস-বৈচিত্র্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই এই প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য।

স্বর্গীয় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-কথা ও রচনার ইতিহাস সঙ্কলন করিবার সময় আমাকে অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ে কিছু অনুশীলন করিতে হয়। তাহারই ফল এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রীবিয়োগের কবিতা সমূহে যে কয়টী প্রধান প্রধান ভাবের ব্যঞ্জনা আছে, সেই গুলিকে মূল সূত্র ধরিয়া 'সেগুলির সহিত' রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের তুল্য ভাবাত্মক কবিতার সাদৃশ্য বা বৈষম্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

---

* সাহিত্য-সভায় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এস্থলে একথা বলা প্রয়োজন যে অক্ষয়কুমার স্ত্রী-বিয়োগ সম্বন্ধে "এষা" নামক একখানি সুসম্পূর্ণ কাব্য-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সেই কাব্যখানি খণ্ড কবিতার সমষ্টি হইলেও কবিতাগুলির মধ্যে একটি শৃঙ্খলা ও সংযোগ আছে।

রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য বিষয়ে সেরূপ কোনও সুসম্বদ্ধ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন নাই—কতকগুলি স্বতন্ত্র কবিতা লিখিয়াছেন;—সেগুলি তাঁহার কাব্য গ্রন্থাবলীর "স্মরণ" নামক খণ্ডে একত্রে স্থান পাইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালও এ বিষয়ে কোনও কাব্য রচনা করেন নাই—তিনি তাঁহার বিপত্নীক জীবনের অনুভূতি কয়েকটী কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অক্ষয়কুমারের ও রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলাল সেরূপ কবিতা অল্পই লিখিয়াছিলেন, এরূপ স্থলে অক্ষয়কুমারের কাব্যে যে সকল ভাবের সমাবেশ আছে, রবীন্দ্রনাথের বা দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় তাহার কোনওটির অভাবকে ত্রুটী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে শেষোক্ত কবিদ্বয়ের-বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের উপর অবিচার করা হইবে। সেরূপ ভাবে তুলনায় সমালোচনা করাও আমার উদ্দেশের বহির্ভূত। আমি কেবল কবিত্রয়ের রচনাভঙ্গীর পার্থক্যের, মনের গতির ঐক্য ও অনৈক্যের এবং কবিত্বের বিশিষ্টতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। সেই অভিপ্রায়ে, যে কয়টী প্রধান প্রধান ভাবের অভিব্যক্তি তাঁহাদের তিন জনেরই আলোচ্য রচনায় সাধারণ ভাবে বিদ্যমান—তাহারই কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। অনুশীলনের সুবিধার জন্য সেই ভাব কয়টীর ক্রমান্বয়ে নাম দিয়াছি—(১) শোকোচ্ছ্বাস, (২) স্মৃতি-উপভোগ, (৩) অতীত চিন্তা, (৪) বিধাতার প্রতি অনুযোগ, (৫) লোকান্তরিতা পত্নীর শুভ-কামনা, (৬) উপস্থিতি কল্পনা, (৭) আহ্বান, (৮) বিচ্ছেদের হেতু কল্পনা, (৯) মৃত্যু-মাধুরী, (১০) শোক জয়।

(১) শোকোচ্ছ্বাস।

দ্বিজেন্দ্র লাল—

শ্রান্ত দেহে, সন্ধ্যাকালে ফিরে এসে যখন,
আপন ঘরে যাবো,
কাহার কাছে বসবো এসে তখন আমি? কাহার
মুখের পানে চা'বো?

ক্ষুদ্র দুঃখ সুখের কথা কইব আমি এখন
কাহার কাছে এসে ?
যাহার কাছে কইতাম নিত্য,—গৃহ আঁধার কোরে
চোলে গিয়েছে সে।
অপমানে ক্ষিন্নপ্রাণে পড়তাম যখন এসে,
তাহার কাছে লুটে,
শান্তিসুধা রাশি দিয়ে, ধুয়ে দিত ক্ষত
কোমল কর পুটে ;
শুভদৃষ্টি ছড়িয়ে দিত তাহার রূপের প্রভায়
পরিপূর্ণ ঘরে ;
বাড়ির যত কর্কশ ধ্বনি ঢেকে যেত তাহার
কোমল কণ্ঠস্বরে।
চাইনি আমি কখনও কারো কাছে কিছু
দেয়নি কিছু কেহ ;
কেবল তুমি, প্রিয়তমে, দিয়েছিলে, গভীর
অযাচিত স্নেহ।
তোমায় আমায় বিবাদ হয়নি, এমন মিথ্যা কথা
কেমন কোরে কই ?
কখনো বা আমার কসুর, কখন বা তোমার,
হবে অবশ্যই।
তুমি মানুষ আমি মানুষ, গড়া দোষে গুণে,
—একটু বেশী কম ;
তদুপরি অনেক সময়ই, বুঝতে পরস্পরে
হোতে পারে ভ্রম।
তবু, তুমি আমায় ভাল বেসেছিলে, জানি,
ভরে' তোমার বুক,
হেথায় অনেক স্বামীর ভাগ্যে ঘটেনা সর্ব্বদা
যে সেই ভাগ্য টুক্।

অনেক সময় অনেক বিপদ, অনেক জ্বালা, ছিল—
অনেক দুঃখ রাশি,
করে ছিলে, তুমি প্রিয়ে, আমার আঁধার নিশায়
শুক্ল পৌর্ণমাসী।

বহেছিলে কোথা থেকে এসে, স্বচ্ছ-তোয়া
নির্ঝরিণী তুমি।
করে ছিলে সুশ্যামলা, তোমার স্নেহে, আমার
হৃদয় মরুভূমি।

আমার হৃদয় সরোবরে পদ্ম ফুলের মতন
তুমি ফুটে ছিলে।
আমার নীরস বৃক্ষকাণ্ডে বনলতার মতন
জড়িয়ে উঠে ছিলে।

পুষ্পিত অটবী দিয়ে, দিয়েছিলে পাহাড়
ঘেরে চারিদিক।
গেয়েছিলে আমার বাবলা গাছের উপর এসে
হে বসন্ত পিক।

রবীন্দ্রনাথ—

তখন নিশীথ রাত্রি; গেলে ঘর হতে
যে পথে চলনি কভু সে অজানা পথে।
যাবার বেলায় কোনো বলিলে না কথা,
লইয়া গেলেনা কারো বিদায় বারতা।
সুপ্তিমগ্ন বিশ্বমাঝে বাহিরিলে একা,
অন্ধকারে খুঁজিলাম না পেলাম দেখা।
মঙ্গল মূরতি সেই চির-পরিচিত,
অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তর্হিত!
গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে?
এ ঘর হইতে কিছু নিলে নাকি সাথে?

বিশ বৎসরের তব সুখ দুঃখ ভার
ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার!
প্রতি দিবসের প্রেমে কত দিন ধরে'
যে ঘর বাঁধিলে তুমি সুমঙ্গল করে,
পরিপূর্ণ করি তাহে স্নেহের সঞ্চয়ে
আজ তুমি চলে গেলে কিছু নাহি লয়ে?
তোমার সংসার মাঝে, হায় তোমা-হীন
এখনো আসিবে কত সুদিন দুর্দ্দিন,—
তখন এ শূন্যঘরে চিরাভ্যাস-টানে
তোমারে খুঁজিতে এসে চা'ব কার পানে?

(শেষ কথা)

অক্ষয়কুমার—

হও নাই গৃহের বাহির;
আজ তুমি কোথা যাবে? কার মুখপানে চাবে
সুখে দুঃখে হইলে অস্থির?
অচেনা অজানা ঠাঁই, কেহ আপনার নাই,
কে মুছাবে নয়নের নীর?
কোমলা সরলা অতি, পতি গতি, পতি মতি;
কে বুঝিবে মর্য্যদা সতীর!

* * *

মেল আঁখি, সর্ব্বস্ব আমার!
ম'রো না—ম'রো না, প্রিয়ে, এক মাত্র তোমা নিয়ে
আমার এ সাজান সংসার।
চেষ্টা করি,' প্রাণেশ্বরি, নয়—তবে দয়া করি'
নিশ্বাস ফেল গো একবার!
না পারো, আমার প্রাণ আমি করিতেছি দান
শ্বাসে—শ্বাসে অধরে তোমার।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার প্রথমাংশের সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার শেষাংশের এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথমাংশের সহিত অক্ষয়কুমারের কবিতার প্রথম শ্লোকটীর সাদৃশ্য আছে। অক্ষয়কুমারের বিলাপধ্বনি মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে, তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত আত্ম-অনুযোগে :—

অক্ষয়কুমার—

জীবনে চাহিনা কিছু আর, শুধু তারে দেখি একবার,
একবার তার মুখখানি !
জলুক—যতই প্রাণ, করিবনা কোন অভিমান,
সুখী হ'ব 'সুখে আছে' জানি'।

জীবনে সে পায় নাই সুখ, দুঃখে কভু ভাবে নাই দুঃখ,
রোগে শোকে হয়নি চঞ্চল ;
সরল অন্তরে হাসিমুখে, সকলি সহিয়াছিল বুকে,
কাঁদিলে যে হবে অমঙ্গল।

বলেছি অনেক রূঢ় কথা, দিয়েছি অনেক বুকে ব্যথা,
সকলি সয়েছে ভালবাসি'।
অনাদরে ফাটিয়াছে বুক, তবু ফুটে নাই কভু মুখ
হাসিতে ঢেকেছে অশ্রুরাশি।

* * * *

আজ বুঝি আমি অপরাধি, মর্ম্মে মর্ম্মে তাই এত কাঁদি
বহি নিজ পাপ তুষানল।
অহঙ্কারে রুদ্ধ করি মন, করেছিনু প্রেম-সংযতন
খুঁজেছিনু ছলনা কেবল।

বলিনি, বলিতে ছিল কত ! লুকাইতে ছিলাম বিব্রত,
লয়ে অভিমান রাশি রাশি।
মন খুলে প্রাণ খুলে তারে বলি নাই কেন বারে বারে,
'ভাল বাসি—বড় ভাল বাসি !'

শূন্যগৃহে বসে' আজ ভাবি—করেছিনু প্রেমের শুধু দাবী!
সে দেছে সর্ব্বস্ব হাসি মুখে!
শূন্যপ্রাণে চেয়েছে কাতরে, প্রেমবিন্দু দেইনি অধরে!
ম্লানমুখ চাপি নাই বুকে!
লয়ে তুচ্ছবাদ বিসংবাদ ফুরাইল জীবনের সাধ!
অপ্রকাশ রহিল সকলি!
জীবনে সহজ ছিল যাহা, মরণে দুর্লভ তাহা!
কে ক্ষমিবে? সে গিয়েছে চলি'।

অক্ষয়কুমারের উক্ত শোকোচ্ছ্বাসের কিয়দংশের সহিত রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত বিলাপোক্তির সাদৃশ্য আছে:—

রবীন্দ্রনাথ—

তোমার সকল কথা বল নাই, পারনি বলিতে,
আপনারে খর্ব্ব করি' রেখেছিলে, তুমি হে লজ্জিতে,
যতদিন ছিলে হেথা, হৃদয়ের গূঢ় আশাগুলি
যখন চাহিত তারা কাঁদিয়া উঠিতে কণ্ঠতুলি'
তর্জ্জনী ইঙ্গিতে তুমি গোপনে করিতে সাবধান
ব্যাকুল সঙ্কোচবশে, পাছে ভুলে পায় অপমান!
আপনার অধিকার নীরবে নির্ম্মম নিজ করে
রেখেছিলে সংসারের সবার পশ্চাতে হেলাভরে।
লজ্জার অতীত আজি মৃত্যুতে হয়েছ মহীয়সী,
মোর হৃদিপদ্মদলে নিখিলের অগোচরে বসি
নতনেত্রে বল তব জীবনের অসমাপ্ত কথা
ভাষাবাধাহীন বাক্যে! দেহ-মুক্ত তব বাহুলতা
জড়াইয়া দাও মোর মর্ম্মের মাঝারে একবার—
আমার অন্তরে রাখ তোমার অন্তিম অধিকার! (কথা)

দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাপ-গীতির করুণ সুর চরমে উঠিয়াছে, যখন তিনি তাঁহার মাতৃহারা শিশুপুত্রের চিত্র পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া, সেই অবোধ

শিশুর অবস্থার সহিত নিজের দুর্ভাগ্যের তুলনা করিয়াছেন; মাতৃহীন শিশু-পুত্রকে সম্বোধন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন—

যতদিন সে ছিল হেথায়, তোর জন্যই সে ছিল আকুল
তুই বলে সে সারা,
এখন একবার চোখের দেখা চেয়েও দেখেনা সে তোরে
ওরে মাতৃহারা!
কোথায় যে সে চলে' গেল কিছুই না বলে গেল;
এইটে কেবল বুঝিয়ে গেল সার,—
যে, ফির্চ্চেনা সে আর।
যাহা কিছু বিশ্বাস করে' দিয়াছিলাম তাহার কাছে,
সে তা নিয়ে গেল;
রচেছিলাম যে সংসারে এতদিনে, এত শ্রমে;—
ভাসিয়ে দিয়ে গেল।
এখন আবার নূতন যত্নে, নূতন শ্রমে, নূতন করে
নূতন সংসার রচি,
আমি না হয় সেটা পারি, তুই যে নেহাইৎ কচি!
না না, তুইই সইতে পারিস, আমিই সইতে পারি নাক;
কি জিনিষ যে হারিয়েছিস বুঝিস্ নাক তুই।
এখন যে রে তোর কাছে, তুল্যমূল্য লোষ্ট্র স্বর্ণ দুই।'
তাহার উপর, শিশুর হাড়ে ভেঙ্গে গেলে যোড়া লাগে
আমাদের আর লাগে নাক যোড়া;
তোদের যদি শুকায় গাছটি, শুকায় শুধু গাছের ডগা
আমাদের যায় একেবারে গোড়া।

অপর একটি কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন যে সর্ব্বস্বধন পুত্রের ও প্রিয়তমা কন্যার প্রতি মায়ের স্নেহটুকু তাঁহার পত্নী তাঁহার কাছে জমা রাখিয়া গিয়াছেন, এখন তিনিই তাহাদের বাপের চিন্তায় ও মায়ের যত্নে রাখেন। এইরূপ সন্তান স্নেহের অভিব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। অক্ষয়কুমারের কাব্যেও সেইরূপ ভাবের কয়েকটী

কবিতা আছে বটে ("গৃহতলে আছে বসি পুত্রকন্যাগণ", "অজয়ে জিজ্ঞাসে দাসী 'কোথা মা আমার'," ইত্যাদি) কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় সেই ভাবটী যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, অক্ষয়কুমারের কবিতায় সেরূপ করে নাই।

রবীন্দ্রনাথের শোকোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁহার সংযত আবেগে, অক্ষয়কুমারের বিশেষত্ব তাঁহার আত্ম-অনুযোগে এবং দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষত্ব তাঁহার সন্তান বাৎসল্যের প্রাবল্যে।

(২) স্মৃতি উপভোগ।

দ্বিজেন্দ্রলাল—

একটা স্মৃতি সকল স্মৃতির সেরা জাগে চিত্ত মাঝে;
একটা গীতি—দুঃখ দিয়ে ঘেরা সুখের মত বাজে;
কন্যার প্রতি মায়ের বিদায় বাণী, রূপের মত নেশা,
বিরঞ্জিত সন্ধ্যার মেঘখানি— সুখে দুঃখে মেশা।
উঠেছিলে যখন চিত্তে নামি', উষার মত জেগে,
কি গরিমা দেখেছিলাম আমি আকাশে ও মেঘে;
জন্মান্তরের যেন একটি গাথা জীবন আমার ব্যেপে,
সৃষ্টির উজ্জ্বল একখানা ছেঁড়া পাতা এলো যেন কেঁপে।
ঝাঁপিয়ে গীতি লভিল সে মরণ ঝঙ্কারেই কূপে;
পুড়ে গেল উষার রাঙ্গা বরণ নিজের তীব্র রূপে;
ক্ষুব্ধ নইক—আছে সেই স্মৃতি জীবন আমার ছেয়ে,
আকাশ থেকে আছে সেই প্রীতি আমার পানে চেয়ে।

অক্ষয়কুমার—

আকাশের ছায়া যথা সমুদ্র হিয়ায় রহে সদা পড়ি—
তেমনি তাহার স্মৃতি বিবিধ মায়ায় মন প্রাণ ভরি।
উড়ে পাখী স্রোতে যথা ক্ষুদ্র ছায়া তার নিমেষে মিশায়,
অন্য সুখ দুঃখ আজ হৃদয়ে আমার আশ্রয় না পায়।
চক্ষে স্বপ্ন-কুহেলিকা বক্ষে মরীচিকা মৃত্যুর তিমিরে—
নিঃশব্দে তাহার প্রীতি—দীপ্তিহীন শিখা ধুমাইছে ধীরে।

রবীন্দ্রনাথ—

আজি এ উদাস মাঠে আকাশ বাহিয়া
তোমার নয়ন যেন ফিরিছে চাহিয়া।
তোমার সে হাসিটুক সে চেয়ে দেখার সুখ
সবারে পরশি চলে বিদায় গাহিয়া
এই তালবন গ্রাম প্রান্তর বাহিয়া।
তোমার সে ভালবাসা মোর চোকে আঁকি
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছে রাখি।
আজি আমি একা একা দেখি দুজ দুজনের দেখা
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি'
আমার তারায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি রাখি।

এই স্মৃতি উপভোগের মধ্যে "আজি আমি একা একা দেখি দুজনের দেখা" কবি-কল্পনাটী রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব।

(৩) অতীত চিন্তা।

দ্বিজেন্দ্রলাল –

জান্তাম্ নাক, চিন্তাম নাক তোমায় আমি প্রিয়তমে,
যোল বছর আগে ;
আমার জীবন তোমার জীবন পৃথক গতি এ সংসারের
ছিল পৃথক্ ভাগে ;
তোমার জগৎ নিয়ে তুমি, আমার জগৎ নিয়ে আমি,
ছিলাম ত সে একা ;
একরম ত যাচ্ছিল সে জীবন, নিরুৎসবে কেটে ;
—কেন হোল দেখা।

* * * *

এসেছিলে সে দিন তুমি যেমন ক্লান্ত নিদ্রাবেশে
সুখ স্বপ্ন আসে ;
এসেছিলে, আসে যেমন কান্তারে চামেলি গন্ধ,
বসন্ত বাতাসে ;

শুষ্ক তপ্ত নদী তটে উচ্ছ্বসিত কল্লোলিত
চেউয়ের মত এসে,
স্মৃতি হতে হায়া একটা অজানা রাগিনীর মত
কোথায় গেল ভেসে।

অক্ষয়কুমার—

জন্মেছিনু একা!
না হয় কৈশোর শেষে তার সনে দেখা।
তার মিলনের আগে কিছুতে মনে না জাগে
কেমনে কাটিত দিন—কি অদৃষ্ট লেখা।
কে বলিবে আজ
কি ছিল কৈশোর আশা, কৈশোরের কাজ!
সেই আদি সূত্র ধরি আবার জীবন গড়ি
সে যদি মুছিয়া যায় জীবনের মাঝ।
কি গড়িব আর?
আমি শুষ্ক ছিন্ন সূত্র দেব মালিকার।
কোথা হ'তে কি যে এলো—
গেল—গেল—সব গেলো—
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সর্ব্বস্ব আমার।

রবীন্দ্রনাথ—

এ সংসারে একদিন নববধূ বেশে
তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে,
রাখিলে আমার হাতে কম্পমান হাত
সে কি অদৃষ্টের খেলা, সে কি অকস্মাৎ:
শুধু এক মুহূর্ত্তের এ নহে ঘটনা
অনাদি কালের এই আছিল মন্ত্রণা।
দোঁহার মিলনে মোরা পূর্ণ হব দোঁহে
বহুযুগ আসিয়াছি এই আশা বহে'।

নিয়ে গেছ কতখানি মোর প্রাণ হতে
দিয়ে গেছ কতখানি এ জীবন স্রোতে!
কতদিনে কত রাত্রে কত লজ্জা ভয়ে
কত ক্ষতি লাভে কত জয়ে পরাজয়ে
রচিতেছিলাম যাহা মোরা শ্রান্তি হারা
সাঙ্গ কে করিবে তাহা মোরা দোঁহে ছাড়া?

এই সুখ দুঃখ বিজড়িত অতীত চিন্তা দ্বিজেন্দ্রলাল সরল ও সাধারণ ভাবেই উপভোগ করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের মনে সেই চিন্তায় বিয়োগ-ব্যথা তীব্র ভাব ধাব ধারণ করিয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে সেই চিন্তা অনাদি অনন্ত মিলনের তৃপ্তিপ্রদ কবিস্বপ্ন জাগরিত করিয়াছে।

(৪) বিধাতার প্রতি অনুযোগ।

দ্বিজেন্দ্রলাল—

এইত ছিল দেবী মূর্ত্তি, আলাপ, বিলাপ হাস্য, রোদন
কর্চ্ছিল ত কাছে;
কোথায় গেল? ফিরিয়ে দাওহে বিশ্বপতি। দাবী কর্চ্ছি—
বল কোথায় আছে?
এই সে ছিল, গেল কোথায়? দেখা হবে আবার,
কিম্বা এ চির বিচ্ছেদ?
আমি পার্ল্লাম নাক; তবে তুমি করে দাও হে প্রভু
এ রহস্য ভেদ।
—হারে মূর্খ! কাহার কাছে কিসের জন্য দাবী কর্চ্ছিস?
জানিস্ না কি ভবে,
যা হবার তা হবেই হবে, মাথা খুঁড়ে মরিস যদি
যা হবার তা হবে।
কাহার কাছে বিচার চাচ্ছিস্? বিচার কর্ত্তা বহুৎ দূরে,
আর্জ্জি বড়ই ক্ষুদ্র;
তোর আর বিচার কর্ত্তার মধ্যে পড়ে আছে উত্তাল
এক প্রকাণ্ড সমুদ্র।

আজ পর্য্যন্ত শুনিনিক—শুনে কারো আর্ত্তধ্বনি
ফিরেছে প্রবাহ ;
বাত্যা থেমে গেছে ; গেছে সমুদ্র শুকায়ে
অগ্নি করে নাইক দাহ ;
উঠে মাত্র আর্ত্ত ধ্বনি, মিশে যেতে সমীরণে
ক্ষুব্ধ মূর্চ্ছনায় ;—
আমি কাঁদি, আমি কাঁদি, এ মহা ব্রহ্মাণ্ডে তাহে
কাহার আসে যায়।

(বিপত্নীক—২)

অক্ষয়কুমার—

কোন্ অপরাধে এই কঠোর শাসন ?
কোন পিতা পুত্র প্রতি
এমন নির্দ্দয় অতি ?
আমিও ত করিতেছি সন্তান পালন—
কত রাগি চোখে মুখে,
তখনি ত টানি বুকে,
মুছাতে নয়ন তার—মুছিত আপন।
এ নহে দেবের দয়া—দৈত্যের পীড়ন।
গিয়াছে প্রাণের সার,
মর্ম্মে মর্ম্মে হাহাকার,
নিরাশার অন্ধকার ঘেরিয়া ভুবন ?
মরণের পথে আজ
দূরে ফেলি' ঘৃণা লাজ—
কে দেবতা তার স্থান করিবে পূরণ ?

* * *

হৃদিহীন বিধির কি দুর্ব্বোধ সৃজন !
নাহি বুঝে নিজ শক্তি,
নাহি লক্ষ্য আত্মরক্তি,

নাহি অনুভব-তৃপ্তি—সূক্ষ্ম দরশন
উন্মত্ত কবির মত,
গড়ে ভাঙ্গে অবিরত
লয়ে এক অন্ধ শক্তি—কল্পনা ভীষণ!

(এবা—৭)

রবীন্দ্রনাথের "স্মরণ" কাব্যের কোনও কবিতায় বিধাতার প্রতি এরূপ অনুযোগের অভিব্যক্তি নাই। স্ত্রী বিয়োগের বহু পূর্ব্বে লিখিত 'শূন্য গৃহে' শীর্ষক কবিতা হইতে এইরূপ ভাবাত্মক দুইটী শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে আজ কাছে নাই
নিতান্ত সামান্য একি নাথ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে
কোথাও কি আছে প্রভু হেন বজ্রপাত!

* * * *

এ আর্ত্ত স্বরের কাছে রহিবে অটুট
চৌদিকের চির নীরবতা?
সমস্ত মানব প্রাণ বেদনায় কম্পমান
নিয়মের লৌহ চক্ষে বাজিবেনা ব্যথা?

(৫) লোকান্তরিতা পত্নীর শুভ কামনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল—

প্রিয়তমে! আজি তুমি জানি নাক কোথায় গেছ;
কোথায় আছ আর;
কোন শাস্ত্রের কোন ধর্ম্মের সাধ্য নাইক দিতে পারে
তাহার সমাচার—
যেথা থাক (থাক যদি) আশা করি আছ সুখে,
আশা করি তবে,
তোমার জগৎ—যাহাই হোক্ না আমাদের এ জগৎ চেয়ে
কিছু ভাল হবে। (বিপত্নীক—২)

অক্ষয় কুমার—

বিদায় বিদায় তবে! দিবা হল অবসান;
জানিনা মৃত্যুর পরে বিধাতার কি বিধান।
যেথা থাক সুখে থাক! ঝরে তপ্ত অশ্রুধার
অদূরে জাহ্নবী বহে ধরা অতি অন্ধকার!

রবীন্দ্রনাথ—

আজি বিশ্ব দেবতার চরণ আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্ব লক্ষ্মী হয়ে!
নিখিল নক্ষত্র হতে কিরণের-রেখা
সীমন্তে আঁকিয়া দিক্ সিন্দুরের লেখা!
একান্তে বসিয়া আজি করিতেছে ধ্যান
সবার কল্যাণে হোক্ তোমার কল্যাণ!

(আহ্বান)

পত্নীর পরলোকে শুভকামনায় কবিত্রয়ের কোনও মতভেদ নাই, কেবল রবীন্দ্র নাথের আশিস্-বাক্যে, তাঁহার পত্নী যে বিশ্বদেবতার চরণে আশ্রয় পাইয়াছেন এ বিশ্বাস ধ্রুবতর।

(৬) উপস্থিতি কল্পনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল —

আমার নাইক এমন কোন দাবী
তোমায় আমি পাবো!
আমি শুধু পূর্ব্ব কথা ভাবি'
তুমিও কি ভাবো?
তোমার পানে সকল দুঃখ মাঝে
আমি চেয়ে থাকি;
যখন দুঃখ বড় বক্ষে বাজে
তুমি আসো নাকি!

আমি শুনি মাঝে মাঝে যেন
তোমার কণ্ঠরব ;
তোমার স্পর্শ তোমার হাস্য হেন
করি অনুভব।
সবই ভ্রান্তি এ কি ? সবই মায়া
তোমার এই প্রীতি ?
শুধু স্বপ্ন ! শুধুই কি ছায়া ?
শুধুই কি স্মৃতি ?

(আহ্বান)

অক্ষয়কুমার—

এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিল কোন জনা ?
এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ কনা।
মূরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন,
শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন ?
এসেছিলে কত সাধে, মনে যেন পড়ে পড়ে,
পূরে নাই সাধ তার, ফিরে গেছে অনাদরে !
কাতর নয়নে চেয়ে কোথা গেল নাহি জানি
মরুর উপর দিয়া নব-নীল মেঘ খানি !

রবীন্দ্রনাথ—

আজি এই দ্বিপ্রহরে পল্লবের মর্ম্মর রাগিনী
তোমার সে কবে কার দীর্ঘশ্বাস করিছে প্রচার।
আতপ্ত শীতের রৌদ্রে নিজ হস্তে করিছ বিস্তার
কত শীত মধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা !
আপনার পানে চেয়ে বসে বসে ভাবি এই কথা
কত তব রাত্রি দিন কত সাধ মোরে ঘিরে আছে
তাদের ক্রন্দন শুনি ফিরে ফিরে ফিরিতেছে কাছে।

(আহ্বান)

দেহ-মুক্ত প্রিয়ার সান্নিধ্য কল্পনার সুখ-স্বপ্ন তিন জন কবিই সমান আবেগে হৃদয়ে পোষণ করিবার জন্য ব্যগ্র।

(৭) আহ্বান।

দ্বিজেন্দ্রলাল—

যখন আমার সাঙ্গ হবে খেলা
তুমি আমার এসো,
যখন ধীরে পড়ে' আসবে বেলা
তুমি একবার এসো।
যখন যাবে কলরব থামি ;
—যখন বড় একা,
কাউকে খুঁজে পাব নাক আমি
তুমি দিও দেখা।
যখন হেথায় ছেড়ে যাবো শেষে
যাহা কিছু প্রেয় ;
তুমি তখন সাগর তীরে এসে
সঙ্গে নিয়ে যেও।
আঁধার যদি—তুমি শুধু হেসো
আঁধার হবে আলো,
তুমি আমায় আগিয়ে নিতে এসো
—তুমি বেসো ভালো।

(আহ্বান)

অক্ষয়কুমার—

সে সময়ে দিও দেখা!

নয়নে যখন ঘনাবে মরণ ধরণী হইবে ধূসর বরণ,
নয়নের তলে অতীত জীবন স্বপনের সম লেখা।

* * * *

অতি নিরুপায় কোথা ছিল পড়ি'
আজীবন স্মৃতি আসে হাহা করি
প্রতিদিনে দিনে রহিয়াছে ভরি
কি গাঢ় কলঙ্ক দাগ?

নিজ পাপে তাপে অদৃষ্ট গড়িয়া
দেহ হতে আমি যাই বাহিরিয়া
সে সময়ে কাছে দাঁড়াবে কি প্রিয়া
লয়ে চির-অনুরাগ ?

রবীন্দ্রনাথ—

আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে
হে কল্যাণি, গেলে যদি, গেলে মোর আগে
মোর লাগি কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চির সন্ধ্যা তরে।
(শেষ কথা)

ইহজীবনের শেষ নিমেষপাতের সময় লোকান্তরিতা পত্নীর সাক্ষাৎ কামনা-তেও কবিত্রয়ের অভিব্যক্তির মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ও অক্ষয়কুমার অন্তিমকালকে একটি কঠিন ও ভীষণ পরীক্ষার ক্ষণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং অক্ষয়কুমার সেই ধারণাকে আত্মগ্লানিতে ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মৃত্যুক্ষণের সেই বিভিষিকাময়ী মূর্ত্তির অভাব নাই।

(৮) বিচ্ছেদের হেতু কল্পনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল—

ওগো তুমি কেন আমার আস না
এসো তুমি এসো আমার কাছে।
বড় রোষে বড় অভিমানে গো
হয়েছে এ ক্ষণিক ছাড়া-ছাড়ি
সকল ব্যথা গলে গেছে প্রাণে গো
এসো আমার—এসো তোমার বাড়ি!

অক্ষয়কুমারের এ সম্বন্ধে ধারণাও আত্মগ্লানির ভিত্তিতে গ্রথিত—সে ধারণা সুস্পষ্ট ও দৃঢ়তর—

প্রতিকর্ম্মে প্রতিধর্ম্মে উঠেছিলে সতী
উচ্চ হতে উচ্চতরে!
নিম্ন হতে নিম্ন স্তরে
নামিতে ছিলাম আমি অতি দ্রুতগতি।
ক্রমে বাড়ে ব্যবধান,
তাই হ'লে অন্তর্দ্ধান—
তোমারে স্মরিয়া যাহে হই শুদ্ধমতি!

রবীন্দ্রনাথের ধারণা দ্বিজেন্দ্রনাথের মত অনুমান সাপেক্ষ বা অক্ষয়কুমারের মত বাস্তবের কঠোর সত্য হইতে উদ্ভূত নহে, উহা কবিকল্পনার সুন্দর স্বপ্নালোকে উদ্ভাসিত রবীন্দ্রনাথ সেই ধারণাকে 'দ্বৈতরহস্য' নামে অভিহিত করিয়াছেন—ধারণাটী এই—

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি;
যে ভাবে সুন্দর তিনি সর্ব্বচরাচরে,
যে ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,—
যে ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী,
যে ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,
যে ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান,
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান,
যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণগন্ধগীত করিছে রচনা,
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি' দিলে সেই রহস্য আভাসে! (দ্বৈতরহস্য)

(৯) মৃত্যু মাধুরী।

অক্ষয়কুমার সাধনার বলে শেষে মৃত্যুকে প্রেম হইতে মধুময় স্থির করিয়াছেন,

রবীন্দ্রনাথের মনশ্চক্ষে মৃত্যু সুন্দর ও মধুর মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পনা ততদূর অগ্রসর হয় নাই, তিনি জীবন-সায়াহ্নে বিষাদক্লিষ্ট মনে মৃত্যুকে শান্তিদায়ক ভাবে কল্পনা করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল—

একে একে চোখের সামনে কুসুমগুলি প'ড়ে যাচ্ছে ঝরে,
ধীরে ধীরে পশ্চিমের ঐ পীতাকাশে নিভে আস্‌ছে আলো,
ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছে জগৎ, সোণার বরণ হয়ে আস্‌ছে কালো,
চক্ষুদুটি মুদে আস্‌ছে ক্রমে ক্রমে যেন নেশার ঘোরে,
বাজ্‌ছে দূরে বিজয়-ডঙ্কা—শুন্তে পাচ্ছি, লাগ্‌ছে নাত ভালো,
ইচ্ছা শুধু, পক্ষ দুটি গুটিয়ে এখন নীড়ে আসি ফিরে।
কে তুমি হে পরিচিত প্রিয়-বন্ধু কে আছো কুটীরে?
এইছি আমি তোমার কাছে, এখন তোমার সন্ধ্যা-দীপটি জ্বালো,
শ্রান্ত আমি ভ্রান্ত আমি, চিনেছি গো নিজ জন্মভূমি,
দেখাও কোথায় শান্তিশয্যা পেতে আমার রেখেছ গো তুমি।

(শান্তি)

অক্ষয়কুমার—

সতী, মরণে ভাবিনা আর ভয়ঙ্কর অতি।
তুমি যাহে দেছ পদ সে যে ফুল্ল কোকনদ,
সে নহে শ্মশান চুল্লী ভীষণ মূরতি।
মৃত্যু যদি নাহি হয়, প্রেম হতে মধুময়
দিবেন কন্যারে মৃত্যু কেন বিশ্বপতি?

অক্ষয়কুমার অন্যত্র লিখিয়াছেন—

হে মরণ ধন্য তুমি! না বুঝে তোমায়
বৃথা নিন্দা করে লোকে;
জগতে তুমিত শোকে
অমর করিছ প্রেমে দেব মহিমায়।
আজি মোর প্রিয়তমা ভব করে বিশ্বরমা
ভাসিছে ইন্দিরা সমা সৃষ্টি নীলিমায়!

কিবা বর্ণ, কিবা গন্ধ কিবা সুর কিবা ছন্দ
জগৎ হয়েছে অন্ধ প্রতি ভঙ্গিমায়
নাহি কায়া, নহে জায়া নাহি সে সম্পর্ক ছায়া—
জাগে শুধু প্রেম মায়া স্মৃতি সুষমায়।

রবীন্দ্রনাথ—

তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী
চির বিদায়ের আভা দিয়া, রাঙায়ে গিয়েছে মোর হিয়া
এঁকে গেছে, সব ভাবনায় সূর্য্যাস্তের বরণ চাতুরী।
জীবনের দিক্ চক্রসীমা লভিয়াছে অপূর্ব্ব মহিমা,
অশ্রুধৌত হৃদয় আকাশে দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী।

*   *   *   *   *

তুমি মোর জীবন মরণ বাঁধিয়াছ দুটী বাহু দিয়া।
প্রাণ তব করি অনাবৃত মৃত্যু মাঝে মিলালে অমৃত,
মরণেরে জীবনের প্রিয় নিজ হাতে করিয়াছ প্রিয়া,
খুলিয়া দিয়াছ দ্বার খানি যবনিকা লইয়াছ টানি
জন্ম মরণের মাঝখানে নিস্তব্ধ রয়েছ দাঁড়াইয়া।

(সার্থকতা)

(১০) শোক জয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রীবিয়োগের কবিতায় শোক জয় সহায়ক কোনও ধারণার অভিব্যক্তি নাই। তাঁহার একটী গীতে তিনি মনকে সেই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রবোধ বাক্য যে বিশেষ শান্তিপ্রদ তাহা বোধ হয় না। গীতটি এই—

একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদি,
জীবন জল বিম্ব সম মরণ-হ্রদ হৃদি।
দুঃখ মিছে কান্না মিছে,
দুদিন আগে দুদিন পিছে,
একই সেই সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী।

একই ঘোর তিমিরে আছে ঘেরিয়া চারিধারে,
জ্বলিছে দীপ নিভিছে দীপ সেই অন্ধকারে ;
অসীম ঘোর নিরবতায়
উঠিয়া গীতি থামিয়া যায়,
বিশ্ব জুড়ি একই খেলা চলেছে নিরবধি।

অক্ষয়কুমার ভগবানের অপার প্রেমের উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শোক জয় করিয়াছেন। ভগবানের নিকট তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছেন—

ভাঙ্গিতে গড়নি প্রেমে ওহে প্রেমময়।
মরণে নহিত ভিন্ন প্রেমসূত্র নহে ছিন্ন
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয় !
অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার।
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি কত ভাঙ্গি কত গড়ি
করি কত সত্য মিথ্যা নিত্য আবিস্কার !
নিজ সুখ দুঃখ দিয়া তোমারে গড়িয়া নিয়া
বসি তব ভাল মন্দ করিতে বিচার !

*   *   *

ক্ষম এ ক্রন্দন গীতি শোক অবসাদ !
সে ছিল তোমারি ছায়া তোমারি প্রেমের মায়া
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আস্বাদ !
এখনো সে যুক্ত করে মাগিছে আমার তরে—
তোমার করুণা স্নেহ শুভ আশীর্ব্বাদ !

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন উপায়ে,—কবি কল্পনার সুস্নিগ্ধ বারি সম্পাতে—তাঁহার শোক তপ্ত হৃদয়কে সুশীতল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

বজ্র যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি,
কে জানিত তব শোক সেইমত করি
আনি দিবে অকস্মাৎ জীবনে আমার
বাধাহীন মিলনের নিবিড় সঞ্চার।

'মোর অশ্রুবিন্দুগুলি কুড়ায়ে আদরে
গাঁথিয়া সীমন্তে পরি' ব্যর্থ শোক পরে
নীরবে হানিছ তব কৌতুকের হাসি।
ক্রমে সবা হতে যতদূরে গেলে ভাসি'
তত মোর কাছে এলে! জানি না কি করে'
সবারে বঞ্চিয়া তব সব দিলে মোরে!
মৃত্যুমাঝে আপনারে করিয়া হরণ
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন,
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—
এই কথা মনে জানি, নাই মোর শোক!

(অশোক)

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে কিন্তু কবিত্রয়ের শোক-গীতির পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বসন্ত, উৎসব, জীবন লক্ষ্মী প্রভৃতি যে সকল উৎকৃষ্ট কবিতা আছে, এবং অক্ষয় কুমারের কাব্যে হিন্দুর গৃহধর্ম্মানুষ্ঠানের, জীবন-মরণ সমস্যার, শোকজয়ের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্বের—নিরাশা ও অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাস ও শান্তির ক্রমবিকাশের যে অভিব্যক্তি না আছে, তাহার পরিচয় দিতে পারি নাই; কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় সে সকল বিষয়ের অবতারণা নাই। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটী কবিতা সম্পূর্ণ আকারেই উদ্ধৃত করিয়াছি, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ও অক্ষয় কুমারের কবিতাগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলিয়া পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করিতে পারি নাই; তাহাতে শেষোক্ত কবিদ্বয়ের কোনও কোনও কবিতার রস ভঙ্গ হইয়াছে। এরূপ স্থলে উদ্ধৃত কবিতাংশগুলি হইতে কবিত্রয়ের সমগ্র শোক-গীতির দোষগুণ বিচার করিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেরূপভাবে তুলনায় সমালোচনা করাও আমার অভিপ্রেত নহে। সেই হেতু উদ্ধৃত কবিতাগুলি সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা না করিয়া কবিত্রয়ের পত্নী-বিয়োগের সমস্ত কবিতাগুলি পাঠে আমার মনে যে ধারণা হইয়াছে,তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

রবীন্দ্রনাথের "স্মরণ" নামক কাব্য-গ্রন্থের সমগ্র কবিতাগুলির অনুশীলন

করিলে আমরা দেখিতে পাই কবির প্রতিপাদ্য এই যে, তিনি ও তাঁহার প্রিয়া অনাদি কাল হইতে দুইজনে মিলিয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়াছেন এবং সেই পূর্ণতা-প্রাপ্তির যাত্রা তাঁহাদের দুইজনকেই সাঙ্গ করিতে হইবে, তাঁহারা দুইজনেই এক,—কবির প্রিয়া ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া কবির অন্তরে দ্বৈত-রহস্যের আভাষ দিয়া গিয়াছেন; মৃত্যুর অন্তরালে গিয়া কবির প্রিয়া কবির জীবনেই জীবন ধারণ করিয়া আছেন—বিচ্ছেদ বেদনার নিবিড় বন্ধনে উভয়ের মিলন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; মরণের পরপার হইতে কবির প্রিয়া এখন কবির সহিত চির-মিলনের প্রতীক্ষায় আছেন; বিবাহ বেদনাকে কবি তাঁহার ইহ-জীবনের আনন্দ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন; মৃত্যুকে কবির প্রিয়া সূর্য্যাস্তের বর্ণরাগে রঞ্জিত করিয়া কবির চক্ষে সুন্দর মূর্ত্তিতে প্রতিভাত করিয়া গিয়াছেন। এই কথা গুলিই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ভাবে, নানা ভঙ্গীতে তাঁহার কবিতাসমূহে প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাগুলির ভাবব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব-সৌরভ-সমাকুল এবং তাহাদের ভাষা ও অভিব্যক্তি সরল ও সুন্দর—বিশেষতঃ তাঁহার চতুর্দ্দশ পংক্তির কবিতাগুলি,—যদিও সেগুলি "সনেট্" নামের গৌরব পাইতে পারে না, কারণ সেগুলিতে ইতালীয় সনেটের মিলের ও অভিব্যক্তির অপরিহার্য্য নিয়মগুলি রক্ষিত হয় নাই—কিন্তু শুদ্ধ কবিতা হিসাবে সেগুলি অনিন্দ্য সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের শোক-প্রকাশ ধীর ও সংযত; তাঁহার অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে লিখিত "শূন্য গৃহে", "কোথায়", "নিষ্ঠুর সৃষ্টি" প্রভৃতি শোক-গাথার যে আবেগ, অনুযোগ ও উচ্ছ্বাস ছিল, স্ত্রী-বিয়োগের কবিতায় তাহা নাই। কবিতাগুলিতে কবির নিজের বা তাঁহার পত্নীর বাস্তব জীবনের—তাঁহার গৃহের—কোনও স্পষ্ট চিত্র নাই—শোকের প্লাবন কবির সেই স্বাভাবিক সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিতে পারে নাই। পরন্তু স্মরণ কাব্যে বিচ্ছেদ-মিলনের উপরোক্ত কবিত্বপ্রময় অভিব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য-নিরূপণের আলোচনা নাই—কবিকে বিয়োগ বেদনায় অন্তর্নিহিত দমন করিতে যে সাধনা করিতে হইয়াছিল তাহার বিশেষ কোনও অভিব্যক্তি নাই। বিশ্বপতির সর্ব্বমঙ্গলময়ত্বে একান্ত নির্ভর কবি হয়ত সেরূপ আলোচনায় প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমারের কবিতায় তিনি তাঁহার নিজের ও পত্নীর বাস্তব

জীবনের চিত্র, জননী, ভগ্নী, পুত্র, কন্যাদি আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবাসীদিগের সহিত স্নেহ-সূত্রে বদ্ধ গৃহের চিত্র, নিঃসঙ্কোচে ও সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। সে কবিতায় আচার-নিষ্ঠ হিন্দু-শুদ্ধান্তের—হিন্দু-ধর্ম্মানুষ্ঠানের চিত্র সমুজ্জল রেখাপাতে নিপুণ-তুলিকায় প্রতিফলিত। "মরণে কি মরে প্রেম! অনলে কি পোড়ে প্রাণ?" জীবনমরণের এই চিরন্তন প্রহেলিকার মীমাংসার কামনায় কবি প্রথমে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের আশ্রয় লইয়া, নিরাশ হইয়া, শেষে প্রকৃতির সাহায্যে অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন, বারিধির অনন্ত বিস্তার প্রত্যক্ষ করিয়া কবির মনে, অসীম বিশ্বের সহিত তুলনায় মানব কত ক্ষুদ্র এবং তাহার জীবন মৃত্যু কত তুচ্ছ ঘটনা সেই সত্য প্রতিভাত হইয়াছে। সেই অভিজ্ঞতার ফলে কবি শোক জয় করিয়াছেন এবং বিগত অতৃপ্তি অবিশ্বাস ও অনুযোগের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। শেষে কবি এই ধারণায় উপনীত হইয়াছেন, যে তিনি যেমন ইহ লোক হইতে প্রিয়ার শুভ কামনা করিতেছেন, তাঁহার প্রিয়াও তেমনি পরলোক হইতে কবির কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছেন। অক্ষয় কুমারের শোক চিত্র বাস্তবতার যাদুদণ্ডস্পর্শে সজীব—তাঁহার বিলাপধ্বনি আত্ম-অনুযোগে হৃদয়োদ্বেলক। 'এষা' কাব্যের প্রতি কবিতাই কোনও নূতন ভাবের সমাবেশ হেতু সার্থক। কবি অসামান্য শব্দকুশলী তিনি সর্ব্বত্রই স্বল্পতম সুনির্ব্বাচিত কথায়, বাক্তব্য পরিস্ফুট এবং ভাষা, ছন্দ, ও ভাবের শ্রেষ্ঠ মিলন প্রদর্শন করিয়াছেন। 'এষা' কাব্য বঙ্গীয় কাব্য-সংসারে অনন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আশা আছে সে প্রতিষ্ঠা অক্ষয় হইবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা, শব্দ লালিত্য ও রচনা শিল্প চাতুর্য্যে রবীন্দ্রনাথের বা অক্ষয়কুমারের কবিতায় সমতুল্য না হইলেও, নিজস্ব সম্পদে অতুল্য —প্রসাদ-

---

শোকের তীব্রতা উপশম হইলে, এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস দ্বিজেন্দ্র অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাঁহার রচনায় সেরূপ আভাস আছে। "শান্তি" ও "আহ্বান" কবিতায় সে পরিচয় আছে। "সীতা" নামক নাট্যকাব্যের ভূমিকা পাঠেও তাহা জানা যায়। ঐ ভূমিকায় মৃতাপত্নীকে উদ্দেশ করিয়া দ্বিজেন্দ্র লাল লিখিয়াছেন "আমি যাহাকে (সীতাদেবীকে) আজ কল্পনার চক্ষে দেখিতেছি, তুমি আজ তাঁহার সহিত একই লোকে বাস করিতেছ. আর তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া পূজায় নিরতা আছ।"

গুণে কোনও কবির কবিতা হইতে হীন নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের শোকোচ্ছ্বাস গভীরতম আবেগে উচ্ছ্বসিত। কবি তাঁহার নিজের দুর্ভাগ্যের কথা মাতৃহারা পুত্র কন্যার চিত্র, হতশ্রী সংসারের চিত্র—অবাধে—স্বাভাবিক ভাবে ও করুণায় ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহার সন্তান স্নেহের অভিব্যক্তির সরল সত্য প্রাণ-স্পর্শী। কবি, মরণের পরপারের যবনিকা উত্তোলন করা মানবের ক্ষমতাতীত সে চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার শোক নৈরাশ্য ব্যঞ্জক এবং প্রিয়ার সহিত চিরভাবিয়া মিলনের আশা, সংশয় কুহেলিকাছন্ন।* তিনি তাঁহার মনের সন্দেহ অবিশ্বাস, আশা নৈরাশ্য অকপটে, নির্ভীক ভাবে, প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র-লালের কবিতার ভাষা, ছন্দ ও রচনা ভঙ্গীতে যেমন তাঁহার স্বকীয় বিশেষত্ব দেদীপ্যমান তেমনই তাঁহার শোকের অভিব্যক্তিতে কেমন একটি পুরুষোচিত ভাব—তেজের ব্যঞ্জনা—আছে, যাহা বাঙ্গালার অপর কোনও কবির শোকোচ্ছ্বাসে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

পঞ্জিকা-সংস্কার।

সম্প্রতি সাহিত্য-সংহিতা পত্রিকায় (১৩২৩ সনের বৈশাখ সংখ্যায়) বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অয়নাংশ ও অয়নগতি সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীযুত আশু-তোষ মিত্র এম, এ মহাশয় প্রথমেই তদীয় প্রতিকূল পক্ষের নানাপ্রকার নিন্দাবাদ করিয়াছেন। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পত্রিকার অয়নাংশ যে ভ্রমশূন্য ও বিজ্ঞান সম্মত তাহা দেখাইবার জন্য তিনি চারিটী হেতুবাদ দিয়াছেন। আমরা এই হেতুবাদের মূল্য, কি তাহাই অতি সংক্ষেপে দেখাইব। বিষয়টীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দেখিতে হইবে, অয়নাংশ (Precession of Equinoxes) বলিতে কি বুঝায়। রবিবর্ম্ম বিষুবৎসম্পাত বিন্দু হইতে নক্ষত্র খচিত রাশিচক্রের নিরূপিত আদি বিন্দুর পার্থ-ক্যকেই অয়নাংশ বলে। প্রথমটী প্রত্যক্ষ দ্বারা স্থিরীকৃত; দ্বিতীয়টী কতকটা স্বীকারের উপরে স্থাপিত। একটী সচল বলিয়া সায়ন, অপরটী অচল বলিয়া নিরয়ণ অভিধাপ্রাপ্ত। কিন্তু উভয়টীই বিজ্ঞানমতে প্রত্যক্ষ ও নির্দ্দিষ্ট—কোনটীই

কেবল কল্পনা প্রসূত নহে। একটী সমরাত্রিন্দিব অথবা ঠিক পূর্ব্বে উদীয়মান সূর্য্য সংস্থান হইতে পর্য্যবেক্ষিত, অন্যটী নক্ষত্রপুঞ্জ মধ্যে বেধোপলব্ধ।

প্রথমতঃ আশুবাবু বলেন, বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার প্রত্যেক গ্রহের স্ফুটে অয়নাংশ যোগ করিলে প্রকৃত বিজ্ঞান সম্মত সায়নস্ফুট যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন এই অয়নাংশ বিজ্ঞান সম্মত। ইহা কেন্দ্র পরিবর্ত্তনে (Change of co-ordinates) উপজাত মাত্র। এই যুক্তি বলে যে কোন অঙ্ককেই অয়নাংশ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সায়ন জ্যোতিষ হইতে হিন্দুমতের নিরয়ণে পরিবর্ত্তনের জন্য দুইটী উপায় অবলম্বিত হইতেছে। অয়নগতি প্রকৃত রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট ধ্রুব বিন্দু কিংবা সময় হইতে অয়নাংশ গণনা করা এক প্রকার; অয়নগতি কল্পনা করিয়া উহা অন্য অনুরোধে ব্যবহার করা দ্বিতীয় প্রকার। প্রথম সম্প্রদায় বলেন, নক্ষত্রের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সংস্থান হইতে অয়নাংশ গণনা করা হউক। এই মতের প্রধান পৃষ্টপোষক বেঙ্কটেশ কেতকর। তিনি প্রধাণতঃ চিত্রা সংস্থানানুসারে আদি বিন্দু নির্ণয় করিতে বলেন, যেহেতু উক্ত তারকা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং ইহা হইতে গণিত হইলে বর্ত্তমান সময়ের তারিখের সহিত অনেকটা ঐক্য থাকিবে। শ্রীবিনায়ক শাস্ত্রী খানপুরকার প্রভৃতি রেবতী যোগ তারার সংস্থান ধরিয়া নিরয়ণ গণনা করিতে বলেন, যেহেতু শাস্ত্রানুসারে উহা রাশিমুখের অতি নিকটবর্ত্তী। ভিন্ন ভিন্ন তারকাবস্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন মেষাদি বিন্দু হয় বলিয়া, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, একটী সময় নির্ব্বাচন করিয়া, ঐ কাল হইতে অয়নগতি অনুসারে অয়নাংশ নির্ণয় করা হউক। তাঁহারা শাস্ত্রোল্লিখিত যোগতারা সমূহের হারাহারি সংস্থান হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চশতাব্দীর শেষভাগে অথবা ৪২১ শক হইতে গণনা করিতে বলেন। ইহা অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক বলা যাইতে পারে; যেহেতু ইহাতে অয়নগতি প্রকৃত থাকায়, আদি-বিন্দুর গতি নাই; যাঁহারা অয়নগতি কল্পনা করিয়া কেবল সায়নের সহিত মিল রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দুইভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, সূর্য্যসিদ্ধান্তের (বার্ষিক ৫৪ বিকলা অয়নগতি) কি গ্রহলাঘবের (বার্ষিক এককলা অয়নগতি) অয়নাংশ পাশ্চাত্য মতে গণিত সায়নস্ফুটে হীন করিলেই নিরয়ণ হইবে। এই পন্থা কেরোলছমন্ ছত্রে অবলম্বন করিয়াছেন। অপর সম্প্রদায় বলেন এতদ্দেশীয় গ্রন্থমতে একটী গ্রহের স্ফুট গণনা করিয়া ঐ সময়ের জন্য

পাশ্চাত্য সায়ন প্রণালীতে ঐ গ্রহের স্ফুট নির্ণয় করতঃ বিয়োগ করিলে যাহা হইবে তাহাই অয়নাংশ বলিয়া ধরা সঙ্গত। কেহ কেহ পর্ব্বান্ত সময়ের চন্দ্র স্ফুট হইতে উহা গণনা করিতে বলেন। বাপুদেবশাস্ত্রী প্রচলিত তারিখ গণনা প্রণালী অপরিবর্ত্তিত রাখার উদ্দেশ্যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের একটী শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া, তন্মতে মেষ সংক্রমণ কালীন সায়ন রবিস্ফুটকেই অয়নাংশ বলিয়া নির্ণয় করিতে বলিয়া ছিলেন। ইহাই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় অনুসরণ করা হইয়াছে। প্রকৃত অয়নগতি ৫০.২৪ স্থলে ৫৮-৭ বিকলা স্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু অয়নগতি (annual general precession) কাল্পনিক ব্যাপার নহে—উহা সায়ন-চক্রে পরিদৃশ্যমান নক্ষত্র চলনোদ্ভূত অন্য কথায় রবিবর্ত্ম বিষুবতের উপর প্রতিবর্ষে যে পরিমাণে অপসারিত উহাই অয়নগতি। কো-অর্ডিনেট পরিবর্ত্তন সময়ে তদধিক ধরা হইলে উহা অয়নজনিত নহে। ইহাকে অয়নজ অর্থাৎ রবিবর্ত্ম চলনজনিত গতি বলিয়া, অয়নাংশ কহিলে বিজ্ঞান উহাকে কখনই সত্য বলিবে না। আমরা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ বলিতেই ইহাকেই লক্ষ্য করি। ইহাকে নিরয়ণ না বলিয়া কল্পিত অয়ন বলিয়া চালাইলে কোন আপত্তি থাকিত না। বিষয়টী বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়, অর্থাৎ ১৩ই এপ্রিল তারিখে,—

সায়ন রবিস্ফুট = সূর্য্য-সিদ্ধান্ত মতের রবিস্ফুট + অয়নাংশ

পাশ্চাত্য মতের সায়ন রবিস্ফুট বিজ্ঞান সম্মত, কিন্তু ঐ দিনের সূর্য্যসিদ্ধান্তের রবিস্ফুট বিজ্ঞান সম্মত কিনা ইহাই দেখিতে হইবে। উহা যদি বিজ্ঞান সম্মত না হয়, তাহা হইলে অয়নাংশে প্রকৃত প্রস্তাবে কখনই বিজ্ঞান সম্মত হইতে পারে না। আমরা জানিনা, এক্ষণে আশুবাবু সূর্য্যসিদ্ধান্তের এই রবিসংস্থানকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য বলিবেন কিনা? কিন্তু চতুর্দ্দশবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গে পঞ্জিকা সংস্কার প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, ইহাকে পাশ্চাত্য মতের শুদ্ধ সংস্থান বলা যাইতে পারে না। ইহাতে সূর্য্যের বার্ষিকগতি জনিত সাড়ে আট বিকলার ভ্রম রহিয়াছে এবং ঐ সময়ের মান্দ্য ফলেরও কতক ভ্রম থাকিতে পারে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার ভ্রান্ত দেশান্তরের জন্য অর্দ্ধকলার স্থায়ী ভ্রম আছে ও অন্যান্য গ্রহের সাময়িক আকর্ষণের ফলেও ঐ পরিমাণ পর্য্যন্ত পার্থক্য হইতে পারে। কাজেই এই অপ্রকৃত অঙ্কের সহিত যে অঙ্কের যোগে প্রকৃত শুদ্ধ ফল হয়, সেই অঙ্ক কখনই ভ্রম বিহীন হইতে পারে না। এই অশুদ্ধ অঙ্ককে নানাপ্রকার বিশেষণে

বিভূষিত করিয়া বিজ্ঞান সিদ্ধ বলিতে হইলে, বড়ই কষ্টের কথা। সূর্য্যসিদ্ধান্তের বর্ষাদির গণনা বিজ্ঞানসিদ্ধ হইলে, প্রথম প্রসারণে অন্যান্য দিনের সূর্য্যস্ফুটও বৈজ্ঞানিক হইয়া যাইবে ইহাই কি বঙ্গে পঞ্চাঙ্গশোধন সভার, প্রথম প্রশ্নোত্তরের প্রকৃত কারণ ? ইহাই কি 'সৌরবর্ষমানং সূর্য্যেতর গ্রহগতিমানং চ কি স্বীকার্য্যং' প্রশ্নের উত্তরে, "সূর্য্য-সিদ্ধান্তোক্তং সৌরবর্ষমানং গ্রাহ্যং, তদিতর গ্রহগতিমানং সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্তং বেধোপলব্ধবীজসংস্কৃতং গ্রাহ্যং' বলিবার হেতু ? সূর্য্যসিদ্ধান্তের সূর্য্যগণনা প্রণালী বিজ্ঞান সম্মত। বলিয়া একবার স্থির হইলে, দ্বিতীয় প্রসারণে বৈজ্ঞানিকত্ব লাভ করিবে ; তখন আর বিসংবাদের কারণ থাকিবে না। আমাদের একবন্ধু বলিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রমতে গণিত সংস্থান যেমন সময়ের হিন্দু জ্যোতিষের সমগ্র গণনাই (time) এক প্রকার ক্রিয়াবিকাশ (function),পাশ্চাত্য মতের গ্রহ সংস্থানও সময়ের (time) অনুরূপ ক্রিয়াবিকাশ (function) বলিয়া, একে অন্যের ক্রিয়াবিকাশ (function) বিবেচনা করতঃ বৈজ্ঞানিক বলা যাইতে পারে। এই নীতি অবলম্বনে পৃথ্বীকে স্থিরতর বলিয়াও, কেহ কেহ শ্রেষ্ঠ আসন প্রার্থী। কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞান এই সকল অধিক মূল্যবান মনে করেন না। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অয়নাংশ কেন্দ্র পরিবর্ত্তন (transformation of Co-ordinates) বশতঃ বলিতে গিয়া সংজ্ঞা পরিবর্ত্তনরূপ ভ্রম করায় বিজ্ঞান বিরুদ্ধ হইয়াছে এবং ইহা কখনই স্থির থাকিতে পারে না। ইহা মৃত সাহিত্যাচার্য্যের গ্রহের গতি মাপ করিবার ষ্টেশন কল্পনার তুল্য। বাস্তব বিষয়ে কল্পনার অতিরিক্ত বিকাশ ফলে বণিক্ যুবকের ন্যায় দুর্দ্দশা ঘটে। অতএব এই আদি বিন্দু কখনই সুস্পষ্ট বলা যাইতে পারে না।

আশু বাবুর দ্বিতীয় যুক্তি এই যে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অয়নাংশ অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। মৃত বাপুদেবশাস্ত্রী পাশ্চাত্য মতের গণনা প্রণালী হিন্দু সমাজে প্রবর্ত্তনের জন্য অয়নাংশ গণনার ঐ প্রণালী প্রাথমিক সময়ে অনুসরণ করিয়াছিলেন। সৌর বর্ষমান তিনি পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হন নাই, অথবা সায়ন প্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য সোপান স্বরূপে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। নিরয়ণ আদি বিন্দুকে একবার সচল করিতে পারিলে, সায়ন তুল্য বর্ষমানের প্রস্তাব করিয়া, উহাকেই নিরয়ণ আখ্যা দিতে সমর্থ হইবেন, যেহেতু পূর্ব্বাভিমুখে সচল আদি বিন্দুর পরিবর্ত্তে, পশ্চিমাভিমুখে অয়নগতিতুল্য সচল

আদি বিন্দু কল্পনা করিলেই, অভীষ্ট পূর্ণ হয়। তাহা হইলে যোগেশ বাবুর ন্যায় বলিতে পারিতেন "We must boldly introduce the sayana instead of placing it in the back ground as is done at present," যাহা হউক, এই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নহে। যোগেশ বাবু ইহা যে সম্পূর্ণ ভাবে আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তিনি একবার লিখিয়াছিলেন "From what I know of the difficulty for fixing with certainty the initial point of nirayan zodiac &c." এবং অন্যস্থানে লিখিয়াছেন "If we accept Siddhanta's length of the year, we should make the annual precession rate 50."24+8."44 or 58."68. ইহা আলোচনা করিলে, তিনি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বুঝা যায় না। বরং তিনি যে ১৮১৯ শকের প্রত্যক্ষায়নাংশ প্রায় ২২।১৪ বলিয়াছেন, তাহা অন্যতম মত মাত্র মনে করেন। ইহার পরে বঙ্গে পঞ্চাঙ্গ শোধন সভার মীমাংসা উল্লেখ করিয়া, তদনুসারে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অয়নাংশ গণিত হইতেছে বলিয়া ভ্রমহীন বলিয়াছেন। বোম্বাই সভার শেষ কার্য্য বিবরণী এ পর্য্যন্ত প্রচারিত না হওয়ায় বিস্তারিত সমালোচনার সুযোগ নাই। এই অয়নাংশ প্রশ্নেই এই সভার মতভেদ হইয়াছিল এবং আশু বাবুই এক্ষণে বলিতেছেন, ইহা নাকি ভবিষ্যতের পুনর্বিচার্য্য ছিল। শ্রীবিনায়ক শাস্ত্রী খানপুরকর প্রভৃতি ঐ সভার ৭জন পণ্ডিত রেবতী যোগ তারাই আদি বিন্দু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত আরও কয়েকজন অয়নগতি বিকলাদি ৫০।১৪ ধরিয়াছেন। ইহার পর বেঙ্কটেশ কেতকার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মত সমর্থন করেন নাই। এই মতে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেরও একজন এম, এ উপাধিধারী অধ্যাপক সম্প্রতি অয়নগতি ৫০-২৪ বিকলার অধিক স্বীকার করিতেছেন না। বোম্বাই সভার ২০০০৲ টাকা পারিতোষিক ঘোষণার ফলে ["Several works have come and they were examined by a committee of astronomers, but none is found quite fit for the prize—vide letter D 2. sept 1911 from the secretary] কিছুই হয় নাই। আমরা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অপর সংস্করণ 'সরল ফলিত পঞ্জিকা' সম্পর্কে "পঞ্জিকা সমা-

লোচনা” প্রবন্ধে (সাহিত্য সংহিতা ১৩১৬ সনের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত) বোম্বাই সভার নির্ণয় সমূহের সাধারণ আলোচনা কালে দেখাইয়াছিলাম যে, তথায় অনেকগুলি পণ্ডিত সমবেত হইলেও প্রকৃত পক্ষে ঐ সভা উপযুক্ত রূপে গঠিত হয় নাই এবং বিষয়টী নিরপেক্ষভাবে আলোচনার অবসর ছিল না। কাজেই তাঁহাদের বিভক্ত অভিমতির দ্বারা নিঃসন্দেহে শাসিত হওয়া নিরাপদ নহে। উক্ত অধিবেশনের পরে শৃঙ্গেরীর শ্রীমদ্‌জগদ্‌গুরুমহোদয়ের আহ্বান মতে দাক্ষিণাত্যে আদি শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমি কাল্‌টীগ্রামে যে জ্যোতির্ব্বিদ মহাসম্মিলনী হইয়াছিল (১৯১০ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী), তথায়ও অনেকেই ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু যুক্তি শাস্ত্রে ব্যক্তিগত নির্ভর অতিশয় ক্ষীণ প্রমাণ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস - আপ্তবাক্য ব্যতীত এই উক্তি সমূহ পরীক্ষার অধীন এবং পবিত্র সত্যের দ্বারা পরিমেয়। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে বিবেচনায় অনেকেই অয়নগতি ৫৮·৭ বিকলা বলিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন।* বস্তুতঃ ইহা অয়নগতি নহে, প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ অয়নগতি ও সূর্য্য সিদ্ধান্তের বর্ষমানের অশুদ্ধি উভয়ে একত্রীভূত হইয়া কাল্পনিক অঙ্কমাত্র—কাজেই ভ্রম পূর্ণ। অতএব প্রকৃতবিষয়টী বুঝিতে পারিলে, এই কাল্পনিক অয়নাংশ, প্রকৃত বিবেচনায় নাক্ষত্রিক স্থিতিকাল কি রাশি সঞ্চার সময় নির্দ্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিবেন না।

তৃতীয়তঃ বলা হইয়াছে যে,বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের অয়নাংশ সৌর পুস্তকের উপদিষ্ট দৃষ্টি মূলক। আশু বাবু বলেন যে সূর্য্য সিদ্ধান্তে ছায়া হইতে সূর্য্যস্ফুট গণনা করিবার ব্যবস্থা থাকায় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অয়নাংশ সমর্থিত হইয়াছে। ইহার মূলে সূর্য্য সিদ্ধান্তের নিরয়ণ মেষাদি রবিস্ফুট প্রকৃত ধরিয়া লইতে হয়। এইরূপ ধরিয়া লওয়ার অনুমতি বিজ্ঞান দিবেন কি? যেহেতু তিনিই ঐ গণনা প্রণালী ভ্রমপূর্ণ বলিয়াছেন। বৃক্ষের উচ্চ শাখায় বসিয়া সেই শাখার মূল দেশ কর্ত্তন কালে, কালিদাসও উহার দৃঢ়তা স্বীকার করার অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। মাধ্যাকর্ষণের নিকট মহাকবিরও কল্পনা বিফল হয়। অধ্যাপক নিউকোম্ব গ্রীষ্মে ও শীতে শস্য বপন ও সংগ্রহের কাল নিয়মিত করার উদ্দেশ্যে যে দিন নির্ণয়ের (calander) প্রয়োজন তাহাতে সামান্য স্থূলতা থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই বলিলে ঐ বর্ষমান বিজ্ঞান সম্মত সৌর বর্ষমান বলিয়াছেন বলিয়া ধারণ করায়

কোন হেতু নাই। বিশিষ্ট বর্ষমান বলিয়া গ্রহণ করা এক কথা ও উহাকে নিরয়ণ বর্ষমান বলা সম্পূর্ণ অন্য কথা। প্রমাণ উল্লেখে নানা স্থান হইতে উক্তি উঠাইয়া, বাঙ্গালা প্রবন্ধ মধ্যে বঙ্গভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজী অনুবাদ করিয়া চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি করা যতদূর সহজ, ঐ সকল উক্তি দ্বারা প্রকৃত পক্ষে বিষয়টী সমর্থিত হইয়াছে প্রতিপন্ন করা ততদূর সামান্য নহে। বৈজ্ঞানিকগণ বংশলোপের ভয়ে সূর্য্যে বীজ দিতে পশ্চাদ্পদ নহেন। ভাস্করাদি অনেকেই বর্ষমান পরিবর্ত্তন করিতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। অধ্যাপক নিউকোম্ব আশু বাবুর 'নির্ব্বংশ'বাদ বৈজ্ঞানিক বলিয়া বিশ্বাস করেন না। ভাস্কর বলিয়াছেন, পূর্ব্বদিকে যে দিন সূর্য্যের উদয় হয়, ঐ দিনের স্ফুট রবিই অয়নাংশ। এই স্ফুট রবি বলিতে কি বুঝিতে হইবে? বিজ্ঞানবিদ্ অবশ্যই বলিবেন উহা আধুনিক বেধসিদ্ধ নিরয়ণ সূর্য্য স্ফুট ব্যতীত আর কিছুই নহে—বিশেষতঃ সিদ্ধান্ত শিরোমণির গণিতাধ্যায়ের সূর্য্য স্ফুট নহে। ইহাতে অন্ততঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তের রবিস্ফুট (যাহা পাশ্চাত্য গণনা বিরুদ্ধ) সূচিত হয় নাই। আমাদের দুর্দ্দৈব তথাপি আমাদিগকে ইহাই ভাস্করের ধ্রুব উদ্দেশ্য ছিল বলিতে হইবে—কেন?—ইহা না করিলে যে বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অশুদ্ধ অয়নগতিকে বিশুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। ১০৭২ শকে ভাস্করাচার্য্য ঐ প্রণালীতে অয়নাংশ ১১ প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে উহা সূর্য্যগতির মূল ভ্রমের উপর স্থাপিত জানিয়াও অন্য উহা 'নজীর' স্বরূপে গ্রহণ করিয়া, কেন যে কৃতার্থমন্য হইতে হইবে বুঝা গেল না। ৬৫১ বৎসরে ১১ অংশ হইলে বার্ষিক অয়নগতি ৬০'৮ বিকলা হয়, তৎস্থলে অয়নগতি ৫৮'৭ বিকলা গ্রহণ করায় 'সর্ব্বপ্রত্যক্ষ দর্শিবাণের মর্য্যাদা কোথায় রক্ষা হইল?

চতুর্থতঃ আশুবাবু বলিয়াছেন, সূর্য্যসিদ্ধান্তের বর্ষমান লইয়া পঞ্জিকা বিজ্ঞান সম্মত রাখিতে হইলে, অয়নাংশ ২২।৩৩ রাখিতে হয়। এই বর্ষমান গ্রহণ করার বৈজ্ঞানিক হেতুবাদ সুস্পষ্ট নহে। স্থূল বর্ষমান গৃহীত হইলেও মিথ্যা অয়নাংশ গ্রহণ করার রীতি নাই। যাঁহারা গ্রেগেরিয়ান সৌরবর্ষমান লইয়াছেন, কিম্বা জুলিয়ান বর্ষমান ব্যবহার করার দোষ দেখিতে পান না, তাঁহারাও অয়নগতির ৫০'২৭ বিকলার অধিক বলিতে সাহসী হন নাই। ঐ সকল কল্পিত বর্ষমানের সহিত প্রকৃত সূর্য্যের অবস্থানের ঐক্য নাই। বর্ষমানের ভ্রমটী অয়নাংশের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া প্রকৃত বিষয়ের বিরুদ্ধাচরণ

করিতে কেহই সক্ষম হন নাই। অয়নাংশ যে একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয়, উহার গতি যে প্রকৃতই বাস্তব—এবং কল্পনার সহিত দূরতর সম্বন্ধও নাই—তাহা প্রকৃত বিজ্ঞান সেবকের হৃদয়ে জাজ্বল্যমান আছে। মেষ-সংক্রমণ-কালীন ঘট উৎসর্গের বিভীষিকা তাঁহাদের মানস পটে উদিত হয় নাই; সমাজ-সংস্কারের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিতে পারেন নাই, এবং তাঁহাদের স্বাধীন অন্তরে বোম্বে-সভার কাল্পনিক আদেশ প্রবেশ লাভ করে নাই। তাঁহাদের নিকট পরম সত্যই একমাত্র আরাধ্য দেবতা—উহাই তাঁহাদের কাছে ভগবদাদেশ। অতএব আমাদের দৃঢ় ধারণা, অচিরেই আশুবাবুর এই ভ্রমপূর্ণ অয়নগতির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞান ব্যক্তিবিশেষের সম্মতি অসম্মতির অপেক্ষা করে না এবং বৃথা কল্পনার প্রশ্রয় দেয় না। একটী ভ্রমপূর্ণ বর্ষমানের অনুরোধে, নিরয়ণ ধ্রুব আদি বিন্দুতে গতিশীলতা আরোপ করিয়া কো-অর্ডিনেট পরিবর্ত্তন প্রভৃতির আচ্ছাদনে, সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া বিজ্ঞান শ্লাঘার বিষয় মনে করে না। আদৌ সংজ্ঞা কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রয়োগ কালে পরিবর্ত্তন করা অবিধেয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তে যখন খগোলে নির্দ্দিষ্ট ধ্রুব স্থানে রবির পুনরাবর্ত্তন কালকে সৌরবর্ষমান বলা হইয়াছে; তখন আবার ঐ কাল নিরূপণের স্থূলতা কি ভ্রম প্রযুক্ত, ঐ স্থূল কি ভ্রান্ত সময় অন্তে সূর্য্য যেখানে আসিবে, তাহাকে খগোলের ঐ নির্দ্দিষ্ট ধ্রুববিন্দু বলা যাইতে পারে না। এরূপ হইলে, যে কোন ব্যক্তিই সার রবার্টসনের সর্ব্বসম্মতি বিশিষ্ট বিষুবৎ স্থিত রবিবর্ত্মের বিন্দুকে সায়ন মেষাদি না বলিয়া কো-অর্ডিনেটের আকারান্তরে অন্যত্র লইতে পারে। এই সংজ্ঞাপরিবর্ত্তন জনিত অশুদ্ধিই অন্যতম ভ্রম। যেহেতু, ব্যবহার সময়ে, সংজ্ঞানুযায়ী সময় নির্ণয়ে প্রতিবন্ধকতা ঘটা অনিবার্য্য।

পরিশেষে আশুবাবু বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় যখন লেখা আছে যে, তাঁহাদের বর্ষমান অশুদ্ধ এবং উহা শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে; তখন উহা বিজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রচলিত পঞ্জিকাকারগণ যখন বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের গণনাদি শাস্ত্র সম্মত; পাশ্চাত্য মতের নহে, পাশ্চাত্য মতে করিতে হইলে শোধন করিয়া লইতে হইবে, তখন তাঁহাদেরও পঞ্জিকা গুলিকে কি বৈজ্ঞানিক

বলিতে হইবে? ইহা বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন (transformation)।

উপরোক্ত আলোচনায় ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে যে, (১) বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গ্রহস্ফুটে কল্পিত অয়নাংশ যোগ করিলে সায়ন পাশ্চাত্য গ্রহস্ফুট হয় বলিয়া, ঐ অয়নাংশ বিজ্ঞান সিদ্ধ বলা যায় না, যেহেতু ইহাতে যে কোন অঙ্কই অয়নাংশ বলা যাইতে পারিবে, অথচ অয়নগতি সমুচ্চয়ে অয়নাংশ বলিয়া, অবিশুদ্ধ অয়নগতি মূলক বিবেচনায় প্রকৃত বিজ্ঞান সম্মত হইতে পারে না। (২) ঐ পঞ্জিকার অয়নাংশ ও অয়নগতি কতিপয় ব্যক্তি ভিন্ন উদ্দেশ্যে স্বীকার করিলেও, সর্ব্ববাদিসম্মত নহে এবং অয়নগতি ৫৮'৭ বিকলা অবাস্তব বলিয়া দৃক্‌বিরুদ্ধ এবং অবশ্য পরিবর্ত্তনীয় বলিয়া লোকে বুঝিয়াছে। (৩) বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত শিরোমণির মূল উক্তি ও প্রকৃত মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এই অয়নাংশ ও অয়নগতি নির্ণীত হওয়ায় উহা সংজ্ঞাপরিবর্ত্তনজনিত ভ্রমপূর্ণ হইয়াছে; যেহেতু সায়ন মতে কোন যোগ তারাটী বার্ষিক পরিবর্ত্তন ৫৮'৭ বিকলা হয় না। (৪) সূর্য্যসিদ্ধান্তের বর্ষমান গৃহীত হইয়াছে বলিয়া উহাকে নিরয়ণ সৌরবর্ষমান বিবেচনা করত উহার ভ্রম অয়নাংশের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া বৈধ হয় নাই; যেহেতু উহার পরিবর্ত্তনের জন্য আশুবাবু প্রথম সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন। তথাপি এই অয়নাংশ ও অয়নগতিকে বিজ্ঞানসিদ্ধ, কাজেই অভ্রান্ত ধ্রুব সত্য বলিতে হইবে। ইহারই নাম অধিকারিত্ব এবং প্রকৃত বিদ্যার নিদর্শন—সমস্যা বড়ই কঠিন, কিন্তু মীমাংসা অতি সহজসাধ্য। তবে আশুবাবু এতদিনে যখন তদীয় পঞ্জিকার অশুদ্ধ বর্ষমান পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তখন সত্বরেই তাঁহার সত্যের ও বিজ্ঞানের কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন ঘটিবে, ইহাই আশা-প্রদ।

শ্রীসাতকড়ি সিদ্ধান্ত-জ্যোতির্ভূষণ।

মিথিলার প্রাচীন কাহিনী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অতঃপর রামসিংহদেব পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক। পবিত্র সাহিত্যের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে বেদের কতকগুলি ভাষ্য সংকলিত হয়। হিন্দুগণ কিপ্রকার ধর্ম্ম কার্য্য ও সামাজিক ব্যাপার গ্রহণ করিবে তাহার বিধান প্রণীত হইল। প্রতিগ্রামে তজ্জন্য একজন করিয়া তৎবিষয়ের উপদেষ্টা নিযুক্ত হইলেন। তিনিই ধর্ম্ম কার্য্যের বিধান প্রদান করিবেন। এই নরপতি সামাজিক বহু ব্যবস্থা করিয়া দেশের এবং দশের মহদুপকার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য, ধর্ম্ম সকল বিষয়েরই সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া পুলিস বা শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করিলেন। উক্ত কর্ম্মচারী সেই গ্রামের উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রাত্যহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া সেই বিভাগীয় চৌধুরীর নিকট প্রেরণ করিবেন। অথবা রাজস্ব আদায়ের প্রধানকর্ম্মচারীর নিকট উক্ত বিবরণ প্রেরণ করিতে হইবে। উক্ত পুলিস কর্ম্মচারী তজ্জন্য রাজার নিকট হইতে বেতনের পরিবর্ত্তে পুরুষানুক্রমে কতিপয় জমি ভোগ দখল করিবে। তাঁহার বহুতর গ্রাম্য সরকার থাকিত; তাহারা হিসাবরক্ষকের কার্য্য করিত এবং প্রত্যেকে মাসিক দশ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইত। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রকার নরপতি প্রায় দৃষ্ট হয় না।

রামসিংহদেবের মৃত্যুর পর শক্তিসিংহদেব সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার ঔদ্ধত্যে উচ্চবংশীয় ব্যক্তিগণ ক্রুদ্ধ হইতে পারেন এইপ্রকার আলোচনা করিয়া তাঁহার অন্যতম মন্ত্রী সপ্তজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা একটি সমিতি গঠিত করিলেন। উক্ত সমিতি দ্বারা রাজার স্বেচ্ছাচারিত দমিত হইয়াছিল। তদীয় তনয় হরসিংহ দেব শেষ নরপতি ছিলেন। তিনি বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গ জেলায় হরহি নামক একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তিনি সাধারণের জন্য উক্ত জেলায় আরও একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের জাতীয় উপবিভাগের সৃষ্টি করেন।

পাঠানরাজ তোগলক সাহ বঙ্গদেশের রাজবিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা বাহাদুরসাকে পরাজিত ও শাসিত করিয়া দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় বিজয়োৎফুল্লবাহিনী লইয়া ত্রিহুতরাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজা হরসিংহের দুর্গ পাঠানাধিকৃত হইল। রাজা উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিয়া নেপাল উপত্যকা অধিকার করিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন, হরসিংহ ও তদীয় বংশধরগণ যাঁহারা ত্রিহুত, শিমরাউন অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সম্ভবতঃ নেপাল সম্রাজ্য অধিকার করিয়া থাকিবেন এবং নেপাল তরাইও সম্ভবতঃ তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত করিয়া থাকিবে। *

হরসিংহের রাজ্যত্যাগের পর হইতেই ত্রিহুত দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। তোগলক সা ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ কামেশ্বর ঠাকুরকে উক্ত ত্রিহুত সাম্রাজ্য প্রদান করেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করেন। তখন এই স্থানে হিন্দুসামন্তবর্গকে পাঠান সম্রাট্ অযথা তাড়ন বা উৎপীড়ন করিতেন না। পরন্তু অধিকাংশ স্থলেই নিত্য নূতন শাসনকর্ত্তার সমাবেশ দৃষ্ট হইত। বস্তুতঃ ত্রিহুতের শাসনকর্ত্তৃগণ পাঠান সম্রাটের অধীন হইলেও তাঁহারা স্বাধীনভাবেই কার্য্য করিতে পারিতেন। তবে বার্ষিক কর পাঠানসম্রাট্‌কে প্রদান করিলেই সকল দোষ কাটিয়া যাইত। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজ সা কামেশ্বরের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোগীশ্বরকে প্রদান করেন। সম্রাট্ ফিরোজ সা কি দোষে যে কামেশ্বরের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লয়েন তাহা অবগত হওয়া যায় না। এই মাত্র কারণ জানিতে পারা গিয়াছে যে, ভোগীশ্বর ফেরোজের প্রিয়বন্ধু ছিলেন। ভোগীশ্বরের পর কীর্ত্তি সিংহ উক্ত সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন। তিনিও ভোগীশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন না। তিনি দিল্লীতে গমন করিয়া সম্রাটের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া এই কার্য্য করিয়াছিলেন। এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নরপতি শিবসিংহ। তিনি দেখিলেন পরাধীন থাকিয়া রাজত্ব করা নিতান্ত কষ্টকর। সুতরাং তিনি ১৪০২ খ্রীঃ বিদ্রোহী হইলেন এবং ঐ বৎসরই আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা

* Vide History of Nepal and surrounding kingdoms by Professor C. Bendall, J. A. S. B. vol. LXXII, Part I (1903).

করিলেন। পরন্তু এই প্রকার তিন বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে মুসলমানগণ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল। অনন্তর তাঁহার মহিষী লখিমা ঠাকুরাণী কবিবিদ্যাপতিকে সঙ্গে লইয়া নেপাল রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী জনকপুরের সন্নিকটে বনাউলীতে (Bonauli) আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অবশেষে তথায় তিনি দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত করিয়া স্বামীর কোন প্রকার সংবাদ অবগত না হইয়া চিতানলে "সতী" হইলেন। এই প্রকারে রাজা ও রাণীর জীবনে যবনিকার পতন হইল। রাজা শিবসিংহ "রাজবাড়ী"তে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। লোকে উক্ত দীর্ঘিকা লক্ষ্য করিয়া অধুনা শিবসিংহের নাম করিয়া থাকে। তাঁহার সম্বন্ধে স্থানীয় বহুপ্রবাদ প্রচলিত আছে, যথা:—শিবসিংহের নির্ম্মিত "রাজখাড়ী" যথার্থ দীর্ঘিকা, আর যে সকল দীঘিকা নয়নগোচর হয় তাহা দীর্ঘিকা নামের যোগ্য নহে, সে সকল "ডোবা"। শিবসিংহই প্রকৃত রাজপদবাচ্য অন্য সকল রাজা নহেন, তাঁহারা সামন্তরাজ বলিয়া কথিত। পরন্তু শিবসিংহের যশের হেতু এই যে, তিনি প্রকৃত বিদ্যানুরাগী ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার মহিষী লখিমা দেবীও ভারতবর্ষের মধ্যে তৎকালে অদ্বিতীয় বিদুষী ছিলেন। বিদ্যাবত্তায় রাজা ও তৎমহিষী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজা শিবসিংহের রাজসভা সর্ব্বদা সুধী, পণ্ডিত, কবি এবং গুণিগণ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত। স্বয়ং নরপতি তাঁহাদের সমাদরে নিয়ত পরিতুষ্ট করিয়া গুণের পুরস্কারস্বরূপ অর্থ, সম্পত্তি প্রভৃতি দ্বারা প্রোৎসাহিত করিতেন। তাঁহার সভাকবি বিদ্যাপতি ঠাকুর তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি উক্ত সভায় যথেষ্ট খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেন রাজগণের ন্যায় তাঁহারাও সৈন্য সংগ্রহের পরিবর্ত্তে দেশময় কবিতা সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ রাজগণ শিক্ষা ও কলাবিদ্যা আলোচনার প্রসার কল্পে গুণী ব্যক্তিদিগকে প্রভূত পুরস্কার প্রদান করিতেন। তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ প্রদানে কৃপণ ছিলেন না। তাঁহাদের সভা প্রকৃতই সংস্কৃত সাহিত্যের ও অলঙ্কারের লীলাভূমি ছিল। তাঁহারা পবিত্র ধর্ম্ম পুস্তক এবং কবিতা পাঠে অহোরাত্র নিযুক্ত থাকিতেন। * রাজা শিবসিংহ কে বিদ্যাপতিকে

Vidyapati and his contemporaries and some mediaeval knigs

বেণীপতি থানার অন্তর্গত বিশকি গ্রাম দান করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দ্বারবঙ্গের প্রাচীন দানপত্রে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। *

কামেশ্বর ঝার বংশাবলী।

- কামেশ্বর ঝা
  - ভবসিংহ
    - দেবসিংহ
      - শিবসিংহ — ইঁহার ছয় পত্নী— {মহাদেবী, বিশ্বাস, গজহায়ণী, রত্না, লখিমা উমা ও গুণা}
      - পদ্মসিংহ
    - হরিসিংহদেব
      - রূপ নারায়ণ (নরসিংহদেব)
        - হৃদয়নারায়ণ (ধীরনারায়ণ)
          - রাঘবসিংহ (স্ত্রী মহাদেবীহাসিনী)
            - কুমার গদাধর (নিঃসন্তান)
        - হরিনারায়ণ (ভৈরবসিংহ) (নসরৎ সাহের সহিত যুদ্ধে হত)
          - রূপনারায়ণ (স্ত্রী—ভানুমতী মেধা ও অজ্ঞাতনাম্নী)
            - কংসনারায়ণ (নিঃসন্তান)

শিবসিংহের বংশধরগণ করদ রাজ্যরূপে ত্রিহুতের উত্তর ভাগে ১৫৩২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেছিলেন। অনন্তর উক্তরাজ্য মুসলমান শাসন কর্ত্তার অধীনে আইসে। এই সময়ের পূর্ব্বে বঙ্গাধিপতিগণ গঙ্গা ও গণ্ডক নদীর সঙ্গম স্থলে হাজিপুরে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপিত করেন। কতিপয় দুর্দ্দান্ত রাজাকে দমন করিবার জন্য এই স্থানে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। যত বিপত্তি উক্ত হাজিপুরের উপরে পতিত হইয়াছিল। পরন্তু উত্তর ত্রিহুতে সে

---

of Mithila by Doctor Grierson. Indian antiquary, vol. XIV, 1885 and volume XXVIII, 1899.

* The authority of the document is disputed, See J. A. S. B., vol. LXVIII, 1899, part I, page 96.

বিপদের আশঙ্কা ছিল না। সুতরাং মুসলমান শাসনের চিহ্ন কেবল হাজিপুর অঞ্চলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। হাজিপুর বঙ্গদেশের রাজা হাজিইলিয়াসের নামে স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গালায় ১৩৪৫-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিয়ৎদিন পরে তিনি বাঙ্গালা ও দিল্লীর সীমান্ত প্রদেশ ত্রিহুত ধ্বংস করিলেন এবং তৎস্থানের দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিগণকে স্ববশে আনয়ন করিবার জন্য একটি উত্তম দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। দিল্লীতে এই সংবাদ প্রচারিত হইল। হাজিইলিয়াসকে শাসন করিবার জন্য দিল্লী হইতে ফিরোজসা সসৈন্যে সমুপস্থিত হইলেন। তিনি অমিত বিক্রমে ত্রিহুত আক্রমণ করিলেন। হাজি ইলিয়াস উপায়ান্তর না দেখিয়া পাণ্ডুয়ায় পলায়ন করিলেন। অবশেষে ফিরোজ সা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া ত্রিহুতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করিলেন।

অবশেষে সেকেন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হইয়া বঙ্গদেশের রাজা হুসেনসাকে পরাজিত করিবার মানসে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। হুসেন সা কালবিলম্ব না করিয়া বাঢ় (Barh) নামক স্থানে সম্রাটের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাহাতে এইরূপ স্থির হইল যে, বঙ্গাধিপ হুসেন সা বিহার, ত্রিহুত এবং সারণ দিল্লীর সম্রাট্কে প্রদান করিবেন। কিন্তু সম্রাট্ আর কখনও হুসেনসার বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিতে পারিবেন না। ত্রিহুতরাজ এই প্রকার সন্ধির সর্ত্ত অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ সম্রাট্ সেকেন্দরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া কতিপয় লক্ষ মুদ্রা সেলামী স্বরূপ প্রদান করিলেন। *

বঙ্গাধিপ এবং ত্রিহুতরাজ অধিক দিন নিরাপদে থাকিতে পারিলেন না। ষোড়শ শতাব্দীতে নসরৎ সা (১৫১৮-৩২ খ্রীঃ) ত্রিহুত আক্রমণ করিয়া দর্পনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র হরিনারায়ণ ওরফে ভৈরবসিংহকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। অতঃপর সেখানে তাঁহার জামাতা আলাউদ্দিনকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। পরিশেষে তিনি হাজিপুর আক্রমণ করিয়া তথায় তাঁহার অপর জামাতা মুখদাম আলীকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। তথায় এই প্রকারে নানা গোলযোগ ঘটিল।

* Elliot's History of India, page 96.

অনন্তর সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে স্বয়ং সম্রাট্ বাঙ্গালা দেশ নিজ করায়ত্ত করিয়া ত্রিহুত দিল্লীর সুবা মধ্যে পরিগণিত করিলেন। অবশেষে ১৭৬৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ত্রিহুত রাজ্যে আর কোন গোলযোগই হয় নাই। উক্ত খৃষ্টাব্দের শেষে ত্রিহুত প্রভৃতি অঞ্চলে দস্যুগণের পূর্ণ অধিকার হইল। অবশেষে ইংরাজ ও ও নেপাল গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে দস্যুভীতি বিদূরিত হইল।

যাহা হউক, মিথিলা রাজ্যে সৈন্য সংগ্রহে যত্ন করা হইত না। তাহার পরিবর্ত্তে শিক্ষা বিস্তার কল্পে স্বয়ং নরপতি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাহার ফলে তৎস্থান বিদ্যার কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠিল। মিথিলা বীরত্বের আবাসভূমি নহে, উহা সরস্বতীর লীলানিকেতন। তথায় সমর বিজয়ের আবশ্যক হয় নাই, পরন্তু বিশ্ববিজয়ী গুণিগণের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। বহু স্বনামধন্য মনীষী মিথিলা ভূমি হইতে মহামূল্য রত্ন কেবল ভারতবর্ষ কেন জগৎবাসীকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যিশুখৃষ্টের আবির্ভাবের সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মিথিলা হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষার কেন্দ্রভূমি ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে বৈশালী বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রভূমি ছিল। অবশেষে তথা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অস্তমিত হইলে, মিথিলা পুনর্ব্বার জ্ঞান গরিমায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। উহা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বের কথা। যে সময় মুসলমান বন্যায় বিহার প্রদেশ প্লাবিত হইতেছিল, তখনও মিথিলা শিক্ষা-বিস্তারে স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিল। সে কার্য্য অবিরাম গতিতে চলিতেছিল। তখনও কাব্য-রসে মিথিলা প্লাবিত হইতেছিল। শিক্ষিত জনগণের অবিরত সমাগমে মিথিলা তখনও ভারতবর্ষের গৌরবের বিষয় ছিল। নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথায় অবিরত শাস্ত্রালোচনা ও শিক্ষিতগণের গুণ গরিমা পরিবর্দ্ধন করিবার জন্য স্বয়ং নরপতি বিনিযুক্ত ছিলেন। তদীয় প্রজাগণও সেই সুরস পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কারণ, তথায় এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব বা অপর কোন অশান্তির কারণই উত্থিত হয় নাই, ইহাও ভগবানের কৃপা ভিন্ন অপর কিছুই নহে। বস্তুতঃ প্রজাগণ শিক্ষারসের আস্বাদন প্রাপ্ত হইলে অপর কোন অশান্তিই তাহাদের হৃদয়মন্দিরকে উদ্বেলিত করে না। পূর্ব্বে যে মিথিলার এবম্প্রকার উন্নতি লক্ষিত হইত, তাহা কালের কুটিল গতিতে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

শ্রী—

প্রণয়-পারিজাত।

বা

বসন্তসেনা।*

(১)

"তপসা মনসা বাগ্‌ভিঃ পূজিতা বলিকর্ম্মভিঃ।
তুষ্যন্তি গৃহিণাং নিত্যং দেবতাঃ কিং বিচারিতৈঃ॥"

উজ্জয়িনী অতি প্রাচীন সমৃদ্ধিশালিনী নগরী। চারুদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণ এই মহানগরীর অতুল ভূষণ স্বরূপ ছিলেন। তরুগণ ফলশালী হইলেই অবনত হইয়া থাকে, কিন্তু ফলবিহীন বৃক্ষ আর অবনত থাকে না; এই গুণেই ধন-গর্ব্বিত মানব অপেক্ষা ইহারা শ্রেষ্ঠ। চারুদত্ত নিজ বিনীততায় এই তরুরাজিকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন, তিনি ধন থাকিতে যেরূপ বিনীত ছিলেন, নির্ধন অবস্থায়ও সেইরূপ লোকপ্রিয় ও বিনয়-বিনম্র ছিলেন।

চারুদত্তের পূর্ব্বপুরুষগণ উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ পল্লীতে বাস করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে আপনাদের অবস্থার অত্যুন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অবর্ত্তমানে চারুদত্ত সেই বিপুল ধনসম্পত্তির একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

---

* "মৃচ্ছকটিক" সংস্কৃত ভাষার একখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক;—কাব্যের লক্ষণ অনুসারে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাকে নাটক না বলিয়া "প্রকরণ" বলা হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধি আছে যে, মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন নাটক, মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণের প্রাদুর্ভাবেরও অনেক পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। ইদানীং মহাকবি ভাস-প্রণীত "চারুদত্ত" দেখিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছে, ভাসের রচনা অবলম্বন পূর্ব্বকই শূদ্রক স্বীয় মৃচ্ছকটিক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ ভাসই পূর্ব্বের হউন অথবা শূদ্রকই পরবর্ত্তী হউন, পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী যে ভাসের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে "চারুদত্ত" অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এখন উহাই ভাসের রচিত, কি উহার পরবর্ত্তী অংশ কালধর্ম্মে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার নিশ্চয় নাই। যাহা হউক, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় এই মৃচ্ছকটিক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা এই সরস কাব্য-প্রণেতাকে শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না।

"চারুদত্ত" নামক সার্থবাহ (বণিক্) ব্রাহ্মণ এই গ্রন্থের নায়ক ও অসামান্য রূপ ও গুণশালিনী বসন্তসেনা নাম্নী বেশ্যাপুত্রী ইহার নায়িকা। উভয়ের অলৌকিক প্রণয় উপাখ্যানেই এই গ্রন্থরত্ন বিরচিত হইয়াছে। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তিগণ এই অপার্থিব করুণ ও অপূর্ব্ব প্রণয় উপাখ্যানের রসাস্বাদনে সমর্থ হইবেন, এই আশাতেই "মৃচ্ছকটিক" অবলম্বন পূর্ব্বক এই "বসন্তসেনা" লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠে গ্রন্থকারের কাব্যের রস গ্রহণে পাঠক কিঞ্চিন্মাত্র সফল হইলেও যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। এস্থলে একথা বক্তব্য, এই প্রবন্ধে "মৃচ্ছকটিক" অবিকল অনুবাদ করা হয় নাই। লেখক।

চারুদত্তের নিতান্ত দয়ার শরীর, দীনহীন জনগণের দারিদ্র্যদুঃখ দর্শনমাত্র তাঁহার অকৃত্রিম দয়ার উৎস উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। উপায়হীন নিরাশ্রয় ব্যক্তি দর্শন মাত্র তিনি নিজের জীবন পণ করিয়াও তাহার দুঃখ নিবারণ করিতে যত্নপর হইতেন। অন্যদিকে স্বকীয় ধর্ম্মকর্ম্মেও তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল;—দেবতা অর্চ্চনা ও অতিথি-সৎকার প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠানে তিনি সর্ব্বদাই অবিচলিতমনা ছিলেন।

এই সব গুণে চারুদত্তের প্রতি সাধারণ লোকে বড়ই সন্তুষ্ট ও অনুরক্ত ছিল; —কিন্তু এই ব্যাপার হইতেই চারুদত্তের অচলা কমলার আসন টলিল! দান-ব্যাপারে তিনি প্রতি নিয়তই মুক্তহস্ত ছিলেন, পক্ষান্তরে আয় পরিবৃদ্ধির উপায় কিছুমাত্রই দেখিতে পারিতেন না, অথবা তাহা জানিবার জন্য কিঞ্চিন্মাত্র ঔৎ-সুক্যও তাঁহার ছিল না; তাঁহার ধারণা দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে, কুবেরের ন্যায় স্বীয় অতুল ধনভাণ্ডার কখনও পরিক্ষীণ হইবে না। কিন্তু অবিশ্রান্ত সৎপাত্রে দান করিয়া চারুদত্ত অবশেষে কপর্দ্দকপর হইয়া পড়িলেন! এই অবস্থায় ক্রমে তাঁহার বাস-ভবন লোকসমাগমশূন্য হইতে লাগিল! দাস দাসী, লোক জন, একে একে বিদায় গ্রহণ করিল! অতিথিগণও দরিদ্র বোধে তাঁহার আশ্রয়ে আগমন করা পরিত্যাগ করিল।

একদিন চারুদত্ত দেবতার অর্চ্চনায় অভিনিবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তাঁহার অকৃত্রিম মিত্র মৈত্রেয় কোন বন্ধু-প্রদত্ত উত্তরীয় বস্ত্রসহ তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৈত্রেয় দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, চারুদত্ত পূজোপ-করণ লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, আর অসময়ের একমাত্র সহচরী দাসী রদনিকা তাঁহার পশ্চাতে আছে। চারুদত্ত তৃণগুচ্ছ দ্বারা সমাচ্ছাদিত নিজ গৃহ-প্রাঙ্গণ নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হায়, আমার সুনির্ম্মল স্বচ্ছপ্রায় তৃণশূন্য গৃহপ্রাঙ্গণে বিনিক্ষিপ্ত পূজার উপহারগুলি হংস ও সারস প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ স্বচ্ছন্দে আগমন পূর্ব্বক মুহূর্ত্ত মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ফেলিত, সেই গৃহপ্রাঙ্গণ এক্ষণে তৃণসমাচ্ছন্ন;—আর তাহার মধ্যে কীটদষ্ট বীজগুলি পতিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে!

মৈত্রেয় নিকটে আসিয়া বন্ধুপ্রদত্ত উপহার বস্ত্র চারুদত্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন, চারুদত্ত তাহা গ্রহণ করিয়া নিরতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন! "এক্ষণে আমার আর পূর্ব্বের ন্যায় সৌভাগ্য নাই, তাহাতেই এই সময়ে বন্ধু

কর্ত্তৃক এই উত্তরীয় প্রদত্ত হইয়াছে,”—এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধোমুখে রহিলেন!

মৈত্রেয় চারুদত্তের তৎকালিক মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া প্রবোধদান মানসে তাঁহাকে বলিলেন, ‘সখে, তুমি এত দুঃখিত হইলে কেন? ধন চিরদিন এক হস্তে থাকে না। লক্ষ্মী চিরদিনই চঞ্চলা, কদাপি তিনি একস্থানে স্থির থাকিতে পারেন নাই! যাহারা কৃপণ, সদ্ব্যয়ে একান্ত পরাঙ্মুখ, তাহারাই বিশেষতঃ মা লক্ষ্মীর কৃপার পাত্র হইয়া থাকে। আরও দেখ, তুমি অসদ্ব্যয় করিয়া অর্থের অপচয় কর নাই, সৎপাত্রে সদ্ব্যয় করিয়া এইরূপ অবস্থাপন্ন হইলে, তাহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে?

চারুদত্ত সাশ্রুনয়নে মৈত্রেয়কে বলিলেন,—সখে,তুমি ভুল বুঝিয়াছ;—অর্থহীন হইয়া এখন অর্থের অভাবে আমার এই কষ্ট ও শোকের উদয় হয় নাই! কারণ সদ্ব্যয়ে অর্থহীন হইয়াছি, সুতরাং তাহাতে আর আমার ক্ষোভের সম্ভাবনা কি আছে? সখে, আজ আমার কি জন্য এই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি শুনিতে চাও; তবে শোন;—এখনও যে আমি পূর্ব্বের মত নিজের ইচ্ছা অনুসারে ধন দান করিয়া দীন দুঃখী ব্যক্তিগণের অভাব বিমোচন করিতে সমর্থ হইতে পারিতেছি না, এই জন্যই আমার বিষাদ, ইহাতেই আমার দুঃখ সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়াছে! দেখ, যেরূপ মধুলোভী ভ্রমর, মধুহীন পুষ্পের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই অন্যত্র চলিয়া যায়, সেইরূপ অতিথিগণও দূর হইতেই আমার শ্রীহীন আবাসগৃহের প্রতি বিষাদভরে চক্ষু ফিরাইয়া স্থানান্তরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে! চির প্রতিপালিত অনুচরগণ আজ আমার গৃহ শূন্য করিয়া অন্যত্র বাস করিতেছে। অধিক আর কি বলিব, একথা মুখে বলিতে আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়, আজ আমি এরূপ নিঃস্ব—নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছি যে তোমার ন্যায় চিরসুহৃৎকেও, আমার এই ভাগ্যহীনতার জন্য, নিজভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করিতে হইতেছে! ইহা অপেক্ষা আমার দুর্ভাগ্যের আর কি পরিণতি বাকি আছে, তাহা কেবল বিধাতাই বলিতে পারেন!

মৈত্রেয় সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, সখে, তুমি স্থির হও। দৈবের উপরে কাহারও হাত নাই, জগতে এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন চিরকাল হইতেই ঘটিয়া আসিতেছে; কেহই এ সংসারে চিরদিন এক অবস্থায় জীবন যাপন করিতে সমর্থ

হয় নাই। দেখ, যে ব্যক্তি অদ্য লক্ষপতি, দৈবদুর্ব্বিপাকে কাল সে পথের ভিখারী;—আবার ভিখারীও অদৃষ্টবলে লক্ষপতি হইয়া পড়ে। আরও ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার এত দুঃখিত হওয়ার কি কোন কারণ আছে? আজ তুমি নিজেকে কিসে অর্থহীন বলিয়া ভাবিতেছ? এই বিশাল নগরী উজ্জয়িনী যাঁহাকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়া গৌরববিমণ্ডিতা—পরম সুভূষণে সুভূষিতা, সেই ব্যক্তি আবার দীন হীন কি প্রকারে হইতে পারে? তোমার আলয়ে এখন আর পূর্ব্বের মত সেইরূপ জনসমাগম নাই,—এই তোমার দুঃখের কারণ! কিন্তু তোমাকর্তৃক সংস্থাপিত দেবালয় ও অন্নসত্রে যে এখনও বহু দরিদ্র ব্যক্তি ক্ষুধায় অন্ন পাইয়া স্বীয় স্বীয় প্রাণ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে! আবার তোমাকর্তৃক খনিত কূপ ও সরোবর প্রভৃতি হইতে এই উজ্জয়িনীবাসী শত শত ব্যক্তি তৃষ্ণায় সুশীতল পানীয় জল প্রাপ্ত হইতেছে! তবে আর তোমার এই শোক, এই তাপ কি জন্যে? উজ্জয়িনীবাসী সকল লোকেই এখনও তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায়ই সম্মানপ্রদান করিয়া থাকেন;—তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার তুল্য ভাগ্যশীল ব্যক্তি আর কে আছে?

চারুদত্ত বলিলেন, সখে, দারিদ্র্য অপেক্ষা এ জগতে দুঃখকর আর কি আছে? দরিদ্র ব্যক্তির সহিত তাহার ধনবান্ সুহৃদ্‌গণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়! দুরবস্থায় নিপতিত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সময়োচিত সান্ত্বনা প্রদান করা দূরে থাকুক, ভাগ্যবান্ বান্ধবের ভ্রমবশতঃ ও দরিদ্র সুহৃদের কথা শ্রুতিগোচর হইলে তিনি নিজের অপুণ্যের সঞ্চার হইল বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকেন! যদি নির্ধন হতশ্রীক ব্যক্তি কদাচিৎ ধনশালী সুহৃদের নেত্রপথবর্ত্তী হয়, কি জানি পাছে স্বীয় দৈন্য জানাইয়া কিছু যাচ্ঞা করিতে পারে এই ভবিয়া ধনী বন্ধু বিপরীত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার নয়নপথের অদৃশ্য হইয়া থাকেন। দরিদ্র অবস্থা অনুসারে নিজের পূর্ব্ব-গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, সুতরাং সাধারণের নিকটে তাহাকে নিতান্ত লজ্জার ভাজন হইয়া পড়িতে হয়। লজ্জা আসিয়া আশ্রয় করিলে, সেই ব্যক্তিকে নিজের পৌরুষপরিচ্যুত হইতে হয়। পৌরুষহীন ব্যক্তি প্রতি-পদেই সাধারণের নিকটে অবমাননার পাত্ররূপে পরিগণিত হয়। "দেখ, এই অবমাননা হইতেই নির্ব্বেদ, ও নির্ব্বেদ হইতেই বিষাদ ও শোক জন্মিয়া থাকে।

শোকাভিভূত ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া পড়ে। বুদ্ধিহীন ব্যক্তির ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী; তাহা হইলেই দেখ, সখে, একমাত্র নির্ধনতাই সকল আপদের আস্পদ।

মৈত্রেয় প্রবোধচ্ছলে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন,—তুচ্ছ অর্থ, আগামী কাল পর্য্যন্তও যাহার অস্তিত্বের বিশ্বাস নাই,—সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী জানিয়াও তাহার জন্য আর দুঃখ কর কেন?

পূর্ব্ব বৈভব স্মরণে দারুণ চিন্তায় উদ্বেলিত চারুদত্ত বলিলেন, সখে, দরিদ্রতা পুরুষের একমাত্র চিন্তার নিবাস স্থান। বল ত দরিদ্র ব্যক্তির চিত্তশান্তির কি উপায় বর্ত্তমান থাকিতে পারে? কেবল অপরের অবজ্ঞার পাত্র নহে, দরিদ্র ব্যক্তি মিত্রদিগেরও অতিশয় ঘৃণাভাজন হইয়া থাকে। অথবা অন্যের কথা কি বলিব, দরিদ্রব্যক্তি আপনার গৃহেও সতত লজ্জিত হইয়া মরণাধিক যন্ত্রণা পাইয়া থাকে! পিতা বা মাতা, ভ্রাতা বা ভগ্নী, পুত্র বা কন্যা, দাস বা দাসী প্রভৃতি পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিই তাহাকে স্নেহ, মমতা, ভক্তি বা প্রভুভাবে নিরীক্ষণ করে না,—তাহার প্রতি কাহারও কিছুমাত্র সমদুঃখশীলত্ব প্রাদুর্ভূত হয় না! অধিক আর কি বলিব, সুখ ও দুঃখের চিরসহচারিণী অর্দ্ধাঙ্গিণী জায়া হইতেও নির্ধন ব্যক্তি সর্ব্বত্র মরণাধিক যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অসহ্য যন্ত্রণা পরম্পরায় বনবাসই নিজের শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। অপর ব্যক্তিকৃত দুষ্কৃতির ভারও দৈবদুর্ব্বিপাকনিবন্ধন তাহারই অঙ্গে আসিয়া আপতিত হইয়া থাকে! হৃদয়ের প্রবল দাবানলস্বরূপ সুদুঃসহ শোক প্রভাবে অহর্নিশ সন্তাপিত হয়, কিন্তু একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায় না, যাহাতে জীবন অপগমে শান্তির সুশীতল ছায়ায় বিশ্রামলাভে সমর্থ হইতে পারে!

সজলনেত্রে মৈত্রেয় বলিলেন, সখে, তুমি আর বিলাপ করিও না, তোমার এই সকরুণ আর্ত্তনাদে এই মৈত্রেয়ের পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যাইতেছে! চিরদিন কাহারও একভাবে যায় না, বিশেষতঃ তোমার মত সর্ব্বগুণশালী ব্যক্তিকে কখনও এই দীর্ঘকালব্যাপী দরিদ্রতার জন্য ব্যাকুলিত হইয়া কাটাইতে হইবে না। তোমার ভবিষ্যৎ শুভ অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া জানিবে; দেবগণ নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন;—অতএব এখন স্থির হও।

সন্তপ্ত চারুদত্ত তখনও বলিতে লাগিলেন,—ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশায় নিবিড়

জনশূন্য অরণ্যে পথিভ্রষ্ট পথিক, সুদূর জনপদস্থিত দীপালোকে যেরূপ জীবন আশায় উৎফুল্ল হইয়া থাকে, চিরদুঃখগ্রস্ত ব্যক্তি পরিণামসুখভোগ ফলে তাহা হইতেও অধিক শান্তিসুখসম্ভোগে সমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি সুখ-সম্পদের অধিকারী হওয়ার পরে ভাগ্যবিপর্য্যয়ে দারিদ্র্যদ্বিপীর বিশাল দংষ্ট্রা বিবরে চিরদিনের জন্য নিপতিত হয়, তাহার শরীর ধারণ করা বৃথা;—কারণ জীবিত থাকিতেও সে মৃতব্যক্তির অবস্থাই ভোগ করিয়া থাকে!

এইরূপ মর্ম্মভেদী পরিবেদনার পরে হস্তস্থিত পূজোপহার প্রসারিত করিয়া চারুদত্ত বলিলেন, সে যাহা হউক সখে, সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। যাও তুমি চতুষ্পথে গিয়া মাতৃদেবতাদিগকে এই বলি প্রদান করিয়া এস; গৃহদেবতার পূজা আমি অগ্রেই সম্পন্ন করিয়াছি।

চারুদত্তের এই কথায় মৈত্রেয় বাধা দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, একান্ত মনে দেবতার অর্চ্চনা করিয়াও তোমার এই সর্ব্বস্বান্তরূপ সমৃদ্ধি লাভই দেখিতে পাইতেছি! ইহাই যদি দেব-আরাধনার পরিণাম, তবে আর ঐ বিড়ম্বনা স্বীকার করা কেন?

চারুদত্ত বাধা দিয়া বলিলেন—অমন কথা মুখেও আনিও না। মানব নিজ কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করে, তাহাতে ভাই আর দেবতার অপরাধ কি! গৃহদেবতার অর্চ্চনা করা গৃহস্থের নিত্যবিধি। কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারে নিত্য-দেবতার অর্চ্চনা করিলে, তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সেই কর্ত্তব্যকার্য্যে সংশয়বুদ্ধির আশ্রয় করিতে নাই; অতএব যাও, তুমি শীঘ্র মাতৃদেবতাদিগকে পূজার উপহার প্রদান করিয়া এস।

এতরাত্রিতে বাহিরে যাওয়ার নির্ব্বন্ধে সরলমনা মৈত্রেয় বড়ই আপত্তি দেখাইয়া বলিলেন, ওহে এখন আর আমি কিছুতেই বাহিরে যাইতে পারিব না। তোমার যদি নিতান্তই প্রয়োজন হয়, অন্য কাহাকেও পাঠাও। বাহিরের অবস্থা যে এখন কিরূপ তাহাত ঘরে বসিয়া কিছু দেখিতে পাও না! রাজপথে কি এখন অপর লোক কিছুতেই গমনাগমন করিতে সমর্থ হইতে পারে? এখন ত নিশাচরেরই রাজত্ব হইয়াছে। বাহির হইলেই দেখিতে পাইবে, বেশ্যা ও লম্পটেরা হুটাহুটি করিয়া বেড়াইতেছে! যেমন আলেয়ার ছায়ায় দিক্‌ভ্রম হয়, ডান ও বাম জ্ঞান থাকে না, আমার মতন লোকও ত এই বেটাদের গোলক ধাঁধায়

পড়িয়া তাই হইয়া পড়িবে! এই পাষণ্ডগুলার কাণ্ডকারখানার সংবাদ তুমি কিছুমাত্রও রাখ কি? ব্যাং যেমন সাপের মুখে পড়ে, পথে এই রাত্রি বেলায় বাহির হইয়া আমিও কি সেইরূপ ইহাদের গ্রাসে গিয়া পড়িব? তোমার মনের ভাবটা কি বল দেখি?

চারুদত্ত বলিলেন, আচ্ছা, তুমি আর একটু অপেক্ষা কর, আগে আমি জপটা সারিয়া লই। জপ সমাধানান্তে পুনর্ব্বার বলিলেন, বয়স্য, আমার জপ শেষ হইয়াছে। যাও, এক্ষণে তুমি বাহিরে যাইয়া মাতৃগণ বলি প্রদান করিয়া এস।

এইরূপে পুনর্ব্বার অনুরুদ্ধ হইয়াও মৈত্রেয় গমন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহাতে চারুদত্তের অতিশয় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়া পড়িল! তিনি নিতান্ত অধৈর্য্যের সহিত বলিতে লাগিলেন, ধিক্, ধিক্, এই অবস্থাতে আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর! হায়, দরিদ্রদশায় নিতান্ত অনুগত ব্যক্তিও এইরূপে আদেশ লঙ্ঘন করিয়া থাকে! সুতরাং এইরূপ ঘটিবার পূর্ব্বে মৃত্যুকে আশ্রয় করাই সেই হতভাগ্য মানবের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। হে দারিদ্র্যদশা, আমার এই বর্ত্তমান অবস্থাতে একমাত্র তোমার জন্যই আমার শোক উপস্থিত হইয়াছে; কেননা তুমি ত অকৃত্রিম সুহৃদের ন্যায় বিশ্বস্তসূত্রে নিঃশঙ্কপ্রায় আমার এই জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালশরীর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ, কিন্তু ভাই, বল ত, ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে এই দেহের অবসান হইলে, এইরূপ সুখে তুমি শেষে আর কোথায় গিয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে?

চারুদত্তের এই মর্ম্মঘাতী বিলাপে মৈত্রেয়ের হৃদয় গ্রন্থি বড়ই বিদলিত হইয়া পড়িল। এক্ষণে আর তাঁহার চতুষ্পথে যাইতে কোন আপত্তি রহিল না, কিন্তু দুর্বৃত্ত নিশালম্পটজনগণের হস্তে কথঞ্চিৎ উদ্ধার কামনা করিয়া তিনি চারুদত্তের নিকটে প্রার্থনা করিলেন, যদি রদনিকা সঙ্গে যায়, তাহা হইলে আর চতুষ্পথে যাইতে তাঁহার কোন আপত্তি থাকিবে না।

চারুদত্তের আদেশে অগ্রে প্রদীপ হস্তে রদনিকা ও তৎপশ্চাৎ পূজোপকরণ হস্তে মৈত্রেয় বহির্গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বহির্দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবামাত্র কাহারও ফুৎকারে রদনিকার হস্তস্থিত প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া পড়িল এবং উভয়ের অলক্ষিতেই সেই অন্ধকারে এক আগন্তুক বেগে চারুদত্তের বাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল! কেহই এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। চারুদত্ত প্রদীপ নিভিয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মৈত্রেয় বলিলেন কপাট ত বন্ধই ছিল, তাহাতেই বাতাসগুলা একত্র জমাট বাঁধিয়া পড়িয়াছিল। যেমন দরজা খোলা পড়িয়াছে, আর সেগুলি খুব জোরে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে; অমনি প্রদীপটাও নিবিয়া গিয়াছে! যাহা হউক, রদনিকা, তুমি একটু বাহিরে দাঁড়াও, আমি ঘরে যাইয়া প্রদীপটা আবার জ্বালিয়া আনিতেছি।

শ্রীমথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি।

সমালোচনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি এ প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। ইহা স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবন চরিত। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাগ্যবান্ পুরুষ; বাণীর পূজায় জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই পূজাতেই জীবন শেষ করিয়াছেন; দেশবাসী তাঁহার পূজার মূল্য বুঝিয়াছে, তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে। শত শত বঙ্গবাসীর হৃদয়-উৎস নয়ন-দ্বারে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার চিতাভস্ম বিধৌত করিয়াছিল। ইহা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? দ্বিজেন্দ্রলালের আর এক সৌভাগ্য যে, নবকৃষ্ণ বাবু তাঁহার জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছেন। নবকৃষ্ণ বাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা আরও বর্দ্ধিত হইবে। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার দোষের প্রতি অন্ধ নহেন। কবির চরিত্র ও রচনার সমালোচনায় তিনি অনেক অপ্রিয় সত্যও বলিয়াছেন। গ্রন্থ-সমালোচনায় তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের পারিবারিক জীবন অপেক্ষা সাহিত্যিক জীবনেরই পরিচয় এই গ্রন্থ হইতে অধিক পাওয়া যায়। ইহাতে গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধিই হইয়াছে। গ্রন্থকার দ্বিজেন্দ্রলালের বৈশিষ্ট্য দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং তাহাতে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কালের নিকষের ন্যায় গ্রন্থপরীক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থের সে পরীক্ষার সময় এখনও আসে নাই। আজ যাহাকে 'সোণা' বলি, কালে তাহা 'বেঙা পিতল' হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক জিনিসই এখনও সোণা, পরেও সোণা থাকিবে। কেন? তাহা নবকৃষ্ণ বাবু সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভাষা ও ভাবে গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সুসঙ্গাধিপতি মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায়, ৫ম খণ্ড] ১৩২৩ সাল, কার্ত্তিক। [৭ম সংখ্যা।

চীন ও হিন্দু সভ্যতা।

চীন ও হিন্দু এই দুই জাতির মধ্যে কোন্ জাতি অধিকতর প্রাচীন তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। হিন্দুগণ মনে করেন যে, তাঁহারাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জাতি। আবার চীনাগণ মনে মনে গর্ব্ব করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের অপেক্ষা প্রাচীন সভ্য জাতি পৃথিবীতে আর নাই। চীন জাতির ৫০০০ বৎসরের লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়; কিন্তু হিন্দু জাতির কোন ধারাবাহিক প্রাচীন ইতিহাস নাই। বর্ত্তমান অনুসন্ধানের ফলে যত দূর জানা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় ইজিপ্টবাসিগণ পৃথিবীর সকল জাতি হইতে অধিক প্রাচীন। কারণ তথায় ভূগর্ভ হইতে সমাধি সকল উত্তোলন করত বিশেষজ্ঞেরা ঐ সকলের কোন কোন সমাধি যে দশ হাজার বৎসরের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন। আমাদিগের এ সম্বন্ধে একটী কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশে যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি বলিয়া চারি যুগের উল্লেখ আছে, সেই চারি যুগের বয়স হিসাব করিলে আমরা ইজিপ্ট অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় হইব তাহার সন্দেহ নাই। এক কলিযুগের বয়সই প্রায় ৫০১৭ বৎসর হইল। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের প্রত্যেকের বয়স কত হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে প্রত্যেক যুগের বয়স যদি গড়ে ৫০০০ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে হিন্দু জাতিও ২০০০০ বৎসর বয়সের দাবী করিতে পারেন। এ সকলই অনুমানের উপর নির্ভর

মাত্র. ইজিপ্ট বা চীনদেশের মত আমাদিগেরও অতি প্রাচীন কালে যদি সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার প্রথা প্রচলিত থাকিত, কি প্রস্তর বা তাম্রফলকে প্রধান প্রধান ঘটনা সকল লিখিয়া রাখিবার নিয়ম থাকিত, তাহা হইলে আমরাও আমাদিগের সভ্যতার বয়স নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতাম। বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বে প্রস্তর বা তাম্রফলকে প্রসিদ্ধ ঘটনা সকল লিখিয়া রাখিবার প্রথা এ দেশে ছিল বলিয়া মনে হয় না। দেশ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। যাহা হউক, এ প্রশ্নের মীমাংসা মাদৃশ লোকের সাধ্যাতীত; ইহার মীমাংসা করাও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

চীন ও ভারতীয় সভ্যতার তুলনা করিতে গেলে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা কর্ত্তব্য।

১। ধর্ম্ম। ২। সামাজিক রীতি। ৩। সাধারণশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা। ৪। শিল্প ও বাণিজ্য।

১। ধর্ম্ম—ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচলিত। চীনে কনফুসার ধর্ম্ম, তাও ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত। চীনে খৃষ্টিয়ানের সংখ্যা এত সামান্য যে তাহা নগণ্য। কনফুসা চীনের মনু ছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবের প্রায় সমসাময়িক লোক ছিলেন। আমাদিগের মনুসংহিতানুসারে যেমন হিন্দুদিগের অনেক ধর্ম্ম ও সামাজিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ কনফুসার সংহিতানুসারে চীনাদের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনৈতিক কার্য্যাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস এই যে, চীনারা সকলেই বৌদ্ধ। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। চীনাদিগের ধর্ম্মমন্দিরে যেমন বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তাদৃশ অন্যান্য বহুসংখ্যক দেব দেবীর মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের দেশে যেমন শাক্তের বাড়ীতে শালগ্রাম শিলা ও শিবলিঙ্গ পূজিত হইয়া থাকেন, সেই মত চীনারা কনফুসার, তাও ধর্ম্ম ও বুদ্ধ দেবের পূজা করিয়া থাকে। মূল কথা, এই তিন ধর্ম্ম একত্র জড়িত। সুতরাং অধিকাংশ লোকই খাঁটি বৌদ্ধ নহে। খাঁটি বৌদ্ধ হইলে জীবহিংসা বা অপর দেবদেবীর উপাসনা করিতে পারে না। হিন্দুগণও পৌত্তলিক, চীনেরাও পৌত্তলিক। চীন জাতিকে কেহ কেহ দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকেন, এক শ্রেণীকে হিন্দু চীনা ও অপর শ্রেণীকে

মুসলমান চীনা আখ্যা প্রদান করেন। চীনাদিগের জাতিভেদ নাই এবং খাদ্য বিচার নাই। তাহা হইলেও অনেক বিষয়ে চীনারা হিন্দুদিগের মত। নানা দেবদেবীর উপাসনা, গাছ পাথরের ও ভূত প্রেতের পূজা করা, পূর্ব্ব পুরুষগণের শ্রাদ্ধ করা, পূজা ও শ্রাদ্ধাদিতে অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতির দ্বারা ভোগ ও ভোজ্য প্রদানের রীতি, পিতা মাতার মৃত্যু হইলে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অশৌচ গ্রহণ করা, দেবকার্য্যে ও শ্রাদ্ধাদিতে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা, গৃহে ও মন্দিরে ধূপাদি জ্বালাইবার প্রথা চীন দেশে প্রচলিত আছে। তবে এক কথা এই যে, দুই জাতির পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিবার পদ্ধতি এক প্রকার নহে। আমাদিগের দেশের মত কোন পর্ব্বোপলক্ষ্যে মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিয়া পূজান্তে সেই মূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন দিবার রীতি চীন দেশে নাই। চীন দেশে সমস্ত মন্দিরে স্থায়িভাবে দেবমূর্ত্তি সকল স্থাপিত থাকে, তাহার আহ্বান ও বিসর্জ্জন নাই। চীনারা কোন পর্ব্বোপলক্ষ্যে মন্দিরে গিয়া ধূপাদি জ্বালাইয়া, বরাহ মাংস, কুক্কুট মাংস, কিংবা অন্যান্য উপচার সহ অন্ন ভোগ দিয়া, জানু পাতিয়া প্রথম তিনবার প্রণাম করিয়া, করযোড়ে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুনরায় তিনবার প্রণাম করিয়া, পূজা সাঙ্গ করে। অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে রূপা ও সোণালি রঙের কাগজ জ্বালাইয়া আহুতি প্রদান করে। বুদ্ধদেবের পূজায় শুদ্ধ শান্ত ভাবে নিরামিষ ভোগ প্রদান করে। যেমন আমরা দুর্গা ও কালী পূজায় মাছ মাংসের ভোগ দিয়া থাকি, কিন্তু নারায়ণের ভোগ নিরামিষ দিই। শক্তি পূজায় আমরা যেমন ছাগ বলি দিই, চীনারা কুক্কুট ও বরাহ বলি দেয়, তবে এক কোপে নয়, কতকটা মুসলমানদিগের হালাল করার মত।

চীন দেশে মৃত দেহের প্রতি যে প্রকার সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিবার রীতি আছে, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। পক্ষান্তরে, আমাদিগের হিন্দু জাতি মৃত দেহের প্রতি যে প্রকার ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা অতি ক্ষোভের বিষয় ও নিন্দনীয়। হিন্দুর পরম পূজনীয় পিতামাতা, পরম স্নেহের ভ্রাতা ও পুত্রাদির মৃত্যুর প্রাক্কালে, যখন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে শান্তিতে রাখিবার প্রয়োজন, তখন ঘরে মৃত্যু হইবার আশঙ্কায় টানা হেঁচড়া করিয়া উঠানে অনাবৃত স্থানে একখানি চাটাই কি মাদুরের উপর আনিয়া শোয়ান হয়। অনেকের তাহাতেও মৃত্যু হয় না। পুনরায় গৃহে তুলিবার প্রয়োজন হয়। যে রোগী

দুই চারি ঘণ্টা আরও বাঁচিত, তাহাকে টানাটানি করিয়া সত্বরই স্বর্গে যাইবার সহায়তা করা হয়।

আসন্ন কালে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে টানা হেঁচড়া করিবার রীতি চীন দেশেও আছে, কিন্তু তাহা ঘরের বাহিরে নহে, ঘরের ভিতরে। চীনারা প্রাচীন ব্যক্তি সকলের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, তাহাদিগকে স্নান করাইয়া, নূতন পরিচ্ছদ পরাইয়া, একখানি চেয়ারে উপবেশন করাইয়া তাহার মুখের মধ্যে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল ও একখণ্ড রৌপ্য প্রদান করত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে। অনেকের এই সকল টানাটানিতে সত্বরই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়। আসন্নকাল উপস্থিত হইলে মুখগহ্বরে তণ্ডুল ও একখণ্ড রৌপ্য প্রদানের উদ্দেশ্য আত্মার সন্তুষ্টি সাধন করা। ইহা দ্বারা পরকালে মৃত ব্যক্তি ধনধান্যে ঐশ্বর্য্যশালী হইবে এই বিশ্বাস। রোগীর মৃত্যু হইবামাত্র গৃহের জানালাদি খুলিয়া দিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মার গতি বিধির পথ মুক্ত করিয়া রাখে। মৃত্যু হইবার পর মৃত দেহটীর মাথায় টুপি ও পায়ে জুতা পরাইয়া শোয়াইয়া রাখে। পরে মৃত দেহটী একটী মূল্যবান্ শবাধারে রাখিয়া ও বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত করিয়া উহা বন্ধ করত গৃহের মধ্যে এক উচ্চ আসনে স্থাপিত করে। তৎপার্শ্বে ধূপ, দীপ, দিবা রাত্রি জ্বলিতে থাকে। প্রেতাত্মার পানাহারের জন্য অন্ন জল প্রত্যহ প্রদত্ত হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির পুত্রগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি সর্ব্বপ্রধান শোককারী (Chief mourner) হইয়া শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করত মৃত দেহের পার্শ্বে দিবা নিশি উপবিষ্ট থাকেন। মৃত্যু হইবামাত্র স্ত্রীলোকগণের ক্রন্দন ধ্বনিতে মৃত্যু সংবাদ ক্ষণমধ্যে চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইয়া পড়ে। প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত সেই ক্রন্দনে যোগ দিয়া থাকে। প্রতিবেশী ও আত্মীয় বন্ধুগণের বাড়ীতে তিন হাত পরিমিত লম্বা দেশী তাঁতের মোটা কাপড় এক এক খণ্ড প্রেরিত হয়। মৃত্যু সংবাদ শুনিবামাত্র যত লোক মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ গমন করিবে, সেই সকলকে শোকচিহ্নস্বরূপ ঐ শ্বেত উষ্ণীষ ধারণ করিতে হইবে। যাঁহারা প্রণাম করিতে পারেন, তাঁহারা মৃত দেহের সম্মুখে অবনত হইয়া প্রণাম করেন, পরে আহারাদি করিয়া প্রস্থান করেন। যে ব্যক্তির অবস্থা ভাল, সে পিতা মাতার মৃত দেহকে এক মাস, এমন কি দুই তিন মাস পর্য্যন্ত গৃহে রাখে। যত অধিক দিন মৃত দেহটী ঘরে রাখা যায়, মৃত

ব্যক্তির আত্মা তত সন্তুষ্ট হন। যত দিন মৃত দেহ ঘরে থাকিবে, তত দিন প্রত্যহ বাটীতে নিমন্ত্রণ ও সদাব্রত চলিবে। পরে জ্যোতির্ব্বেত্তা বা দৈবজ্ঞ সমাধির দিন ও ক্ষণ স্থির করিয়া দিলে, শেষ দিনে বড় নিমন্ত্রণের আয়োজন হয়। সে দিন যত লোক আসিবে সমস্ত লোককেই শ্বেত উষ্ণীষ প্রদান করা হয় এব যাহারা বেশী পয়সা খরচ করে তাহারা শ্বেত পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া থাকে। দুই একবার লেখকও এই প্রকার শ্বেত উষ্ণীষ ও শ্বেত পরিচ্ছদ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যত লোক যাইবে সকলকেই কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিবার রীতি আছে। যে দিন মৃত দেহের সমাধি হইবে সে দিন নানাপ্রকার সং সাজাইয়া নৃত্যগীতাদি সহ বহুবিধ ছবির মিছিল বাহির হয়। প্রায় এক মাইল দীর্ঘ সেই শোভাযাত্রা চলিতে থাকে। বাটীর বধূ ও কন্যাগণ আপাদমস্তক শ্বেত পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া বদনাবৃত করত মৃত দেহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে, চিৎকার করিয়া রোদন করত পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকদূর গিয়া, পথিমধ্যে আবার প্রণাম করিবার পর, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কেহ না পড়িয়া যায় তজ্জন্য শোকার্ত্তদিগকে, বিশেষতঃ প্রধান শোককারীকে, দুইজনে ধরিয়া চলে। তিনিও শোকে অতি কাতরতার ভাণ করিয়া অবনত হইয়া চলিতে থাকেন। চীনাদের প্রত্যেকের পারিবারিক সমাধি স্থান আছে। সেই স্থানে সমাধি দেওয়া হইলে অচিরে তথায় এক সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া মৃত ব্যক্তির নাম প্রভৃতি প্রস্তর ফলকে লিখিয়া রাখে। সেই লিপিসকল শত শত বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া মৃতের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-গণের সমাধি স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। আর আমাদিগের দেশের যত বড় প্রসিদ্ধ লোকই হউন না কেন, তিনি মরিবামাত্রই তাড়াতাড়ি শ্মশান ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাঁহাকে ভস্মীভূত করিয়া তাঁহার সমস্ত চিহ্ন লোপ করিয়া ফেলা হয়। চীনারা প্রতি বৎসর পর্ব্বাদির সময় এই সকল সমাধি স্থানে গিয়া পূজা দেয় এবং তথায় বন্দনা করিয়া সবান্ধবে ভোজন করে। প্রতি বৎসর চীনা-দিগের সপ্তম মাসে (চীনাদের মাসের কোন নাম নাই, ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগে চীনাদের প্রথম মাস আরম্ভ হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় মাস বলিয়া মাসের উল্লেখ করে; এই রূপ বারের নামও নাই) অর্থাৎ আগষ্ট বা ভাদ্র মাসে আমাদিগের পিতৃপুরুষের তর্পণের ন্যায় পনর দিন যাবৎ প্রেতাত্মাকে অন্নজল প্রদান করে।

চীনারা বিশ্বাস করে যে, এই সময়ে প্রেতাত্মগণ বাড়ীতে ফিরিয়া আইসে। পনর দিন শেষ হইলে শেষ দিনে প্রত্যেক বাটীর সম্মুখে একখানি টেবিল পাতিয়া তাহাতে ধূপ দীপ, নৈবেদ্য, নানা' ভোজ্য দ্রব্য প্রেতাত্মার আহারের জন্য রাখিয়া দেয়। পরে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির নামে এক এক খানা ১ ফুট লম্বা বড় চিঠির খামের উপর তাহাদের গুণ কীর্ত্তন লিখিত থাকে। অগ্নিকুণ্ড করিয়া মন্ত্র পাঠ করত ঐ সকল খাম অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া প্রেতাত্মগণকে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে অনুরোধ করে। আমাদিগের হোমের মত সকল কার্য্যেই চীনারা অগ্নিকুণ্ড করিয়া তাহাতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকে। হিন্দুগণ পিতা মাতার মৃত্যু হইলে এক বৎসর যাবৎ কালাশৌচ পালন করে, কিন্তু চীনারা মাতা মরিলে তিন বৎসর এবং পিতার মৃত্যুতে এক বৎসর অশৌচ পালন করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোক বিধবা হইলে তিন বৎসর যাবৎ মাথায় শ্বেত উষ্ণীষ ধারণ করিয়া অশৌচ পালন করে। বিধবাগণ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে। যে সকল অল্পবয়স্ক বিধবা পুনরায় বিবাহ না করিয়া পবিত্র বৈধব্যভাবে নিষ্কলঙ্কে কাল কাটাইতে পারে, চীনারা তাহাদের স্মরণ চিহ্নস্বরূপ সদর রাস্তার উপর বিধবার স্মৃতিরক্ষণ অর্থবা (widows' memorial arch) নির্ম্মাণ করে।

সমগ্র চীন দেশের সর্ব্বত্রই বৃহৎ বৃহৎ ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত আছে। এমন কি এমন বৃহৎ গ্রাম আছে যেখানে তিন চারিটী পর্য্যন্ত বড় বড় মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি সহরে বহু মন্দির আছে। এ তুলনায় বঙ্গদেশ কত হীন তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তবে আধ্যাত্মিকতায় হিন্দুগণ জগতে শ্রেষ্ঠ। চীনদেশে বাস করিয়া চীনাদিগের সঙ্গে মিলিয়া এক দিনও কোন চীনার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনি নাই। ফলতঃ ঈশ্বরের যে কোন একটা প্রতিশব্দ চীনভাষায় আছে, তাহা চীন ভাষায় পণ্ডিত পাদরি সাহেবগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই।

চীনাদিগের জাতিভেদ নাই, খাদ্য বিচার নাই; সুতরাং আহারাদি লইয়া জাতি ধ্বংসের সূত্রে দলাদলির কোন আশঙ্কা নাই। পার্থিব ব্যাপারের উন্নতিতে চীনারা হিন্দুগণ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আধ্যাত্মিক চিন্তায় আমাদিগের অপেক্ষা অনেক হীন।

২। সমাজ: বিবাহপ্রণালী—কোন কোন বিষয়ে আমাদিগের সঙ্গে চীনাদের বিবাহপ্রথার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়—যেমন বিবাহের সম্বন্ধ নির্ণয় ও পাত্রী নির্ব্বাচনে পিতা মাতার কর্ত্তৃত্ব থাকে, যিনি বিবাহ করিবেন, তাঁহার মতামতের প্রয়োজন হয় না। পিতা মাতা কালো, বোবা ও কুৎসিৎ পাত্রী দিলেও পুত্র তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য। সেই মত কন্যাকেও যে বরে পিতামাতা বিবাহ দিবেন তাহাতে তাহার আপত্তি করিবার শক্তি নাই। পাত্রী নির্ব্বাচিত হইলে, পত্র-করিবার পর, বিবাহের পূর্ব্বে, পাত্র মারা গেলে ঐ পাত্রীকে বিধবা বলিয়া গণ্য করা হয়। চীন দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা নাই, অথচ স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা বা অবগুণ্ঠন প্রথা নাই। যুবতীগণ অভিভাবকের অধীনে অশ্বারোহণে বা পদব্রজে যথাতথা যাইতে পারে, কিন্তু যুবতী কুমারীদের বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে গৃহমধ্যে অবরুদ্ধভাবে রাখা হয়। কন্যা বিবাহ দিয়া পণ গ্রহণের প্রথা আছে।

বিবাহের পত্র বা এগ্রিমেণ্ট অনেক সময় বালক বালিকাদিগের অল্প বয়সেই হয়। কিন্তু বিবাহ উভয়েই যৌবনে পদার্পণ না করিলে হয় না। পাত্রের অর্থ-সঙ্গতির অভাব হইলে কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিলেও কোন কোন সময় ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়।

বিবাহ ব্যাপার আমাদিগেরও যেমন ব্যয়সাপেক্ষ, ইহাদেরও সেইরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বিবাহ করিতে হইবে, অবিবাহিত থাকিবার উপায় নাই। যৌতুক দান ও লোকজন খাওয়াইতে অনেক অর্থ নষ্ট হয়। এ বিষয়ে ইউরোপীয় ও বর্ম্মানগণের বিবাহ পদ্ধতি ভাল, অল্প খরচে হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে অনেকে ঋণ করিয়া বিবাহ করে, চীন দেশেও সেইরূপ। একবার বিবাহ করিয়া তালাক দিবার বা ডাইভোর্স করিবার রীতি নাই, তবে যাহারা বহু বিবাহ করে তাহারা পরবর্ত্তি-স্ত্রীদিগকে অন্যের নিকট মূল্য গ্রহণ করিয়া বিক্রয় করিতে পারে। এই সকল স্ত্রীকে উপপত্নী স্বরূপ মনে করে। চীনদেশে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয় প্রথা আছে।

চীনাদের বিবাহে কন্যা তুলিয়া আনিয়া বরের বাড়ীতে বিবাহ হয়। বিবাহের দিন নানা বাদ্য বাজনা করিয়া কন্যার জন্য নানা প্রকার পরিচ্ছদ, মিষ্টান্ন, একটী বরাহ, কুক্কুট, হংস প্রভৃতি দ্রব্য, উপহার প্রেরিত হয়। তাহার পরে

সায়ংকালে বহু পতাকা উড়াইয়া বাদ্যাদি সহ একখানি উৎকৃষ্ট শিবিকা কন্যাকে আনিবার জন্য প্রেরিত হয়; এক বা একাধিক বয়ঃস্থা মহিলাও অপর শিবিকা-রোহণে প্রেরিত হয়। কন্যা উঠাইয়া দিবার সময় নানা স্ত্রী-আচার আছে। কন্যা বরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে বাটীর সদর দরজা হইতে কন্যা তুলিয়া আনিতে আরও অনেক স্ত্রী-আচার করিবার রীতি আছে। ইতিপূর্ব্বে বরের কক্ষ সজ্জিত থাকে। কন্যা উপস্থিত হইয়া বরের কক্ষে প্রবেশ করিলে, তথায় পরস্পর পরস্পরকে সুরা আদান প্রদান করত এবং স্ত্রীর স্বামীর প্রতি বশ্যতা স্বীকার স্বরূপ দুই একটা আচার ব্যবহার করার পর, বিবাহ হইয়া যায়। কন্যা দান ও মন্ত্র পাঠের জন্য কন্যাকর্ত্তা ও পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। রাত্রিযাপনের পর দিন কন্যা কুমারীত্বের চিহ্নস্বরূপ মাথার বেণী কর্ত্তন করিয়া ফেলিয়া স্বামিসহ গৃহদেবতাকে ও গুরুজনকে প্রণাম করে; এইরূপে বাসি বিবাহ সাঙ্গ হয়। তা'ও ধর্ম্মের পুরোহিত আসিয়া কিছু দৈবকার্য্য সম্পন্ন করেন।

চীনে বাল্য বিবাহ নাই, সচরাচর স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর বয়স দুই তিন বা ততোধিক বৎসর বেশী হইয়া থাকে। তাহার ফলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী শীঘ্রই বৃদ্ধ হইয়া পড়ে।

(২) আহার্য্য ও আহার প্রণালী—পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, চীনেরা এক জাতি, সুতরাং খাদ্য বিচার নাই। জগতে এমন কোন খাদ্য নাই যাহা চীনদেশের প্রায় কোন না কোন প্রদেশে ভক্ষিত হয় না। চীনাদের প্রধান আহার্য্য অন্ন এবং মাংস। বরাহ মাংসই চীনের সর্ব্বত্র নিত্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমাদিগের দেশে যেমন মৎস্য না হইলে এক বেলা আহারে রুচি হয় না, চীনদেশে তাদৃশ কোন প্রকার মাংস ব্যতীত চীনেরা এক বেলা আহার করিতে পারে না।

চীনারা ইউরোপীয়গণের মত টেবিলে আহার করে। তবে ইউরোপীয়গণ কাঁটা, চামচ ও প্লেটের সাহায্যে আহার করেন, চীনারা চীনা মাটীর বাটী ও একজোড়া শলাকার (Chop stick) সাহায্যে আহার করে। এক একটী টেবিলে, ছয় অথবা আটজন লোকের আহার করিবার রীতি। কোন নিমন্ত্রণে কার বাড়ী কত লোক খাইবে জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে "বিশ" কি ত্রিশ টেবল্

হইবে।" টেবিলের সংখ্যা দ্বারাই লোকের সংখ্যা নির্ণীত হয়। চীনাদের আহার-প্রণালী আমাদিগের আহার-প্রণালী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। আমাদিগের কোন নিমন্ত্রণে বাটীর আঙ্গিনায় কলার পাতা পাতিয়া লোক মাটীতে বসিয়া অঙ্গুলির সাহায্যে আহার করে। দই কি অম্বল খাইবার সময় মহা মুস্কিল। অঙ্গুলির দ্বারা পাতলা দই কি অম্বল তুলিয়া মুখে দেওয়া কষ্টকর। ইতিমধ্যে পাতা খানি হটাৎ ছিঁড়িয়া গেলে নিম্ন হইতে মাটী উঠিয়া খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া "মাটী খাওয়া" কার্য্যে পরিণত হয়। আমাদিগের কলার পাতায় খাওয়া আজকাল বিজ্ঞান-চর্চ্চার দিনে অতি আপত্তিজনক। এই প্রকার আহার-প্রণালী ও অন্যান্য কারণে ইউরোপীয়গণ ভারতবাসীদিগকে অসভ্য মনে করেন। কলার পাতা অচিরে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কাঁসার বা পিতলের থালায় আহার-প্রণালীও আজকাল বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। তাহার পরিবর্ত্তে চীনামাটীর বাসন চলিত হইলে খুব ভাল হয়। আমরা অঙ্গুলি দ্বারা আহার করি বলিয়া চীনারা আমাদিগকে বিদ্রূপ করে।

চীনাদিগের টেবিলের উপর একটী বাটী, এক জোড়া শলা (বাঁশের—হাতির দাঁতের বা রূপার), একখানি চামচ প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সজ্জিত থাকে। টেবিলের উপর আট কি দশখানা প্লেটে নানাবিধ ফলাদি সাজাইয়া রাখে। অনেক নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের কে কোন্ স্থানে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহার নিদর্শনস্বরূপ এক এক খানি করিয়া কাগজে তাঁহাদের নাম লেখা থাকে। সুতরাং কোথায় কে বসিবে, পাতা পাইলাম না, জল পাইলাম না বলিয়া একটা গণ্ডগোল হয় না। গৃহস্থ প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে অভি-বাদন করত নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিবার জন্য অনুরোধ করেন। সকলে আসন গ্রহণ করিলে এক এক টেবিলে একজন বা দুইজন করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিবেশক নিয়মমত আহার্য্য পরিবেশন করিতে থাকে। কোন গোলযোগ হয় না। একটুশব্দও শুনিতে পাওয়া যায় না। টেবিলের মধ্য ভাগে একটী গামলায় বা বড় বাটিতে করিয়া এক একটী ব্যঞ্জন রাখিয়া দেওয়া হয়, সকলে তাহা হইতে উক্ত শলাকা দ্বারা উত্তোলন করত মুখে দেন। ঝোল খাইতে হইলে চীনারা চীনে মাটির বা রৌপ্যের চামচ ব্যবহার করে। আহারাদির সময় চীন দেশে জল পান করিবার নিয়ম নাই। আমরা কিন্তু খাইবার সময় জল পান না করিলে

খাদ্য গলাধঃকরণ করিতে পারি না। প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তির নিকট এক একটী ক্ষুদ্র সুরা পাত্র থাকে, তাহাতে এক কি দেড় তোলার বেশী সুরা ধরে না। পুনঃ পুনঃ সুরা পানের অনুরোধে সকলকে অত্যধিক সুরা পান করিতে হয়। ইহা দ্বারা নেশা হইলেও আমাদিগের দেশের মাতালগণের মত ইহাদিগকে টলিয়া পথে ঘাটে পড়িতে বা নানারূপ কেলেঙ্কারী করিতে দেখি নাই। প্রত্যেক বাড়ীতেই প্রত্যেক টেবিলেই প্রতিদিন সুরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীনাদের অনেকে ভোজনে মাংসাদিই অধিক পরিমাণে আহার করে। ভাত অতি অল্পই খায়। কেবল মদ ও মাংসদ্বারা উদর পূর্ণ করে, চীনাদের আহার্য্যের মধ্যে Birdsnest soup সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। ইহার এক তোলার মূল্য ৪৷৫ টাকা। ব্রহ্মদেশের সমুদ্রের ধারে Swallow নামে এক প্রকার পাখী দেখা যায়। তাহারা পাথরের উপর আপন থু থু দ্বারা এই সকল বাসা নির্ম্মাণ করে। ইহা অতি বলকারক পথ্য। আহার শেষ হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ শলাকা দুইটী হাতে করিয়া গৃহস্থকে নমস্কার করিয়া আহার সমাপ্ত করেন। পরে এক এক পেয়ালা উত্তপ্ত সাদা চা অর্থাৎ চিনি ও দুধবর্জ্জিত চা পান করিয়া ও ধূম পান করত আহার কার্য্য শেষ করেন। সাহেবদিগের মত চীনারা আহারান্তে মুখ ধোয় না। অনেক চীনা আহার কালে মাঝে মাঝে ধূম্রপান করে।

(৩) অন্যান্য সামাজিকপ্রথা—জাতিভেদ না থাকিলেও চীনাদিগের মধ্যে ইউরোপীয় জাতি সকলের ন্যায় উচ্চশ্রেণী, মধ্যমশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী এইরূপ বিভাগ আছে। অর্থ-প্রতিপত্তিশালী রাজকর্ম্মচারিগণ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে গণ্য, ব্যবসায়ী ও ধনী শিল্পিগণ মধ্যমশ্রেণীভুক্ত এবং কৃষক ও মজুরগণ নিম্নশ্রেণী-ভুক্ত। প্রয়োজন হইলে নিম্ন শ্রেণীর কন্যাও উচ্চশ্রেণীর লোকে বিবাহ করিয়া থাকে। সামাজিক নিমন্ত্রণে নিম্নশ্রেণীর লোকে স্বতন্ত্র ঘরে আহার করে।

সৌজন্য ও আদব কায়দায় চীনাদিগের সমকক্ষ কোন জাতি নাই। এত Etiquette কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। কোন ভদ্র লোকের কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইলে কার্ড দ্বারা সাক্ষাৎ করিবার নিয়ম। সকল ভদ্রলোকেরই নিজের নিজের নামের কার্ড আছে। কোন আগন্তুক ভদ্রলোক অন্য কোন

ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইলে বাটীর সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে কার্ড খানি পাঠাইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। যাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, তিনি স্বয়ং নিজের কার্ড পাঠাইয়া আগন্তুক ভদ্রলোককে সংবাদ দেন যে তিনি অবিলম্বে যাইতেছেন। পরে নিজে গিয়া সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া, পরস্পর অভিবাদন করত আগন্তুককে সাদরে আহ্বান করিতে থাকেন। প্রথমতঃ পরস্পর পরস্পরকে অগ্রে যাইতে অনুরোধ করার পর আগন্তুককেই বাধ্য হইয়া অগ্রে যাইতে হয়। পরে বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলে, গৃহস্থ আগন্তুককে আসন গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আগন্তুকও গৃহস্বামীকে অগ্রে বসিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু কেহই আগে বসেন না। এইভাবে শিষ্টাচার করিতে করিতে কতকটা সময় যায়। অতঃপর কেহই যখন অগ্রে উপবেশন করেন না, তখন উভয়েই অবনত হইতে হইতে একযোগে বসিয়া পড়েন। অতঃপর ভৃত্য দুই পেয়ালা চা আনিলে গৃহস্বামী স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া এক পেয়ালা চা লইয়া অতি বিনীতভাবে আগন্তুকের হস্তে দিলে, তিনি স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া অভিবাদন করত চার পেয়ালাটী হাতে গ্রহণ করেন। আবার চা একটু ঠাণ্ডা হইলে, পেয়ালাটী মুখে তুলিবার সময় আবার পরস্পরকে পরস্পর চা-পানের অনুরোধ করিয়া পান কার্য্য শেষ করেন। আগন্তুক যদি কোন বিশেষ গুণবিশিষ্ট হন তাহা হইলে গৃহস্বামী তাঁহাকে শতমুখে প্রশংসা করেন। প্রশংসা করিতে করিতে বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি সটান করিয়া তাঁহাকে দেখান। আরও বেশী প্রশংসা করিতে হইলে দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একযোগে সটান করিয়া দেখান। ভাষায় যে কথা প্রকাশ করা না যায়, এই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলে তাহা প্রকাশ পায় অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রশংসা হইতে পারে না। আমাদিগের দেশে এই প্রকার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলে বিষম অনর্থ ঘটে। কিন্তু চীনাদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলে তাহারা বড় খুসী হয়। চীনাদিগের জন্মদিন উপলক্ষে তাহারা বন্ধু বান্ধবগণকে কার্ড পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং বন্ধু বান্ধবগণও নানাপ্রকার উপহার কার্ডসহ প্রেরণ করেন। এই প্রথা আমাদিগের নাই; কিন্তু ইহা ইউরোপীয়দিগের মত। কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা রাজকর্ম্মচারী যদি একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করেন বা অন্যস্থান হইতে আসেন, তাহা হইলে সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোককে কার্ড পাঠাইয়া নমস্কার প্রেরণ করেন।

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্থানান্তরে গমনকালে সহরের বা গ্রামের লোকের তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া অনেকটা দূর আগাইয়া দিবার রীতি, এবং কোন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক বা কর্ম্মচারী অন্যস্থান হইতে আসিবার কালে তাঁহাকে অগ্রসর হইয়া লইয়া আসিবার রীতি আছে, তাহা না হইলে অসৌজন্য প্রকাশ পায়।

মলত্যাগের সময় চীনারা সাহেবদিগের মত কাগজ ব্যবহার করে, জল ব্যবহার করে না। চীন দেশে চীনারা কচিৎ স্নান করে। এ দেশে একটা প্রবাদ আছে যে, চীনারা জীবনে তিন দিন স্নান করে—জন্মদিনে এক দিন, বিবাহের দিন এবং মৃত্যুকালে একদিন। তবে প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটী বেসিনে গরম জল লইয়া সাবান দ্বারা হাত ও মুখমস্তক ধুইয়া গামছা দ্বারা মুছিয়া ফেলে, এই তাহাদের স্নান। এক চীন জাতি ছাড়া এসিয়া খণ্ডে অন্য কোন জাতির চেয়ার টেবিল প্রভৃতি আসবাব ছিল না। চীনাদিগের বৈঠকখানা মূল্যবান চেয়ারে সজ্জিত, টেবিলও বেশ মুল্যব্যন সোনালী রং দ্বারা ভূষিত। চীনাদিগের বৈঠকখানার সম্মুখে মূল্যবান ফুলের টব সকল সজ্জিত থাকে। গৃহ মধ্যে নানা ধর্ম্ম-কথাযুক্ত নানাপ্রকার পট ঝুলান থাকে। আমাদিগের আসবাবের মধ্যে পিঁড়ি জল চৌকি ও তক্তপোষ খাট, ও ফরাষের বিছানা, তাহাতে দুই একটী তাকিয়া থাকে। চীনাদিগের চেয়ার টেবিল ছাড়া খুব সম্মানসূচক আসনও আছে। তাহা এই—একখানা তক্তপোষের উপর মধ্য স্থানে এক খানি একফুট উচ্চ, তিনফুট লম্বা ও দেড় ফুট প্রশস্ত টেবল থাকে। তাহার দুই পার্শ্বে দুই লাল রঙের বনাতের দ্বারা প্রস্তুত করা ছোট গদি এবং তাহার প্রান্তে দুইটী লাল রঙের তাকিয়া থাকে। যাহাকে বেশী সম্মান দেখাইতে হইবে, তাহাকে সেই আসনের বামদিকে বসাইতে হইবে এবং গৃহস্থ দক্ষিণ দিকে বসিবেন, কারণ বামহস্ত চীন দেশে পবিত্র, বাম দিকও সম্মানসূচক। দক্ষিণ হস্ত অপবিত্র, কারণ ডাইন হাত দ্বারা নানা ময়লা দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়। আমাদিগের সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় চীনজাতি হিন্দুগণ অপেক্ষা হীন। সাধারণ লোকের গৃহ গুলি অতি অপরিষ্কার। চীনারা যে ঘরে বাস করে তাহাতে থু থু ফেলিয়া কক্ষটি অতি অপরিষ্কার করিয়া রাখে। ঘরের মেজে কাঠের বা মাটির হইলেও তাহা কখনও ধুইয়া পরিষ্কার করিবার রীতি নাই। স্নান না করার

গায়ে ময়লা আটিয়া থাকে, এবং অধিকাংশ লোকের গাত্র খুজলী প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগে ভরা। তবে দিন রাত্রি গায়ে জামা থাকায় তাহা সহসা দৃষ্টি-গোচর হয় না। আমাদিগের অপেক্ষা চীনারা আমীর ও খুব বিলাসী। তাহাদের পরিচ্ছদ আমাদের পরিচ্ছদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ অতিহীন ও বর্ত্তমান সভ্যতাবিরুদ্ধ। এ বিষয়ে চীন বহু অগ্রসর। ইউরোপীয়গণের নীচেই চীনারা।

৩। শিক্ষা ও নীতি—সাধারণ শিক্ষায় সমগ্র চীনদেশ আমাদিগের দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রতি পল্লীতে অন্ততঃ একটী করিয়া বিদ্যালয় আছে। কোন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে তিন চারিটি স্কুলও আছে। বর্ত্তমানকালে নূতন ধরণে শিক্ষা প্রচলিত হইয়া সমগ্র চীনদেশকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা পূর্ব্বে আদৌ ছিল না, এখন সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। বয়ঃস্থা বিবাহিতা স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত স্কুলে গিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকে। চীনদেশে লেখাপড়ার চর্চ্চা এত অধিক যে নিরক্ষরের সংখ্যা অতি কম। চীনদেশে ইউনিভার্সিটী বহু প্রাচীনকাল হইতে আছে। পেকিন গেজেট নামক সরকারি কাগজ প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন। ইহা যখন স্থাপিত হয়, তখন পৃথিবীর কুত্রাপি কোন সংবাদপত্র ছিল না। পরীক্ষা দ্বারা এণ্ট্রাস, এফ এ, বি, এ, এম, এ প্রভৃতি পরীক্ষার সমান ডিগ্রি প্রদত্ত হইয়া থাকে। পেকিনে পরীক্ষার কেন্দ্রস্থল। তথায় ইনভারর্সিটী হল আছে। চীন দেশে যেখানেই যাওয়া যায়, তথায়ই প্রস্তর-ফলকে, কাষ্ঠ-ফলকে, প্রাচীর-গাত্রে, সমাধিস্তম্ভে, গৃহ মধ্যে, দোকানে সর্ব্বত্রই চীনাভাষায় লিখিত নানা ধর্ম্মকথা বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা থাকে। এইপ্রকার সর্ব্বত্র লেখাপড়ার ছড়াছড়ির এক কারণ আছে। চীনা ভাষায় alphabet নাই। বর্ণবিন্যাস-প্রথা নাই, ব্যাকরণ নাই। এক একটী অক্ষর এক একটী শব্দ। সেই সকল স্মরণ করিতে তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কের প্রয়োজন। চীন ভাষায় বহু সহস্র অক্ষর আছে। কেহ কেহ বলে ৪০।৫০ হাজার অক্ষর চীন ভাষায় দৃষ্ট হয়। চীন দেশে এমন কোন পণ্ডিত নাই, যিনি এই সমস্ত অক্ষর জানেন। শুনাযায় দশ বার হাজার বা ত্রিশ হাজারের বেশী কেহ জানেন না। এই কারণে সর্ব্বত্র বড় বড় অক্ষরে লিখিত ধর্ম্ম-কথাযুক্ত সকল বিবরণ দৃষ্টিগোচর হইলে অপরিচিত অক্ষরগুলি শিখিবার ও স্মরণ করিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

চীনাদিগের নৈতিক চরিত্র আমাদিগের অপেক্ষা উন্নত নহে। চীনারা অনর্থক সর্ব্বদাই মিথ্যা কথা বলে। তবে সম্ভ্রান্ত মহাজনগণ ব্যবসায়ে ততদূর মিথ্যা বলে না। সচরাচর চীনারা এত মিথ্যা বলে যে, সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। চীনারা সর্ব্বদাই কুৎসিৎ ভাষায় পরস্পর পরস্পরকে গালি দেয়। আমাদের কাণে কিন্তু অসহ্য। চুরি, দস্যুতা, প্রতারণা এদেশে অত্যন্ত অধিক। চুরির শাস্তি এত তাহা কঠোর যে চোরকে ধরিতে পারিলে তাহার দুইটী কাণ কাটিয়া দেয়।

কৃষি ও শিল্প—চীনারা উৎকৃষ্ট কৃষক। আমাদিগের দেশের কৃষক হইতে ইহাদের কৃষি কার্য্যে বুদ্ধি ও কৌশল বেশী। ইহাদের ক্ষেত্রে জল সেচনের প্রণালী ও ইরিগেসন প্রথা চমৎকার। গবর্ণমেণ্ট ইহাদের কোন সহায়তা করেন না। প্রজামণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় ও একতায় ক্ষেত্রে খাল খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ, প্রস্তরের সেতু নির্ম্মাণ কার্য্য চীন দেশের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রে জল আনিবার প্রণালী চমৎকার। প্রয়োজন হইলে নদীর জল চালিত করিয়া ক্ষেত্রে আনে। ক্ষুদ্র নদী সকল এই সময় কিছু কালের জন্য এই কারণে জলশূন্য হয়। পর্ব্বতের গাত্র কাটিয়া চীনারা থিয়েটারের গ্যালারির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক এক খণ্ড জমি থাকে থাকে উপর হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া, পর্ব্বতের গাত্র বেষ্টন করিয়া পরিখা কাটিয়া তাহার দ্বারা ঝরণার জল আনাইয়া ক্ষেত্রে পাতিত করায়। উপরস্থ ক্ষেত্র জলে ভরিয়া সিক্ত হইলে নিম্নে পতিত হয়; সমস্ত ক্ষেত্র ভরিয়া উঠিলে সেই জলের মধ্যে চাষ করে। নানা প্রকার সার, মনুষ্যের মল-মূত্র, আগাছাসকল ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলে। আগাছাসকল পচিয়া সার হয়। মনুষ্য-মল যখন ক্ষেত্রে ও বাগানে ঢালে তখন পথ ঘাটে চলিতে বড় কষ্ট হয়। নাক বন্ধ না করিয়া চলা কষ্টকর। তরকারির বাগানের মধ্যে একটী করিয়া পাকা ক্ষুদ্র চৌবাচ্চা থাকে। পায়খানার মল ভারে ভারে কিনিয়া আনিয়া সেই চৌবাচ্চায় ঢালে। এক এক ভার মল পাঁচ ছয় আনায় বিক্রীত হয়। মূত্র সংগ্রহের জন্য কৃষকগণ হাটের মধ্যে গামলা রাখিয়া দেয়, যত লোক হাটে যায়, তাহারা সেই সকল পাত্রে মূত্র ত্যাগ করে। কৃষকগণ তাহা লইয়া উক্ত চৌবাচ্চায় কাঠের হাতা দ্বারা মল মূত্র ঘাঁটিয়া চতুর্দ্দিকে গন্ধে আমোদিত করিয়া তোলে। পরে হাতায় করিয়া তরকারির গাছের গোড়ায় ঢালে। চীনারা বলে যে মল মূত্র না দিলে তরকারি ও ফসলাদি

ভাল জন্মে না। চীন দেশে যেমন ও যত বড় তরকারি জন্মে অন্য দেশে তেমন দেখি নাই। চীনারা যে প্রসিদ্ধ শিল্পী তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তাহাদের অনেক বিষয়ে মৌলিকত্ব আছে। চীনা মাটির দ্রব্য তাহাদের মৌলিকত্বের প্রমাণ। চীনদেশীয় পট্টবস্ত্র জগতে প্রসিদ্ধ। চীনাদিগের মত ব্যবসায়বুদ্ধি অল্প লোকেরই আছে। ইউরোপীয় জাতিসকলের নিম্নেই চীনারা। অবশ্য বর্ত্তমানে জাপানীরা চীনাদিগকে অতিক্রম করিয়াছে। ইহাদের বাণিজ্য বিষয়ে স্বদেশে ও বিদেশে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সভাসমিতি আছে। তাহা দ্বারা ব্যবসায় কার্য্য চালিত হয়। গুপ্ত সমিতি দ্বারা সমগ্র চীনদেশের রাজনৈতিক ও অনেক সামাজিক ও নৈতিক কার্য্য সকল পরিচালিত হইয়া থাকে। এবিষয়ে আমাদিগের দেশ কত হীন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে দেশে দশজন একত্র হইয়া একটী কার্য্যের প্রস্তাব করিলে দশ মত হয়, সে দেশের কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মূল কথা, এক ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক চিন্তা ভিন্ন এবং কোন কোন নীতিমূলক আচার ব্যবহার ভিন্ন চীনারা হিন্দুজাতি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

শ্রীরাধালাল সরকার।

৺মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ।

আমরা অতীব শোকার্ত্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, সাহিত্য-সভার পরম হিতৈষী বন্ধু—অন্যতম সহ-সভাপতি মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর বি, এ, সাহিত্য-সভাকে, আত্মীয় স্বজনগণকে, বঙ্গবাসীদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, গত ১৬ই আশ্বিন অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। গত ৩২শে আষাঢ় সাহিত্য-সভার, ১৭শ বার্ষিক ২য় মাসিক অধিবেশনে মহারাজ কুমুদচন্দ্র, সভাপতির কার্য্য সমাপনের পর বলেন, "আমি বাণীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য এতদিন সাহিত্য-সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম। দুর্ব্বিষহ রোগে আমাকে এদেশ ছাড়িয়া যাইতে হইল, কিন্তু সাহিত্য-সভার সহিত আমার সম্বন্ধ চিরকালই

অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আপনারা আমার সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।" মহারাজের এই উক্তি শ্রবণে তখন সভাস্থ সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু হায়! তখন কেহই ভাবেন নাই যে, মহারাজের এই বিদায়বাণীই শেষ বিদায়বাণীতে পরিণত হইবে। সাহিত্য-সভা, স্বর্গীয় মহারাজের নিকট নানা বিষয়ে ঋণী। মহারাজের অকালে স্বর্গারোহণে সাহিত্য-সভার যে বিশেষ ক্ষতি হইল, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। আমরা অদ্য নিম্নে মহারাজ কুমুদচন্দ্রের আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করিলাম। ভবিষ্যতে বিস্তৃত সমালোচনার ইচ্ছা রহিল।

মহারাজ কুমুদচন্দ্র ১২৭৩ সালে, ১৮ই আষাঢ়, রবিবার (1866, June) ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সুসঙ্গ দুর্গাপুরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে দুর্গাপুর উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন, পরে এই স্কুল স্থায়ী না হওয়ায় অধ্যয়ন সমাপ্তির জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। তথায় যথাক্রমে এণ্ট্রেন্স, এফ,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে তদানীন্তন বিকোর্সে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর তিনি এম, এ, ও আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার পিতা ৺মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের পীড়ার সংবাদ পাইয়া স্বদেশে গমন করেন। বাটী যাইবার কিছুকাল পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, সুতরাং বাধ্য হইয়াই এম, এ, ও আইন পরীক্ষা দিবার বলবতী বাসনা পরিত্যাগ করেন। তিনি কলেজে সংস্কৃত পড়েন নাই, কিন্তু শৈশবাবধি সংস্কৃত ভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকায় বাড়ীতে আসিয়া স্বচেষ্টায় সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার এই অদ্ভুত অধ্যবসায়ের ফলে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে এতদূর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি অনায়াসে সংস্কৃত ভাষায় আলাপাদি ও বক্তৃতা করিতে পারিতেন এবং কাব্য, দর্শন, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, সঙ্গীত শাস্ত্র প্রভৃতিতে পারদর্শী হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে যে কোন নূতন সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা আনাইয়া পাঠ করিতেন। কতিপয় বৎসর হইল, মহারাজ বাহাদুর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সবিশেষ অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং মহাকবি ভাসের নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ সমূহ সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিয়া মনীষী পণ্ডিতগণের সহিত তদ্বিষয়ে সবিশেষ

আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি পালকাপ্য-প্রণীত সুবৃহৎ 'হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ' গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন (এই গ্রন্থ বিষয়ে তাঁহার অভিমত সাহিত্য-সংহিতায় হস্তী-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)। তিনি যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেক বৃহৎ পুস্তকালয়েও বিরল।

বঙ্গ-সাহিত্যকে তিনি যে কেবল প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এমন নহে, পরন্তু যথোপযুক্তরূপে তাহার সেবা করিতেন এবং সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গলারও তিনি একজন প্রকৃত সাধক ছিলেন (আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের গতিবিধি সম্বন্ধে মহারাজ বাহাদুরের অভিমত ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে তাঁহার বক্তৃতা দ্রষ্টব্য)। বঙ্গভাষায় গোজাতি, হস্তী ও নানাজাতীয় পক্ষী সম্বন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ যে সমস্ত প্রবন্ধ 'সাহিত্য-সংহিতা,' 'আরতি' 'সৌরভ' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে 'দুগ্ধ' 'হস্তী-প্রসঙ্গ' "প্রাচীন ভারতের পশু চিকিৎসা" "প্রাচীন ভারতের চতুঃষষ্টি-কলাবিদ্যা" প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ৺কালীঘাটের ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীতে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা এবং কলিকাতা-সাহিত্য-সম্মিলনে 'প্রাচীনভারতের পুষ্পকরণ' সম্বন্ধে তাঁহার পঠিত প্রবন্ধ গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

পেন্সিল দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বেশ সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন। চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। সঙ্গীত চর্চ্চায় তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তিনি নিজেও বেহালা, বাঁশী ও হারমোনিয়মে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

স্বর্গীয় মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর ১৮৬৫ খৃঃ 'রাজা বাহাদুর' ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারি দিল্লী দরবার উপলক্ষে 'মহারাজ' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং উল্লিখিত উপাধি ১৮৮৪ খৃঃ Hereditary অর্থাৎ বংশানুক্রমিক হয়। মহারাজ কুমুদচন্দ্র তদনুসারে ১২৯৭ বাঙ্গলা সনের ১৭ই পৌষ বুধবার, মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মহারাজ হন। মহারাজ রাজকৃষ্ণের জীবিতাবস্থায়ই মহামান্য সদাশয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সশস্ত্র ১০০ শত শরীর-রক্ষী সৈন্য রাখিবার অধিকার প্রদান করেন। মহারাজ কুমুদচন্দ্র

এই সম্মান অব্যাহত ভাবে ভোগ করিয়া গিয়াছেন এবং এই সম্মান অদ্যাপি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার খুল্ল-পিতামহ ও পিতৃব্যগণ ভোগ করিতেছেন। মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরকে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে হইত না, গভর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া এই সম্মান ও Right of Private entry (সাধারণের অব্যবহার্য্য দ্বার দিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ) ১৯১৩ খৃঃ হইতে মহারাজ কুমুদচন্দ্রকে বংশানুক্রমে ভোগ করিবার অধিকার প্রদান করেন। মহারাজ কুমুদচন্দ্র, মহামান্য ভারতেশ্বরের ভারতে আগমন উপলক্ষে দিল্লীতে যে অতি বৃহৎ দরবার হইয়াছিল, তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু বালিকাদের শিক্ষা পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করিবার জন্য মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, মহারাজ কুমুদচন্দ্র এতদুভয়েরই একজন সদস্য ছিলেন। লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর ও অন্যান্য বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং অকৃত্রিম বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর, লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ কালে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে ভারতের প্রাচীন রীতি নীতি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত Imperial war relief fund, Bengal Branch এর অন্যতম সদস্য রূপে মহারাজ বাহাদুর মনোনীত হইয়াছিলেন।

বারেন্দ্র কুলীনসমাজ ৮টি বিভিন্ন পঠিতে বিভক্ত ছিল, সুসঙ্গের রাজবংশ এই আট পঠির নায়ক। এই সম্মান অন্য কাহারও নাই এবং ইহা সুসঙ্গের রাজবংশ বহু পুরুষাবধি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ কুমুদচন্দ্র এই বিভিন্ন ৮ পঠির মিলন সাধন করেন। ৺কালীঘাটে ১৩২০ বাঙ্গলা সনে যে প্রথম ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল, মহারাজ কুমুদচন্দ্র তাহার সর্ব্ব প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি 'ব্রাহ্মণ-সভা', কলিকাতাস্থ ময়মনসিংহ ছাত্র-সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন এবং কিছু কালের নিমিত্ত

'সাহিত্য-সভার' সভাপতি এবং বহু বর্ষকাল উহার সহ-সভাপতি ছিলেন। ময়মনসিংহে বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল, মহারাজ কুমুদচন্দ্র তাহারও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। এতদ্ভিন্ন 'Calcutta Old club,' 'Calcutta Literary Society,' '৺মহাকালী পাঠশালা' 'সৎসঙ্গ' প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে তিনি সভাপতি ও সভ্যরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে পঞ্জিকা-সংস্কার বিষয়ে তাঁহার অত্যধিক আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল এবং তাঁহারই যত্নে ব্রাহ্মণসভা সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রজাবৎসল মহারাজ কুমুদচন্দ্র, প্রভূত ভোগ বিলাস ও বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইলেও কোন দিনই ভোগ বিলাস বা বিষয়াসক্ত ছিলেন না পরন্তু বিষয় কার্য্যে কোন দিনই অনুরাগ বা স্পৃহা প্রদর্শন না করিলেও প্রজার আর্ত্তনাদে তাঁহার কোমল হৃদয় বিচলিত হইত; এমন কি মৃত্যুর সপ্তাহকাল পূর্ব্বেও যখন প্রজাবৃন্দ ও অমাত্যবর্গ মহারাজ কুমুদচন্দ্রের রোগ মুক্তি কামনায় দুই দিন অহোরাত্র হরিসংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন সেই সংবাদ শুনিতে পাইয়া তাঁহার শুভানুধ্যায়ী প্রজাবৃন্দ ও আমাত্যবর্গকে দর্শন অভিলাষে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন তিনি শয্যাশায়ী ও উত্থানশক্তিরহিত সুতরাং তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতে না পারিয়া, অশ্রুপাত করেন ও অবশেষে অধীর হইয়া নিম্নলিখিত কতিপয় ছত্রে তাঁহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করেন:—

"সমবেত প্রিয় অমাত্যবর্গ ও প্রজাবৃন্দ! আমার পীড়ার সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত ও চিন্তিত হইয়া আপনারা সকলে, আমার অচিরে রোগমুক্তি কামনায় ভগবচ্চরণে যে প্রার্থনা জানাইতেছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার ফল শীঘ্রই ফলিবে এবং অল্পকাল মধ্যেই আমি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে সমর্থ হইব। আজ আমি উত্থানশক্তি-রহিত, হৃদয়ের প্রবলভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, সুতরাং বাধ্য হইয়াই আমার হৃদ্গত সামান্য দুই একটি ভাব লিখিয়া দিলাম এবং তাহা আপনাদিগের নিকট পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইবার নিমিত্ত আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ অনুজ শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র সিংহকে পাঠাইলাম। জানিনা জন্মান্তর কি ইহজন্মকৃত কোন্ দুষ্কৃতির ফলে আজ আমাকে রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে

হইতেছে। এ সংসারে কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। গগনস্পর্শি প্রাসাদবাসী হইতে পর্ণাম্বুভোজী দীন কুটীরবাসী পর্য্যন্ত কাহারও কর্ম্মফলের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী শতৈরপি"। নিশ্চয়ই কোন পাপের ফলেই আজ আমাকে এই দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। আপনাদের নিকট জ্ঞানতঃ কিম্বা অজ্ঞানতঃ যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা ক্ষমা করিবেন। আমার আর বেশী লিখিবার ক্ষমতা নাই, ভরসা করি আপনাদের প্রার্থনায় ভগবান কর্ণপাত করিবেন এবং আমিও শীঘ্র আরোগ্য লাভপূর্ব্বক আপনাদের সকলের নয়নপথবর্ত্তী হইয়া জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হইব। ইতি ১০ই আশ্বিন মঙ্গলবার (১৩২৩)।"

স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের Life is duty জীবন কর্ত্তব্যময় ইহাই তাঁহার প্রবাদবাক্য ছিল তিনি এই প্রবাদবাক্য জীবনে কতটুকু অনুসরণ করিয়াছিলেন, সুধীগণ তাঁহার জীবনী সুন্দররূপে পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। তিনি অত্যন্ত সরল ও উন্নতহৃদয়, উদারপ্রকৃতি, স্বধর্ম্মানুরাগী, শিষ্টাচারসম্পন্ন, বিনয়ী ও সদালাপী ছিলেন এবং স্ত্রীজাতিকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল ও তাঁহার হৃদয় পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার ন্যায় বালকসুলভ সরলতা বর্ত্তমান কালে কচিৎ দৃষ্ট হয়। সাহিত্যচর্চ্চায় নানাবিধ শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গেই তিনি কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব এতদূর প্রবল ছিল যে, আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যখন তাঁহাকে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে বলা হইল, তখন অতি কষ্টে হাত জোড় করিয়া স্পষ্টভাবে কতকবার "দুর্গা" নাম উচ্চারণ করেন ও জড়িতকণ্ঠে একটি স্তোত্র পাঠ করেন।

মৃত্যুর দিন সন্ধ্যার সময় যখন করাল কাল তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখনও তিনি অসহ্য রোগ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া, সুসঙ্গনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ তর্ক-সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়কে সন্নিকটে বসাইয়া ৺বটুক ভৈরব স্তোত্র পাঠ করিতে বলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠ বিজড়িত ও তিনি মুহুর্ম্মুহু মোহে আক্রান্ত হইতেছিলেন ও সুদীর্ঘ শ্বাস তাঁহার আসন্ন মৃত্যু জ্ঞাপন করিতে-

ছিল, সেই অবস্থায় ক্ষণকাল সংজ্ঞা লাভ করিয়া, পণ্ডিত প্রবরের সহিত সাগ্রহে অর্দ্ধ স্ফুটিত স্বরে স্তব পাঠ করিয়াছিলেন।

আসন্নকালে তাঁহার প্রবল ধর্ম্মভাবের কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় নাই, মহারাজ বাহাদুর তদীয় খুল্লতাত-অগ্রজ ভ্রাতাকে তখন ডাকিয়া বলেন যে, "আপনারা দেখিবেন যে ঔষধ রূপেও যেন আমাকে কোন অখাদ্য না দেওয়া হয়" এইরূপ কথাটীই তাঁহার হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত সদাচার পালনের বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি যে কেবল প্রবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন এমন নহে, তাঁহার লিখিত অপ্রকাশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাও বর্ত্তমান আছে।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহে Minor (মধ্য ইংরাজী) পরীক্ষাপ্রার্থী জমিদারবর্গকে পৃথক আসনে বসিতে দেওয়া হইত। মহারাজ বাহাদুর Minor পরীক্ষা দিতে যাইয়া পৃথক ভাবে বসিতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে একত্রে বসিয়া পরীক্ষা দেন এবং তদবধি উল্লিখিত বিভিন্ন আসনে উপবেশনের প্রথা লুপ্ত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনার সময় যখন কমিটি জমিদারবর্গের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন, তখন স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরও এই প্রথার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন।

দেশের জিনিষকে আন্তরিক ভালবাসা, দেশের পুরাতন আদর্শ গুলিকে প্রীতির চক্ষে দেখা এবং সেই গুলিতে একটা আমোদ ও প্রকৃত মাধুর্য্য অনুভব করা ও সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ গুলিকে দেশের 'খাঁটি' জিনিষ বলিয়া ধারণা রাখা ও তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তাঁহার একটী লোভনীয় বস্তু ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে এই ভাবে তিনি একজন খাঁটি দেশহিতৈষী ছিলেন। দামোদরের বন্যায় যখন বর্দ্ধমানবাসী নিরাশ্রয় হইয়াছিল, স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর সর্ব্বপ্রথমে সেই সংবাদ পাইয়া, শ্রীযুক্ত মাননীয় স্যার মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সম্মানার্থ আহূত সভায় বর্দ্ধমানবাসী দিগের দুর্দ্দশার অবসানকল্পে নানারূপ অনুষ্ঠান করিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

৺বৃন্দাবন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থলে পশুহত্যা-নিবারণ জন্য মাননীয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের নিকট আবেদন করিবার জন্য কলিকাতায় ৺মদনমোহন তলায় যে সভা আহূত হইয়াছিল, সেইখানে তিনি সকরুণ ভাষায় যে বক্তৃতা

দিয়াছিলেন তাহাতে অনেককেই অশ্রুপাত করিতে হইয়াছিল এবং সেইদিন উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ প্রকৃতই তাঁহার দেবভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

তিনি বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায়ই বিজ্ঞান-আলোচনা করিতেন। এবং বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে সমধিক চেষ্টা না করায় ও শৈশবাবধি ব্যাকরণ আয়ত্ত না করিয়া সংস্কৃত পড়ায় সময়ে সময়ে আক্ষেপ করিতেন।

তিনি ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ ফণ্ড, দামোদর রিলিফ ফণ্ড, বেঙ্গল এম্বুলেন্স্ কোর, ইম্পিরিয়েল রিলিফ ফণ্ড ও অন্যান্য অনেক সদনুষ্ঠানে অনেক অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

যদিও স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর রাজনীতিক আলোচনায় অতি অল্পই যোগদান করিয়াছেন, তথাপি রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল এবং এবং কলিকাতা-স্বদেশী-প্রদর্শনীতে (Exhibition) সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া দেশের শিল্পাদির উন্নতি লক্ষ্য করিয়া আনান্দিত হইতেন। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর যখন ময়মনসিংহে গমন করিয়াছিলেন, তখন ময়মনসিংহে বঙ্গবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিবার জন্য যে মহতী সভা আহুত হয়, মহারাজ বাহাদুর তাহার সভাপতিরূপে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন এবং গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলা বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া মাননীয় লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর ময়মনসিংহে যে Round table conference আহ্বান করেন, স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর তাহার সভ্যরূপে ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন এবং পক্ষান্তরে জেলার বিভিন্ন স্থান-গুলিতে Railway বিস্তার করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

মহারাজ বাহাদুর স্বচেষ্টায় ও নিজ পরিশ্রমে সুসঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যিক রাজা রাজসিংহের প্রণীত অপূর্ব্ব 'ভারতী মঙ্গলকাব্য' গ্রন্থখানি সাহিত্যসংহিতায় প্রকাশ করেন।

পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতিকে শিক্ষা প্রদান করিবার মানসে ও অন্যান্য কার্য্যবশতঃ তিনি জীবনের শেষাংশের অধিকাংশ সময় কলিকাতায় অতিবাহিত করিতেন। তথায় অবস্থান-কালে দেশহিতকর প্রায় সকল অনুষ্ঠানেই যোগদান

করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল বিদেশে অবস্থানের পরে বিগত ভাদ্র মাসে দেশবাসী প্রজাবৃন্দ অমাত্যবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। বাড়ী আগমনের ৪।৫ দিন পরেই জ্বরাক্রান্ত হন, এই অসুস্থতাই তাঁহার কালস্বরূপ হইল। প্রায় ৬।৭ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং সেই দারুণ পীড়াতেই তাঁহার শরীরের অবস্থাও ক্রমশঃ খারাপ হইতেছিল। বাড়ী আসিয়াই যে জ্বরাক্রান্ত হন, ক্রমে তাহার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল ও নানা উপসর্গের সঙ্গে অবশেষে—uremiaর লক্ষণ সমূহ স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। সকলে বুঝিতে পারিল সুসঙ্গের মুকুটমণি চিরতরে অস্তমিত হইবে। প্রজাবৃন্দের, আত্মীয় স্বজনের সমস্ত আকুল প্রার্থনা শেষ হইল। দেখিতে দেখিতে ১৬ই আশ্বিন কাল নিশা আসিয়া সমুপস্থিত হইল। মহামায়ার বোধন আরম্ভ হইল, জগজ্জননী নিদ্রোত্থিতা হইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয় সন্তান কুমুদচন্দ্র তাঁহারই ক্রোড়ে স্থান লাভ করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, বোধনের অব্যবহিত পরেই ১৬ই আশ্বিন সোমবার রাত্রি প্রায় ১০½ ঘটিকার সময় শান্তিরূপিণী মহামায়া তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে সন্তানকে আশ্রয় দান করিলেন। ১৬ই আশ্বিনের রজনী অবসানের সঙ্গে কুমুদচন্দ্রের চিতানল সোমেশ্বরীতীরে নির্ব্বাপিত হইল। সব ছাই হইয়া গেল, সুসঙ্গের আশাভরসা যশঃ গৌরব কুমুদচন্দ্রের সহিত তিরোহিত হইল!

স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের বৃদ্ধা জননী ও ভার্য্যা এখনও বর্ত্তমান। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে আই, এ, শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া পিতৃপথানুসরণ করিতে সমর্থ হউন, ভগবানের নিকট আমাদিগের ইহাই প্রার্থনা।

শ্রী •—

সুসঙ্গাধিপতির স্বর্গারোহণে—

বাগীশ্বরী-বরপুত্র কমলার প্রিয়
'কুমুদ' মুদিল আজ ছড়ায়ে সৌরভ
সুখরিত খ্যাতি যার বঙ্গের গৌরব
সেই রত্ন বাঁধি নিল দেব-উত্তরীয়,
ত্যক্ত দেখি তা'রা—যা'রা কেবলি নিষ্ক্রিয়
কালরূপী মহাকাল ভূতেশ ভৈরব
সিদ্ধহস্ত ফিরিছেন হরিতে বৈভব
কেন হেন ? বোঝেনাক মোর জ্ঞানেন্দ্রিয়
রত্নময় বঙ্গহৃদি-ময়ূর আসনে
কত মুক্তা কত মণিমাণিক্যের ভার
একে একে খসিতেছে কালের শাসনে !
আজি যে খসিল হীরা কিবা জ্যোতিঃ তার
অশ্রুপূর্ণ আঁখি মোর নীরব ভাষণে
'কুমুদ' ছিল না সে যে শতদল-হার !

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বানুসারে মানবের স্বাভাবিক আহার বিচার।

প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপরম্পরার দিকে উত্তরোত্তর অধিকতর মনোনিবেশ হইতেছে, এবং সভ্যজন সভ্যতার উচ্চতমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যে দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক অশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকেন তাহার অধিকাংশ যে যথার্থই উচ্চতমাবস্থাসম্ভব বিলাসিতা বা অস্বাভাবিক আচার-জনিত বিষয়ে ধারণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে ইহা বর্ত্তমানকালীন জ্ঞানোন্নতির বিশেষ পরিচায়ক।

বিগত কতিপয় শতাব্দীতে জনসমাজে অদ্ভুত উন্নতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও মানব জাতির বাহ্যিক এবং মানসিক অবনতি হওয়াতে সপ্রমাণ হইতেছে যে সভ্যতা উৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ এবং শুভকারিণী হইলেও তাহা হইতে নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল আশা করা যায় না। "আমরা কি মরনোন্মুখ জাতি?" এই আখ্যা বিশিষ্ট কোন পত্রিকার লেখক নিশ্চিত ঘটনাপরম্পরা দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে "আমরা মরণোন্মুখ জাতিই বটি।"

মানব স্বভাবতঃ সরল রীতি এবং প্রকৃতির উপযোগী। ইহার বহুল পরিমাণে ব্যভিচারই এই বাহ্যিক অবনতির কারণ। সভ্যতা জনিত অবশ্যম্ভাবী কলুষিত ভাবের তথ্যানুসন্ধানে যে নানা প্রকার কথা উপস্থিত হয় তন্মধ্যে একটির মাত্র উল্লেখ করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। এ কথাটি মাংসাহার বিষয়ক; অর্থাৎ প্রাণি-মাংস মনুষ্যের স্বাভাবিক আহার? কি স্বচ্ছন্দ ভূমিজাত শস্যাদি মনুষ্যের স্বাভাবিক আহার?—এই কথাটিরই পত্রিকায় আলোচনা করা হইয়াছে। এই কথার মীমাংসার জন্য তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়:—

প্রথমতঃ—পুরাবৃত্ত অর্থাৎ মানবের অভিজ্ঞতায় যাহা জানা যায়,

দ্বিতীয়তঃ—বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রাকৃতিক তত্ত্বের আলোচনায় যাহা জানা যায়,

তৃতীয়তঃ—ধর্ম্মনীতি অর্থাৎ ঐশ্বরিক অভিপ্রায় বিচার,

বিজ্ঞান অধ্যয়নের ফলে জানা যায় যে স্বাভাবিক অবস্থায় যে কোন প্রাণীর

আহার তাহার দৈহিক গঠনভাব ও তাহার পরিপাক প্রণালী পরম্পরা এবং তাহার অন্যান্য দৈহিক ক্রিয়ার অনুরূপ; এই বৈজ্ঞানিক সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা বা প্রস্তাবনা—অর্থাৎ মাংস মানবের স্বভাবসিদ্ধ ভোজ্য? বা শাক শস্য তাহার স্বাভাবিক ভোজ্য?—ইহা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ঐ সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণি-গণের আহারের প্রকার ভেদে তাহাদিগকে চারি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,- তৃণপত্রভোজী, ফলাহারী, মাংসাশী এবং সর্ব্বভুক। উচ্চশ্রেণীস্থ জীবের পক্ষেই প্রধানতঃ এই বিভাগ সঙ্গত হইয়া থাকে। তবে পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি অধঃ-শ্রেণীস্থ প্রাণীকেও এই বিভাগের অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে।

এই সাধারণ শ্রেণী বিভাগকে আরও অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—শস্যভোজী, চর্ব্বক, রোমন্থক এবং অদন্তী। অধিকাংশ ফলহারী প্রাণীর ভক্ষ্য শস্য, তজ্জন্য শস্য-ভোজী প্রাণী ফলাহারীর অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া সাধারণতঃ পরিগণিত হইয়া থাকে।

কোন্ প্রাণী পূর্ব্ব-নির্দ্দেশিত কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত ইহা নির্ণয় করিতে হইলে বিশেষ মনোযোগের সহিত প্রাণীর গঠনপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। এই পর্য্যবেক্ষণে প্রাণি-জগতের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয়প্রাণী নিজ নিজ প্রাকৃতিক আহারানুসারে আবার বহুতর শাখা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের আকৃতির প্রকৃতিগত বিশেষত্বের জ্ঞান থাকা আবশ্যক হইবে। তাদৃশ শ্রেণী-বিভাগ হেতু প্রয়োজনীয় উপাদান—জানিবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীস্থ প্রাণীর প্রকৃতিগত বিশেষ ভাব সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

তৃণপত্র ভোজী প্রাণীর দন্ত।

গো, অশ্ব, মেষ, প্রভৃতি তৃণপত্র ভোজি-প্রাণি অন্তর্নিবিষ্ট শ্রেণীর দন্ত তাহা-দিগের কর্কশ এবং আয়ত আহার্য্য পদার্থ চর্ব্বণের সম্যক্ উপযোগী। গোর চতুর্ব্বিংশতি চর্ব্বণ-দন্ত; তন্মধ্যে প্রত্যেক হনুর প্রত্যেক দিকে ছয়টী। অষ্ট সংখ্যক ছেদন-দন্ত; সবগুলি নিম্নহনুতে সন্নিবিষ্ট, উপরিস্থ হনুতে ছেদন-দন্ত নাই; সেই স্থান শৃঙ্গ-সদৃশ এক প্রকার কঠিন পত্র দ্বারা পরিব্যাপ্ত। হনুদ্বয় বদ্ধ হইলে সেই কঠিন পত্রে নিম্নস্থ ছেদন দন্ত পঙ্‌ক্তি সংলগ্ন হইয়া থাকে।

ইহাদিগের দন্তের গঠন প্রণালীতে বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য শ্রেণীস্থ প্রাণীর অধিকাংশের দন্তের ন্যায় ইহাদিগের দন্ত রুচকে * আবৃত না হইয়া তাহা পর্য্যায়-ক্রমে রুচক এবং রদিনের † দ্বারা স্তরে স্তরে সংযোজিত। দৃঢ় ও মসৃণ রুচকের স্তর গুলির মধ্যস্থিত কোমল রদিনের স্তর গুলি অপেক্ষা শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তখন তৃণ পত্রাদি পেষিত এবং বিচূর্ণিত করিবার উপযোগী প্রসারিত রুচকের স্তর গুলি বর্ত্তমান থাকে।

মাংস ভোজি-প্রাণীর দন্ত :—

মাংসাশী মাত্রই মাংসভোজি প্রাণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীভুক্ত প্রাণিগণের বিশেষত্ব এই যে ইহাদের উভয় হনুতে শ্বদন্ত ‡ চতুষ্টয় বর্ত্তমান। প্রত্যেক হনুর উভয় পার্শ্বে দুইটি অবস্থিত। শ্বদন্তের সম্মুখে ছেদন-দন্ত, এবং পশ্চাতে চর্ব্বণ-দন্ত। এই চর্ব্বণ-দন্তগুলির অগ্রভাগ দেখিতে ঠিক করপত্র অর্থাৎ করাতের কর্ত্তন প্রান্তের ন্যায়।

কেবল মাত্র সিংহের মত মাংসভোজী জন্তুর শ্বদন্ত অতিদীর্ঘ এবং তাহা সমস্ত শ্বদন্ত প্রাণীর শ্বদন্তের ন্যায় অন্য দন্ত হইতে সুদূরে সংস্থাপিত। কুকুরের শ্বদন্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ভল্লুকের মত যে জন্তু অধিক পরিমাণে উদ্ভিদ এবং ফলভোজী তাহার শ্বদন্ত কুকুরের শ্বদন্তাপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্র।

ফল ভোজী জন্তুর দন্ত :—

ফলভোজী প্রাণি-শ্রেণীর অন্তর্গত বনমানুষ অর্থাৎ সিম্পাঞ্জি, ওরাঙ্-আউটাঙ্ এবং গোরিলার কেবল মাত্র ফল শস্য, বাদাম প্রভৃতি কঠিনত্বক সম্পন্ন অন্তঃশস্য বিশিষ্ট ফল আহার। ইহাদিগের সর্ব্বসাকল্যে দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যকদন্ত। প্রত্যেক হনুর দন্ত সংখ্যা ষোড়শ। যথা, চারি ছেদন-দন্ত, শ্বদন্ত স্থানে প্রত্যেক দিকে একটী করিয়া দুইটী ভেদন-দন্ত, চারি দ্বিপিণ্ড অর্থাৎ ক্ষুদ্র চর্ব্বণ দন্ত এবং ছয় বৃহৎ চর্ব্বণ-দন্ত। তীক্ষ্ণ ভেদন-দন্তদ্বয় অন্যান্য দন্তাপেক্ষা বৃহত্তর; এবং অন্যান্য হইতে অল্প পৃথকভাবে অবস্থিত। বানর জাতি ব্যতীত আরও বহুতর জতীয় ফলভোজী-প্রাণী আছে। চর্ম্মচটী বা বাদুড়, কাঙ্গারু

---

* Enamel † Canine teeth ‡ Dentine

প্রভৃতি জাতীয় প্রাণীর দন্ত উচ্চশ্রেণীস্থ বানর জাতির অর্থাৎ বনমানুষের দন্তের অনুরূপ।

সর্ব্বভুক জন্তুর দন্ত—সর্ব্বভুক প্রাণীর দন্ত তাহাদিগের প্রকৃতির বিশেষ অনুরূপ। এই শ্রেণীস্থ প্রাণী সর্ব্বপ্রকার আহারই গ্রহণ করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ ইহারা আবর্জ্জনা পরিষ্কারক। শূকর এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদিগের দন্তে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে সম্মুখে প্রসারিত ছেদন-দন্ত এবং শ্বদন্তগুলি দীর্ঘ এবং উপর দিকে বক্র। ইহারা উহাদ্বারা অপর জীবিত বা মৃত জন্তুকে নষ্ট বা ছিন্ন ভিন্ন করে এবং বন্যাবস্থায় ইহাদিগের ভোজ্য মূলাদি মৃত্তিকাতল হইতে উত্তোলন করে।

নর-দন্ত—মানব দন্তের প্রতিকৃতি প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার সহিত পূর্ব্ব কথিত বিবিধ শ্রেণীস্থ প্রাণী সমূহের দন্তের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইবে। মনুষ্য দন্তে দুইটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ ইহাদিগের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দন্তাধার দন্তে পূর্ণ; অর্থাৎ দন্ত-পঙক্তি মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। দ্বিতীয়তঃ সকল দন্তগুলি কার্য্যতঃ সমান দীর্ঘ। দন্তের সংখ্যা দ্বাত্রিংশৎ। প্রত্যেক হনুতে চারি ছেদক, দুই ভেদক, চারি ক্ষুদ্র চর্ব্বক এবং ছয় বৃহৎ চর্ব্বক দন্ত।

এক্ষণে যদি আমরা দন্তের গঠন বিচার পূর্ব্বক স্থির করিয়া থাকি মানব কোন্ শ্রেণীস্থ প্রাণীর অন্তর্গত তাহা হইলে আমাদিগের আলোচিত পূর্ব্বোল্লিখিত কতিপয় শ্রেণীস্থ প্রাণীর বিবরণ উল্লেখ করিলেই জিজ্ঞাস্যের উত্তর দেওয়া হইবে। এই প্রকার পর্য্যালোচনা করিতে হইলে আমাদিগের পূর্ব্ব স্থিরীকৃত মত এবং সংস্কার পরিত্যাগ করিতে হইবে; এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত মনুষ্যকে কোন ভূতপূর্ব্ব ভূগর্ভ নিহিত অপ্রকাশিত প্রাণী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তাহার রীতি প্রকৃতি নির্দ্ধারণ জন্য তাহার কঙ্কাল, যে সকল প্রাণীর রীতি প্রকৃতি আমরা অবগত আছি তাহাদিগের কঙ্কালের সহিত মিলাইতে হইবে। তৃণ-পত্র ভোজিপ্রাণীর দন্তের সহিত মানবদন্তের আমরা কিঞ্চিন্মাত্রও সাদৃশ্য দেখিনা। কেবল মাংস ভোজী-প্রাণীর দন্তের সহিত মনুষ্য-দন্তের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যের সিংহ এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় অন্য মাংস-চ্ছেদনোপযোগী দীর্ঘ ধারাল দন্তের সম্পূর্ণ অভাব। সর্ব্বভুক-প্রাণীর দন্তের সহিত

মানব-দন্তের তুলনা করিতে আমরা দন্তের আকৃতি এবং হনুতে সজ্জিত সাধারণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিব, কিন্তু যখন নর-দন্তের সহিত উচ্চতর বানর বা বনমানুষ জাতির অন্তর্গত ফলাহারী প্রাণীর দন্তের তুলনা করিব, তখন যে কেবল মাত্র আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করিব তাহা নহে; দন্তের সংখ্যা, আকৃতি, যোজনা এবং হনুতে সজ্জিত হইবার ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কেবল মাত্র আকারে এই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বানর জাতির ভেদ-দন্ত তাহার অন্য দন্তাপেক্ষা বৃহত্তর; এবং অন্য দন্তাপেক্ষা অল্প দূরে অবস্থিত। ইহাতে হনু যোজনের এবং বন্ধ করিবার সুবিধা হইয়া থাকে। এবং দন্ত-চতুষ্টয় মাংসাশী প্রাণীর শ্বদন্ত-চতুষ্টয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; যেহেতু সেই শ্বদন্ত দীর্ঘ, ধারাল ও তীক্ষ্ণ এবং মাংসচ্ছেদনোপযোগী; কিন্তু বানর জাতির ভেদন-দন্ত বিষমকোণাকৃতি এবং ইহা পরস্পর সম্যক্‌রূপে সংযোজিত হইতে পারায়, বানর জাতি তদ্বারা তাহাদিগের ভোজ্য বাদাম প্রভৃতি কঠিনত্বক্ সম্পন্ন অন্তঃশস্য বিশিষ্ট ফল পেষিত করিতে এবং ফলের আবরণ চ্যুত করিতে সমর্থ হয়।

কেবল মাত্র দন্ত নহে। অন্যান্য যন্ত্রের ও পরীক্ষায় দেখা যাইবে যে, যে গুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রাণীর খাদ্য সামগ্রীর পরিচায়ক এবং উপযোগী। এই সকল বিশেষত্ব পরম্পরাভাব এবং বর্ত্তমান জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধের সংক্ষেপ পর্য্যালোচনায় ঔৎসুক্য জন্মাইবে সন্দেহ নাই।

দেহের শাখা চতুষ্টয়—জীব-রহস্য বিৎ পণ্ডিত হক্স্লি (Huxley) সাহেব জরায়ুজ প্রাণীর দৈহিক শাখা লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা মশক, নখী, এবং হস্তী (হস্তশিষ্ট)। মশক প্রাণী তৃণপত্র ভোজী বা সর্ব্বভুক্ হইবে। নখী প্রাণী সংধারণতঃ মাংসভোজী হয়। মানবের পদ হস্তের রূপান্তর মাত্র। অতএব হস্তী বা হস্ত বিশিষ্ট প্রাণী মাত্রেই ফলাহারী। এই নিয়মের ব্যতিক্রম কেবল মাত্র কতিপয় নিম্ন শ্রেণীস্থ মানবের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অন্য আহারাভাবে কীটও ভক্ষণ করিয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত বিবরণানুসারে মানবকে ফলশস্যভোজীপ্রাণি-শ্রেণী ভুক্ত করিতে হইবে।

তাহার হস্ত মাংসাশী প্রাণীর নখের মত মাংস ছেদনের সম্পূর্ণ যোগ্য। তাহার হস্ত তৃণপত্রভোজী বা সর্ব্বভুক প্রাণীর খুরের মতও নহে।

অন্ননালী।—আপেক্ষিক শারীরবিদ্গণ * কর্ত্তৃক অন্ননালীর দৈর্ঘ্য বিষয়ক এবং অত্যাবশ্যক তত্ত্বনিরূপিত হইয়াছে। মাংসাশি-প্রাণিগণের অন্ননালী অতি হ্রস্ব; এবং তৃণপত্রভোজি-প্রাণিগণের অন্ননালী দীর্ঘ। বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর শারীরিক দৈর্ঘ্যের সহিত তুলনায় অন্ননালী এইরূপ হইয়া থাকে যথা,—মাংসাশি প্রাণিগণের অন্ননালীর দৈর্ঘ্য তাহাদিগের দেহাপেক্ষা ত্রিগুণ অধিক, মেষের মত তৃণ পত্র ভোজী প্রাণিগণের অন্ননালী তাহাদিগের দেহাপেক্ষা ত্রিংশ গুণ দীর্ঘ; বানরের অন্ননালী তাহার দেহাপেক্ষা দ্বাদশ গুণ দীর্ঘ; সর্ব্বভুক গণের অন্ননালী তাহাদিগের দেহাপেক্ষা দশগুণ দীর্ঘ; এবং ফলাহারী প্রাণীর ন্যায় মানবের অন্ননালী তাহাদিগের দেহাপেক্ষা দ্বাদশগুণ দীর্ঘ। এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে শারীরসংস্থান বিদ্যা † অনুসারে মানব পূর্ব্ব কথিত মত ফলাহারী প্রাণী মধ্যে পরিগণিত। কোন কোন লেখক ভ্রান্তিক্রমে মনুষ্যের দণ্ডায়মান কালীন দৈর্ঘের পরিমাণ গ্রহণ করাতে দৈর্ঘ্য দ্বিগুণিত করিয়া দৈর্ঘের অনুপাত ১০১২ স্থলে ১০৬। স্থির করিয়াছেন। এই রূপ পরিমাণ ভ্রান্তিমূলক। কারণ, ইহাতে নিম্ন সীমা কর্থাৎ পদদ্বয় পর্য্যন্ত পরিমাপিত হইতেছে। অথচ অন্যান্য প্রাণীর অগ্রভাগ হইতে পৃষ্ঠ বংশের শেষ পর্য্যন্তই মাপ হইয়া থাকে। সর্ব্বভুক প্রাণীর অন্ননালী বানর এবং নরের অন্ননালী অপেক্ষা হ্রস্ব। সুতরাং এই জাতীয় প্রাণীর সহিত তৃণ পত্র ভোজিপ্রাণীর অপেক্ষা মাংসাশি প্রাণীর সহিত অধিকতর সাদৃশ্য আছে।

শারীরবিৎ কটনার ‡ কর্ত্তৃক এক রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ ব্যাক্তির ক্ষুদ্র অন্ত্র § সম্বন্ধে বহুল পরিমাণ গবেষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন রুসিয়ার উদ্ভিদ্ভোজি কৃষকগণের ক্ষুদ্র অন্ত্র দৈর্ঘ্যে ২০ হইতে ২৭ ফীট্ ॥ এবং জার্ম্মানবাসিগণ নানা প্রকারের যথেষ্ট পরিমাণ মাংসাহার

* Comparative anatomists.

† Anatomy.

‡ Kutner.

§ Small intestine.

॥ ৩ ফীটে ১গজ বা ২হাত।

করায় তাহাদিগের ক্ষুদ্র অন্ত্রের দৈর্ঘ্য ১৭ হইতে ১৯ ফীটের মধ্যে আহারের বিভিন্নতা নিবন্ধনই যে এই দ্বিবিধ শ্রেণীস্থ ব্যক্তির মধ্যে ঈদৃশ তারতম্য ইহাই গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বহু পুরুষ পর্য্যন্ত কোন এক প্রকার গৃহীত আহারের প্রভাবে যে এই বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে ইহা স্থির। এই কথায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মাংসাশি প্রাণি সহস্র সহস্র বৎসর হইতে তাদৃশ আহার গ্রহণ হেতু তাহার প্রভাবে ক্রমশঃ তাহাদের দৈহিক গঠন বিশেষ রূপে সেই আহার গ্রহণের উপযোগী হইয়াছে। যদি মনুষ্যের অন্ত্রের দৈর্ঘ্য, কয়েক শতবৎসর অন্য আহারের সহিত মাংসাহার হেতু হ্রস্ব হইয়া যায় তাহা হইলে যে সকল প্রাণী কেবল মাত্র মাংসাহার করিয়া থাকে অধিকতর দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার ফলে তাহাদিগের মধ্যে আরও অধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তন সহজেই লক্ষিত হইবে।

একটী জৈবিক রহস্য ঃ—

জীব রহস্যবিৎ হক্স্লি এই রহস্যের আবিষ্কারক। রহস্য এই যে প্রাণীর জন্মের পূর্ব্বে তাহারা যে গঠন প্রণালী ক্রমে পোষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার প্রকার ভেদানুসারে তাহাদিগকে শ্রেণী বদ্ধ করা যাইতে পারে।

১। তৃণ-পত্র ভোজি মশক এবং সর্ব্বভুক্ প্রাণী। জন্মকালে ইহাদিগের প্রসূতির পরিস্রব * জরায়ু হইতে স্খলিত হয় না; ইহা নাভীদেশে সংলগ্ন থাকিয়া যায়। এই অন্ত্র মধ্য দিয়া অজাত শাবক প্রসূতী হইতে পোষণ প্রাপ্ত হয়।

২। মাংসাশী প্রাণী। ইহাদিগের পরিস্রব শাবকের জন্মকালে জরায়ু হইতে স্খলিত হয়; এবং ইহা বলয়াকার †।

৩। বানর প্রভৃতি ফলাহারী প্রাণী। ইহাদিগের জন্মকালে পরিস্রব স্খলিত হয়; এবং ইহা মণ্ডলাকৃতি‡।

* Placnta. † Zone. ‡ Disc

স্তন *:—

মাংসভুক্ এবং সর্ব্বভুক্ প্রাণীর স্তন নিম্নোদরে স্থিত। উচ্চ-শ্রেণী বানর জাতির এবং মানবের স্তণ বক্ষে অবস্থিত। দৈহিক গঠন প্রণালী সম্বন্ধে এই একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়। ইহাতে কোন ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না।

বৃহৎ অন্ত্র †। মাংসাশি প্রাণীর বৃহৎ অন্ত্র মসৃণ; এবং কোষাকারে বদ্ধিত অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ বিশিষ্ট ‡ নহে।

উচ্চশ্রেণী বানর এবং নরের বৃহৎ অন্ত্র কোষ বিশিষ্ট। তৃণপত্রভোজী প্রাণীর বৃহৎ অন্ত্র নরের ন্যায় কোষ বিশিষ্ট।

জিহ্বা। মাংসাশি-প্রাণীর জিহ্বা অতি কর্কশ। শরীরে লাগিলে ঘর্ষণের যাতনা অনুভূত হয়। উচ্চ শ্রেণী বানর এবং নরের জিহ্বা মসৃণ।

চর্ম্ম—মাংসাশি প্রাণীর চর্ম্মে ঘর্ম্মনালী নাই; সুতরাং কুকুর, বিড়াল এবং তজ্জাতীয় প্রাণীর চর্ম্মে ঘর্ম্ম থাকে। বানরের চর্ম্মে লক্ষলক্ষ ঘর্ম্মনালী আছে; এবং মানবের চর্ম্মে এতাধিক ঘর্ম্মনালী বা আধার আছে যে সে গুলি খুলিয়া দিলে একাদশ সহস্র বর্গকীট * স্থান আচ্ছাদিত হইতে পারে। সর্ব্বভুক প্রাণী শূকরের কেবল মাত্র নাসাগ্র ঘর্ম্মাক্ত হইয়া থাকে। অশ্ব, গো প্রভৃতি উদ্ভিদ্-ভোজিপ্রাণীর সমগ্র চর্ম্ম মনুষ্যের ন্যায় ঘর্ম্মাক্ত হইয়া থাকে।

‡ ১১০০০=১২২২২ বর্গগজ।

লাঙ্গুল—মাংসাশী, তৃণপত্রভোজী এবং সর্ব্বভূক প্রাণীর মেরুদণ্ড * পরিবর্দ্ধিত হইয়া একাংশ লাঙ্গুল রূপে পরিণত হইয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীস্থ বানর লাঙ্গুল বিহীন।

চলিবার ভাব—মাংসাশী, তৃণপত্রভুক্ এবং সর্ব্বভুক প্রাণী চতুষ্পদ; এবং চলিবার সময়ে তাহাদিগের চক্ষু উভয় পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করে; কিন্তু ওরাঙ্

* Mammary gland.

† Colon.

‡ Succulated.

ওটাঙ্‌ প্রভৃতি অনেক উচ্চ শ্রেণী বানর প্রায়ই অথবা সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের ন্যায় সোজা ভাবে চলে এবং তাহাদিগের দৃষ্টি সম্মুখ দিকে থাকে।

নখর—মাংসাশি-প্রাণীর ধারাল নখ আছে। তৃণপত্রভোজী এবং সর্ব্বভুকের খুর আছে; এবং উচ্চ শ্রেণীস্থ বানর ও নরের চেপ্টা নখ আছে। এইরূপ নখ অন্য কোন প্রাণীর নাই। মাংসাশী তৃণ পত্র ভোজী এবং সর্ব্বভুক প্রাণী চতুস্পদ; কিন্তু উচ্চশ্রেণী বানর এবং নর দুই হস্ত ও দুই পদ বিশিষ্ট। কখন কখন ভ্রান্তি বশতঃ বানরের পশ্চাদে কিছু পদ দ্বয় হস্ত নাম অভিহিত হইয়া থাকে। ডাক্তার হক্‌স্লি বলেন সেই দুইটীরঅস্থি এবং মাংস পেশীর গঠন প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহাদিগকে হস্ত শ্রেণী ভুক্ত না করিয়া পদ-শ্রেণী ভুক্ত করিতে হয়।

লালাধার *। মাংসাশি প্রাণীর লালাধার ক্ষুদ্র; এবং তাহাতে যে পরিমাণ লালারক্ষিত হয়। তাহার শ্বেত সার † জাতীয় আহারের পক্ষে কার্য্যকারী নহে। কিন্তু উচ্চশ্রেণী বানর এবং নরের লালাধার সম্পূর্ণ পরিবর্দ্ধিত এবং লালা কার্য্যকরী।

দন্ত—নরের চারি ভেদন-দন্ত ‡ থাকায় কিছু মাত্র প্রমাণ হইতেছে না যে আহার সম্বন্ধে এই প্রাণী সম্পূর্ণ রূপে বা কিয়ৎ পরিমাণে মাংসাশী। যদি আহারে ইহাকে স্বভাবতঃ সর্ব্বভুক বলা হয়, তাহা হইলে ইহার দন্ত শূকরের দন্তের ন্যায় গঠিত এবং সজ্জিত হইত। ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, যে মাংসাশী-প্রাণীর শ্বদন্ত তাহার ভোজ্য মাংসের পরিমাণের অল্পতানুসারে হ্রস্ব হইয়া থাকে; অর্থাৎ সেই প্রাণী যত অল্প পরিমাণ মাংসাহার করে তাহারি শ্বদন্ত তত হ্রস্ব এবং তত অল্প প্রকাশিত হয়। এই জন্য কুকুরের শ্বদন্ত সিংহের শ্বদন্তাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

বানরের ভেদন দন্ত মাংসাশি-প্রাণীর শ্বদন্ত,স্থানীয় এবং এই ভেদন-দন্ত অন্য দন্তাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহত্তর। এই প্রাণীর আহার্য্য মাংস নহে। ফল, শস্য এবং বাদাম প্রভৃতি কঠিন ত্বক যুক্ত অন্তশস্য বিশিষ্ট ফলই ইহার অহার্য্য। নরের

---

* Salivery gland.

† Storch.

‡ Cuspid

ভেদন-দন্ত বানরের ভেদন-দন্তাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে এই প্রাণী বিশেষরূপে ফলাহারী। মাংসাহার দূরে থাকুক স্থূল উদ্ভিদ এবং অপক্ক শস্য পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে বর্জ্জনীয়। 'এটি সহজে প্রমাণিত হইবে যে মনুষ্যের ভেদন-দন্ত কোন প্রাণীর আম মাংসচ্ছেদন কার্য্যের একেবারে অনুপযোগী।

নিরবচ্ছিন্ন তৃণ-পত্র ভোজী মৃগ এবং উষ্ট্রের নাম মাত্র ভেদন-দন্ত থাকায় এবং অশ্বেরও ঐরূপ বলগাদন্ত নামক দন্ত থাকায় ঈদৃশ ভেদন-দন্ত একেবারেই সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপে মাংসভোগের পরিচায়ক হইতে পারে না।

পূর্ব্ব কথিতানুসারে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মানবের গঠন প্রণালী দৃষ্টি পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে বিজ্ঞান এবং প্রকৃতি অনুসারে নিরামিষাহারই নিঃসংশয়িত রূপে মানবের পক্ষে অনুকূল। এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য গঠন প্রণালী সংক্রান্ত আরও পোষক প্রমাণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা বিশেষ প্রতিপাদক হইলেও এস্থলে অনাবশ্যক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়।

৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি।

বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্য একটী উজ্জ্বল রত্ন—সাহিত্য-সভা একজন মাননীয় সভ্য হারাইয়াছে। আমরা শোকার্ত্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি গত ১২ই আশ্বিন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বৈজয়ন্ত ধামে বাণীকুঞ্জে প্রয়াণ করিয়াছেন। সুশিক্ষিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় যৌবনের প্রারম্ভে যে বাণীসেবাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সেই মহাব্রত পালনপূর্ব্বক বঙ্গভাষা—বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গে অনেকগুলি উজ্জ্বল রত্নালঙ্কার দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত সম্বন্ধ-নির্ণয় গ্রন্থখানি তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ সাহিত্য-সংহিতার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার বিয়োগে সাহিত্য-সভা একজন পরম হিতসাধক সভ্য হারাইয়াছেন।

পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় স্বহস্তে যে অতি সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় লিখিয়া গিয়াছেন এবং তৎসহ তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য যে টীকা সংযোজিত করিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশিত করিলাম।

"নদীয়া জিলার বনগ্রাম সবডিভিসনের অন্তর্গত মহেশপুর সমাজের ৺রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র নাট্যপরিশিষ্টাদি গ্রন্থপ্রণেতা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ নদীয়ার রাজ-সভাসদ ধর্ম্মদহনিবাসী ৺কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবাচস্পতির ভ্রাতুষ্পুত্র, ৺রামলোচন তর্কসিদ্ধান্তের পৌত্র, ৺রামরাম তর্কপঞ্চাননের দৌহিত্র লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য।

জন্ম ১৭৬৪ শকাব্দার ৬ই চৈত্র। পঞ্চম বর্ষ মধ্যে বিদ্যারম্ভ—সপ্তম বর্ষ মধ্যে পাঠশালার বাঙ্গলা লেখা পড়া সমাপ্ত। একাদশ বর্ষে উপনয়ন ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে আবৃত্তি। ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে মুগ্ধবোধ, অমরকোষ অভিধান

কবিকল্পদ্রুম ধাতুপাঠ ও ভট্টীকাব্য অধ্যয়ন। এই সমুদায়ের অধ্যয়ন মহেশপুর, দিগম্বরপুর ও উলার চতুষ্পাঠীতে হয়। তৎপরে মহেশপুরের মডেল স্কুলে প্রবেশ ও তথা হইতে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ইংরাজী ১৮৬৮ সাল মধ্যে কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও ন্যায়াদি অধ্যয়ন এবং তদ্বিষয়ে কৃতার্থতার নিদর্শন স্বরূপ কালেজ কমিটী হইতে বিদ্যানিধি এই উপাধি প্রাপ্তি। ইতি মধ্যে অর্থাৎ ১৮৬২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলা ভাষার প্রথম অলঙ্কার কাব্যনির্ণয় গ্রন্থের রচনা করণ। তাহতে সংস্কৃত কালেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিষ্টার ই, বি, কাউয়েলের সঙ্গে বিশেষ আনুগত্য এবং তৎকার্য্যেই বঙ্গভাষার কাব্যেতিহাসাদি সভার সদস্যগণের সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্দ এবং রহস্য সন্দর্ভাদিতে লেখন। তাহাতে বিদ্বন্মণ্ডলীতে বিশেষরূপে সুপরিচিত হই। ১৮৬৮ সালের ২৫ জানুয়ারিতে কটক কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠান। তৎপর দিনাজপুর জিলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্যে নিয়োগ। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ছোট নাগপুরের জিলা সমূহের স্কুল ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের পদে ক্রমান্বয়ে অধিবেশন। তৎপর ১৮৮৮ খৃঃ পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং বর্দ্ধমান কাল্‌না কাটোয়ার স্কুল সমূহের তত্ত্বাবধান কার্য্যে থাকিয়া পুস্তকাদি লিখন। এই সময় মধ্যে বঙ্গদর্শনে ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা বর্ণন ও তদ্বিষয়ে কৃতার্থতা লাভে বিশেষ সুখ্যাতি প্রাপন। তৎপরে সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থের লিখন ও ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে উহার প্রকাশ করণ।

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি।”

১। মহেশপুর গ্রাম এক্ষণে যশোহর জিলার অন্তর্গত হইয়াছে।

২। মহামান্য হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এবং ৺গোলাপ চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

৩। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মহামান্য এল, এস, জ্যাক্সন সাহেব বাহাদুর রহস্যসন্দর্ভে তাঁহার বাঙ্গলা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন তজ্জন্য তাঁহাকে কলিকাতা কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের রাজকুমারদিগের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। তিনি যখন সংস্কৃত কালেজের ছাত্র তখন হইতেই শিক্ষা বিভাগের ইংরাজ উচ্চ কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনা করিতেন।

৪। কৃষ্ণনগরের মহারাজ স্বর্গীয় ৺ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর তাঁহার সহিত প্রায়ই শাস্ত্রালোচনা করিতেন। মহারাজের সহিত যখনই তাঁহার মতানৈক্য হইত তখনই তিনি বিশেষভাবে পুরস্কৃত হইতেন।

৫। মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার সি, ডবলিউ, বোলটন সাহেব বাহাদুর তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহার নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন। এই সময় বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ লিখিয়া ৺বঙ্কিম বাবুকে বিশেষ সাহায্য করেন।

৬। বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর (সম্ভবতঃ রিভার্স টমসন সাহেব বাহাদুর) কালনা পরিদর্শন কালে রাজকীয় যানে কেবল মাত্র পিতৃদেবকেই সঙ্গে লইয়াছিলেন।

৭। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে তিনি হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের হেড পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। তথায় অবস্থান কালে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৺রামপতি ন্যায়রত্ন, বর্দ্ধমানের কমিশনার ৺রমেশচন্দ্র দত্ত, মিষ্টার পি, মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত সদালাপে কালক্ষেপণ করিতেন। হুগলীর অনেক রাজকর্ম্মচারীই তাঁহার নিকট হিন্দুধর্ম্মের মীমাংসা গ্রহণ করিয়া দণ্ডাজ্ঞা দিতেন।

ইংরাজ রাজপুরুষগণ তাঁহাকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্র পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে :—

BIHAR and ORISSA
'Government Camp.
20th May 1916.

DEAR SIR,

I thank you for your letter and good wishes which I reciprocate. I hope you have still many years of happiness before you.

I remain
yours truly
(Sd.) E. A. GAIT.
Leutenant Governor.

এক সময় তিনি ঢাকায় ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর বাহাদুরের বাড়ীতে যাইয়া দেখা করেন। তাঁহার সহিত কএক ঘণ্টা আলাপের পর কালীপ্রসন্ন বাবু কহিলেন, কাব্যনির্ণয় গ্রন্থই আপনাকে অমর করিয়া রাখিবে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এ ম, এ মহোদয়ের মত এই যে আজিও বঙ্গভাষায় কাব্যনির্ণয়ের ন্যায় গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। অন্য লোকের মত—সম্বন্ধনির্ণয় তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

পেনসন লইয়া তিনি বঙ্গের বহু রাজা মহারাজ এবং সামাজিক ব্যক্তিবর্গের সহিত সুপরিচিত হন। তিনি সরল নির্ভীক, তেজস্বী স্পষ্টবক্তা, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, কার্য্যতৎপর, সত্যনিষ্ঠ ও সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

যতিপঞ্চকম্।

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ,
সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা বৈ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা,
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥

মনের নিবৃত্তি যেই সুশান্তিদায়িনী,
মণিকর্ণিকাই সেই তীর্থের প্রধান।
আদিগঙ্গা—উৎসারিত জ্ঞানের প্রবাহ,
পুণ্যময়-তীর্থ কাশী—সে যে আত্মজ্ঞান ॥

যথামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং,
চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্।
সচ্চিৎসুখৈকা জগদাত্মরূপা,
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥

মানস-বিলাস এই চারু চরাচর,
হতেছে কল্পিত যাহে ইন্দ্রজাল সম।
পুণ্যময়-তীর্থ কাশী—সে যে আত্মজ্ঞান—
সুখময় চিরানন্দ; অতি নিরুপম ॥

পঞ্চেষু কোষেষু বিরাজমানা,
বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহং।
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতান্তরাত্মা,
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥

হৃদয়ের পঞ্চকোষে রাজেন ভবানী,
প্রতিদেহে বুদ্ধিরূপে তাঁর অধিষ্ঠান।
জগতের সাক্ষী শিব আত্মা সবাকার,
প্রতিমনে কাশী তীর্থ—সে যে আত্মজ্ঞান ॥

কার্য্যং হি কাশ্যতে কাশী,
কাশী সর্ব্বং প্রকাশ্যতে।
সা কাশী বিদিতা যেন,
তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা॥

কার্য্যপ্রকাশিকা কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা,
মনোমাঝে মহাতীর্থ সর্ব্বতীর্থসার।
বিদিত এ কাশী যাঁর, তিনি অতি ধীর,
কাশীলাভে মনে তাঁর আনন্দ অপার॥

কাশীক্ষেত্রং শরীরং
ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা,
ভক্তিশ্রদ্ধাগয়েয়ং
নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ
সকল জনমনঃ সাক্ষীভূতান্তরাত্মা
দেহে সর্ব্বং মদীয়ং
যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি॥

শরীরেই এ কাশীক্ষেত্র; সকল ব্যাপিনী
বিশ্বমাতা জ্ঞানগঙ্গা হেথা প্রবাহিত।
হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা—পূত গয়াধাম,
গুরুর চরণ ধ্যান—প্রয়াগের মত॥
এই যে আনন্দ প্রাণে—ইনি বিশ্বেশ্বর,
সকল মানব সাক্ষী আত্মা সবাকার।
দেহে মোর রহিয়াছে সব বিদ্যমান,
অন্য তীর্থে প্রয়োজন কি আছে আমার?

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

প্রণয়-পারিজাত বা বসন্ত-সেনা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২)

"গুণো কৃখু অনুরাএস্স কারণং, ণ উণ বলক্কারো।"

"রত্নং রত্নেন সংগচ্ছতে।"

উজ্জয়িনী নগরীতে মূর্ত্তিমতী বসন্ত শোভার ন্যায় অলৌকিক রূপগুণ শালিনী যুবতী বসন্ত সেনানাম্নী এক বারাঙ্গনাপুত্রী বাস করিত। কোন সময়ে কামদেবায়তন নামক উপবনে তাদৃগ্‌গুণগ্রামসম্পন্ন চারুদত্তকে অবলোকন করিয়া এই রমণী তৎপ্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইয়া পড়ে। অবস্থার বিপর্য্যয়ে তখন চারুদত্ত কপর্দ্দক শূন্য, একপ্রকার পরোপজীবী বলিলেই হয়। পক্ষান্তরে এই তরুণী রমণী স্বীয় জননীর অতুল ধনসমৃদ্ধিতে উজ্জয়িনী নগরে অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তদুপরি নিজেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নবোদ্ভাসিত যৌবনবতী কামিনী, সুতরাং তাহার কটাক্ষকামুক লম্পটব্যক্তির কিছুমাত্রও তথায় অভাব ছিল না। কিন্তু দৈবের বিচিত্রতায় বিপুলসমৃদ্ধিশালিনী পরম রূপগুণযৌবনবতী এই বারাঙ্গনা-পুত্রীও নিঃস্ব চারুদত্তের গুণাবলীতে একেবারে সমাকৃষ্ট হইয়া পড়িল! বসন্তসেনা তাহার চাক্ষুষ দর্শনের পূর্ব্বেও অতুলগুণাধার চারুদত্তের যশঃসৌরভে কতকটা বিমুগ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু উদ্যানে সাক্ষাৎ দর্শন অবধি তাহার পক্ষে চিত্তদমন করা ক্রমে অসহ্য হইয়া পড়িল। অবশেষে একদিন নিশীথভাগে সেই প্রেমোন্মাদিনী স্বয়ংই প্রিয়তম চারুদত্তের মিলন আশায় তাঁহার বাসস্থান অভিমুখে গমন করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইল।

উজ্জয়িনী অধিপতি পালকের উপপত্নীর এক অতি দুর্ব্বৃত্ত ভ্রাতা ছিল, তাহার নাম "সংস্থানক"—সে রাজার "শ্যালক" এই অভিমানে এরূপ অন্ধ ছিল যে কিছুই তাহার পক্ষে অকর্ত্তব্য ছিল না। পরম সুন্দরী বসন্তসেনার দর্শন অবধি সেই মহামূর্খও উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু চারুদত্ত-গতপ্রাণা বসন্তসেনা ঐ দুর্ব্বৃত্তের প্রদত্ত ধন, বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি উপ-

ঢৌকন সমস্তই তৃণের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। সংস্থানক বসন্তসেনার মিলনলোভে অন্ধপ্রায় হইয়া প্রতি নিয়তই তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য সহচরগণের সহিত কি দিবা রজনী সকল সময়ে রাজপথে বিচরণ করিত। অতঃপর বসন্তসেনাকে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক নিজ হস্তগত করিবে ঐ কামুকের এই অভিপ্রায় জন্মিয়াছিল। পরিশেষে একদা চারুদত্তের অভিমুখে প্রস্থিতা বসন্তসেনাকে রাজমার্গে দর্শন করিয়া স্বীয় মনোরথ পূর্ণ হইল ভাবিয়া, সে স্বীয় সহচরদ্বয়ের সহিত বসন্তসেনার অনুসরণ আরম্ভ করিল।

তখন বসন্তসেনা সানুচর সংস্থানককে তাহার অভিমুখে আসিতে দেখিয়া ব্যাধানুধাবিতা চঞ্চল-নয়না ভীতা কুরঙ্গিণীর ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। সংস্থানকও নানাবিধ ভাবভঙ্গীতে অনুনয় বিনয় সহকারে নিজের প্রণয় বিজ্ঞাপন করিয়া তাহার প্রসন্নতার আশায় বসন্তসেনার দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। অসহায়া রমণীর দুঃখে সমবেদনা দেখাইবার জন্যই যেন রজনীদেবী শোকে নিজ তিমির বসন পরিধান করিয়াছিলেন! প্রমত্তগণ তিমিরাচ্ছন্না বসন্তসেনাকে স্পষ্টত নয়নগোচর করিতে সমর্থ হইল না বটে, কিন্তু কেবল অলঙ্কারের শব্দ অনুমান করিয়া তাহার পশ্চাতে অনুধাবন করিতে লাগিল।

এইরূপ বহুদূর পর্য্যন্ত দৌড়িয়া পরিশ্রান্তা বসন্তসেনা তখন নিজ পরিচারিকাগণের নাম ধরিয়া ডাকিয়া দেখিল, কেহই তাহার সঙ্গে আসে নাই! তখন আরও ভীতা বসন্তসেনা মনে করিল দুর্ব্বৃত্তেরা অলঙ্কারের লোভে অনুসরণ করিতেছে, অতএব তাহা দিয়া এই বিপদ কাটাই;—মনে ভাবিয়া বলিল, তোমরা কারা? কেন অসহায়া অবলাকে তাড়না করিতেছ?

দুর্ব্বৃত্তদের কেহ বলিল, তুমি অবলা সরলা জানিয়াই তোমাকে ধরিতে ছুটিতেছি। কেহ বা বলিল, অবলা বলিয়াই না মারিয়া ফেলিয়া তোমাকে জীবন্তে ধরিতে চেষ্টা করিতেছি।

বসন্তসেনার অনুনয় বিনয়েও দুর্ব্বৃত্তেরা ভয়ই দেখাইতেছে, এই অনুমান করিয়া সে বলিল, তোমরা কি এই গহনার জন্য আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছ? আমি সব খুলিয়া দিতেছি, নিয়া আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও!

সংস্থানক বলিল, আমি কে জান? আমি সাক্ষাৎ দেবতা রাজপুরুষ। তুমি আমাকে দয়া কর, আমি ইহাই চাই, গহনা চাই না।

সংস্থানকের সহচর বিট ভদ্রবংশীয় যুবক লাম্পট্যে সর্ব্বস্বান্ত হইলেও একেবারে নিজের প্রকৃতি হারায় নাই।' সে বলিল,—বসন্তসেনা, বাগানের লতার ফুলগুলি তুলিয়া নিলে কি তাহার শোভা থাকে? আমরা তোমার অলঙ্কার হরণ করিতে ইচ্ছুক নহি।

সংস্থানকের বাক্যে বসন্তসেনা ঘৃণার সহিত তাহাকে বলিল, মূর্খ, তুমি শান্ত হও। আমার কাছ হইতে তুমি দূরে সরিয়া যাও।

কামান্ধ মূর্খ সংস্থানক বসন্তসেনার প্রথমোচ্চারিত "শান্ত" শব্দে "শ্রান্ত' বলিয়া বুঝিয়া নিজ মনে ভাবিল, সে দৌড়িয়া পরিশ্রান্ত হওয়াতেই বসন্তসেনা তাহাকে পরিশ্রম দূর করিবার অভিপ্রায়ে শান্ত শব্দ দ্বারা স্থির হইতে বলিয়া তাহার প্রতি নিজের অনুরাগ প্রকাশ করিতেছে! সে তখন বিটকে বলিল, সখে, শোন, শোন, বসন্তসেনা আমাকে "শান্ত" হইতে বলিয়া আপনার ভালবাসা জানাইতেছে।

বিট্ মনে মনে বলিল, ওরে মহামূর্খ, তুমি ঠিকই বুঝিয়াছ! তোমার মত কাপুরুষকে দূর করিয়া দিতেছে, আর তাহাতেই তুমি জীবন্ত ভালবাসা ফুটিয়াছে দেখিতে পাইতেছ! তখন সে প্রকাশ্যে বসন্তসেনাকে বলিল, বসন্তসেনা, তুমি যে কুলে জন্মিয়াছ এইরূপ ব্যবহার তাহার উপযোগী নহে। মনে ভাবিয়া দেখ, ধনাঢ্য তরুণ ব্যক্তিগণই বেশ্যাদের অবলম্বন। তুমি ত গণিকার গর্ভেই জন্মিয়াছ, পথে জাত লতার ন্যায়, সকলের সহিতই তোমার সম্বন্ধ রহিয়াছে। পণ্যভূত তোমার এই শরীর, ধন বিনিময়ে যে কোন ব্যক্তিই আত্মসুখ আশায় ক্রয় করিবার অধিকারী। ধন লাভই ত তোমাদের শরীর ধারণের অবলম্বন; সুতরাং প্রিয় বা অপ্রিয়, এইরূপ জ্ঞান না করিয়া, ধন দেখিয়াই ব্যক্তিবিশেষের প্রতি তোমার অনুরাগিনী হওয়া উচিত। তুমি আরও দেখ, যে পুকুরে বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ স্নান করেন, বর্ণাধম অস্পৃশ্য চণ্ডালও ত সেই পুকুরের জলেই স্নান করিয়া থাকে। যে প্রস্ফুটিত লতা মধুর আরাবকারী মধুকরের পদভরে অবনমিত হয়, সেই লতাতেই কর্কশ আরাবী বায়সও আরোহণ করিয়া থাকে। যে নৌকায় বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পার হয়েন, ইতর ব্যক্তিও ত সেই নৌকাতেই পার হইয়া থাকে! তোমার অবস্থাও এই সকল হইতে কিছুতেই ভিন্ন প্রকার নহে। যখন তুমি বেশ্যা,—তখন দেহ বিনিময়ে অর্থলাভই তোমার জীবিকার একমাত্র উপায়।

এই ব্যক্তি মূর্খ হইলেও তোমার প্রতি বড়ই অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছে, এবং এজন্য তোমাকে প্রচুর অর্থও প্রদান করিতেছে, অতএব নিজ জাতি ও ধর্ম্ম ভাবিয়া ইহার বাসনা পূর্ণ কর, প্রতিকূল হইও না।

বসন্তসেনা বলিল, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সবই ঠিক, কিন্তু পরস্পরের গুণই অনুরাগ প্রকাশ করিয়াথাকে, বল করিয়া কখনও প্রণয় গঠিত হয় না!

বিট্ বলিল, এ কথা কুলবধূর পক্ষে, তোমার ন্যায় বারাঙ্গনার পক্ষে নহে, কারণ তোমাদের ভালবাসা কেবল অর্থ ব্যয় দেখিয়া। যাহা হউক, তুমি এখন ইহাকে দূর করিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু অর্থের লোভে তোমার মা যখন বাধ্য হইয়া পড়িবে, তখন কিছুতেই আর ইহার হাত এড়াইয়া যাইতে পারিবে না।

সেই সময়ে সংস্থানক সহসা বলিয়া উঠিল, সখে, শুন, কামদেব উদ্যানে চারুদত্তকে দেখিয়া অবধি বসন্তসেনা সেই দরিদ্র চারুদত্তের ভালবাসায় পড়িয়াছে, আমি সবই জানি। এখন আমরা ক্রমে সেই চারুদত্তের বাড়ীর কাছেই আসিয়া পড়িয়াছি। অতএব সাবধান হও, দেখিও যেন আমাদের চক্ষে ধূলি দিয়া বসন্তসেনা সেখানে গিয়া সরিয়া না পড়ে!

বসন্তসেনাকে চারুদত্তের প্রতি অনুরাগিণী জানিয়া সহসা বিটের চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সে তখন মনে মনে ভাবিল, মূর্খের বুদ্ধির দৌড় দেখ, যাহা গোপন করা আবশ্যক, তাহাই আগে দেখাইয়া দিল। সে যাহা হউক, "রত্ন রত্নেরই অনুসরণ করে" এ কথাটি ঠিকই বটে! বসন্তসেনা এক্ষণে নিজ প্রণয় পাত্রের নিকটেই থাক, আর এ মূর্খও নির্বুদ্ধিতার ফল প্রাপ্ত হউক! পরে সংস্থানককে বলিল, ভাল, বাঁ দিকে না চারুদত্তের বাটী? আচ্ছা এই আঁধারে বসন্তসেনাকে ধরা যায় কিরূপে বল ত?

নির্ব্বোধ সংস্থানক তখন, "হাঁ, হাঁ, বাঁ দিকেই সেই হতভাগ্য চারুদত্তের বাড়ী," সহর্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ফেলিল। "আমি গহনার গন্ধে ও মালার শব্দে * বসন্তসেনাকে এখনই ধরিয়া ফেলিতেছি!"

বসন্তসেনা এই সঙ্কেতে তখনই নিজের গলা হইতে সুগন্ধ মালা দূর

---

* সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র অনুসারে সংস্থানকের সর্দ প্রকৃতি লোকের পারিভাষিক সংজ্ঞা "শকার"—এইরূপ অসংবদ্ধ প্রলাপপ্রায় বচনপরম্পরার বাহুল্য তাহার কথাবার্ত্তায় প্রচুর প্রয়োগ হইয়া থাকে।

করিয়া ফেলিয়া দিয়া এবং স্বীয় নূপুর যুগল খুলিয়া বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া লইল। ক্রমে সে যখন চারুদত্তের আবাসের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া পড়িল, তখন গৃহে প্রবেশ কালীন প্রদীপ দেখিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইল, কিন্তু অমনই অলক্ষিতে বস্ত্রসঞ্চালন পূর্ব্বক রদানিকার হস্তস্থিত প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া, একেবারে চারুদত্তের আবাসগৃহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল!

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি।

ক্রমশঃ

সমালোচনা

মণিমুক্তা। শ্রীরসময় লাহা প্রণীত। রসময় বাবু হাস্যরসের কবিতা লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। "মণিমুক্তা"য় তিনি কয়েকটি ইংরাজী কবিতার ভাবানুবাদ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে অবিকল অনুবাদও দৃষ্ট হয়। গ্রন্থখানিতে তাঁহার কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদে প্রায়ই মূল কবিতার ভাব রক্ষা করা যায় না। রসময় বাবুর কৃতিত্ব এই যে তিনি অনেক স্থানে তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুস্তকখানির আদর দেখিলে সুখী হইব।

৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির দুঃস্থা কন্যার সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ।

বঙ্গদেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিক স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিরাশ্রয়া দুঃস্থা কন্যার সাহায্যার্থ আমরা যে অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, সে বিষয়ে আজি পর্য্যন্ত আমরা সিদ্ধমনোরথ হইতে পারি নাই। বঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যানুরাগিগণ এবং সাহিত্যসেবিগণ এখনও এ বিষয়ে সহায়তা করেন, ইহা আমাদিগের প্রার্থনা। ৺বিদ্যানিধি মহাশয় যেরূপ প্রাণপণে ও নিঃস্বার্থভাবে বঙ্গ সাহিত্যের ও বঙ্গ ভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া সাধারণে অবশ্যই এ বিষয়ে তৎপর হইবেন আমাদিগের এইরূপ বিশ্বাস। ইহা হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগিগণের অনুরাগের মূল্য বুঝা যাইবে। আজীবন নিঃস্বার্থ সাহিত্যসেবার এই পরিণাম বাস্তবিকই বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্বদেশবাসিগণের পক্ষে লজ্জা ও কলঙ্কের কথা।

এ পর্য্যন্ত যতটাকা সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল—

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন বার এট-ল…	…	১৲
,, রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এ,	…	১৲
,, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর	…	২৲
,, রাজা হৃষীকেশ লাহা সি, আই, ই,	…	১৲
,, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি	…	২৲
,, কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এম্, এ, এম, বি,		২৲
,, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই,		৪৲
,, কবিরাজ বসন্ত কুমার গুপ্ত	…	১৲
,, রায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর	…	১৲
,, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	…	১৲
,, মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই,		১০৲
,, রসময় লাহা	…	১৷০
,, সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	..	১৲
,, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়	…	৩৲
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	…	১৲

শ্রীযুক্ত কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন	...	১৲
,, পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন	...	১৲
,, হেমচন্দ্র মিত্র	...	২৲
,, প্রফুল্ল নাথ ঠাকুর	...	২৲
,, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ (ঢাকা)	...	২৲
,, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,	...	১৲
,, চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ (কলসকাটী)	...	২৲
,, যদুনাথ কাব্যতীর্থ (বারাকপুর)	...	১৲
,, অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১৲
,, রায় শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর	...	৫৲
,, অমৃতলাল দত্ত	...	১৲
,, বীরেন্দ্রলাল বসু	...	১৲
,, চণ্ডীচরণ মিত্র (বেলঘরিয়া)	...	২৲
,, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি	...	১৲
,, কুমার শোভেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	...	১৲
,, রায় ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর	...	১৲
,, অনিলপ্রকাশ বসু বার-এট-ল	...	১৲
,, বিপিন চন্দ্র সেন	...	১৲
শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ	...	১৲
,, জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	...	২৲
,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৲
,, ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	...	১৲
,, ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন	...	১৲
,, আন্দুল মহিয়াড়ী সাহিত্য সম্মিলন	...	১২৲
	মোট	৭৫॥০
বাদখরচ ৺বিদ্যানিধি মহাশয়ের কন্যাকে দেওয়া হইয়াছে		৫০৲
সম্পাদকের নিকট মজুদ		২৫॥০

সাহিত্যসভা
১০৬।১ গ্রে ষ্ট্রীট।

শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী
সম্পাদক।

সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত

দানসাগরঃ।

মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লাল সেন দেব বিরচিতঃ।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিতঃ।

প্রথম খণ্ড—মূল্য ॥০ আট আনা। ২য়—॥০, ৩য় ॥০।

সম্পাদক, সাহিত্য-সভা,

১০৬।১ গ্রে-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গের কবিতা।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ,

কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত।

দুই ভাগের প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ আট আনা, দ্বিতীয় ভাগ দেড় টাকা মাত্র। বাঙ্গালা কবিতার উৎপত্তি হইতে ইংরাজী প্রভাবের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত ইহার ধারাবাহিক ইতিহাস সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন কবিগণের অনেক অপ্রকাশিতপূর্ব্ব কবিতা, গান ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের সূচী হইতেই ইহার গুণবত্তা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইবে।

সাহিত্য সভা পুস্তকাগার।

প্রত্যহ প্রাতে সাতটা হইতে সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত ও সন্ধ্যায় ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণের জন্য খোলা থাকে।

পুস্তকালয়াধ্যক্ষ

১০৬।১ গ্রে-ষ্ট্রীট।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায়, ৫ম খণ্ড।] ১৩২৩ সাল, অগ্রহায়ণ। [৮ম সংখ্যা।

বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ।

(১)

সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কি তাহার অনুশীলনের জন্য, বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গ সাহিত্যিকগণের মধ্যে একটু চেষ্টা বা অভিলাষ উৎপাদন করিবার আকাঙ্ক্ষায় এই প্রবন্ধটী লিখিত হইতেছে। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান সাহিত্যিক বা কবি হইতে হইলে. অনেকের বিবেচনায়, সংস্কৃত কাব্যের অনুশীলন এখন এক প্রকার নিষ্প্রয়োজন বা অকিঞ্চিৎকর। যাঁহারা এই মত প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা সকলই ইংরাজি সাহিত্যের অনুশীলনের ফল, ইংরাজী সাহিত্যের ভাব গুলিকে বাঙ্গালা ছাঁচে ঢালাই করিতে পারিলেই বঙ্গসাহিত্যের অপেক্ষিত পুষ্টি হইবে এবং তাহার দ্বারাই সহৃদয় হৃদয়াকর্ষক সৌন্দর্য্য ও বর্দ্ধিত হইবে। বঙ্গ সাহিত্য এখন যে ভাবে সমুন্নত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালীর রুচি ও আকাঙ্ক্ষা যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ও নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, ভাবের জন্য, সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্য, বা রীতির জন্য অথবা অলঙ্কার সম্পদের জন্য, এক্ষণে আর বাঙ্গালা সাহিত্য কোন প্রকারেই সংস্কৃত সাহিত্যের মুখাপেক্ষি নহে, সুতরাং এহেন সময়ে সংস্কৃতসাহিত্যের বা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি বা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। নব্য সাহিত্যিকগণের এই প্রকার মতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া যাঁহারা সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে উদ্যত হন, তাঁহারা যে অজ্ঞান বশতঃ বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও সৌন্দর্য্যের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়া থাকেন, তাহাই

বুঝাইবার জন্য এই প্রবন্ধটীর অবতারণা করা যাইতেছে—আশা আছে, নিরপেক্ষ সাহিত্যিকগণ এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়কয়টীর প্রতি অগ্রেই অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া, একটু অবধানের সহিত ইহার আলোচনা করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

কথাটা হইতেছে—এই যে, অধিকাংশ বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণ যে ভাবে এখন সাহিত্যের পুষ্টি করিতে চাহেন, তাহা দ্বারা বাঙ্গালীর জাতীয় অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে পারে কি না তাহাই ভাল করিয়া বুঝিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। কেন যে বর্ত্তমান সময় এই প্রকার অলোচনার উপযুক্ত, তাহাও বলি।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের গন্তব্য পথের এমন একটী স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, যে স্থলে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে এখন একবার অগ্র ও পশ্চাৎ দুই দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেই হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম আলোক ছটার উন্মাদিনী ও আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে পশ্চাতে না চাহিয়া, পশ্চাতে কি ছিল বা কি আছে তাহা ক্ষণকালের জন্য না ভাবিয়া, যতবেগে একটা পরাধীন জাতির বিজেতৃ জাতির আদর্শের দিকে দৌড়ান সম্ভব পর, তাহা আমরা দৌড়িয়াছি, নানা কারণে আর কিন্তু সেইরূপ বেগে দৌড়ান আর সম্ভবপর নহে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই আজ বুঝিতেছেন এবং ক্রমে আরও বুঝিবেন। আত্ম সমাজে পাশ্চাত্য আদর্শের সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ও আমরা এ পর্য্যন্ত যত কার্য্য করিয়াছি তাহার মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টিই যে আমাদের সর্ব্ব প্রধান ও উল্লেখযোগ্য কার্য্য, তাহা কে অস্বীকার করিবে? সাহিত্য মুকুরেই জাতীয়জীবনের আদর্শ প্রতিবিম্বিত হয় এবং সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠার দ্বারা আত্মোৎকর্ষ লাভ করিবার জন্য সভ্য জাতিমাত্রই আবহমান কাল হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, সমগ্র সভ্যজাতির অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস ইহাই আমাদিগকে নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে বুঝাইয়া থাকে।

এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচারের আরম্ভের সময় হইতে এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বাঙ্গালার শিক্ষিতসম্প্রদায় ব্যগ্রতা ও আবেগের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীর গৌরব কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথপর্য্যন্ত সকল সাহিত্যিকই এই সাধনায় দীক্ষিত, জাতীয় সাহিত্যের দ্বারা আদর্শ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক

জাতির সর্ব্বতোমুখ অভ্যুদয় বিধানই হইল এই সাধনার লক্ষ্য, ইহা কে অস্বীকার করিবে? এক্ষণে কিন্তু দেখিতে হইবে যে এই সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া আমরা আমাদের লক্ষ্যের দিকে কতটা অগ্রসর হইয়াছি এবং সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে রাজা রামমোহন রায় হইতে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত আমাদের বরণীয় সাহিত্যরথিগণ যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ প্রতিমা গঠিত হইয়াছে কিনা।

আমাদের বিবেচনায় এ পর্য্যন্ত আমাদের বঙ্গভাষায় এমন একখানি সাহিত্যও প্রস্তুত হয় নাই, যাহার সাহায্যে আমাদের জাতীয় জীবন প্রকৃত পক্ষে স্বীয় লক্ষ্যের দিকে নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইতে পারে, অর্থাৎ সাহিত্যের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা আমাদের জাতীয় জীবনকে অভ্যুদয়ের ও নিঃশ্রেয়সের অনুকূল ভাবে গঠন করিতে পারি।

কেন যে, এই প্রকার বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহাও বলি।

বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাকে বাঙ্গালী হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে যিনি—শ্লাঘা বোধ করিয়া থাকেন, এমন শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়রূপ বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হইলে একমাত্র ধর্ম্মই তাহার সুদৃঢ় ভিত্তি হওয়া উচিত এবং সেই ধর্ম্ম আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণসেবিত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রমূলক সনাতন ধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ধর্ম্ম হইতেই পারে না, আমরা যে কেবল ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্ম চাহি, তাহা নহে, আমরা ধর্ম্ম চাহি, কাম অর্থ ও মোক্ষের জন্য, সুতরাং ধর্ম্মের ঐকান্তিক সাধনা করিতে গেলে আমরা অর্থ কাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবহার ক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব হারাইয়া অকর্ম্মণ্য ও বিরক্তিপ্রবণ সন্ন্যাসী হইয়া পড়িব, এই প্রকার শঙ্কা এক্ষেত্রে উদিতই হইতে পারে না।

সেই ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে এবং সেই ধর্ম্মের বলে অর্থ কাম ও মোক্ষলাভ করিতে হইলে, আমাদের চতুরাশ্রম প্রণালীর সংস্কার ও পরিপুষ্টি যে একান্ত আবশ্যক তাহা কে অস্বীকার করিবে?

আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্যপূত ছাত্রজীবন বহুদিন হইল বিনষ্ট হইয়াছে। বিলাসবাসনা করাল রাক্ষসীর ন্যায় আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রধান ভরসা স্থল ছাত্র জীবনকেও গ্রাস করিবার জন্য বিকট আস্য ব্যাদান করিয়া

আজ বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অপ্রতিহতভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছে, দুঃখের বিষয় বঙ্গে এখনও এমন সাহিত্যের সৃষ্টি হইল না, যাহার সাহায্যে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা সহিত ছাত্র জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালী ছাত্র ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারে, অতীত যুগে সংস্কৃত সাহিত্য যে ব্রহ্মচর্য্য, গুরুভক্তি, সংযম ও সরলতার আদর্শভূত ছাত্রজীবনের গৌরবোজ্জ্বলিত মধুর চিত্র তাৎকালিক হিন্দুসমাজের মানসপটে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, আজ সেরূপ চিত্র নব্য বাঙ্গালীর সাহিত্য ভাণ্ডারে কয়টী খুজিয়া পাওয়া যায়? কই সে উত্তঙ্ক? কই সে উদ্দালক? কোথায় সেই বেদ? কোথায় সে আরুণি? আর কোথায় সেই বরতন্তু শিষ্য কৌৎস? সমগ্র নব্য বাঙ্গালা সাহিত্য খুজিয়া কই তেমন একটী মধুর ও পবিত্র আদর্শ বাহির কর দেখি? বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টির অপূর্ব্ব চাতুরী ও এবিষয়ে পরাঙ্মুখ, রমেশচন্দ্র, দামোদর, তারকনাথ প্রভৃতি ঔপন্যাসিক সাহিত্যিকগণের লেখনী এই চিত্র অঙ্কিত করিতে অগ্রসর হয় নাই। এই সকল সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকগণ যে সকল জীবনের চিত্রণ কার্য্যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা কিছুতেই ছাত্রজীবনের আদর্শ হইতে পারেনা, আমাদের ছাত্রসম্প্রদায় বর্ত্তমান সময়ে কোন প্রকার তাদৃশ সমুন্নত আদর্শ সাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পায় না বলিয়া তাহারা এক প্রকার নিস্পন্দ বা উদ্যমহীন হইয়া পড়িতেছে ইহা কে অস্বীকার করিবে? ফুটবল খেলায় তাহাদের উৎসাহ আছে, সত্য বটে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাহারা প্রাণপাতী পরিশ্রম করে তাহাও ঠিক, অর্দ্ধোদয় প্রভৃতি যোগ উপস্থিত হইলে কিয়ৎকালের জন্য দেশহিতৈষণার বশে তাহারা বিপৎ সমুদ্রে অবগাহন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না একথাও কেহ অস্বীকার করে না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের জীবন যে বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন ভারতের পবিত্র ছাত্র জীবনের আদর্শে গঠিত হইতেছে, ব্রহ্মচর্য্য ও সংযমের কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাহারা সকলের অবলম্বনভূত পবিত্র গার্হস্থ্যের গুরুভার বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে একথা কে স্বীকার করিবে? তাহারা লেখা পড়া শিখে কেন? তাহাদের অধিকাংশের জীবনের উদ্দেশ্য যে কোন প্রকারে অর্থার্জ্জন ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে ইহা বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন হয় না, লেখা পড়া শিখিয়া একটা বড় চাকরী যোগাড় করিতে পারিলে তাহারা এবং তাহাদের অভিভাবক বর্গ জীবনের সাফল্য

বোধ করিয়া থাকেন এ অর্থার্জ্জন ও তাহাদের কিসের জন্য ? বিলাসের জ্বালাময়ী বাসনার চরিতার্থতা সম্পাদনই কি তাহাদের অর্থার্জ্জনের মুখ্যতম উদ্দেশ্য নহে ? কিসে আমি আমার পুত্র পরিবার লইয়া আয়াসে থাকিব, নিত্য নিত্য নূতনতর আমোদের স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইব নিজের স্বার্থসিদ্ধির পথে যাহা কণ্টক, তাহার উদ্ধার করিতে হইলে যদি মনুষ্যত্বও বর্জ্জন করিতে হয় তাহাও করিব, ইহাই ত হইল এখন বাঙ্গালী জীবনে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা। এই বিলাস বাসনারূপ করাল রাক্ষসীর সর্ব্বগ্রাসী কবলে আমাদের ছাত্রবর্গ পতিত হইয়া যাহাতে মনুষ্যত্ব হীন না হয়, তাহার জন্য আমাদের জাতীয় সাহিত্য এ পর্য্যন্ত কয়টী আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে ? কয়জন সাহিত্যিকের সাহিত্য সৃষ্টি প্রভাবে আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের ভিত্তিস্বরূপ এই ছাত্রজীবন ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর সাধনার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে ? ছাত্রজীবনের কথা ছাড়িয়া গার্হস্থ্যজীবনের আলোচনা করা যাক্, এদিক্ও নৈরাশ্যের সূচীভেদ্য অন্ধকারে নিবিড়ভাবে আবৃত, পশ্চিমের সভ্যতার যাহা সার তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা আজ লোলুপ হইয়াছি—ইহা সত্য বটে, কিন্তু, সেই সঙ্গে আমাদের প্রকৃতির অনুকূল চিরাভ্যস্ত প্রাচ্য সভ্যতার যাহা কিছু সার সেইগুলিকে একে একে পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়া আজ আমরা মনুষ্য নামধারী এক কিম্ভূত কিমাকার জীবে পরিণত হইয়া পড়িতেছি. গার্হস্থ্য যে আত্মভোগের জন্য নহে, বিলাস বাসনার চরিতার্থতাই ইহার উদ্দেশ্য নহে বর্ত্তমানেই ইহা প্রতিষ্ঠিত নহে অতীত ভবিষ্যতের স্মৃতি ও গৌরবের অপূর্ব্ব মিশ্রণের দ্বারা আমাদের বংশের আমাদের জাতির এবং পরিশেষে সর্ব্বমানবজাতির ঐহিক ও পারত্রিক অভ্যুদয়ের সাধনরূপে ইহা বর্ত্তমানের সহচর মাত্র, ইহাই হইল হিন্দুর গার্হস্থ্যের পরিচয়, এই পরিচয় পাইবার জন্য আমরা এখনও সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত সাহিত্যেরই অপেক্ষা করিয়া থাকি এই পরিচয়ের সাড়া এখনও বাঙ্গালা সাহিত্যে পাওয়া যায় না কেন ?

প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়ী সৃষ্টির মধ্যে—যাহা কিছু সন্নিবিষ্ট আছে, সুন্দর হউক বা অসুন্দর হউক, পবিত্র হউক বা অপবিত্র হউক, ললিত হউক বা বীভৎস হউক, তাহারই যথাযথ চিত্রণ করাই কবির কার্য্য, কবির কল্পনা সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্য, এই সৌন্দর্য্য জ্ঞান কোন প্রকার নৈতিক শৃঙ্খলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নহে, অনাবৃত নভোমণ্ডলে অপ্রতিহত গন্ধীয়মারুতের

ন্যায় কবি প্রতিভা ধর্ম্ম, সমাজ ও লোকমর্য্যাদাজ্ঞান দ্বারা প্রতিহত বা সংযত হইবার নহে, তাহা সত্যপক্ষপাতিনী হইবে মাত্র, কিন্তু তাই, বলিয়া সে পবিত্র বা লোক সম্মানিত বা লোক মত পুষ্ট সত্যেরই পক্ষ পাতিনী হইবে, এরূপ নিয়ম মানিলে চলিবে কেন? যাহা সত্য তাহা পবিত্রও হউক আর অপবিত্র হউক, তাহা স্বর্গীয় হউক বা নারকীয় হউক, সে বিষয়ে বিচার করিলে চলিবে কেন? যে হেতু তাহা সত্য, সেইহেতু তাহা কবির বর্ণনীয় এবং তাহারই যথাযথ-ভাবে বর্ণন করিতে পারাই কবিত্ব, এই প্রকার বিশৃঙ্খল মতের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীর কাব্য উপন্যাস বা নাটকজাতীয় সাহিত্য নির্ম্মাণে যাঁহারা সমালোচনাদি দ্বারা উৎসাহ দেন বা ঐরূপ কার্য্য স্বয়ং করেন, আমরা তাঁহাদের সহিত কখনই একমত হইতে পারিবনা, প্রত্যুত জন্মা-ন্তরকৃত তপস্যার প্রভাবে লব্ধ কবিত্বশক্তির অপব্যবহার দ্বারা লক্ষ্যভ্রষ্ট সুতরাং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহারা যে বঙ্গীয় সমাজের বিশেষরূপে অনিষ্ট করিতেছেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে আমাদের জাতীয় সমাজে ঘোষণা করিব। এই কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া আবার লোকহিতৈষণা প্রণোদিত সংস্কৃত অমর কবিদিগের সরস ও সদ্‌ভাবপূত বরণীয় সাহিত্যের উপাসনায় জন্য প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিব। তাঁহাদের আবেগময়ী রসসৃষ্টিকুশল কল্পনাকে ধর্ম্মময় লোকহিতকর বিরাট সংস্কৃত হিন্দুসাহিত্যের আদর্শে বঙ্গ সাহিত্যে আদর্শ সৃষ্টি করিবার জন্য সাদরেও সগৌরবে আমন্ত্রণ করিব।

মোট কথায় আমরা বলিতে চাহি—যে ক্ষণিক আনন্দের জন্য কাব্য রচনা নহে, অপরিণতমতি চঞ্চল প্রকৃতি যুবার বা যুবতীর দুর্দ্দমনীয় বিলাস বাসনার অগ্নি জ্বালায় ঘৃতাহুতি দানকরাওজাতীয় সাহিত্যের কার্য্য নহে—বাঙ্গলার লোকো-ত্তর প্রতিভাসম্পন্ন মহা কবি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জীবনের সন্ধ্যাকালে এই মহান্ সত্যের বিভূতি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তিনি তাহা আরও অনেক পূর্ব্বে ইহা বুঝিতে পারেন নাই, যখন তিনি বুঝিয়া ছিলেন, তখন তাঁহার সেই কবিত্ব শক্তি, সেই অপূর্ব্ব মধুর কল্পনা, সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিন্যাস পটুতা—বার্দ্ধক্যের তীব্র অবসাদ যষ্টির আঘাতেভগ্নশীর্ষ ও উন্মাদনা হীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাই তাঁহার দেবী চৌধুরাণী তাঁহার সীতারাম বা তাঁহার আনন্দ মঠ দ্বারা—যে জন্য তাঁহাকে সেই বৃদ্ধ বয়সে লেখনী ধারণ করাইয়ছিল, সে কার্য্য সম্যগ্‌ভাবে

সাধিত হয় নাই—কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী চন্দ্রশেখর ও ভ্রমরের ন্যায় তাঁহার শেষ জীবনের এই তিন খানি উপন্যাস তাঁহার অভিমত আদর্শ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই, লোকচরিত্রঅঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ তিনখানি উপন্যাসে তিনি প্রাণের আবেগময়ী ভাষার সাহায্যে সেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেননাই, যাহার সৃষ্টি করিতে তরুণ বয়সে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালী সাহিত্যের স্রোত ; এতদিন যে দিকে ঝুঁকিয়া বহিতেছে, তাহার বিপরীত দিকে তাহাকে ফিরাইতে হইবে, যাহারা বাঁচিয়া আছে; যাহাদের প্রভুত্বার গৌরব সূর্য্য দিবারাত্রির মধ্যে ক্ষণকালের জন্য অস্তমিত হয় না ধনে মানে জ্ঞানে ঐশ্বর্য্য ও গৌরবে যাহারা অতুলনীয় হইয়া এখন সগর্ব্বে পৃথিবীতে মাথা উঠাইয়া চলিতেছে; তাহাদের সাহিত্যের গতি প্রকৃতি ও ভাব লইয়া আমাদের ন্যায় অধঃপতিত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতির জীবনপ্রদও অভ্যুদয় কর সাহিত্যের সৃষ্টি করা সম্ভবপর নহে, আমাদের অতীত গৌরবের দিনে যে স্যাহিত্য রচিত হইয়া আমাদের ঐহিকও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয়ের পথকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল, সেই সংস্কৃত সাহিত্যের গতি প্রকৃতিও ভাবের খবর আমাদিগকে ভাল করিয়া লইতেই হইবে, আরও একটী কথা এই যে সাহিত্য সৃষ্টির পূর্ব্বে, যে জাতির জন্য স্যাহিত্য সৃষ্টি করিবে, সেই জাতির অস্তিত্ব প্রসার ও অভ্যুদয়ের প্রকৃতি কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। তাহা না বুঝিয়া যদি সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উদ্যত হও, তাহা হইলে অনেক স্থলেই তুমি শিব গড়িতে বানর গড়িয়া বসিবে, সুতরাং সময় থাকিতে সাবধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। এবারে এই পর্য্যন্ত, আগামী বারে সংস্কৃত সাহিত্যের গতি প্রকৃতিও ভাবের স্বরূপ দেখাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমাদের জাতীয় উন্নতির একটী সূত্র।

"নিজে উন্নত" বা "উন্নতি করিতে সমর্থ" এরূপ আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান না থাকিলে বাধা সত্ত্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও কাহারও উন্নতিলাভ ঘটে না—ইহা একটী সাধারণ নিয়ম। কারণ, যে ব্যক্তি নিজেকে কোন একটী বিষয়ে উন্নত বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তিই বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া অপর বিষয়ে উন্নতি-লাভে প্রবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু, যে ব্যক্তি নিজেকে কোন একটা বিষয়েও উন্নত বলিয়া জানে না, সে ব্যক্তি বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া অপর বিষয়েও উন্নতি-লাভ করিতে পারে না। যদি কোথাও দেখা যায়, কোন ব্যক্তি নিজেকে কোন বিষয়েও উন্নত বলিয়া বুঝে না, অথচ সে ব্যক্তি বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে ব্যক্তি অন্ততঃ পক্ষে নিজেকে উন্নতিলাভে সমর্থ বলিয়া জানে, নচেৎ বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া উন্নতিলাভ তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতএব "নিজে উন্নত" বা "উন্নতি লাভে সমর্থ" এরূপ আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান না থাকিলে বাধা সত্ত্বে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কখন কাহারও উন্নতি লাভ ঘটে না।

উন্নতি লাভের ইহাই যদি সাধারণ নিয়ম হয়, এবং বর্ত্তমান অবস্থায় যদি আমাদের উন্নতি লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের কোন্ উপায় অবলম্বনীয়, কোন্ পথ অনুসরণীয় ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই বোধ হয় চিন্তার বিষয়, ইহা বুদ্ধিমান শ্রেয়স্কামী ব্যক্তি মাত্রেরই ভাবিবার বিষয়।

এই পথে চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যাহা আমাদের গৌরবের জিনিষ, যাহার জন্য আজও আমরা প্রধান, আজও আমরা গর্ব্ব করিতে পারি, আমাদের তাহারই বিষয় প্রথমে সবিশেষ জ্ঞানলাভ এবং তাহারই প্রচার অত্যাবশ্যক। এই জ্ঞানলাভ বা প্রচারকার্য্যের সুবিধা না থাকিলে আমাদের উন্নতির পথ সংকীর্ণ হইতে হইতে ক্রমেই রুদ্ধ হইয়া আসিবে। কারণ, আমরা যদি আমাদের গৌরবের বস্তুর সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া সমধিক আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন না হই, তাহা হইলে উন্নতিশীল স্বাধীন জাতি, দ্রুতবেগে উন্নতির পথে

অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে সকল বিষয়েই পশ্চাতে ফেলিয়া দিবে, এবং তখন আমাদের আত্মসম্মান-বোধোপকরণের অভাববশতঃ প্রতিদ্বন্দিতাক্ষেত্রে আমাদের হতাশার সঞ্চার হইবে এবং ক্রমে আমাদের উন্নতির প্রবৃত্তি পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তদ্রূপ, আমাদের গৌরবের বস্তুর প্রচারকার্য্য না থাকিলে সাধারণভাবে আমাদের উন্নতির প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে; কারণ, যাহারা নবীন সংসারে প্রবেশ লাভ করিতেছে, তাহাদের সকলের পক্ষে ওরূপ জ্ঞানলাভ প্রচার ভিন্ন অসম্ভব হয়। প্রচারকার্য্য না থাকিলে কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ জ্ঞান সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু সাধারণভাবে বহুলোকের পক্ষে ওরূপ জ্ঞানলাভ কখনই সম্ভবপর নহে।

অতএব আমাদের যদি উন্নতিলাভ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমাদের যাহা গৌরবের জিনিষ অগ্রে তাহারই সবিশেষ জ্ঞানলাভ প্রয়োজন, অগ্রে আমাদের তাহারই প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অবশ্য, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে উন্নত নহে, বা যাহার নিজেকে "উন্নতি করিতে সমর্থ" বলিয়া জ্ঞান নাই, তাহার উন্নতি করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বনীয়, কোন্ পথ অনুসরণীয় তাহা এস্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

যাহা হউক, এখন জিজ্ঞাস্য—আমাদের সেই গৌরবের জিনিষ কি? আমরা কি লইয়া এখনও গর্ব্ব করিতে পারি? কিসের জন্য এখনও আমরা প্রধান, এখনও আমরা গণ্যমান্য হইতেছি?

একটু চিন্তা করিলে মনে হয় যে, আজও আমরা যাহা লইয়া গর্ব্ব করিতে পারি, আজও আমরা যাহার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের গুরুর আসন গ্রহণ করিতে পারি, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এখনও পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য বিবুধগণ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিতে বহুযত্ন করিতেছেন,—কিন্তু তথাপি তাঁহারা ইহা আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। এখনও তাঁহারা এদেশে আসিয়া পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, এখনও পর্য্যন্ত ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের বিশেষ আদরের সামগ্রী, বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু—একথা আমাদের মধ্যে অনেকেই বিদিত আছেন, অতীতের ইতিহাসও ইহা সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে। ফলতঃ এই জন্য বলিতে হয়, ভারতীয় দর্শন যে ভারতবাসীর এখনও গৌরবের বস্তু, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু এমনই দুঃখের বিষয় এই যে, আজ আমরা যাহার জন্য প্রধান ও গণ্যমান্য, আমরা তাহারই বিষয় সম্যক্ অবগত নহি। আজ আমাদের অনেক দর্শনশাস্ত্রীয় গ্রন্থ আমাদের দেশে মুদ্রিত না হইয়া ইংলণ্ড, জর্ম্মানি, ফ্রান্স, ও রুষিয়াতে মুদ্রিত হইতেছে। আজ আমরা আমাদের দর্শনশাস্ত্রের তাৎপর্য্য আমাদের ভাষায় যত অবগত হইতে পাই, তদপেক্ষা অধিক ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার সাহায্যে অবগত হইয়া থাকি। অধিক কি আমাদের মধ্যে অনেকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের পূর্ব্ব গৌরব অবগত হইতেছেন। জানি না, কোলব্রুক ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি না জন্মিলে আমাদেরই দর্শন-বেদ-বেদান্ত আমাদের অনেকের গৃহে বিরাজ করিত কিনা? জানি না, স্যার উইলিয়াম্ জোন্স এসিয়াটিক সোসাইটীর সৃষ্টি না করিলে আমাদের দর্শনশাস্ত্রের বহুলুপ্ত গ্রন্থরত্ন উদ্ধার হইত কি না? রুষরাজ্যের অর্থে জর্ম্মান পণ্ডিতগণের সাহায্যে যে সংস্কৃত অভিধান রচিত হইয়াছে, অদ্যাবধি ভারতবাসী ভারতীয় ভাষায় তাহা অপেক্ষা উত্তম অভিধান রচনা করিতে পারিল না। ম্যাক্সমুলরের "ভারতীয় ষড়দর্শন" ও "প্রাচ্য পবিত্র-গ্রন্থমালা" প্রকাশিত না হইলে টুবনারের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত না হইলে, কাউয়েল, গাফ্, জেকব, উইলসন, ডুসেন প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করিতে না পারিলে আমাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের দর্শনপ্রভৃতি শাস্ত্রসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিতেন। তাই বলিতে হয়—যাহা লইয়া আজ আমরা গর্ব্ব করিতেছি—তাহারই সবিশেষ পরিচয়পর্য্যন্তও আমরা অবগত নহি, তাই বলিতে হয়—আমাদের উন্নতিলাভের উপায়চিন্তা করিলে আমাদের মন দুঃখসাগরেই নিমগ্ন হয়।

কিন্তু, এই দুঃখের সীমা এই স্থলেই শেষ হয় না, এতদপেক্ষা আরও দুঃখের বিষয় রহিয়াছে। দেখা যায়, আমাদের মধ্যেই অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে, আমাদের দর্শনশাস্ত্র পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট নহে, অর্থাৎ যাহা লইয়া আমরা আমাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছি, তাহাই পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনায় নিকৃষ্ট, সুতরাং এ পথ দিয়া আমাদের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত, ইত্যাদি।

যাহা হউক, এই কথাটী কতদূর যুক্তিসহ তাহা স্থির করিতে হইলে, আমাদের দেখিতে হইবে এজন্য ইহারা কি কি যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহার পর দেখিতে হইবে সেই সকল যুক্তির সারবত্তাই বা কতদূর।

ইঁহারা এজন্য যে সকল যুক্তি সাধারণতঃ প্রদর্শন করেন, তাহাদের মধ্যে প্রথম এই যে, পাশ্চাত্যপ্রদেশে তদ্দেশীয় দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস প্রভৃতি যেরূপ পাওয়া যায়, আমাদের দর্শনশাস্ত্রের সেরূপ কিছু নাই। আমাদের এরূপ কোন গ্রন্থই নাই, যাহাতে আমাদের দেশের দার্শনিক মতগুলি একসঙ্গে জানিতে পারা যায়,—যাহাতে তাহাদের উৎপত্তি, বিস্তার, বিকৃতি এবং উদ্ভাবনকর্ত্তা-দিগের চরিত্রপ্রভৃতি এক সঙ্গে জানিতে পারা যায়। দার্শনিক চর্চ্চা ভালরূপ হইলে এরূপ গ্রন্থের অভাব কখনই সম্ভবপর নহে! দর্শনশাস্ত্রে প্রথমপ্রবৃত্তগণের পক্ষে এ জাতীয় বিবরণ নিতান্ত প্রয়োজন হয়। দর্শনশাস্ত্রের বহুল প্রচার কামনা হইলে এ সকল কথা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। দেখ, পাশ্চাত্য দর্শনের কত লোকে কত ইতিহাস রচনা করিয়াছে। কতলোক তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়প্রদানার্থ তাহাদের উৎপত্তি, স্থিতি, বিকৃতি, প্রচার, এবং মতপ্রবর্ত্তকগণের আবির্ভাবকাল ও চরিত্রপ্রভৃতি কতরূপে সুসজ্জিত করিয়া কত গ্রন্থ রচনা করিয়াছে। কিন্তু এরূপ গ্রন্থ আমাদের কি একখানিও আছে? এইজন্য বলিতে হয়, আমাদের দর্শনচর্চ্চা ভালরূপ হয় নাই; সুতরাং আমাদের দর্শনশাস্ত্র লইয়া গর্ব্ব করা বা আত্ম মর্য্যাদা জ্ঞানের বৃদ্ধির চেষ্টা করা বৃথা।

দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, আমাদের দর্শনশাস্ত্র অতি প্রাচীনকালের জিনিষ; অতএব তাহা আধুনিক কালের জিনিষ অপেক্ষা পূর্ণতর বা নির্দ্দোষ হইতে পারে না। কারণ, অভিব্যক্তিবাদের সিদ্ধান্তই এই যে, জগৎ দিন দিন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে, জগতের জ্ঞানসম্পত্তি, বলবীর্য্য বিদ্যাবুদ্ধি সকলই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কালে যাহা যেরূপ ছিল, আজ তাহা অনেক উন্নত ও অনেক ভাল হইয়াছে। তাহার পর এদেশেও আধুনিক কালে যে দর্শনচর্চ্চা হইয়াছে, তাহাও আধুনিক পাশ্চাত্য-দর্শন অপেক্ষা কোন রূপেই উত্তম হইতে পারে না। আধুনিক ভারতীয় দর্শন যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে সময় ভারত পরাধীন, ম্লেচ্ছশাসনে উৎপীড়িত, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন যে সময় উৎপন্ন হইয়াছে, সে সময় ইয়োরোপ স্বাধীন, সমগ্র পৃথিবী তাহার অধীন। পরাধীনের চিন্তা বা চেষ্টা কখন স্বাধীনের চিন্তা বা চেষ্টার সমকক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং, ভারতীয় আধুনিক দর্শন পাশ্চাত্য আধুনিক দর্শনের মত পুষ্ট হইতে বা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

তৃতীয় যুক্তি এই যে, আমাদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত, যে সকল দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বহু দৃষ্টান্ত, আজকাল দেখা যাইতেছে, ভ্রান্ত এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নহে। দৃষ্টান্তবলেই লোকে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সুতরাং, আমাদের দর্শনের মধ্যে বহু ভ্রান্ত-সিদ্ধান্তই প্রবেশলাভ করিয়াছে, আর তাহার ফলে আমাদের দর্শনশাস্ত্র পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র হইতে কোন মতেই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। অতএব এরূপে আমাদের আত্মমর্যাদাজ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা নিষ্ফল হইতে বাধ্য।

চতুর্থ যুক্তি এই যে, আমাদের দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থগুলির রচনাপ্রণালী, সাজান পদ্ধতি ও ব্যাখ্যারীতি প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে মনে হইবে—উহা যেন নিতান্ত অপরিণত বুদ্ধিপ্রসূত, একজন প্রথমশিক্ষার্থী গুরূপদেশসাহায্য ভিন্ন ইহার ভিতর প্রবেশ করিতেই পারে না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যদর্শনে অন্ধও যেন নিজ গন্তব্যপথ দেখিতে পায়, সকল কথাই বুঝিতে পারে। আমাদের ভালরূপদর্শন চর্চা হইলে কি এইরূপ অপূর্ণতা, এরূপ ত্রুটী পরিলক্ষিত হইত? এইজন্য বলিতে হয়—আমাদের দর্শন লইয়া আমাদের গৌরবজ্ঞান করা নিষ্প্রয়োজন।

পঞ্চম যুক্তি এই যে, আমাদের দর্শনশাস্ত্র ঋষিবাক্য ও বেদকে প্রমাণ অর্থাৎ অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া অনেক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। ইহার ফলে আমাদের দার্শনিকসিদ্ধান্ত অনেকই ভ্রমসংকুল হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, ঋষিবাক্য ত মনুষ্যবাক্য, এবং বেদ মনুষ্যকর্তৃক রচিত। তাহাতে মনুষ্যোচিত ভ্রমপ্রমাদ স্থান পাইতে বাধ্য। মনুষ্য কখন অভ্রান্ত বা সম্যক্‌জ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারে না। যেহেতু, মনুষ্যের জ্ঞানলাভের যে সকল করণ (অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি), তাহারা সকল প্রকার বিষয় গ্রহণ করিতে অসমর্থ। আজকাল যন্ত্রসাহায্যে কত চক্ষুকর্ণের অগোচর পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছে। এই সকল পদার্থের অস্তিত্ব পূর্বে সকলের অজ্ঞাত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে। অতএব ঋষিবাক্য ও বেদকে অভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া দর্শনশাস্ত্র রচনা করায় আমাদের দর্শনশাস্ত্র যে নিতান্ত ভ্রমসংকুল, সত্যান্বেষণের বিশেষ অন্তরায় হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহার পর, এই সকল ঋষিবাক্য ও বেদ অতি প্রাচীনকালের জিনিষ। এই সকল ঋষি ও বেদকর্তা যে সময় বিদ্যমান ছিলেন, সে সময় জগৎ একরূপ অন্ধতমসাচ্ছন্ন

ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সময়ে লোকের জ্ঞানভাণ্ডার কিরূপ সংকীর্ণ ছিল, তাহা সেই বেদাদি গ্রন্থমধ্যেই মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব অতি প্রাচীনকালের ঋষিবাক্য ও বেদকে অবলম্বন করিয়া আমাদের দর্শনশাস্ত্র নানা দোষদুষ্ট হইয়াছে, আর তজ্জন্য তাহা লইয়া আমাদের আত্ম-মর্য্যাদাবৃদ্ধির আশা করা বৃথা, আমাদের দর্শন লইয়া বর্ত্তমান নিত্যনূতন-প্রসবিনী পাশ্চাত্য সভ্যতার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে বাতুলতাবিশেষ বলিতেই হইবে।

এইরূপ যুক্তি আজকাল আমাদের মধ্যে অনেকেই প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং সাধারণ লোককে তদনুযায়ী শিক্ষা প্রদানও করেন। কিন্তু, আমাদের বোধ হয় এই সকল যুক্তির মধ্যে অনেক অসঙ্গতি আছে, ইহাদের সর্ব্বাংশ নির্দ্দোষ নহে। যে কারণে আমরা এই সকল যুক্তিকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করি না তাহার কতিপয় এই,—

প্রথম—সত্য বটে, ঠিক পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের ন্যায় আমাদের দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস নাই। সত্য বটে, আমাদের একখানি গ্রন্থমধ্যে আমাদের যাবতীয় দার্শনিকমতের সমাবেশ, উহাদের উৎপত্তি, বিস্তৃতি, বিকৃতি মতপ্রবর্ত্তকের চরিত্র ও আবির্ভাবকাল প্রভৃতি নাই; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আমাদের দর্শনশাস্ত্রকে বা আমাদের দর্শনচর্চ্চাকে পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য দর্শনচর্চ্চা অপেক্ষা হীন বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। দর্শনের যাহা প্রতিপাদ্য, দর্শনের যাহা প্রয়োজন, তাহা লইয়া পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনা করিলে আমাদের দর্শন পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসনই লাভ করিবে।

ইহার কারণ, ভালরূপ দার্শনিক চর্চ্চা করিতে হইলে যে, দার্শনিক ইতিহাস 'সংকলন' করা একান্ত আবশ্যক হয়, এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না। ইতিহাসের লক্ষ্য ঘটনাবলীর পারম্পর্য্যপ্রদর্শন, এবং ঘটনাবলীর মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধনির্ণয়। অতএব দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস বলিলে দার্শনিকমতের বিবরণ, দার্শনিক মতসমূহের উৎপত্তি ও স্থিতিসংক্রান্ত পারম্পর্য্য এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধপ্রদর্শন প্রভৃতিই বুঝায়। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস বলিলে দার্শনিকমতের বাদপ্রতিবাদ, অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি এবং সিদ্ধান্তের

ভিত্তি প্রভৃতির সম্যক্ প্রদর্শন বুঝায় না। প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যেই এই সকল কথা স্থান পাইয়া থাকে। সুতরাং, দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া কখনই দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য প্রভৃতি সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে যে সকল বিষয় স্থান পাইয়া থাকে তাহারা অপ্রবৃত্ত ব্যক্তিকে প্রবৃত্ত করাইবার পক্ষে কতকটা উপযোগী হয়, তাহারা সাধারণের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রালোচনায় একটা ইচ্ছার উদ্রেক মাত্র করিয়া দিতে পারে, তাহারা দর্শনচর্চ্চার বিস্তৃতির পক্ষে সহায়তা করিতে পারে, কিন্তু তাহারা কখনই একজনকে অসাধারণ দার্শনিক করিয়া তুলিতে পারে না, অথবা একজনকে দর্শনের নূতন ও সূক্ষ্মতম তত্ত্ব আবিষ্কারে সবিশেষ সমর্থ করিতে পারে না, কিংবা তাহারা দার্শনিক বিদ্যার আশানুরূপ গভীরতাসম্পাদন ও করিতে পারে না। এ সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে যথার্থ দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিতে হয়, দর্শনের প্রকৃত বিষয়ের গভীর চিন্তা ও সবিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে হয়। এইজন্য বলিতে হয়—ভালরূপ দার্শনিক চর্চ্চা করিতে হইলে যে দার্শনিক ইতিহাস সংকলন করা একান্ত আবশ্যক হয়—এমন কোন নিয়ম নাই। ইতিহাসের ফল গুরুর সহিত নিয়ত বিচারে সিদ্ধ ও হয়।

তাহার পর, আর এক কথা—দর্শন শাস্ত্রালোচনার বিস্তৃতি ও গভীরতার মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায়—সত্যনির্ণয় জ্ঞানের গভীরতার যত উপযোগিতা আছে, জ্ঞানের বিস্তৃতির ততটা উপযোগিতা নাই। একটা জাতির বহু লোক সামান্যভাবে দার্শনিক হইয়া উঠিলে সে জাতির নিকট যতটা সত্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, সেই জাতীয় অল্পলোকে বিশেষভাবে দার্শনিক হইয়া উঠিলে সেই জাতির নিকট অপেক্ষাকৃত অধিক সত্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। বলিরাজ শত পণ্ডিত লইয়া পাতালগমনে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বর্গে যাইয়া মূর্খ প্রজার উপর রাজত্ব করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। অতএব যাহা দার্শনিকচর্চ্চার বিস্তৃতির পক্ষে সহায়তা করে তাহার দ্বারা কোন জাতির দার্শনিক চর্চ্চার উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হইতে পারে না। দার্শনিকচর্চ্চার উৎকর্ষাপকর্ষবিচার দার্শনিক সিদ্ধান্তের সত্যাসত্যনির্ণয় লইয়া করিতে হইবে, অন্য পথে গমন করিলে চলিবে না। অতএব পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের ন্যায় আমাদের দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস আমাদের নাই বলিয়া আমাদের দর্শনশাস্ত্র পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা হীন বা নিকৃষ্ট হইতে পারে না।

তাহার পর, পাশ্চাত্য দর্শনের যে ইতিহাস, তাহার সৃষ্টি বহুল পরিমাণে অভিব্যক্তিবাদের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য—ইহা এরূপ যে-কোন গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের সত্যতা স্বীকার করিতেন না, এবং তজ্জন্য তাঁহারা এরূপ ইতিহাসরচনার আবশ্যকতাও উপলব্ধি করেন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, আজকাল অভিব্যক্তিবাদের অনুসরণ করিয়া জগতের যাবতীয় পদার্থের উত্তরোত্তর উন্নতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, আমাদের পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ তাহা স্বীকারই করিতেন না, তাঁহারা জগতের যাবৎ পদার্থের উন্নতি ও অবনতি উভয়ই স্বীকার করিতেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ একরূপ ক্রমোন্নতিবাদী, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারগণ পরিবর্ত্তনবাদী। এইরূপ মতভেদই বাস্তবিক আমাদের দেশে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসরচনা না হইবার হেতু। সুতরাং, এতদ্দ্বারা আমাদের দর্শনের হীনতা কোনরূপেই প্রমাণিত হইতে পারে না। এক পথের পথিকদ্বয়েরই গন্তব্যসংক্রান্ত তুলনা হইতে পারে, বিভিন্ন পথের পথিকের মধ্যে সেরূপ তুলনা সঙ্গত হইতে পারে না।

তাহার পর, যাঁহারা বলেন আমাদের দর্শনশাস্ত্রের মতভেদগুলি একত্র জানিবার উপায়স্বরূপ কোন গ্রন্থ আমাদের নাই, তাঁহাদের কথাও চিন্তনীয়। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, আমাদের মহাভারতের এক শান্তি পর্ব্বটীই কত যে দার্শনিক সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছে, তাহার নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তৎপরে হরিভদ্র সূরির ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়, বৌদ্ধসর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, শাঙ্কর সর্ব্ব-সিদ্ধান্তসংগ্রহ এবং মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি দেখিলে আমাদের দেশের দার্শনিক মতগুলি অবগত হইতে পারা যায়। অবশ্য তাই বলিয়া পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের ন্যায় ইহাতে ভিন্ন মতাবলম্বী যাবৎ প্রধান ব্যক্তির মত উল্লিখিত হয় নাই; পরন্তু ইহাতে নিতান্ত প্রধান প্রধান মত প্রবর্ত্তকের মতই সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র।

পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য নিম্নে আমরা এই সকল গ্রন্থে যে সকল মতবাদ আছে, তাহাদের নাম ও সংখ্যা মাত্র নির্দ্দেশ করিলাম। যথা—

পঞ্চম শতাব্দীর জৈন হরিভদ্র সূরিকৃত ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে যে সকল মতবাদ দেখা যায়, তাহা এই—

১। বৌদ্ধ মত
২। নৈয়ায়িক মত
৩। সাংখ্য মত
৪। জৈন মত
৫। বৈশেষিক মত
৬। জৈমিনিয় মত। (পূর্ব্বমীমাংসা)

ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে যে সকল মতবাদের উল্লেখ আছে, তাহাও শুনিয়াছি উপরি উক্ত জৈন ষড়দর্শনসমুচ্চয়েরই অনুরূপ। এই গ্রন্থখানি এখনও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। সুতরাং, ইহার সবিশেষ পরিচয় আর এখানে দিতে পারিলাম না। ইহা আমরা একটী জাপানি পণ্ডিত বন্ধুর নিকট হইতে অবগত হইয়াছি মাত্র।

সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য বিরচিত সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহে আমরা যে সকল মতবাদ দেখিতে পাই, তাহা এই—

১। লোকায়তিক মত (চার্ব্বাক)
২। আর্হত মত (জৈন)
৩। মাধ্যমিক বৌদ্ধমত
৪। যোগাচার বৌদ্ধমত
৫। সৌত্রান্তিক বৌদ্ধমত
৬। বৈভাষিক বৌদ্ধমত
৭। বৈশেষিক মত
৮। নৈয়ায়িকমত
৯। প্রাভাকর মীমাংসামত
১০। কুমারিল মীমাংসামত
১১। সাংখ্যমত
১২। পাতঞ্জলমত
১৩। ব্যাসমত
১৪। বেদান্তমত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্যস্বামিবিরচিত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে যে সকল মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই—

১। চার্ব্বাক দর্শন
২। বৌদ্ধদর্শন
৩। আর্হত দর্শন (জৈন)
৪। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন (মাধ্বদ্বৈতবেদান্ত)
৫। রামানুজ দর্শন (বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত)
৬। নকুলীশ পাশুপত দর্শন
৭। শৈব দর্শন
৮। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন
৯। রসেশ্বর দর্শন
১০। ঔলুক্য দর্শন (বৈশেষিক)
১১। অক্ষপাদ দর্শন (ন্যায়)
১২। জৈমিনি দর্শন (পূর্ব্বমীমাংসা)
১৩। পাণিনি দর্শন
১৪। সাংখ্য দর্শন
১৫। পাতঞ্জল দর্শন
১৬। শাঙ্কর দর্শন, (অদ্বৈতবেদান্ত)

বিংশ শতাব্দীতে শ্রীযুক্ত রামসুব্রহ্মণ্যাচার্যাকৃত যে সর্ব্বমতসংগ্রহবিলাস নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যে সকল মতবাদ দেখা যায়, তাহা এই—

১।	অদ্বৈতমত	১১।	যোগমত
২।	বিশিষ্টাদ্বৈতমত	১২।	বৈশেষিকমত
৩।	মাধ্বমত	১৩।	ন্যায়মত
৪।	শ্রীকণ্ঠমত	১৪।	শাক্তমত
৫।	পাঞ্চরাত্রমত	১৫।	বুদ্ধমত
৬।	বল্লভমত	১৬।	জৈনমত
৭।	ব্যাসমত	১৭।	চার্ব্বাকমত
৮।	ভাস্করমত	১৮।	ভট্টপ্রভাকরমত
৯।	নিম্বার্কমত	১৯।	বৈখানসমত
১০।	সাংখ্যমত	২০।	যাদবমিশ্রমত

অবশ্য আজ কাল পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে অনেকে নানামত সংগ্রাহক নানা-গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, এস্থলে সে সকল আমাদের লক্ষ্য নহে। প্রাচীন শিক্ষার ফলে ভারতীয় রীতিতে যাহা রচিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে আমাদের লক্ষ্য; এই জন্য বিংশশতাব্দীর শেষোক্ত গ্রন্থখানি মাত্রেরই উল্লেখ করা গেল।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে মাধবের মতে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় দার্শনিকমত সর্ব্বশুদ্ধ ১৬টী, এবং রামসুব্রহ্মণ্যাচার্য্যের মতে তাহা সর্ব্বশুদ্ধ ২০টী মাত্র। অবশ্য এতদ্দৃষ্টে কেহ মনে করিতে পারেন যে, পূর্ব্বকালে মতভেদ সংখ্যা অল্প ছিল, যত-দিন গিয়াছে, জগৎ যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, ততই তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১৬ অথবা ২০টীতে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলেও অভিব্যক্তিবাদানু-মোদিত ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হইবে, ইত্যাদি। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীর সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে যে সকল মতবাদের স্থান হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেক মতবাদ পঞ্চম শতাব্দীর ষড়্দর্শনসমুচ্চয়রচনার পূর্ব্বেও ছিল, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, যেমন বেদান্ত ও যোগমত ইত্যাদি।

তাহার পর, এই কয়খানি দর্শনমতসংগ্রাহক গ্রন্থ ভিন্ন আরও কোন এই জাতীয় গ্রন্থ ছিল কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই। প্রত্ন-

তত্ত্ববিদ্‌গণের চেষ্টায় সম্প্রতি এ জাতীয় আরও কয়েকখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়—এ জাতীয় আরও অনেক গ্রন্থ ছিল, কালে তাহারা প্রকাশিত হইবে, অথবা তাহারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, মাধবের সর্ব্বদর্শনে অথবা রামসুব্রহ্মণ্যাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনে যে সকল মত আছে, তাহারা যথাক্রমে ১৬টী অথবা ২০টী হইলেও অনুরূপ প্রাচীন বিভাগ অনুসারে তাহারা ৯টীর অতিরিক্ত হয় না। সেই প্রাচীন বিভাগ এই, যথা—

ভারতীয় দর্শন।

- আস্তিক দর্শন
  - সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত
- নাস্তিক দর্শন
  - চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ

এই বিভাগে কৌশলক্রমে ইহাদিগের সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অবশ্য কোন্‌টী কাহার অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও তাহারা এই বিভাগ যে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহা স্থির। মতভেদের মীমাংসা না করিয়া এ কার্য্য করিলে নানারূপ সন্দেহের উদয় হইবে, এজন্য এ ক্ষেত্রে এ কার্য্যে আমরা বিরত রহিলাম। ফলতঃ, উপরি উক্ত ১৬টী বা ২০টী মতই ইহাদের যে অনতিরিক্ত এবং তাহা যে সর্ব্বসুধীজনসম্মত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু, যদি আমরা আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের বিভাগের প্রতি দৃষ্টি করি, তাহা হইলে ইহাদিগকে আবার কেবলমাত্র তিনটী মতে পরিণত করিতে পারা যায়, যথা—

১। সৎকার্য্য বাদ। (পরিণামবাদ)
২। সৎকারণ বাদ। (বিবর্ত্তবাদ)
৩। অসৎকার্য্য বাদ। (আরম্ভবাদ)

ইহাই হইল ভারতীয় দর্শনের শ্রেণীবিভাগবৈচিত্র্য ; এইবার দেখা যাউক, এই সকল মতবাদের আবার অবান্তরভেদ কত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই কার্য্যটী যেরূপ গুরুতর এবং বৃহৎ, তাহা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নহে। অতএব আমরা অধিকাংশ পণ্ডিতবর্গের যাহা বিদিত, তদবলম্বনে ইহার একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম মাত্র।

প্রথমে সাংখ্যদর্শনটী গ্রহণ করা যাউক। আমরা দেখিতে পাই—ইহাতে টীকাকারগণেরমতানুসারে যে মতভেদ হইয়াছে, তাহার নির্ণয় নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। তথাপি, যাহা অনেকেই অবগত আছেন এবং যাহা প্রধানরূপে পরিগণিত হয়, তাহা এই—

কপিলের সাংখ্যদর্শন।

- পঞ্চশিখ মত
- আসুরি মত
- ঈশ্বরকৃষ্ণ মত
  - গৌড়পাদ মত
  - বাচস্পতি মত
  - বিজ্ঞানভিক্ষু মত

এতদ্ব্যতীত তত্ত্বসমাসসূত্র, সাংখ্যসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যে মতভেদ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। কেহ কেহ বলেন, তত্ত্বসমাসসূত্রই আদি-জ্ঞানী কপিলকৃত প্রকৃত সাংখ্য, সাংখ্যসূত্রখানি পরবর্ত্তী সম্প্রদায়ভুক্ত কপিল নামধারী অপর ব্যক্তিকৃত গ্রন্থ। অনেকে বলেন এই কপিল, এমন কি বাচস্পতি মিশ্রেরও পরবর্ত্তী ব্যক্তি। আবার কেহ বলেন সাংখ্যসূত্রই যথার্থ আদি গ্রন্থ। ফলতঃ, এ সকল মতামতবিষয়ে অনেক জানিবার, অনেক ভাবিবার আছে, এস্থলে ইহার দিঙ্‌নির্দ্দেশ মাত্রই আমার প্রয়াস। কপিল যে একজন নহেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এ যাবৎ চারিজন কপিল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ পরিচয় পাইয়াছেন। যাহা হউক, এই শাস্ত্রে এখন প্রধানতঃ দুইটী মতভেদ প্রবল। ইহারা বাচস্পতিমত এবং বিজ্ঞানভিক্ষুমত।

এইবার পাতঞ্জল মতটী গ্রহণ করা যাউক। ইহারও বিভাগ নিতান্ত অল্প নহে। তথাপি—

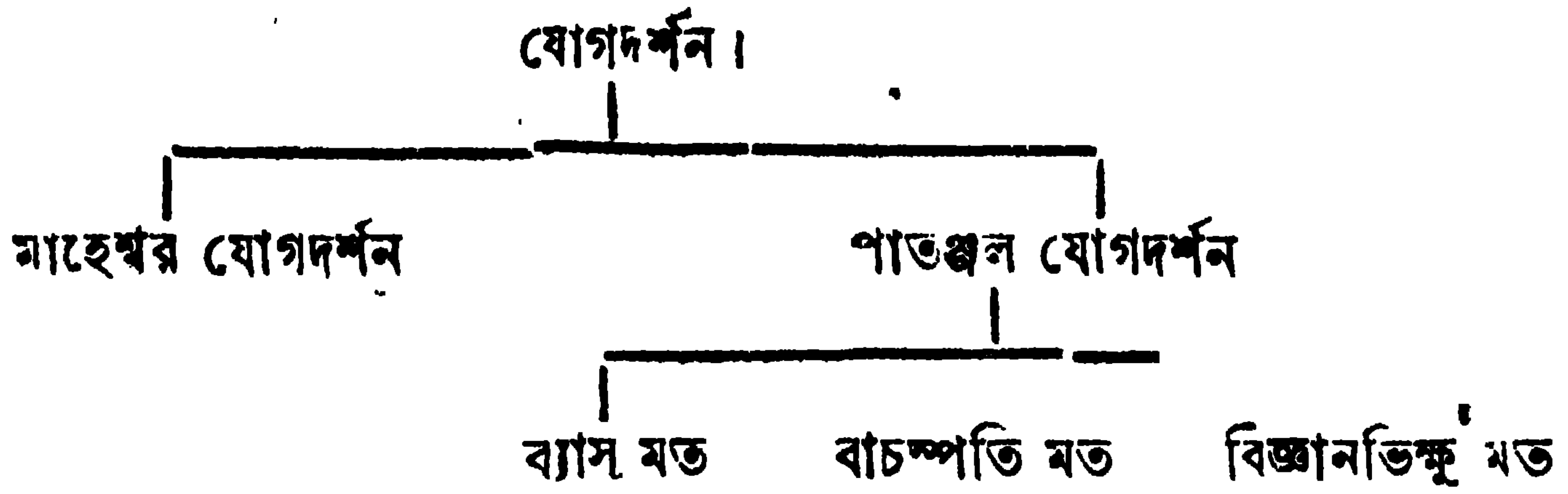

ইহাদের মধ্যে মাহেশ্বর মত বিলুপ্ত, ইহার উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থ মধ্যে মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ন্যায়দর্শন মধ্যে প্রচীন ও নব্যভেদে দুইটী প্রধান শাখা দেখা যায়। কিন্তু চীনদেশের প্রবাদ গ্রহণ করিলে বুদ্ধকৃত ন্যায়সূত্রবৃত্তির মতটী লইয়া ইহাকে তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায়, যথা—

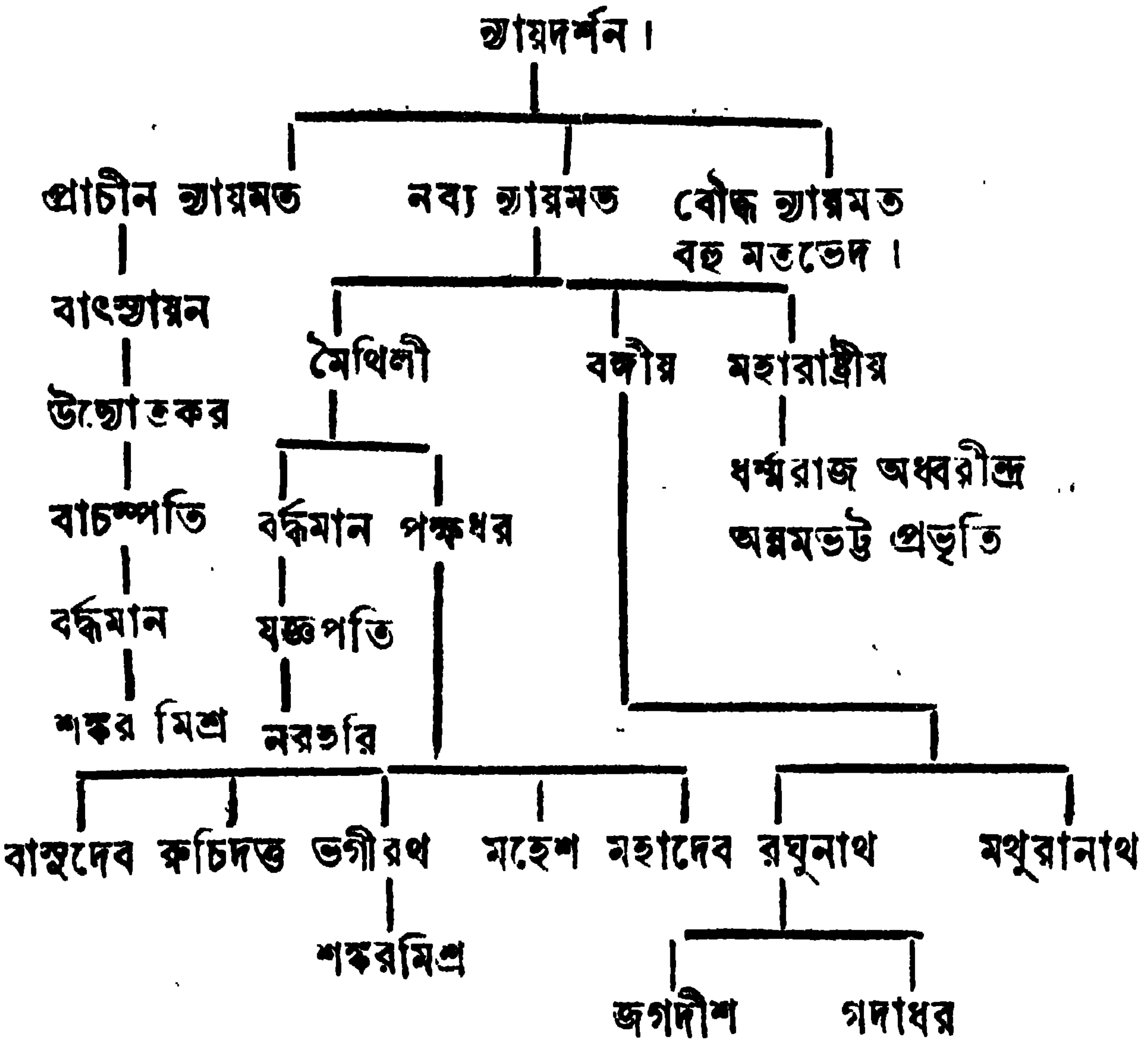

রঘুনাথের টীকার উপর বহু টীকা আছে, তাহার উল্লেখ এ স্থলে অসম্ভব।

ফলকথা, এই ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। ইহার নির্ণয় করা আজ এক প্রকার অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন পণ্ডিতগণ কেবল এক ন্যায়সূত্রের নির্ণয় যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন যে, তাহা দেখিলে এরূপ মনে করা অসঙ্গত হয় না। নব্যন্যায় সম্বন্ধেও সেই কথা।

বৈশেষিক মতের সম্প্রদায়ভেদ বড় কম নহে। ইহার বহু শাখা বিলুপ্ত, তথাপি যাহা সাধারণতঃ অবগত হওয়া যায়, তাহা এই ;—

বৈশেষিক দর্শন।

রাবণ মত　প্রশস্তপাদ মত　শঙ্করমিশ্র মত

(প্রশস্তপাদ মত —) শ্রীধরাচার্য্যের মত　উদয়নাচার্য্যের মত

মীমাংসা দর্শনের মতভেদ বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। ইহার সম্বন্ধে আজ কাল যাহা সচরাচর পণ্ডিতগণের নিকট শুনা যায়, তাহা এই—

মীমাংসাদর্শন।

উপবর্ষমত　ভবদাস মত　শবরস্বামি মত

(শবরস্বামি মত —) প্রাভাকর মত　কুমারিল মত　মুরারিমিশ্র মত

(প্রাভাকর মত —) নবীন (শালিকনাথ)　প্রাচীন

(কুমারিল মত —) পার্থসারথীমত　সোমেশ্বরমত　সুচরিতমিশ্র　খণ্ডদেব প্রভৃতি

বেদান্ত সম্প্রদায়ের বিভাগটী মীমাংসা অপেক্ষা কোন অংশেই সহজ নহে। তথাপি ইহা যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহা এইরূপ—

বেদান্ত দর্শন।

অতি প্রচীন মত　প্রাচীন মত　নব্য মত

কাশকৃৎস্ন, ঔড়ুলোমি, আশ্মরথ্য, কাষ্ণাজিনি, জৈমিনি

উপবর্ষ, দ্রমিড়, ভর্ত্তৃহরি, কপর্দ্দী, ভারুচি, বোধায়ন, গৌড়পাদ, বিষ্ণুস্বামী, গুহদেব

শঙ্কর　যাদবপ্রকাশ | রামানুজ | নিম্বার্ক | বলদেব | লিঙ্গায়েৎশৈব | শাক্ত |

ভাস্কর　শ্রীকণ্ঠ　মধ্ব　বল্লভ　বিজ্ঞানভিক্ষু　সৌর গাণপত্য

ইহার মধ্যে এক শঙ্করের মতাবলম্বনে আবার কত মত ভেদ হইয়াছে, তাহা বলাও দুরূহ। এজন্য মহামতি অপ্পয় দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ নামক একখানি গ্রন্থই রচনা করিয়াছেন। অপ্পয় দীক্ষিত যে সকল মতের নাম করিয়াছেন, তাহার বহুমত আজ বিলুপ্ত। তথাপি যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে তাহার কয়েকটী এবং অপর কয়েকটী একত্র করিলে এইরূপ বিভাগ আমরা দেখিতে পাই।

শঙ্কর মত।

পদ্মপাদ, বাচস্পতি, আনন্দগিরি, শঙ্করপাদ ভূষণকার, ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার

পদ্মপাদ → বিবরণকার → তত্ত্বদীপনকার → উপন্যাসকার

বাচস্পতি → অমলানন্দ → অপ্পয়দীক্ষিত

এতদ্ব্যতীত আনন্দবোধেন্দ্রভট্টারক, গঙ্গাপুরীভট্টারক, চিৎসুখাচার্য্য, শ্রীহর্ষ, সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি, মধুসূদন সরস্বতী, রামতীর্থ, শঙ্করানন্দ, বিদ্যারণ্য, প্রভৃতি মহাত্মগণের মতভেদ ধরিলে যে কত মতভেদ হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বলা বাহুল্য; রামানুজ, মধ্ব বল্লভ ও নিম্বার্কমতেও বহু মতভেদ ঘটিয়াছে, তবে তাহা শঙ্করমতের ন্যায় সংখ্যায় অধিক নহে।

চার্ব্বাক দর্শনও বহুবিধ, কিন্তু ইহা আজ প্রায় একবারে বিলুপ্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুনা যায় বৃহস্পতি ও বেণরাজ প্রভৃতি এই মতের প্রবর্ত্তক ছিলেন; এবং তাঁহাদের বহু শিষ্যসম্প্রদায় হইয়াছিলেন।

জৈনমতটী শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ। কিন্তু ইহাদের আবার অবান্তর ভেদ গ্রহণ করিলে তাহা অসংখ্য হইয়া উঠে। ইহারা প্রায় সর্ব্বত্র হিন্দুগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দুগণ, যে নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কয়েকটী ক্ষেত্রে জৈনগণও সেই নামে তাঁহাদের নিজ মতানুযায়ী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বৌদ্ধমতের প্রধানতঃ চারিটী বিভাগ,যথা—সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। ইহারা আবার পরিশেষে ১৮টী মতে পরিণত হইয়াছে। তাহারও আবার অবান্তরভেদ আছে, কিন্তু তাহারা তত প্রবল নহে।

বলা বাহুল্য, এইরূপে যদি যাবৎ প্রধান প্রধান গ্রন্থকারকেই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এই মতভেদসংখ্যা একরূপ অগণ্য হইয়া পড়ে। আমরা, উপরে নিতান্ত প্রসিদ্ধ, বহুজন বিদিত কয়েকটী মাত্র মতভেদের উল্লেখ করিলাম। যাহা হউক, এই সকল মতভেদকে যদি সংক্ষিপ্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহা মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহানুযায়ী ১৬টী, অথবা নয়টি, যথা—বৈদিক ছয়টি এবং অবৈদিক তিনটী, আবার মধুসূদনের মতে তিনটী হয়। এই সকল মতের সারমর্ম্ম বিশদভাবে জানা যায় এরূপ গ্রন্থ আমাদের নাই, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের দেশের নিতান্ত প্রধান প্রধান দার্শনিক মতগুলি জানিতে পারা যায়—এরূপ কোন গ্রন্থ আমাদের নাই, একথা বলা চলে না।

কিন্তু, এরূপ গ্রন্থ থাকিলেও অনেকে বলিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশে দার্শনিক মত যখন ১৬টী বলিয়া বিখ্যাত ও তাহাই গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ হইল এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকমতসংগ্রাহক গ্রন্থাবলীতে যখন তদপেক্ষা বহু অধিকমতের স্থান হইয়াছে, তখন ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে. পাশ্চাত্য দেশে দার্শনিকচর্চ্চা আমাদের দেশের চর্চ্চা অপেক্ষা যে অধিক হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমাদের মনে হয় এ কথাও ভিত্তিহীন। আমাদের দেশে যে সকল দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হইত, তাহা সাধারণতঃ তদ্বিরোধী আবশ্যকীয় বা প্রধান মতের নিরাসপূর্ব্বকই রচিত হইত, এজন্য যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন দর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতেন, তিনিই প্রায় অপর সকল দার্শনিক মতই অবগত হইতেন। এই প্রথা এই দেশেরই একপ্রকার বিশেষত্ব। সুতরাং, মতসংগ্রাহক গ্রন্থাবলীর আবশ্যকতা আমাদের দেশে তত হইত না।

তাহার পর, কালগত-পারম্পর্য্যের প্রতি যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায় যে, আমাদের দেশে যে সময় এই জাতীয় প্রথম গ্রন্থ রচিত হইতে আরম্ভ হয়, সে সময় পাশ্চাত্য প্রদেশে এ জাতীয় গ্রন্থের উদয়ই হয় নাই। পাশ্চাত্য দার্শনিক ইতিহাসের বয়স তুলনায় নিতান্ত অল্প। যে সময় পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস প্রথম রচিত হয়, সে সময় যদি পাশ্চাত্য প্রথায় ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস যে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস অপেক্ষা বৃহৎ হইত না, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। আজ কাল

যদি কোন মনীষী আমাদের দেশের সকল দার্শনিক পণ্ডিতের মতভেদগুলি একত্র করিয়া কোন ইতিহাসরচনার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহাতে যে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক মতবাদের স্থান হইবে, তাহা বোধ হয় না।

কিন্তু, তাহা হইলেও একটী কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের দেশ যেরূপ বৃহৎ, এবং যত প্রাচীন কাল হইতে ইহাতে যত দার্শনিক পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য দেশের সহিত তুলনা করিলে সংখ্যায় অল্পই হইবে বলিয়া বোধ হয়।

এ কথার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, যে কারণে এইরূপ অল্পতা ঘটিয়াছে, তাহা ভারতে দার্শনিকচর্চ্চার হীনতার সূচনা করে না; পরন্তু তাহা এদেশের রীতি ও নীতি ভেদের সূচক, এককথায় তাহা এদেশের প্রবৃত্তিভেদের জ্ঞাপক।

প্রথমতঃ দেখা যায়, আমাদের দেশে সত্যনিষ্ঠা ও জাগতিক স্বাধীনতালাভের প্রবৃত্তিটী, একপ্রকার গুরুদ্রোহিতা বা রাজদ্রোহিতার সীমা হইতে পাশ্চাত্য দেশের সত্যনিষ্ঠাও জাগতিক স্বাধীনতা লাভের প্রবৃত্তি অপেক্ষা যেন কিছু অধিক দূরে অবস্থিত। পাশ্চাত্য দেশে সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনতালাভপ্রবৃত্তির মধ্যে একপ্রকার গুরুদ্রোহিতা ও একপ্রকার রাজদ্রোহিতা যতটা আছে, আমাদের দেশে তাহা ততটা নাই। আমাদের দেশে স্বাধীনতালাভের প্রবৃত্তি জগতের বিষয়ে কম, কিন্তু পারলৌকিক বিষয়ে অধিক। পারলৌকিক বা আত্মার স্বাধীনতা আমাদের যত প্রিয়, জাগতিক বা শারীরিক স্বাধীনতা আমাদের তত প্রিয় নহে। আমরা যত লোকে আত্মাকে এক, অদ্বৈত, পূর্ণ ও সম্পূর্ণস্বাধীন বস্তু বলিয়া বুঝি, পাশ্চাত্য দেশে ততলোকে সেরূপ বুঝে না। বস্তুতঃ, এইরূপ সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনতার প্রবৃত্তি কতকটা এইরূপ মতভেদের মূল। শিষ্য, সাধারণতঃ গুরুর মতাবলম্বীই হইয়া থাকে, অধিক কি মানবপ্রকৃতির গতিই এইরূপ হয়, যেহেতু গুরুই শিষ্যের সাধারণতঃ আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকেন। অতএব গুরুর ভ্রান্তি প্রভৃতি শিষ্যের নিকট উপলব্ধ হইলেও শিষ্য যদি গুরুর অনুগত হয়; তাহা হইলে শিষ্য গুরুবাক্যের ব্যাখ্যাচ্ছলে, অথবা গুরুবাক্যের সম্মানরক্ষাপূর্ব্বক নূতন মত প্রচার করে। গুরুর আনুগত্য অল্প না হইলে শিষ্য সাধারণতঃ স্বয়ং মতভেদের সৃষ্টি করেন না। এজন্য মতভেদের মূলে এক প্রকার গুরুদ্রোহিতা-সংসৃষ্ট সত্যনিষ্ঠা ও জাগতিক স্বাধীনতালাভের প্রবৃত্তি কতকটা কোন না-কোন

আকারে প্রায় থাকিয়া যায়। আমাদের দেশে এই প্রবৃত্তিটা একটু কম, আমাদের দেশে হিন্দুর বেদানুগত্যপ্রবৃত্তি অপরের নিজ নিজ উপদেষ্টার মতানুসরণপ্রবৃত্তি অপেক্ষা একটু অধিক একনিষ্ঠ, অথবা একটু অধিক সংযত বলিয়া বোধ হয়। এজন্য তুলনায় আমাদের দেশে মতভেদ কিছু অল্প উৎপন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং, স্বীকার করিতে হইবে—নীতিভেদবশতঃ আমাদের দেশে দার্শনিক মতভেদের সংখ্যা অল্প দেখিয়া আমাদের দর্শনচর্চ্চাকে হীন বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত হয় না।

তাহার পর রীতি বা প্রকৃতি ভেদবশতঃও কি করিয়া আমাদের দার্শনিক চিন্তায় মতভেদ অল্প হইয়াছে, দেখা যাউক। দেখা যায়; আমাদের দর্শনশাস্ত্রের লক্ষ্য কতকটা জাগতিক অভ্যুদয়পূর্ব্বক নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষলাভ। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের লক্ষ্য যথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে জাগতিক অভ্যুদয়লাভপূর্ব্বক স্বর্গবিশেষ লাভ। অর্থাৎ জগতে কি করিয়া সকলে মিলিয়া উত্তরোত্তর সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া পরিশেষে ঈশ্বররাজ্যে বসতিলাভ করিতে পারা যায়, তাহারই জন্য পাশ্চাত্য দর্শনের চেষ্টা। পক্ষান্তরে আমাদের দর্শনের চেষ্টা প্রধানতঃ নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষলাভ, এবং সেই মোক্ষলাভের পথের পথিক হইয়া যে-ভাবে জীবনকে কতকটা সুখে অতিবাহিত করা যাইতে পারে, তাহারই উপায় নির্দ্ধারণ করা। পাশ্চাত্য দর্শনে জাগতিক পদার্থের প্রতি অনুরাগ নষ্ট করে না, কিন্তু আমাদের দর্শনশাস্ত্র তাহা করিয়া থাকে।

এখন এই জাগতিক অভ্যুদয়লাভে জাগতিক স্বাধীনতার বিশেষ আবশ্যকতা থাকে, আর তজ্জন্য পাশ্চাত্যগণের আবার সেই জাগতিক স্বাধীনতাচিন্তারও বিশেষ আবশ্যকতা হয়। এই জাগতিক স্বাধীনচিন্তার প্রধান উপকরণ নানা মতবাদের জ্ঞানলাভ। সকলেই জানেন যে, লোকে পাঁচটা মতামত শুনিলে নিজে একটা নূতন মত গঠন করিয়া লইতে পারে। সুতরাং, এই স্বাধীনচিন্তার জন্য যত মতবাদের জ্ঞান লাভ হয়, ততই সুবিধা হইয়া থাকে। এজন্য বুঝিতে পারা যায় যে, পাশ্চাত্য রীতি বা প্রকৃতির অনুসারে বহু মতবাদের উৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের দর্শনমতসংগ্রহের উদ্দেশ্য—এই স্বাধীন চিন্তার উপকরণ সংগ্রহ নহে, পরন্তু ইহার উদ্দেশ্য—অপরাপর প্রধান প্রধান মতের সহিত তুলনা করিয়া নিজ নিজ সাম্প্রদায়িকমতের সত্যতাবধারণ, এবং

প্রাধান্যপ্রদর্শন মাত্র। অতএব আমাদের রীতি অনুসারে অল্প মতবাদের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। ইহাই আমাদের দার্শনিকমতসংগ্রাহক গ্রন্থাবলীতে অল্প সংখ্যক মতবাদের স্থান হইবার হেতু, আর এই জন্য আমাদের দর্শনচর্চ্চাকে হীন বলিয়া বিবেচনা করা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

এস্থলে অবশ্য কেহ কেহ শঙ্কা করিতে পারেন, তবে কি হিন্দুদিগের দার্শনিক চর্চ্চা জৈন ও বৌদ্ধগণের দার্শনিক চর্চ্চা অপেক্ষা হীন ছিল? আর সেই জন্যই ভারতীয় দার্শনিকমতসংগ্রাহক গ্রন্থ প্রথমে জৈনগণ এবং বৌদ্ধগণ রচনা করেন এবং তৎপরে হিন্দুগণ তাহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছিলেন? কারণ, দেখা যাই-তেছে, পঞ্চমশতাব্দীর জৈন হরিভদ্রসুরির ষড়দর্শনসমুচ্চয়ই প্রথম এই জাতীয় গ্রন্থ, তাহার পর সপ্তম শতাব্দীর আচার্য্য শঙ্করের সর্ব্বসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ এবং চতুর্দ্দশশতাব্দীতে মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে, ইত্যাদি।

ইহাও কিন্তু ঠিক নহে। জৈন ও বৌদ্ধগণের এ জাতীয় গ্রন্থরচনারও হেতু তাঁহাদের বেদবিরোধী প্রবৃত্তি। এই বেদ তৎকালে সাধারণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রমাণ বলিয়া সম্মানিত হইত, সাধারণের নিকট এই বেদের প্রভাবই তখন বিশেষ ভাবে বিরাজমান ছিল। পাশ্চাত্যগণের প্রবৃত্তিতে যে প্রকার স্বাধীনতা প্রভৃতি দেখা যায়, জৈন ও বৌদ্ধগণের প্রকৃতিতেও এই ক্ষেত্রে সেইরূপ কতকটা লক্ষিত হয়। ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। যাহা হউক এ বিষয় আমরা এ স্থলে আর অধিক বিস্তার করিতে ইচ্ছা করি না, আমরা এই বার পাশ্চাত্য মতানুরাগিগণের দ্বিতীয় আক্ষেপের উত্তর প্রদানে চেষ্টা করিব।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

মাধবী-কুঞ্জ

নাটকীয় চরিত্রাবলি

পুরুষ।

গৌতম বুদ্ধ	মগধের পূর্ব্বতন নৃপতি শুদ্ধোদনের সংসার বিরাগী পুত্র
জীমূত বাহন	মগধের বৌদ্ধ রাজা।
শালিবান্	ঐ সেনাপতি।
শৌনক	ঐ মন্ত্রী।
পুষ্পধনু	অবন্তী রাজকুমার।
বিক্রমদম	ঐ সেনাপতি।
অনিরুদ্ধ	ঐ বয়স্য।

অবন্তী রাজসৈন্যগণ, মগধ রাজসৈন্যগণ, ভিক্ষুগণ,
কোটাল প্রহরীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মুঞ্জরা	...	মগধ রাজকুমারী।
বাসন্তী	...	ঐ প্রিয়সখা।
মন্দাকিনী	...	ঐ মাতা (মগধের রাণী)

সখীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

কুঞ্জকানন। বাসন্তীপ্রকৃতি।

কন্দর্প বিলাসিনীগণ।

নৃত্যগীত

প্রমোদ পরাণে, মধুর পঞ্চমে পাপিয়া তুলিছে তান।
বকুল নিকুঞ্জে, অলিকুল গুঞ্জে, কোকিল গাহিছে গান
হেম-রবিরাগে কুসুম হাঁসিছে,
সোহাগ আবেগে পবন চুমিছে;
(হের) যৌবন পুলক কানন বল্লরী
লুটায়ে দিতেছে প্রাণ।
প্রেমে ভেসে গেছে নিকুঞ্জ কানন,
প্রেমগন্ধভরা আকাশ পবন,
(তাই) ছিঁড়ে গেছে শত মরম বাঁধন
আকুল করেছে প্রাণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—মগধ উপকণ্ঠে শিবির।

অদূরে শৈলরাজি। নির্ঝরে জল নির্গমন। অরুণোদয় কাল।

বৈতালিকের গীত।

যামিনী মুদেছে আঁখি অরুণ হাঁসিছে ঐ।
পুলকে প্রভাতী গীতি বিহগ গাহিছে ঐ।
নব কুসুমের কলি, সমীর চুম্বনে ঢুলি
পড়ে লাজে ঢলি ঐ।
রঞ্জিত তপন রাগে, গিরিশির পুরোভাগে

গগন চুমিছে ঐ।
জুড়ায়ে শ্রবণ প্রাণ, কলতানে গাহি গান,
তটিনী চলেছে ঐ।
মেল আঁখি হের ধরা, বিপুল পুলকে ভরা,
অমরা সমান ঐ।

(গীতান্তে প্রস্থান)

(শিবিরাভ্যন্তর হইতে পুষ্পধনু ও অনিরুদ্ধের প্রবেশ)

পুষ্পধনু— সখা, সখা, হের কিবা অতুল সুষমা!
ব্যোমঅঙ্গে ভাসমান নীরদ সমান—
দূরে হের তুঙ্গ শৈলমালা।
ভেদিয়া পাষাণ, তুলি কলতান
রজত ধারায় নেচে আসে স্রোতস্বিনী।
ঝঙ্কারে তাহার পুলক জাগায় প্রাণে।
হের পূর্ব্ব গগনে ধীরে ওঠে রবি,
কিবা মনোহর ছবি!
চঞ্চল পবনে উড়ায়ে অঞ্চল
প্রকৃতি নামিছে যেন তপন চরণে।
বিহঙ্গ সঙ্গীত ছলে, ললিত লহর তুলে
প্রকৃতি গাহিছে যেন আবাহন গীতি!

অনিরুদ্ধ— তাই মহাভীতি জাগে প্রাণে!
ভাবি মনে, কহিব কেমনে তোমা—
দারুণ দুর্দ্দশা মোর!

পুষ্পধনু— এমন মাধুরীমাখা মধু ঊষাকালে,
মূর্খ তুমি তাই কহ বিষাদের কথা।
মন্দ প্রভাত সমীরে পুলকে শিহরে,
জীবদেহ!
ব্যোমচারী বিহগ সঙ্গীতে জুড়ায় শ্রবণ,
প্রাণ মন, ডুবে যায় নন্দন-সুবাসে।

তব সম কে আছে অভাগা—
হেন শোভা, মনোলোভা নহে যার।

অনিরুদ্ধ— সখা! ক্ষমাকর বাতুল প্রলাপ।
রজনীর অমিত আহারে
পরিহার নিদ্রাদেবী ক'রেছেন মোরে।
উ হুঃ! (উদরে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বিরক্তি প্রকাশ)
দগ্ধ এই উদরের তরে,—
বারে বারে সহি কত লাঞ্ছনা অপার।
ধিক্ পেটুক ব্রাহ্মণ!—
শতধিক্ মোরে।—হেন মলয় সমীরে
পুলকে নাচেনা মম প্রাণ।
মন্দভাগ্য ব্রাহ্মণ, শুনি বিহগ কুজন
প্রাণ মন হরষে না মাতে!
ওহো।—
মন্দাগ্নি ক'রেছে অধীর।
শ্রবণ বধির তাই সখা।—

পুষ্পধনু— (সহাস্যে) অসম্ভব হেন বাণী।
মন্দাগ্নি সম্ভব নহে ব্রাহ্মণ উদরে।
ব্রহ্মার কৃপায়, ব্রহ্মসম লভিয়াছ
শ্রেষ্ঠত্ব ধরায়। সর্ব্বভুক্ বিভুসদা—
বিদিত ভুবনে।

অনিরুদ্ধ— তাই ভাবি মনে, রসনা কর্ত্তনে
নির্ম্মূল করি যত লোভ আশা মোর।
কিন্তু হায়! রসনা বিহনে,
কেমনে হ'বে হে সখা বাণী উচ্চারণ?
পরাণের সাধ পরাণে রহিবে পড়ে।
প্রিয়-সম্ভাষণ রসনা বিহনে,
কেমনে হবে হে ভাবি।

পুষ্পধনু— রঙ্গ রাখ সখা।
চল যাই গিরি শিরে—
দেখিব নির্ঝরে, অবিরাম
কেমনে ঝরিছে বারি।

গীত

এস ভ্রান্ত, এস অন্ধ- হে ভবপান্থ, ঘুচিবে মানস ভ্রান্তি।
এস তাপিত, ক্ষুধিত, পতিত হেথা মিলিবে বিপুল শান্তি।

১ম রক্ষি। ওকি? কারা গান গাইছে?

২য় রক্ষি। আমি তোর সঙ্গে কথা কইব না।

১ম রক্ষি। এমন গান কাণে গেলে আর কারু রাগ থাকে?

২য় রক্ষি। ওঃ! কি ভাবুক রে আমার!

(ভিক্ষু সংহতি ও গৌতম বুদ্ধের প্রবেশ)

ভিক্ষু সঙ্ঘের

গীত

এস ভ্রান্ত, এস অন্ধ হে ভবপান্থ ঘুচিবে মানস ভ্রান্তি।
এস তাপিত, ক্ষুধিত, পতিত হেথা মিলিবে বিপুল শান্তি।
অম্বর ভেদিয়া ওঠে হাহাকার!
বিদারি হৃদয় বহে অশ্রুধার!
শোক দুঃখ জরা, ভরিয়াছে ধরা
বাসনার নাহি ক্ষান্তি।
অনিত্য জীবন, বৈভব বঞ্চক—
মধুর যৌবন দামিনী ঝলক
মায়া মোহ ঘোর, ঘুচিবে তোমার
হেরিবে বিমল কান্তি।
ছাড়ি রাজ্য ভার, ভিক্ষা পাত্র সার—
হের প্রভু ভ্রমে করুণা আধার
ঢালি শান্তি বারি, দূরিতে জীবেরি
ভব মরু পথ ক্লান্তি।

গৌতম। এই বুঝি কুমার শিবির?

১ম ভিক্ষু। অনুমান হয় প্রভু!

গৌতম। লয়ে এস সমাচার, শিবিরে কুমার কিনা!

১ম রক্ষি। আজ্ঞে, যুবরাজ শিবিরে নাই। তিনি মৃগয়ায় গমন ক'রেছেন।

গৌতম। মৃগয়া! ও হোহো, একি নিদারুণ কথা!

ব্যথা বড় বাজিল পরাণে!
ব্যাকুল করিল মর্ম্মস্থল!
জ্ঞানহীন শ্বাপদ সকল—
মুক্তপ্রাণে ভ্রমে বনস্থল
নিষ্পাপ সরল—বিলোল নয়নে
চাহে তারা মানব নয়ন পানে!
কত ব্যথা প্রাণে, জানাতে না জানে
নীরবে ঢালে অশ্রুধারা!
কঠিন প্রস্তরে গঠিত কি মানব হৃদয়!
কৃপালেশ নাহি কি হে তায়—
অন্ধ মন সদা কি হে ধায়—
কিসে হয় বাসনা পূরণ!
করুণায় নাহি গলে প্রাণ!
চল, চল, বৃথাবাক্য কাল ব'য়ে যায়
জীবকুল ব্যাকুল পরাণে কাঁদে,
হৃদি ফাটে শুনি আর্ত্তনাদ!
বিলম্বে ঘটিবে প্রমাদ
দ্রুতপদে এস চলে—
বারিব কুমারে।

(প্রস্থান, ভিক্ষুগণের অনুসরণ)

১ম রক্ষি। কি মিষ্ট কথা! শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল!

২য় রক্ষি। তাত গেল। কিন্তু যুবরাজকে ফেরাতে গেলেন, তার কি!

১ম রক্ষি। কি ক'রব বল।

২য় রক্ষি। দেখ, আমার বোধ হয় প্রভুকে কখনও ব্যাঘ্র ভল্লুকে ভয় দেখায় নাই।

১ম রক্ষি। কেন?

২য় রক্ষি। তা না হলে তাদের উপর এত দয়া হয়! সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখ্‌লে— অত দয়া ধর্ম্ম কোথায় ভয়ে পালিয়ে যায় তার ঠিকানাই থাকে না।

১ম রক্ষি। তুমি নারকী। তোমার মত লোকে মহাত্মার মাহাত্ম্য কি বুঝ্‌বে।

[প্রস্থান।

২য় রক্ষি। ওহে পুণ্যাত্মা! ওহে ধার্ম্মিক মহাশয়—শোন, শোন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—কানন।

ধনুহস্তে পুষ্পধনুর প্রবেশ। তাঁহার পশ্চাতে রক্ষিগণ পরিবেষ্টিত অনিরুদ্ধের প্রবেশ।

পুষ্পধনু। এইবার সার্থক মম শ্রম।

আর কোথা যাবে? (তীর নিক্ষেপ, ও নেপথ্যে শার্দ্দুল গর্জ্জন ও পতন শব্দ) ঐ পশু ভূমিতলশায়ী!

অনিরুদ্ধ। ওঃ! (ভীতিসূচক আর্ত্তনাদ করিয়া, স্তব্ধভাবে অবস্থান)

পুষ্পধনু। (সোল্লাসে) সখা, সখা! আনন্দে অধীর প্রাণ।

গত-প্রাণ শার্দ্দুল সম্মুখে হের। (প্রদর্শন)

নির্ব্বাক্ কি হেতু সখা?

অনিরুদ্ধ। আর সখা! কারে আর কর সম্বোধন!

বুঝিতে না পারি এখনও কি ধরি প্রাণ!

শুনি সেই ভীষণ গর্জ্জন, অচেতন—

সংজ্ঞাহীন সম করি অবস্থান।

বক্ষে রাখি কর, দেখ একবার—

পরাণ নাচে কিনা উরস মাঝারে।

হায়, হায়, কেন আমি এসেছিনু তব সাথে:—

গহন কাননে? আতঙ্কে ত্যজিতে মম
অমূল্য জীবন? ব্রাহ্মণীর হৃদয় রতন—
অবহেলে ব্যাঘ্রমুখে দিতে জলাঞ্জলি?

পুষ্পধনু— এস, এস, শঙ্কার নাহিক কারণ!
হের ঐ গত প্রাণ শার্দ্দূলভীষণ—
এস সখা ক'রে আসি নিরীক্ষণ (অনিরুদ্ধের হস্তধারণ)

অনিরুদ্ধ— ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে!
একশরে ব্যাঘ্র নাহি ত্যজিবে জীবন।
হ'য়ে অচেতন, শায়িত ধরণী পরে।
পুনঃ যদি লম্ফ দিয়া করে আক্রমণ,—
ডরে প্রাণ তখনি ত্যজিব!
রক্ষিগণে দাও অনুমতি—
দ্রুতগতি স্কন্ধে বহি লয়ে যাক—
শিবিরে তোমার—

পুষ্পধনু— রক্ষিগণ—সাবধান লয়ে যাও—
শার্দ্দূল ভীষণে—!

রক্ষিগণ— যে আদেশ যুবরাজ। (প্রস্থান)

অনিরুদ্ধ— খুলি প্রাণ মন—করি আশীর্ব্বাদ—
ব্রাহ্মণের অভিলাষ করিলে পূরণ।

পুষ্পধনু— সখা শঙ্কা দূর তব?

অনিরুদ্ধ— কিবা কব, বুঝিতে না পারি।
নির্ব্বিঘ্নে শিবিরে যদি পারি পশিবারে—
শঙ্কাদূর হইবে তখন।
স্মরি ভীম শার্দ্দূল গর্জ্জন
আতঙ্কে এখনও কাঁপে প্রাণ!
ওঃ! কি আপদ ভীষণ!
শতজন্ম ধরি করিয়াছি—
বহুকষ্টে সুকৃতি অর্জ্জন—

তাই আজি রহিল জীবন।

পুষ্পধনু— নহে সখা সুকৃতির ফল।

ব্রাহ্মণীর হাতে শোভে অয়স কঙ্কণ—

প্রাণ তব রহিল আজি তাই।

অনিরুদ্ধ— সেই ভাল! কোন মতে ধরি প্রাণ!

চল, চল দুরু দুরু কাঁপে হৃদিস্থল—

বিকল অন্তর মম!

হেথা আর রহিতে না পারি।

পুষ্পধনু— চল সখা।

(প্রস্থানোদ্যত)

(নেপথ্যে দূরাগত সঙ্গীত ধ্বনি)

গীত।

কুসুম ফুটেছে মাধবী কুঞ্জে, পুঞ্জে পুঞ্জে সই।

সৌরভে মধুর, মাতি মধুকর চুমে পরিমল ঐ।

পুষ্পধনু— আহা কিবা মোহন সঙ্গীত তান!

সহ মঞ্জীর নিক্কণ,—

সমীরণে ভেসে আসে হেথা!

অনিরুদ্ধ— নিরুপায় এতক্ষণে!

(পুনঃ সঙ্গীতধ্বনি)

পুষ্পধনু— ঐ! ঐ পুনঃ উঠে স্বর!

বিকল অন্তর মম!

এস দেখি কোথা হ'তে ওঠে তান।

অনিরুদ্ধ— এ কি তব কৌতুহল!

ক্ষুধানল প্রখর জ্বলিছে—

মম উদরের মাঝে।

সঙ্গীত ঝঙ্কার, ক্ষুধাদূর নাহি করে!

এস ফিরি শিবিরে সত্বর!

পুষ্পধনু— বারেক হেরিব মাত্র স্থান—!

তিলেক দেখিব সে বদন সুন্দর—
এস, এস সখা—! (প্রস্থান)

অনিরুদ্ধ— প্রমাদ, প্রমাদ!
উপায় নাহিক আর! (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য—মাধবী-কুঞ্জ।

কুসুম ও চুত মঞ্জরী ভূষিতা সহচরীগণ বেষ্টিতা—

বাসন্তী ও মুঞ্জরা।

বসন্তোৎসব গীত।

কুসুম ফুটেছে মাধবীকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে সই।
সৌরভে মধুর, মাতি মধুকর. চুমে পরিমল ঐ।
মধু গন্ধে তায় বহে ধীরি ধীরি—
ঝ'রে পড়ে তায় কুসুম মঞ্জরী—
রিণি রিণি রিণি, মধুর শিঞ্জিনী
বাজেলো চরণে সই।
রসালে ঘিরেছে কানন বল্লরী—
প্রেমের স্পন্দনে উঠিছে শিহরি!
যৌবন নিরখি, মেলি ফুল আঁখি
অনিমেষে হেরে ঐ।
কোকিল গাহিছে প্রেমের মহিমা—
কুসুমে ভাসিছে পিরীতি সুষমা—
নিখিলে ভাসিছে, ভুবনে ফুটিছে
মিলন গীতিকা ঐ।

বাসন্তী— লো সজনি!
হের কি মোহন ভূষণে আজি—
সাজিয়াছে তব সাধের মাধবী কুঞ্জ।
হের, গুঞ্জরি ভ্রমর,—
ফুলে ফুলে ক'রে মধুপান—!

ঐ হের, লতাকুঞ্জমাঝে—
বিহগ তুলিছে তান—!
নিজ মন সাধি, অবাধে
উড়িছে প্রজাপতি—!
হরিৎপল্লবে—শোভিত এ কুঞ্জবন—
এ নবমধুমাসে, হরষে কাঁপিছে হৃদি—
মলয় বাতাস, আকুল পিয়াস
জগায় পরাণে।

মুঞ্জরা— আয়াস সফল এতদিনে।
সাধের নিকুঞ্জে বসি—
শুনি যবে পাপিয়ার তান—
প্রাণ মম শূন্যে উড়ে যায়!
মানস মুকুর পরে,—
ধীরে ধীরে ফোটে কত
স্বপনের ছবি!
র'য়েছে সকলি সই,—
তবু যেন নাহি কিছু মোর—!

বাসন্তী— এ হেন মধুমাসে, মধুর যৌবনে,
এই তোর মোহন মাধবীকুঞ্জে—
নাগর যদি না আসিল সই—
তবে চকোর-পিয়াসে—
কত দিন রবি ব'সে সই?

মুঞ্জরা— ভাবিব না আর সই!
ফুটিলে কমল, লোভে পরিমল
আপনি আসিবে অলি!
এস করি কুসুম চয়ন। (কুসুম চয়ন)

(অলক্ষে পুষ্পধনু ও অনিরুদ্ধের প্রবেশ)

পুষ্পধনু—(জনান্তিকে) সখা, সখা, হের ঐ নন্দন-কানন!

গলে ফুলমালা, হাতে ফুলডালা—
দেব বালা, গাঁথে হার।
মরি মরি!
কিবা মাধুরী লহরী—
খেলে ঐ বদন সরলে!
মন্দ মন্দ বহি,—
ফুলগন্ধ ছাড়ে গন্ধবহ,
অন্ধ অলি মকরন্দ কর পান!
আনন্দে অধীর প্রাণ মম।

অনিরুদ্ধ— তবে স্বর্গে কি আসিনু মোরা?
অমরা সমান বল,—
প্রাণ বিমোহন সঙ্গীতনিস্বন—
যাদুময় মঞ্জীর নিক্কণ—

অনিরুদ্ধ— (স্বগত) বিস্মৃত কিশিকারের কথা?
আহা শুনিলে একথা,—
বড় ব্যথা বাজিবে পরাণে—
আকুল পরাণে কাঁদিবে নিয়ত
যত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণে!
লোক মুখে শুনি, সিদ্ধার্থ আপনি,
দ্বারে দ্বারে করিছেন জীব-প্রেমগান!
করিতে কি পারিব সবারে?
পারি যদি, আয়াস সফল মম তবে।

পুষ্পধনু— চিন্তা কেন কর অকারণ?
চল করি গিরি আরোহণ—
হেরিব চরণ মূলে শ্যামলা মেদিনী!
সমীরণে ভাসিবে বিহগতান,
বীণাতানে ছুটিবে নির্ঝর ধারা—
শ্রবণে অমিয় ধারা,

পরাণে পুলক ধারা—ঢালিবে তখন—
নিখিলে রোমাঞ্চ লেখা উঠিবে ফুটিয়া!

অনিরুদ্ধ। আনন্দে নাচিছে হিয়া!
রহিয়া, রহিয়া, উঠিছে কাঁপিয়া
হৃদিস্তল!
ব্যাকুল পরাণ—আগুয়ান হও সখা!

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। যুবরাজ! অশ্বধনু সব প্রস্তুত।

অনিরুদ্ধ। (স্বগত) হায়! হায়! প্রমাদ ঘটিল বুঝি!

পুষ্পধনু। বিস্মৃত আছিনু সখা শীকারের কথা!
চল ত্বরা গহন কাননে।

অনিরুদ্ধ। যুবরাজ! ক্ষমা কর মোরে।
নিবেদিত উদর যন্ত্রণা!
পুনঃ কেন কহ মোরে—
তব সনে গহন গমন কথা?

পুষ্পধনু। বুঝিলাম, ভীরু ব্রাহ্মণ কুমার!
ব্যাঘ্র ভয়ে ভীত এবে তুমি।
কিন্তু ভয় কিবা মম সাথে?
থাকিব দুজনে রথে।

অনিরুদ্ধ। বন পথে, কেমনে চলিবে রথে
বুঝিতে না পারি।

পুষ্পধনু। শস্ত্রধারী রক্ষিগণ পার্শ্বে রবে মম—
আশঙ্কার নাহিক কারণ—

অনিরুদ্ধ। কিন্তু বুঝেও না বুঝে প্রাণ মন—
গণি অনুক্ষণ, পাছে দীন ব্রাহ্মণ নন্দন
পশে বুঝি শার্দ্দূল বদনে!

পুষ্পধনু। ব্রাহ্মণীরে পড়েছে কি মনে?
প্রতিক্ষণে আশঙ্কা জাগে প্রাণে তব?

ভয় নাই, আমি তব থাকিব হে সাথে—
চল রথে; ব্যাঘ্রসাথে করিব সমর!
উৎসাহে হৃদয় ভোর!
এসহ সত্বর, বিলম্ব না সহে আর। (অনিরুদ্ধের হস্ত ধারণ)

অনিরুদ্ধ। হায়, হায়! কি হবে উপায়!
বিষম প্রমাদ গণি!
ব্রাহ্মণি! ব্রাহ্মণি!
সতী সীমন্তিনি! বুঝিবা হারায়—
তোর নয়নের মণি!

পুষ্পধনু। কেন আকুল পরাণী?
ব্রাহ্মণীর ভালে শোভে অক্ষয় সিঁন্দুর—
প্রমাদ হইবে দূর তার পুণ্যবলে।
এস চলে। (অনিরুদ্ধকে ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত)

অনিরুদ্ধ। ধীরে সখা করহ গমন—
চরণ ভাঙ্গিবে টানে—
বমনে তিতিবে সখা—
শ্যামলা মেদিনী। (উভয়ের প্রস্থান)

(রক্ষিদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম রক্ষি। এতক্ষণে সর্ব্বনাশ ঘটবে।

২য় রক্ষি। কেন?

১ম রক্ষি। কেন? তা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? তুমি একটা জলজ্যান্ত গর্দ্দভ কিনা!

২য় রক্ষি। গালাগাল দিস্‌না বলছি। আমি গর্দ্দভ? আর তুই কি? তুই কি? তুই যে একটা আস্ত মর্কট!

১ম রক্ষি। মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্‌। নইলে তোর ভাল হবে না বলছি।

২য় রক্ষি। কি করবি? তোর মতন উল্লুক, বাঁদর, গরু এ ভূভারতে নাই। বলব বেশ ক'রব বলব। একশবার বলব, লাখবার বলব!

১ম রক্ষি। মাথা গরম্ করিস্ না,—ঠাণ্ডা কর, ঠাণ্ডা কর। নইলে একটা বিদেশী-শিক্কে ওজনের চাঁটি মাথায় মারব, আর অমনি ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'সে থাকবি।

২য় রক্ষি। বটে! এতদূর সাহস তোর—! তবে তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি র'স্।

(নেপথ্যে সঙ্গীত ধ্বনি)

অচেতন করিল হে মোরে!
আহা মরি মরি!
পরাণ করিল চুরি—
ভেবে মরি,—ব্রাহ্মণীর সাধেবাদ
কে সাধে এমন!
যুবরাজ থাক তুমি হেথা—
চলিনু শিবিরে একা;
ব্যথা বড় বাজিল পরাণে
স্মরি এবে ব্রাহ্মণীর কথা।

পুষ্পধনু। (মুগ্ধভাবে) সখা! সখা!

অনিরুদ্ধ। হায়, হায়! ছাড়িয়াছে শর!
নিঠুর মদন ছাড়িয়াছে শর!
অপার দুর্গতি এবে।
এস ভেবে কি বা হবে!
এখনও রয়েছে সময়
পায় পায় চ'লে এস।

বাসন্তী। লো সই! জিনি মকর কেতন—
মোহন মুরতি ঐ
এত দিনে বিধি বুঝি মিলন রতন!

মুঞ্জরা। (সহসা পুষ্পধনুকে দেখিয়া)
এ কি মোহন মুরতি সই! (একদৃষ্টে নিরীক্ষণ)

অনিরুদ্ধ। হায়, হায়! মজিল সকলি!

আঁখিবাণ হানিছে দুর্জ্জয় ঐ,
আর নাহি দ্বিতীয় উপায়!
সখা, সখা!—

পুষ্পধনু। (বিহ্বলভাবে) কি সুন্দর! মন্দার কুসুম বলি—
হয় অনুমান!
স্বপনের ছবি!
হৃদয় করিল চুরি মোর! (এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ)

অনিরুদ্ধ। হায়, হায়! মজিল সকল!
হীন ফুলশর,—
দুর্জ্জন, পামর,—
অভিলাষ মিটিল কি তোর?

শ্রীঅমর চন্দ্র ঘোষ, বি এ

ক্রমশঃ

সংক্ষিপ্ত সমালোচন

বীরভূমবিবরণ। প্রথম খণ্ড। মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় সম্পাদিত, মূল্য দুই টাকা মাত্র। মহারাজ কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় জননী বঙ্গভাষার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই যে প্রথম পুষ্পাঞ্জলির উপহার ভক্তিভরে তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছেন, তাহার দিব্য সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া জননীর সেবকবৃন্দ আজ সকলেই পরম প্রীতি অনুভব করিবেন ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। কমলার প্রিয় পুত্র হইয়া মহারাজকুমার যে বাণীর বরপুত্র হইবার জন্য সাহিত্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন—শুধু প্রবৃত্ত হইয়াছেনই বা বলি কেন, তাঁহার সাধনার সিদ্ধি প্রভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে এমন একটী সুন্দর ফলের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা দেখিয়া বোধ করি শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই অদ্য আনন্দিত ও গর্ব্বিত।

বীরভূমের ইতিহাস বাঙ্গলার অতীত গৌরবের অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তিজ্যোৎস্নায় সমুদ্ভাসিত, অতীত যুগে বাঙ্গালীর শৌর্য্য বীর্য্য, বাঙ্গালীর জ্ঞান গরিমা, বাঙ্গালীর সাধন মহিমা, বাঙ্গালীর ভক্তিময়ী উপাসনা ও বাঙ্গালীর উদারতা ও নীতি নিপুণতা আজ বাঙ্গালীর মানসনেত্রে এমন মধুর ও সরল ভাষায় এমন অত্যুক্তি ও পুনরুক্তি বর্জ্জন পূর্ব্বক যিনি ফুটাইতে পারেন তিনি যে একজন অসাধারণ সাহিত্য স্রষ্টা তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী একজন স্বদেশ প্রেমিক ঐতিহাসিক, তাঁহার বর্ণনার সারল্য ও গভীরার্থতা দেখিয়া আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি—এই প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশে হেতমপুর কাহিনী অন্যান্য কাহিনী হইতে বৃহৎ হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে মহারাজকুমার হেতমপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের পরিচয় প্রসঙ্গে যেরূপ সংযতভাবে আত্মবংশ গৌরবের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, তাঁহার লেখার কোন স্থলেই আভিজাত্য বা ঐশ্বর্য্যের বিরক্তিকর অভিমান প্রকটিত হয় নাই ইহা দেখিয়া আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। বীরভূম সম্বন্ধে অনেক পুরাতন বিস্মৃত তত্ত্ব এই গ্রন্থে নূতনভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থের প্রচার যত অধিক হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। পরিশেষে একটী বক্তব্য এই যে—এই গ্রন্থখানির সহিত যে ভূমিকাটী লিখিত হইয়াছে, তাহা না থাকিলে যে গ্রন্থের কোন অঙ্গে সৌষ্ঠবের হানি হইতে পারে ইহা আমরা বিশ্বাস করি না, আমাদের বিবেচনায় এইরূপ ভূমিকাটী এই সুন্দর গ্রন্থের সহিত যোজিত না হইলেই ভাল হইত। ভূমিকার লেখক বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বাবু নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু দেখিতেছি নিতান্ত তাড়া তাড়ি করিয়া বাধ্যতাবশে এই ভূমিকাটী লিখিতে যাইয়া তিনি মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য ত বাড়াইতে পারেন নাই, বরং গ্রন্থের সৌন্দর্য্য যে কোন অংশে তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে বা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। তাহা ছাড়া এমন অনেক বাজে কথা তিনি বলিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহা দেখিলে অভিজ্ঞব্যক্তি মাত্রই বিস্মিত হইবেন! আমাদের সাহিত্য সংহিতার কলেবর বৃহৎ নহে সুতরাং তাঁহার এইপ্রকার সকল উক্তির উল্লেখপূর্ব্বক দোষ প্রদর্শন করিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি কর্ত্তব্যানুরোধে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ভূমিকাতে দেখিতে পাই "ভাণ্ডীরবন প্রসঙ্গে গ্রন্থকার একটী অতি

প্রাচীন ঋষির আশ্রমের সন্ধান দিয়াছেন। রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভাণ্ডকের আশ্রমের সংবাদ পাইয়াছি। রামায়ণের বিভাণ্ডক বন অধুনা বৈষ্ণব প্রাধান্যকালে ভাণ্ডীরবনে পরিণত হইয়া থাকিবে। আমরা রামায়ণ হইতে জানিতে পারি, অঙ্গাধিপ লোমপাদ বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম হইতে তৎপুত্র ঋষ্য-শৃঙ্গকে কৌশল করিয়া নিজ রাজধানীতে জলপথে লইয়া গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশ হইতেই প্রাচীন অঙ্গরাজ্য আরম্ভ। সুতরাং রামায়ণী কথায় যদি কিছুমাত্র ঐতিহাসিকতা থাকে, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে অঙ্গাধিক তাঁহার রাজ্যের অদূরবর্ত্তী বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম হইতে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনাইয়া ছিলেন। এরূপ স্থলে বলিতে হয় রামায়ণীযুগে বীরভূমের এই অংশে ঋষির আশ্রম ছিল।"

প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের এই প্রকার উক্তি—কবির উক্তি হইতে পারে, কল্পনার রশ্মিকে অসংযত করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিলে এইরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত ও হইতে পারে, ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু ঐতিহাসিকের পক্ষে এইরূপ উক্তি শোভা পায় না, প্রথমতঃ বিভাণ্ডক বনকে ভাণ্ডীরবনে পরিণত করিতে বৈষ্ণব প্রাধান্য যে কিরূপে উপযোগিতা পাইল, তাহা প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয় কি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিবেন? বিভাণ্ডক নামে বৈষ্ণবের বিদ্বেষ আছে এবং তৎপরিবর্ত্তে ভাণ্ডীর শব্দ প্রয়োগ করিলে বৈষ্ণবভাবটা রক্ষা পায়, এইরূপ আজগুবি সিদ্ধান্ত কেন যে প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের ঐতিহাসিক মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল, তাহা কি তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন? দ্বিতীয়তঃ প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণর মহাশয় বলিতেছেন রাজা লোমপাদ জলপথে শৃষ্য শৃঙ্গকে বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম হইতে লইয়া গিয়াছিলেন, আমরা কিন্তু রামায়ণে এই জলপথের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না, নগেন্দ্রবাবু স্বয়ং মহার্ণব বলিয়া কি জলপথটা তাঁহার এত প্রিয় হইয়াছে? তাহার পর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় নিঃসঙ্কোচে কি বলিতেছেন শুনুন "যদি রামায়ণী কথায় কিছুমাত্র ঐতিহাসিকতা থাকে, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে অঙ্গাধিপ তাঁহার রাজ্যের অদূরবর্ত্তী বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম হইতে তৎপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনাইয়া ছিলেন। এরূপ স্থলে বলিতে হইবে রামায়ণীযুগে বীরভূমের এই অংশে ঋষির আশ্রম ছিল।" "যদি রামায়ণী কথায় কিছুমাত্র ঐতিহাসিকতা থাকে"

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয় মনে মনে রামায়ণী কথার ঐতিহাসিকত্বে তেমন আস্থাবান্ নহেন, না হইবারই ত কথা! এখন বড় প্রত্ন-তাত্ত্বিক হইতে হইলে অগ্রে রামায়ণ ও মহাভারতের ইতিহাসত্ব খণ্ডন বা মস্তক চর্ব্বণ একান্ত আবশ্যক, কারণ নব্য বাঙ্গালীর ইতিহাসগুরু প্রতীচ্যপণ্ডিতগণ রামায়ণ ও মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া মানিতে চাহেন্ না। যাক্ সে কথা, নগেন্দ্র বাবুর এখানে ঐতিহাসিক যুক্তির বাহারটা একবার দেখুন "যদি রামায়ণী কথার কিছুমাত্র ঐতিহাসিকতা থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে অঙ্গাধিপ তাঁহার রাজ্যের অদূরবর্ত্তী বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম হইতে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনাইয়াছিলেন অর্থাৎ রামায়ণী কথার যদি কিছুমাত্র ঐতিহাসিকতা থাকে তাহা হইলে ঋষ্য শৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে লইয়া যাওয়াটাই একমাত্র সেই ঐতিহাসিক ধ্রুব সত্য, তদ্ব্যতিরেকে রামায়ণে আর যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে তাহার কোনটীও ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিশ্বকোষ প্রণেতা মহাশয়ের মতে পরিগৃহীত হইতে পারে না. হায় বঙ্গদেশ! বর্ত্তমানকালে ইঁহারাই তোমার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট ঐতি-হাসিক! ইঁহাদেরই বচনবাগীশতার উপরই দেশের অতীত গৌরবের বিলুপ্ত স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার ভার ন্যস্ত হইয়াছে! ইহাত হইল ভূমিকার ঐতিহাসিক গবেষণার দিগ্মাত্র পরিচয়, এরূপ আরও অনেক আছে সাহিত্য-সংহিতার কলেবর নিতান্ত অল্প বলিয়া এই জাতীয় উদাহরণ আর উদ্ধৃত হইল না। পাঠক নিজে দেখিয়াই মনস্তুষ্টি করিয়া লইবেন। এখন ভূমিকা লেখকের বাঙ্গালা ভাষার উপর ব্যুৎপত্তিটা কিরূপ প্রবল তাহারও কয়েকটা পরিচয় লউন।

উল্লিখিত পঙ্ক্তির মধ্যেই দেখিবেন "রামায়ণীযুগে" যুগটা যে কি করিয়া রামায়ণী হয় তাহা বৈয়াকরণগণ বুঝিতে পারিবেন কি? আর এক-স্থলে দেখিতে পাই "বিধ্বস্ত স্তূপগুলি প্রাচীনযুগের অতীত কীর্ত্তির বিলুপ্ত স্মৃতি বলিয়া মনে হইবে" বিধ্বস্তস্তূপগুলি বিলুপ্ত স্মৃতি হইবে কিরূপে? স্মৃতি হইল জ্ঞানবিশেষ, সুতরাং আত্মধর্ম্ম বা অন্তঃকরণ ধর্ম্ম—অর্থাৎ আন্তর বস্তু, তাহা বাহ্য বিধ্বস্ত স্তূপ হইতে অভিন্ন হইবে কিরূপে? এমন উদ্ভট ও নিরর্থক বাঙ্গালা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শিখিলেন কোথা হইতে? আবার শুনুন "কিন্তু তন্মধ্যে অনেক অমূলক কথা প্রকাশিত হওয়ায় তাহার সংশোধনের আবশ্যক

হইয়াছিল” ‘সংশোধনের আবশ্যক’টা যে সর্ব্বাগ্রে সংশোধনীয় তাহা নিশ্চিতই নগেন্দ্রবাবুর পক্ষেও স্বীকারের আবশ্যকতা আছে, আশা করি একথা তিনি অঙ্গীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। আর এক স্থানে ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে—“ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিপুল ও বিশাল” এইরূপ পুনরুক্তির ছড়াছড়ি করিয়া কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বোধ করি প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয়ই জানেন।

যাক্ এসব হইল অবান্তর কথা, কারণ এইরূপ ভূমিকার সহিত প্রকৃত গ্রন্থের কোন অপেক্ষিত সম্বন্ধ নাই বরং ভূমিকাটী বাদ দিয়া গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে পারিলেই ভাল হইত। আজকাল উপাধিব্যাধিগ্রস্ত লোকের দ্বারা একটা ভূমিকা লেখাইয়া মূল গ্রন্থের সহিত মুদ্রিত করা একটা ফ্যাশান্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অবশ্য ভাল ভূমিকা গ্রন্থের গৌরবই বাড়াইয়া থাকে, কিন্তু, ফ্যাশান রক্ষা করিবার অনুরোধে এইরূপ অসার ও দোষপূর্ণ ভূমিকা জুড়িয়া দিলে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য সাধিত হয় না, প্রত্যুত ইহা দ্বারা মূল গ্রন্থের প্রতি অনেক স্থলে সাধারণের অরুচি উৎপাদিত হয়, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

পরিশেষে মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে এইরূপ সুখ পাঠ্য ও বহু জ্ঞাতব্য ঐতিহাসিক তত্ত্বে পূর্ণ মনোহর গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য আমরা বঙ্গসাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায়, ৫ম খণ্ড। ১৩২৩ সাল, পৌষ, মাঘ। [৯-১০ সংখ্যা।

প্রকৃতির কৌশল।

ডারুইন্ সাহেব গত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে জীব-বিজ্ঞানে যে নূতন আলোক পাত করিয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে এই বিশাল সৃষ্টির যে কত রহস্য জানা যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। আমরা চক্ষুর দ্বারা প্রকৃতির যে মূর্ত্তি দেখি, তাহা অতি মনোরম; কিন্তু জ্ঞানের আলোক দিয়া পরীক্ষা করিলে সেই প্রকৃতিরই যে এক অপরূপ মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা অতুলনীয়। ডারুইন্ সাহেব প্রকৃতিকে যথার্থভাবে দেখিবার জন্য কেবল একটি দীপশিখা জ্বালাইয়া গিয়াছিলেন; আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সেই শিখারই উজ্জ্বল আলোকে এখন প্রকৃতির নব নব রূপ দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেছেন। সেই আলোকে আণুবীক্ষণিক প্রাণী ও উদ্ভিদের অভিব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া, এখন সুদূর নক্ষত্রলোকের ভীমকায় জ্যোতিষ্কদের অভিব্যক্তির ধারাও বুঝা যাইতেছে। চরাচর ব্রহ্মাণ্ড একই মহানিয়মের অধীন হইয়াই যে, এই সৃষ্টিকে এমন সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা জানিতেন না; আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এখন তাহাই বিজ্ঞানের নূতন আলোকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন।

ডারুইন্ যে সকল প্রাকৃতিক রহস্যের পরিচয় দিয়া বিজ্ঞানকে নূতন পথ দেখাইয়াছেন, এই প্রকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা অসাধ্য। তিনি এক জীবের যে সহিত অপর জীবের স্বাভাবিক সম্বন্ধের আভাস পাইয়াছিলেন, আমরা এখানে কেবল তাহারই একটু পরিচয় দিব। এই মহাবিশ্বে কোন জীবই

অনাবশ্যক নয় ; কেহই অপরের সহিত সম্বন্ধ রোধ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না ; প্রকৃতি দেবী সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌কে একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়া জীব রাজ্যের শাসনকার্য্য চালাইতেছেন। এই কয়েকটি উক্তি ডারুইনের পূর্ব্বে অপর কোন বৈজ্ঞানিকের নিকটে শুনা যায় নাই। ডারুইন্ এই বৈজ্ঞানিক সত্য-গুলিকে Web of Life নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন ; আমরা সেই গুলিরই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কেঁচো অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, পশু পক্ষী প্রভৃতি উন্নত প্রাণীর দেহে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, ইহাদের দেহে তাহা নাই। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, বুঝি ইহারা সংসারের কোন কাজে লাগে না, কিন্তু নিম্নের উর্ব্বর মৃত্তিকা উপরে উঠাইয়া ইহারা নীরবে শস্যক্ষেত্রের যে উপকার করে তাহা অগ্রাহ্য করিবার বিষয় নহে। ডারুইন্ হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, কোন দিন ধরা পৃষ্ঠ হইতে কেঁচোজাতীয় প্রাণী যদি হঠাৎ লোপ পাইয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভূমির উর্ব্বরতাও কমিয়া যাইবে। বিড়াল গৃহস্থের প্রচুর অনিষ্ট করে সত্য, কিন্তু ইহারা শস্যহানিকর ইঁদুর এবং নানা প্রকার কীট নষ্ট করিয়া যে উপকার করে, তাহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। ডারুইন্ সাহেব এই প্রকার কয়েকটি স্থূল উদাহরণ দিয়া, জীবগণের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধের কথা বলিয়াছিলেন।

ডারুইনের মৃত্যুর পর প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এই সুদীর্ঘ-কালে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনেতিহাসের যে সকল নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে ডারুইনের উক্তির সত্যতা আরও সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহারা বলিতেছেন, জীবগণ যদি পরস্পরের সহিত যোগরক্ষা করিয়া চলিতে না পারে, তাহা হইলে এই সৃষ্টি হইতে তাহাদের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইয়া যায়। আমরা সংসারের দৈনন্দিন কার্য্যে কত অনৈক্য কত অমিলের মধ্যে পড়িয়া সংগ্রাম করি, ইহাতে যে, কত শক্তি ও সময়ের অপব্যয় হয়, তাহার পরিমাণই হয় না। প্রকৃতির কার্য্যে এই প্রকার অনৈক্য অসা-মঞ্জস্য স্থান পায় না ; যে জীব প্রকৃতির বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

প্রচুর খাদ্য সম্মুখে পাইলে প্রাণিগণ তাহা আহার করিয়া পুষ্ট হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বংশ বিস্তার করে। কোনও সীমাবদ্ধ স্থানে কোন বিশেষ প্রাণীর

এই প্রকার বংশবৃদ্ধি কখনই সৃষ্টি রক্ষার অনুকূল নয়। সুইডেনে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকার একটি ঘটনা দেখা গিয়াছিল। আমাদের শশক বা কাঠ-বিড়ালের ন্যায় লেমিং নামে এক প্রকার উদ্ভিজ্জভোজী ক্ষুদ্র প্রাণী ঐ দেশে সর্ব্বত্র দেখা যায়। হঠাৎ দুই বৎসর সুজন্মা হওয়ায় প্রচুর আহার্য্য পাইয়া ইহারা সংখ্যায় এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, দেশে শস্যহানির সম্ভাবনা হইয়াছিল। কৃষকেরা এই উপদ্রবের শান্তির জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিল, কিন্তু, তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। শেষে প্রাকৃতিক বিধানেই এই উপদ্রবের শান্তি হইল; অকস্মাৎ এই ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের মধ্যে মড়ক দেখা দিল। এবং পূর্ব্বে যে পরিমাণে ঘাস-পাতা জন্মিত তাহাও কমিয়া আসিল। এই প্রকারে কতক লেমিং পীড়ায় এবং কতক অনাহারে মরিয়া যাওয়ায় দেশের শস্যহানি রোধ প্রাপ্ত হইল। এই ঘটনার মধ্যে বিস্ময়কর ব্যাপার কিছুই নাই। এই প্রকার উদাহরণ সংগ্রহের জন্য সুইডেনের পশুপক্ষীদিগের ইতিহাস অনুসন্ধান করিবারও প্রয়োজন হয় না। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেরই শস্যক্ষেত্রে হয় ত পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার সংঘটিত হয়। বিশেষ কারণে কোন প্রাণি জাতির অত্যধিক অভ্যুদয় হইলে যে সঙ্কট উপস্থিত হয়, প্রকৃতি কি প্রকার কৌশলে তাহার প্রতিবিধান করেন, ইহাই আমাদের চিন্তার বিষয়। উদ্ভিজ্জভোজী প্রাণীরা কেবল তৃণ পত্র আহার করিয়া জীবিত থাকে। আবার মাংসাশী প্রাণিগণ কেবল উদ্ভিজ্জভোজী প্রাণীদিগের মাংসে জীবন ধারণ করে। কাজেই একের অভাবে অপরের জীবিত থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। খাদ্য ও খাদকের মধ্যে যাহাতে নিয়ত সামঞ্জস্য থাকে, স্বভাবতঃই তাহার ব্যবস্থা আছে। যদি কোনও অকস্মিক কারণে এই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, তখন জীবন-সংগ্রাম অতি ভীষণ হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহারই ফলে দেশে হাহাকার পড়িয়া যায়। কিন্তু এই সংগ্রাম রোধ করিয়া শান্তি সংস্থাপনের অধিকার মনুষ্যের নাই; স্বয়ং প্রকৃতিই শান্তির বিধাত্রী।

প্রাণীর মৃত্যুর সহস্র দ্বার নিয়তই উন্মুক্ত রহিয়াছে। কতকগুলি দুর্ব্বল প্রাণী প্রবল শত্রুর হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করে; কতকগুলি আবার আকস্মিক প্রাকৃতিক উৎপাতে মরিয়া যায়। সন্তান প্রসব করিয়া প্রসূতি নিজের সন্তানদিগকে নিজেই ভক্ষণ করিতেছে, এ প্রকার দৃষ্টান্তও কীট পতঙ্গদিগের মধ্যে বিরল নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রকারে দলে দলে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া সত্ত্বেও কোনও

প্রাণীর বংশ লোপ হয় না। বংশ রক্ষার জন্য এই সবল প্রাণীদিগকে চেষ্টাও করিতে হয় না, প্রাকৃতিক সুব্যবস্থাতেই দুর্ব্বল প্রাণীদিগের বংশ অক্ষুণ্ণ থাকে। যাহারা নিঃসহায় তাহারা স্বভাবতঃই এত অধিক সন্তান প্রসব করে যে, আকস্মিক উৎপাতে ও বলশালী শত্রুর উপদ্রবে বহু সন্তানের বিনাশ হইলেও যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা বংশ রক্ষার পক্ষে প্রচুর হয়। রাত্রিতে আলো জ্বালিলে যে এক প্রকার সবুজ রঙ্গের ক্ষুদ্র পতঙ্গ প্রদীপের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, পাঠক অবশ্যই তাহা দেখিয়াছেন। ইহাদের শত্রু অনেক,—নানা জাতীয় পক্ষী ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ভক্ষণ করে; ইহা ছাড়া পীপিলিকা ভেক ইত্যাদি প্রাণিগণও এই গুলিকে নিকটে পাইলে বিনষ্ট করে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হক্সলি সাহেব হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন, এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র পতঙ্গগুলি হইতে এত অধিক সন্তান জন্ম গ্রহণ করে যে, একটি মাত্র পতঙ্গের সন্তান সন্ততি তিন মাসের মধ্যে পৃথিবীর জন সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই ক্ষুদ্র প্রাণীদের জন্মের হার যেমন অধিক মৃত্যুর হারও ঠিক তদনুরূপ অধিক, এই ব্যবস্থায় জন্মমৃত্যু সমান তালে চলে বলিয়া, এই শ্রেণীর প্রাণীদিগের বংশ লোপ ঘটে না। কেবল ক্ষুদ্র পতঙ্গগণই যে, অধিক সন্তান প্রসব করে, তাহা নহে। যে প্রাণীর মৃত্যুর হার অধিক, তাহাদের জন্মের হারও স্বাভাবিক নিয়মে আপনা হইতেই অধিক হইয়া দাঁড়ায়। শশক অতি নীরিহ প্রাণী, মাংসাশী প্রাণিমাত্রেরই ইহারা ভক্ষ্য। এই কারণে ইহাদের মধ্যে মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক। বংশ অব্যাহত রাখিবার জন্য ইহাদের জন্মের হারও অত্যন্ত অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শশক মাত্রেই প্রতি বৎসরে চারিবার শাবক প্রসব করে এবং প্রত্যেক বারে পাঁচ ছয়টি করিয়া শাবক জন্মগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যে সকল প্রাণী নিজের দৈহিক বল বা বুদ্ধির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে আকস্মিক মৃত্যু অতি অল্পই দেখা যায়। কাজেই ইহাদের যে সকল সন্তান জন্মে, সেগুলি প্রায়ই দীর্ঘ জীবন লভে করিয়া বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। এই কারণে ইহাদের সন্তানের সংখ্যাও অল্প হয়। মানুষ বুদ্ধিমান্ প্রাণী; বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া শত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিতে পারে। মানুষের সন্তান ইতর প্রাণীদিগের তুলনায় অনেক কম হয়। হস্তী বুদ্ধিমান ও বলশালী প্রাণী; এই কারণে

ইহাদের শত্রুও অল্প। হস্তিনী দশ বৎসর অন্তরে এক একটি শাবক প্রসব করে।

পক্ষীজাতির সহিত আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিচিত আছি। কিন্তু প্রকৃতিতে ঐক্য রক্ষার জন্য ইহারা যে কিছু করে, তাহা আমাদের হঠাৎ মনেই হয় না। জীবতত্ত্ববিদ্গণ পক্ষীর কার্য্য সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া থাকেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা বলেন, উদ্ভিজ্জভোজী কীটপতঙ্গ এবং মুষিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণিগণ যে প্রকার দ্রুত সন্তান প্রসব করে, তাহাতে অল্পকালের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী ঐ সকল ক্ষুদ্র প্রাণীতে আচ্ছন্ন হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা দেখা যায়। বহু মুষিক ও কোটী কোটী পতঙ্গাদি ভক্ষণ করিয়া পক্ষিগণই উহাদের সংখ্যা কমাইয়া রাখে। ইহাতেই ভূপৃষ্ঠের তৃণপত্রাদি অব্যাহত থাকিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। জনৈক জীবতত্ত্ববিদ্ হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন, আজ যদি পৃথিবী হইতে পক্ষিজাতি লোপ পাইয়া যায়, তবে ছয় বৎসর পরে সমগ্র ভূতল খুঁজিয়া একটি উদ্ভিদেরও সন্ধান পাওয়া যাইবে না;—পতঙ্গের উপদ্রবে সমগ্র বৃক্ষলতা গুল্ম বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

পক্ষীগণ সাধারণতঃ কীটপতঙ্গ নষ্ট করিয়া উদ্ভিদের উপকার করে সত্য, কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে কতকগুলি শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া সংসারের যে ক্ষতি করে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই সামান্য ক্ষতির জন্য উক্ত পক্ষীদিগকে প্রকৃতির বিদ্রোহীদিগের দলে ফেলিলে অবিচার করা হয়। কৃষক বহুশ্রমে ক্ষেত্রে যে শস্য উৎপাদন করে, রাজার আইনে তাহাতে উহার ষোল আনা অধিকার থাকিলেও, প্রকৃতির বিধান অনুসারে সমগ্র শস্য একক ক্ষেত্র স্বামীরই প্রাপ্য হয় না। এই বিশাল বসুন্ধরার অসংখ্য বৃক্ষলতাতৃণাদি যে ফল প্রদান করে, তাহাতে প্রকৃতির সকল সন্তানেরই তুল্য অধিকার আছে। মানুষ স্বার্থপর; এইজন্য প্রকৃতির সকল নিয়মই নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

গো মেষ মহিষাদি প্রাণীদিগকে পালন করিয়া আমরা যখন সংসার পাতিয়া লই, তখন মনে হয় বুঝি এই সকল প্রাণীদের অভাবে আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। বলা বাহুল্য ইহা একটি প্রকাণ্ড মিথ্যা ধারণা। মানুষ উন্নত বুদ্ধির অধিকারী হইয়া নিজেকে এবং নিজের সমাজকে এমন কৃত্রিম

আবরণে আবৃত রাখিয়াছে যে, প্রকৃতি হইতে তাহার যাহা প্রাপ্য তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সে দাবী করে। কিন্তু প্রকৃতির দানে পক্ষপাত নাই, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা অপেক্ষা একটুও অধিক কেহই প্রকৃতির নিকট হইতে পায় না। কাজেই কৃত্রিম অভাব পূরণ করিবার জন্য মানুষ বুদ্ধিবলে অনেক ইতর প্রাণীর স্বাধীনতা হরণ করে এবং ইহাতে তাহাদের অবস্থা এ প্রকার হইয়া দাঁড়ায় যে, মানুষের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। বুদ্ধিমান মানুষ প্রকৃতির বিদ্রোহী হইয়া জীবন ধারণের উপায়গুলিকে কৃত্রিম করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই তাহাদের এত অভাব এবং এত অভিযোগ। আমরা যেমন গো-মহিষাদির সাহায্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, উদ্ভিদ্ ও ইতর প্রাণীরাও জীবন ধারণের জন্য সেই প্রকার পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহই মানুষের ন্যায় বুদ্ধিমান জীব নয়, কাজেই তাহারাই প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গ করে না, প্রকৃতির নির্দ্দেশানুসারে জড়বৎ চলিয়াই পরস্পরের সাহায্য করে। সৃষ্টির ধারা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য প্রকৃতি যে কৌশলে প্রাণী ও উদ্ভিদদিগকে পরস্পরের সাহায্যে নিযুক্ত করেন, তাহা বড়ই আশ্চর্য্য-জনক। পাঠক অবশ্যই জানেন, পুষ্পের পুংকেশরের পরাগ গর্ভকেশরে আসিয়া না পড়িলে, পুষ্প হইতে ফল হয় না। পুংকেশর ও গর্ভকেশর কতকগুলি উদ্ভিদের পুষ্পে একত্র থাকে, কিন্তু আমাদের পরিচিত অধিকাংশ উদ্ভিদেরই পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প পৃথক হইতে দেখা যায়। লাউ ও কুমড়া প্রভৃতি উদ্ভিদ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ গুলিতে কতক পুষ্প গর্ভকেশর লইয়া এবং কতক কেবল পুংকেশর লইয়া প্রস্ফুটিত হয়। কাজেই পুংপুষ্পের পরাগ স্ত্রীপুষ্পের কেশরে আসিয়া না ঠেকিলে ফল জন্মে না; ইহাতে এই শ্রেণীর উদ্ভিদের বংশলোপের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু কোন জীবের বংশ লোপ করা প্রকৃতির বিধান নয়, স্বয়ং প্রকৃতিই মধুমক্ষিকা প্রভৃতি নানা জাতীয় পতঙ্গের সাহায্যে পুংপুষ্পের পরাগ স্ত্রীপুষ্পে যোজনা করিয়া থাকেন। পতঙ্গেরা মধু-পানের জন্য যখন পুংপুষ্পের উপরে বসে, তখন এই পরাগ কণা তাহাদের দন্তুর পদে এবং সর্ব্বদেহে সংলগ্ন হইয়া যায়। পরে এই পতঙ্গগুলি যখন স্ত্রীপুষ্প হইতে মধু সংগ্রহের চেষ্টা করে, তখন সেই পরাগকণিকা গুলিই স্ত্রীপুষ্পের গর্ভকেশরে সংযুক্ত হইয়া পুষ্পের গর্ভাধান করে। নিঃসহায়

উদ্ভিদদিগের বংশ-রক্ষার এ প্রকার সুব্যবস্থার কথা শুনিলে প্রকৃতই বিস্মিত হইতে হয়।

উদ্ভিদের ফল পাকিলে তাহা ভূতলে পতিত হয় এবং মৃত্তিকা সরস ও উর্ব্বর হইলে হয় ত সেই সকল ফলের বীজ বৃক্ষতলেই অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু একই স্থানে বহু বীজ একত্র অঙ্কুরিত হইলে কোন অঙ্কুরই বৃক্ষে পরিণত হয় না; যে সকল বীজ পরস্পর দূরে দূরে থাকিয়া অঙ্কুরিত হয়, সেইগুলিই ভবিষ্যতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নিজের বীজগুলিকে বহুদূরে নিক্ষেপ করিয়া বংশরক্ষা করার শক্তি উদ্ভিদের নাই, কাজেই অনুকূল স্থানে যথাযোগ্যভাবে বীজ নিক্ষিপ্ত হওয়ার অভাবে উদ্ভিদ্‌দিগের বংশলোপের সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃতির কৌশলে কতকগুলি উদ্ভিদের বংশ কি প্রকারে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা উল্লেখযোগ্য।

ফল পাকিতে আরম্ভ করিলেই বহু ফলভোজী পক্ষী বৃক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই এক একটি সুপক্ক ফল ঠোঁটে করিয়া দূরে লইয়া গিয়া ফেলে। এই গুলির বীজই উপযুক্ত মৃত্তিকায় পড়িলে সহজে অঙ্কুরিত হয়, এবং শেষে সেই অঙ্কুরগুলিই বৃক্ষে পরিণত হয়। আমাদের দেশের বট ও অশ্বত্থ নিম্ব প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌গণ এই প্রকারেই বংশ বিস্তার লাভ করে। কাঠবিড়াল এবং মূষিক জাতীয় প্রাণীরাও কখন কখন এই কার্য্যের সহায়তা করে। ইহারা বৃক্ষ হইতে সুপক্ক ফল সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য সে গুলিকে মৃত্তিকাতলে লুক্কায়িত রাখে। কিন্তু ইতর প্রাণীর স্মৃতিশক্তি প্রবল নয়, এই কারণে তাহারা কোথায় ফল লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যায়। শেষে মৃত্তিকা-আচ্ছাদিত এই সকল ফলের বীজ অঙ্কুরিত হইলে বৃক্ষে পরিণত হয়। জলচর পক্ষীরা যে, জলজ উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর বংশ বিস্তারে সাহায্য করে, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। কোন জলাশয়ে বিচরণ করিয়া এই সকল পক্ষী যখন অপর জলাশয়ে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের পায়ে এবং ঠোঁটে জলজ উদ্ভিদ্‌দিগের ক্ষুদ্র বীজ সংলগ্ন থাকে। এই সকল বীজ নূতন জলাশয়ে আশ্রয় পাইয়া অঙ্কুরিত হয়, এবং তাহাতে ঐ সকল উদ্ভিদের বংশ বিস্তৃতি লাভ করে। জলচর পক্ষীরা এই প্রকারে জলজ ক্ষুদ্র প্রাণীদিগেরও ডিম্ব নূতন নূতন জলাশয়ে বহন করিয়া লইয়া যায়। জনৈক জীবতত্ত্ববিদ্ বক জাতীয় পক্ষীর পদে লিপ্ত কর্দ্দম পরীক্ষা করিয়া তাহাতে প্রায়

ত্রিশ প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর-বীজ এবং ডিম্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে,—জলজ জীবের বিস্তৃতি এবং বংশ রক্ষার জন্যও পক্ষীরা যথেষ্ট সাহায্য করে।

পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণী যে, সংসারের কোনও উপকারে আসিতে পারে, তাহা হঠাৎ আমাদের মনে হয় না। কিন্তু জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, এই প্রাণীগণ নানা প্রকার তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের বংশ রক্ষার বিশেষ সাহায্য করে। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, পিপীলিকাগণ বৃহৎ প্রাণীদিগের তুলনায় অনেক অধিক বুদ্ধিমান, ইহাদের সমাজ আছে এবং সেই সমাজেরই মঙ্গল বিধানের জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ লক্ষ্য করিয়াছেন, পিপীলিকারা যখন নানা জাতীয় ঘাসের বীজ এবং শস্যাদির দানা মুখে করিয়া তাহাদের দূরবর্ত্তী গর্ত্তের দিকে চলিতে আরম্ভ করে, তখন সকল বীজ ও শস্য তাহাদের ভাণ্ডারে গিয়া স্থান পায় না; পথের মধ্যে যে গুলি ঘটনাক্রমে তাহাদের মুখ হইতে স্খলিত হয়, তাহা পথেই পড়িয়া থাকে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, এই প্রকারে তৃণের বীজ ও শস্যাদি দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়া ঐ সকল উদ্ভিদের বংশ বিস্তার করে।

প্রকৃতির নির্দ্দেশে প্রাণী ও উদ্ভিদ্ পরস্পরকে সাহায্য করিয়া কি প্রকারে পরস্পরের বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে, আমরা তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলাম। এক জাতীয় প্রাণী অপর আর এক জাতীয় প্রাণীকে সাহায্য করিয়া প্রকৃতিতে ঐক্য রক্ষা করিতেছে, এ প্রকার উদাহরণও জীব-বিজ্ঞানে অনেক পাওয়া যায়। জলাশয়ে যে সকল শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুক জন্মে, তাহাদের জীবনেতিহাসে এই ব্যাপারটির পরিচয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। ঝিনুক তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সন্তানকে মৎস্যের ন্যায় নির্ম্মমভাবে জলে ছাড়িয়া দেয় না; শাবকগুলিকে তাহারা কিছুদিন নিজেদের কান্‌কার, (Gill-plate) গোড়ায় রাখিয়া পালন করে। তার পরে বিশেষ বিশেষ কয়েক জাতীয় মৎস্য নিকটবর্ত্তী হইলে ঝিনুকেরা তাহাদের শাবক গুলিকে জলে ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করে। ছাড়া পাইলে সে গুলি নিকটস্থ মৎস্যের দেহে সংলগ্ন হইয়া যায়। এই প্রকারে ঝিনুক শাবকগুলি দীর্ঘকাল মৎস্যের দেহে লিপ্ত থাকিয়া কাটাইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বয়োবৃদ্ধির সহিত নিজেদের দেহগুলিকে পরিণত করিতে থাকে। পূর্ণাবয়ব

প্রাপ্ত হইলে ঝিনুক শাবকেরা আর মৎস্যের দেহে থাকিতে চায় না; তখন তাহারা সেখান হইতে একে একে স্খলিত হইয়া জলাশয়ের পঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঝিনুক শাবকগুলি ঝিনুকের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে মাত্র; তাহাদের পালনের ভার মৎস্যদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, ঝিনুক স্বেচ্ছায় নিজের সন্তানদিগের পালন ভার মৎস্যের উপরে সমর্পন করে না, এবং মৎস্যও দয়াদ্রচিত্ত হইয়া নিজের দেহে অপরের সন্তানকে আশ্রয় দেয় না। নিঃসহায় ঝিনুক শাবক গুলিকে পালন করার ইহাই প্রাকৃতিক বিধান,—এই কারণেই স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা চালিত হইয়া ঝিনুক তাহাদের শাবকগুলির পালন ভার মৎস্যদিগের উপরে দিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

সহযোগিতার সাহায্যে আমরা সংসারের অনেক কাজ করি। আমি বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করি, ছাত্রের অভিভাবকেরা ইহার বিনিময়ে কিছু অর্থ দান করেন; ইহাতে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা হয়। এই প্রকারে একের অভাব অপরের পূরণ করে এবং শেষে দেখা যায় উভয়েই লাভবান হইয়াছে। খঞ্জ যখন অন্ধের স্কন্ধে চাপিয়া রাজবাটিতে ভিক্ষার জন্য যায়, তখনও তাহাদের মধ্যে ঐ প্রকার সহযোগিতা দেখা যায়। কারণ ভিক্ষালব্ধ ধন উভয়ে ভাগ করিয়া লয় এবং তাহাতে উভয়েই লাভবান্ হয়। ইতর জীবের মধ্যে এই প্রকার সহযোগিতা জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ আবিষ্কার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য আমরা যেমন স্বার্থ-সিদ্ধির কথা মনে করিয়া বুদ্ধিপ্রয়োগে অপরের সহিত সম্বন্ধ পাতাই; ইতর জীবেরা তাহা করে না। দুইটি অসম্পূর্ণ জীবকে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া প্রকৃতিই তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখেন। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ব্যাপারটিকে Symboisis বলেন,—আমরা তাহাকে সহযোগিতা বলিলাম। উদ্ভিদ এবং ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের জীবন হইতে ইহার অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়।

শৈবাল ও ব্যাঙের ছাতা উভয় উদ্ভিদ; কিন্তু একজাতীয় উদ্ভিদ নয়। শৈবাল (Algae) অসম্পূর্ণ এক কোষময় জীব। বদ্ধ জলে যে হরিদ্‌বর্ণের সর পড়ে, তাহাই ঐ এক কোষময় উদ্ভিদের সমষ্টি। ইহাদের মূল নাই; বদ্ধ জলে আকস্মিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাই উহারা দেহস্থ করিয়া জীবিত থাকে। অপর খাদ্য তাহারা দেহের হরিদ্ কণার (Cholorophyl) সাহায্যে প্রস্তুত

করিয়া লয়। ব্যাঙের ছাতা উদ্ভিদ্ শ্রেণীভুক্ত হইলেও অপুষ্পক। ইহাদের মূল আছে,—আকরিক পদার্থ ইহারা মূলের সাহায্যে মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করিয়া দেহস্থ করে। কিন্তু দেহে হরিদ্‌কণা না থাকায়, তাহারা অপর প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজ দেহে প্রস্তুত করিতে পারে না। এই জন্যই যেখানে লতাপাতা বা গোময়াদি পচিতে থাকে, সেখানে ব্যাঙের ছাতা জন্মে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শৈবাল ও ব্যাঙের ছাতা উভয়েই এক একটি অভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং একের অভাব অপরটিতে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। জীবতত্ত্ববিদ-গণ দেখিয়াছেন, প্রায়ই ব্যাঙের ছাতা এবং শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ্ একই স্থানে একত্র অবস্থান করে দেহের হরিদ্‌কণার সাহায্যে বায়ুর অঙ্গারক বাষ্প টানিয়া শৈবাল যে খাদ্য নিজ দেহে প্রস্তুত করে, তাহার সমগ্র অংশ সে নিজে ভক্ষণ করে না; একটা ভাগ সে ব্যাঙের ছাতাকে দিতে থাকে। ব্যাঙের এই অযাচিত দান পাইয়া নিশ্চিন্ত থাকে না। সে নিজের মূলে সাহায্যে মৃত্তিকার আকরিক পদার্থ শোষণ করিয়া যে খাদ্য প্রস্তুত করে, তাহার একটা ভাগ শৈবালকে দান করিতে থাকে। এই ব্যবস্থায় কাহারও খাদ্যের অভাব হয় না। প্রত্যেকে অপরের অভাব মোচন করিয়া পরিপুষ্ট হইতে আরম্ভ করে। বৃক্ষের ত্বকে পুরাতন প্রাচীরের গায়ে যে সাদা ও সবুজ রঙ্গ মিশান ছাতা দেখা যায়, তাহা শৈবাল ও ক্ষুদ্র জাতীয় ব্যাঙের ছাতারই এক একটি উপনিবেশ। প্রকৃতির নির্দ্দেশে পরস্পরকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাহায্য করিয়াই উহারা জীবন ধারণ করে।

মটর কড়াই শিম প্রভৃতি উদ্ভিদের জীবনেও সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই অবস্থায় এক প্রকার জীবাণু (Bacillus) উহাদের মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করিতে থাকে। বায়ু হইতে নাই-ট্রোজেন্ সংগ্রহের এক অদ্ভুত ক্ষমতা এই জীবাণুগুলিকে দেখা যায়। কাজেই এই অতিথিদিগকে আশ্রয় দিয়া উদ্ভিদ্‌গণ বিশেষ লাভবান্ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দেহস্থিত অঙ্গার ও হাইড্রোজেন—ঘটিত অনেক সুখাদ্য জীবাণুদিগকে দান করিতে আরম্ভ করে। এই আদান প্রদানে উদ্ভিদ্ ও জীবাণু উভয়েই লাভবান্ হয়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ইউরোপীয় সাহিত্যে দুঃখবাদ ও বঙ্গ সাহিত্যে তাহার প্রভাব।

"Werther infusing itself into the core and whole spirit of literature, gave birth to a race of sentimentalists, who have raged and wailed in every part of the world till better light dawned on them or at least exhausted nature laid itself to sleep, and it was discovered that lamenting was an unproductive labour."—Carlyle.

যে দিন ইউরোপে Werther এর জন্ম হইল, সেই দিন হইতে ইউরোপে সাহিত্যেরও এক নবীন ধারা প্রবাহিত হইল। এই সাহিত্যের মূলসূত্র,—'জীবন ভোগ একটা বিড়ম্বনা'। এখানে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা দুঃখদুর্দ্দশার ভাগই বেশী। আর এই জীবনভোগের পর কি আছে তাহা অনন্ত সংশয়াচ্ছন্ন। কিছুই আমরা সত্য ও ধ্রুব বলিয়া ধরিতে পারি না। এই কথাই নানা ভাবে, নানা আকারে এই সাহিত্যের ভিতর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কথাটা কিছু নূতন নয়। কিন্তু ইউরোপ এই ভাবের উপর যে সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত করিল তাহাতে একটু নূতনত্ব আছে। যখন দুঃখ অমঙ্গলই জীবনে বেশী তখন তাহাকে ভুলিবার জন্য, চাপা দিবার জন্য, তাহারা কোন অনুষ্ঠানের কথা তুলিল না। তাহারা দুঃখকে এক রকম বরণ করিয়া লইল। অমঙ্গলের বড়াই করিতে শিখিল। অবশ্য জীবনে সুখের আশা নাই বা সুখ নাই এ কথা এ সাহিত্য বলিতেছে না। তবে তাহার পরিমাণ এত অল্প ও তাহা এত ক্ষণিক যে তাহা প্রকৃত ভোগের বস্তু না হইয়া কেবল বিড়ম্বনার কারণ হইয়া উঠে। নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার অপেক্ষা ক্ষণিক বিদ্যুদ্দীপ্তি অধিকতর সঙ্কটজনক। ইহার ফল ইংলণ্ডে Byron, ফ্রান্সে Chateaubriand ইত্তালীয় সাহিত্যে Leopardi. রুসিয়ার সাহিত্য, বলিতে গেলে, Byronism এর উত্তেজনাতেই প্রথম প্রাণলাভ করে। Poushkin Byron এর মন্ত্র শিষ্য।

ইউরোপে এই ভাব প্রথমে Wertherism, পরে Byronism ও শেষে Pessimism নামে পরিচিত হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রের Pessimism সাহিত্যের এই pessimism হইতে একটু স্বতন্ত্র পদার্থ। 'নৈরাশ্য বাদ' বলিলে ইহা ঠিক্ বুঝান হয় না। ইহাতে শুধু কান্না নাই, হাঁসিও আছে, সব তুচ্ছ করা বিশেষতঃ মানুষের উচ্চতর মনোবৃত্তি, স্নেহ, প্রেম, দয়া ভালবাসা প্রভৃতিকে খাটো-করা হাল্কা-করা হাসি। ইহার একটা লক্ষণ—দুঃখকে লইয়া, অমঙ্গলকে লইয়া বড় করা। নিজের অন্তর ক্ষত দেখাইয়া লোকের কাছে গর্ব্ব করা এবং তাহার জোরে প্রাধান্য বা বিশেষত্ব লাভ করিবার চেষ্টা। Intellectual বা মননশীল ইউরোপীয়গণ সকল বিষয়ে বিশ্বাস হারাইয়া শেষে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব লইয়া পড়িল এবং অন্য সব তুচ্ছ করিতে শিখিল। তখন প্রত্যেকের বোধ হইতে লাগিল যেন জগতের সব বস্তু তাহাকেই আঘাত করিতেছে, সংসারের সকল অমঙ্গল তাহারই পিছনে ছুটিয়াছে। নিজেকে ভিন্ন যে আর কাহাকেও জানে না, তাহার কাছে ইহা স্বাভাবিক। সেই জন্য ইউরোপীয় মন তখনকার সাহিত্যে নিজের যে চিত্র প্রতিফলিত করিল তাহাতে মনে হয় যেন জীবনের বহু সুযোগ দুঃখ দুর্দ্দশায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে, হৃদয়ের ও মনের অনেক শক্তি দুঃখের ও অমঙ্গলের পেষনে বৃথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই ভাব হইতে ইউরোপীয় Realistic বা বাস্তব সাহিত্যের উৎপত্তি। কারণ Pessimism হইতে realism ও Optimism হইতে Idealism উদ্ভূত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ।

সকলেই জানেন জার্ম্মান কবি Goethe প্রথম বয়সের চাঞ্চল্যবশে এই Wertherএর গল্প লেখেন। তিনি তাঁহার যুবা নায়ককে ইউরোপ সুলভ প্রেমের নৈরাশ্যে ডুবাইয়া, কর্ম্মহীনতার অন্ধ তামসের মধ্যে কিছুকাল ঘুরাইয়া শেষে আত্ম-হত্যার পথে জীবনের দুর্ব্বিসহ কারাভোগ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। পরিণত বয়সে Goethe এই Werther কে ইউরোপের অধিকতর উপযোগী করিয়া এবং সমস্ত জন সমাজের এক নিত্য অংশের প্রতিবিম্বে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া Mephistopheles চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যে অল্পতর ক্ষমতাশালী লেখকগণ এই Werther কে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিল না। Goethe অসাধারণ ক্ষমতা শালী ছিলেন। তিনি ইউরোপের মন ঠিক্ ধরিয়া-ছিলেন। Goethe র মত সমস্ত ইউরোপ তখন এক নব অভ্যুদয়ের চাঞ্চল্যে

আলোড়িত। ইউরোপ তখন ধর্ম্মপ্রধান ও কর্ম্মপ্রধান যুগ পার হইয়া চিন্তা প্রধান যুগে পদার্পন করিতেছে। চিন্তাপ্রধান যুগে মানুষ তর্ক করে, অতীতাপেক্ষী বা Retrospective হয়, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহারই সূত্র ধরিয়া অনেক নাড়াচাড়া করে, সমালোচনা করে, প্রায়ই সকল বিষয়ে সংশয় কাটাইয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু যাহা করে তাহা অত্যন্ত হঠকারিতার সহিতই সম্পন্ন করে। Goethe এ যুগের একজন আদর্শ কবি। তাই সেই প্রথম বয়সের চাঞ্চল্য প্রসূত Werther এর সুর তখনকার ইউরোপীয় জনচিত্তে ও জনচিন্তানুসারক সাহিত্যে বেশ জমিয়া গেল। ইউরোপে, Werther-বাদ আরম্ভ হইল। সেই দিন হইতে Byron এর আবির্ভাব এবং ইতালীয় কবি Leopardi র নিরাশ সঙ্গীত গুলির জন্ম কেবল সময়ের অপেক্ষা করিতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সংশয়বাদ ও Sentimentalism অযথাভাবুকতায় মিশিয়া সাহিত্যে Pessimism এর সৃষ্টি করিল।

এরূপ হইবার যে কারণ ছিল না, তাহাও নয়। কারণ যথেষ্টই ছিল। ইহার কারণ হইতেছে, শিক্ষা ও সমাজের অসামঞ্জস্য। ইহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্য ফিরাইয়া পাইয়া ইউরোপ দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠিল এবং আপনাকে শিক্ষিত করিতে যত্নবান হইল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী এক মহা ধর্ম্ম দ্বন্দ্বের যুগ। যখনই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে দ্বন্দ হয় তখনই বুঝিতে হইবে যে উভয়ের অন্তরে গলদ আছে। সেই গলদের নামান্তর ভণ্ডামী। প্রাচীন রোমক গ্রীসীয় সাহিত্যের পুনরাবিষ্কারে ইউরোপের মস্তিষ্ক যখন নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া, স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া সকল জিনিষই যাচাই করিতে লাগিল তখন এই ধর্ম্ম দ্বন্দের অন্তর্নিহিত ভণ্ডামি ধরিয়া ফেলিতে তাহার দেরি হইল না। কিন্তু অধিকাংশ নব্য শিক্ষিতেরা দেখিল যে সে ভণ্ডামী ভাঙ্গিতে গেলে সমস্ত সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে। সুতরাং সমাজ ধর্ম্মকে আপন পথে যাইতে দিয়া তাহারা নূতন নূতন কাব্য ও শিল্প কলার সৌন্দর্য্যের আস্বাদনে ব্যাপৃত রহিল। তাহারা যখন গ্রীক্ সাহিত্য রসের আস্বাদনে Pagan, বাহিরে তখন Catholic ধর্ম্মের সমাজবন্ধন। কাজেই শিক্ষা ও সমাজের সামঞ্জস্য রহিল না। ফলে সমাজধর্ম্মের অপেক্ষা না থাকায়

সংযম লুপ্ত হইল। এ যুগের অনেক শিল্পী ও সাহিত্যিকের জীবন এই সংযম হীনতার চূড়ান্ত নিদর্শন। যাহারা Catholic সমাজের গণ্ডী ছাড়াইল তাহারাও সেই চেষ্টার উত্তেজনায় সংযম হারাইল। লোকে সংযম হারাইয়া শান্তি হারাইল। সেই অশান্তির তাড়নায় তাহারা জীবন দেবতাকে দেখিতে না পাইয়া চারিদিকেই বিকট বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। তখনও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের কল্পনা সৌন্দর্য্য ও রস সৃষ্টি করিতে লাগিল বটে কিন্তু Grotesque বা উদ্ভট ভাবে। জীবন ও সৌন্দর্য্যকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া নহে! জীবনের পূর্ণতা লক্ষ্যের অতীত হইয়া গেল। সাহিত্য খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করিল। চারিদিক হইতে সাহিত্যে কেবল নিস্ফলতা, চাঞ্চল্য ও দুঃখের ক্রন্দন উঠিতে লাগিল। ইহার মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্যও ছিল, কিন্তু বেশী ছিল আপনাকে না জানার চাঞ্চল্য।

সাহিত্যে দুঃখের কথা চিরকালই আছে। এই দুঃখবাদ সাহিত্যে Traedy বা করুণ রসের গীতিকাব্যাদির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে Tragedy নাই। আলঙ্কারিকগণ তাহা পরিহার করিয়াছেন। কিন্তু Tragedyর উপকরণ সমস্তই আছে। কারণ দুঃখই করুণ রসের অবলম্বন, আর সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে করুণ রসের অভাব নাই, কিন্তু সংস্কৃত কবি জীবনের পূর্ণতার দিকে যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহারা অখণ্ড জীবনচিত্র আঁকিতেন। তাই উত্তরচরিত ও মৃচ্ছকটিক এমন সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ। Tragedy—উদ্দীপ্ত করিবার জন্য নহে, শান্ত করিবার জন্য। আমাদের প্রাচীন নাটককারেরা বোধ হয় তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা শেষের দিকে মঙ্গলটা যুড়িয়া দিতেন। তাহাতে একটু কৃত্রিমতা ছিল। গ্রীক্ কবিগণ আরও স্পষ্ট ভাবে এ সত্যটা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যোড়া তাড়া দিয়া বা যতই কৌশল সহকারে হউক্, এই মঙ্গলটাকে পার্থিব আকার দিবার চেষ্টা করিতেন না। তাঁহারা জানিতেন কোন কোন মহজ্জীবনের পরিণাম পৃথিবীর মঙ্গলামঙ্গলের অতীত হইয়া যায়। তাঁহারা আরও জানিতেন Fate বা অদৃষ্ট দেবীর জালে সমস্ত মানবজীবন বদ্ধ। সুখদুঃখ সেই একই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া একই পথে যাতায়াত করে। তাহারা মানুষের আয়ত্বের অতীত। যে পথে হয়ত কাহারও সর্ব্বনাশ আসিতেছে, সেই পথেই কাহারও অনন্নুমেয় মঙ্গল

আসিতেছে। আনুষঙ্গিক মঙ্গলকে ছাড়িয়া নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ গ্রীক্ কবি জানিতেন না। যে দৃশ্যে Oedipus এর হৃদয়োন্মাদকর প্রলাপ, সেই খানেই Antigoneর মহৎ হৃদয়ের অভিব্যক্তি। এই জন্য গ্রীক্ Tragedy এত বিখ্যাত জিনিষ। গ্রীক কবিও জীবনের সম্পূর্ণতা ভাঙ্গিতেন না। তাই শান্ত চাঞ্চল্যহীন গাম্ভীর্য্যে গ্রীক্ Tragedy—অঙ্কিত জীবন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দুর্ণিবার বিপদের উদ্দাম ক্ষণেও মানব হৃদয়ের গৌরব কোথাও নষ্ট হয় নাই। হোমর, ভার্জ্জিল, বাল্মীকিতেও দুঃখের কথা আছে। কিন্তু তাহা জীবনের নানা অবস্থার অন্যতম। তাহাকে লইয়া সাজান গুছান নাই। সেখানেও জীবনের পূর্ণতাই বজায় রাখা হইয়াছে। Dante র অমর কাব্যে দুঃখী হৃদয়ের যেরূপ মেঘান্ধকার ছায়া পড়িয়াছে সেরূপ খুব কম কাব্যেই আছে। কিন্তু দান্তে ও দুঃখকেই সার করেন নাই। তাঁহার চিন্তান্বিত বিষাদক্লিষ্ট মুখের ছায়ায় স্বর্গ অবধি মলিন হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু তবুও তিনি জীবনের পূর্ণ পরিণাম ভুলেন নাই। ক্ষণেকের তীব্র সুখে, যদি পরবর্ত্তী চির জীবনও দুঃখ ময় হয়, তবে সে সুখ ও বর্জ্জনীয়। ইহাই তাঁহার কাব্য পাঠে আমাদের মনে হয়। একবার যে তাঁহার Beatrice র সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল!

কিন্তু Renaissance এর পর ইউরোপে যে সাহিত্য গঠিত হইতে আরম্ভ করিল তাহার একাংশ তেমন পূর্ব্বতন সাহিত্য অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ও নূতন নূতন ভাবময় অন্যদিকে তেমনই তাহাতে এই দুঃখের চিত্র ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। এখন হইতে দুঃখবাদ বলিয়া একটা জিনিষ সাহিত্য মধ্যে প্রচলিত হইতে লাগিল। যে Romantic Tragedy গঠিত হইল তাহাতে সেক্সপীয়ারের মত মহা-কবি ছাড়া আর কাহারও মানব জীবনের সূক্ষ্ম অদৃষ্টসূত্র পরিমাপ করিবার ক্ষমতা ছিল না। কাজেই তাহা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। শুধু চঞ্চলতা ও তজ্জনিত দুঃখ দেখানই Tragedyর আদর্শ হইল। ইহা সাহিত্যে সত্যেরও পরিপূর্ণতার অভাব আনিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জাতির মন নানাদিকে কর্ম্মব্যপৃত ছিল। বানিজ্যে, উপনিবেশ সংস্থাপনে, চিত্রে, স্থাপত্যবিদ্যায়, তাহারা নানা কীর্ত্তি লাভ করিতেছিল। কাজেই তখন এই দুঃখ বাদের বিশেষ ফল লক্ষ্য হয় নাই। কারণ কর্ম্ম-প্রধান যুগে লোকে Tragedy কে Tragedy ভাবেই গ্রহণ করে, তাহার

সম্বন্ধে ভাবিবার অবসর পায় না। তাই সেই দুঃখ বাদের ভিতরেও অনাবশ্যক আকুলতা নাই, বরং একটি পরিপূর্ণতা আছে। কিন্তু চিন্তাপ্রধান যুগে এই Tragedy কে তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়া মানুষের মন শেষে সংশয়ের গোলকধাঁধায় পড়িয়া পথহারা হইয়া যায় ও মুখ বাঁকাইয়া সংসারকে বিদ্রূপ করিতে বা দুঃখের একটা বিভীষিকা মূর্ত্তি দেখাইতে শেখে। কেহবা গভীর ভাবে নির্ম্মম হস্তে কেবলি সংসারের কেহ বা আপনার ক্ষতগুলি বাহির করিয়া সংসারকে দেখাইতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতা সমাজের মধ্যে জাঁকিয়া বসিয়াছে, লোকে ভাবিবার অবসর পাইয়াছে, তখনই দেখা গেল, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে, মানুষ সব বিষয়ে বিশ্বাস হারাইয়া সমস্ত সংযম ভাসাইয়া দিয়াছে।

ইউরোপীয় সাহিত্যে এই দুঃখবাদ আরও এক রূপে দেখা দিল। সমাজের নানা কুৎসা ও জীবনের দুঃখ জানাইবার জন্য Satire বা ব্যঙ্গচিত্র রচিত হইতে লাগিল। এই Satire গুলি প্রাচীন রোমক জাতির Satire এর আদর্শে রচিত। রোমক জাতির ধ্বংসের কিছু পূর্ব্বে কয়েক খানি সুন্দর Satire তাহাদের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। সব অধঃপাতে যাইতেছে, ইহাই সেই Satire গুলির প্রধান বক্তব্য। রোমক জাতির মধ্যেও শিক্ষা বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। গ্রীস্‌দেশ জয়ের পর গ্রীক্ পণ্ডিতগণ আসিয়া রোমে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। গ্রীসের আর তখন সে তেজ ছিল না। অহঙ্কারী, গর্ব্বিত, যোদ্ধার জাতি রোমকগণ এই পণ্ডিতগণকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ফল হইল, শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে ঠিক মিল হইল না। রোমকগণ তখন সকল জিনিসে মুখ বাঁকাইতে আরম্ভ করিল। জীবনের মঙ্গল ও মহৎ মূর্ত্তি ভুলিয়া গেল। দুঃখের মহত্ত্ব ভুলিয়া শুধু হীনতাটাকে উপহাস রাশির দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিল। Horace ও Ovid এর গীতি কাব্যে, Perseus ও Juvenal এর Satire এ, Plantus ও Terence এর নাটকে, যে একটা সঙ্কীর্ণতা ও হীনতা দেখা যায়, তাহা সেই জাতীয় হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও হীনতারই ফল, এবং সেই হীনতার মূলে ঐ শিক্ষার অসামঞ্জস্য। শুধু রোমে যে এই রূপ হইয়াছিল তাহা নয়, সকল জাতির অবনতির সময় বা শিক্ষা ও সমাজের অসামঞ্জস্যে ইহা অতি স্বাভাবিক ঘটনা। সেই Renaissance এর দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত

ইউরোপে এই শিক্ষা ও সমাজ সমস্যার মীমাংসা চলিয়া আসিতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার চরম পরিণতি ঘটে। তাহারই ফলে Werther এর সৃষ্টি। জর্ম্মানীর নিকট হইতে শিখিয়া ইউরোপীয় মন তাহার অসংযত চঞ্চলতাকে একটা গভীর ভাব বলিয়া ধারণা করিয়া তাহার নাম দিল Sturm-und drang, Storm and Stress. তাহারই সুর আজও থাকিয়া থাকিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যে উঠিতেছে। কিন্তু সুর ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাহারা শিক্ষাকে সমাজের অনুরূপ করিয়া লইতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। Ibsen ও Maeterlinck এর সাহিত্য সেই চেষ্টার প্রথম ফল। তবে এখন কেবল বুদ্ধি চর্চ্চা। ইহার পরিণত ফল ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত। ইউরোপের যে অবস্থায় Werther এর রচনা, ইংরাজাধিকারের কিছু-দিন পরেই বাঙ্গালায় প্রায় সেই রূপ অবস্থা ঘটে। বহুদিন পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালায় শিক্ষা বিভ্রাটের সূত্রপাত হইয়াছিল। বাঙ্গালার Renaissance, পাঠান রাজত্বের শেষ হইতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসে আরম্ভ করিয়া, মোগল রাজত্বের প্রথমাংশে রঘুনন্দন, রঘুনাথ, শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব কবিগণের অদ্ভুত সম্মিলনে পর্য্যবসিত। বিদেশী রাজার ভয়ে বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তখন নানা বিধি ব্যবস্থা ঠিক্ করিয়া সমাজের আট ঘাট বাঁধিয়া ফেলিতেছিলেন! কিন্তু মুসলমানেরা কখনই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশকে শাসন করিতে পারেন নাই। কেবল আকবরের চেষ্টাই কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কাজেই বিদেশীয় শিক্ষার বিশেষ কোন বিস্তার বা ফল হয় নাই। রাজদরবার ব্যতীত তাহার ফল প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইত না। কিন্তু ইংরাজেরা অধিকার করিয়াই দেশের প্রকৃত শাসন আরম্ভ করিলেন। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার এই শাসনের একটি প্রকাণ্ড সহায় ও চিহ্ন স্বরূপ হইল। তখন শিক্ষা ও সমাজে প্রকৃত সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। সমাজ এক-দিকে টানে ও শিক্ষা আর এক দিকে বল প্রয়োগ করে। ফলে মানুষের মন নিশ্চেষ্ট থাকে না। হঠাৎ শিক্ষার প্রবলতর বেগে সে সমাজের দিকে না চাহিয়া অসংযত ভাবে অন্য দিকে ছুটিল। তখন সেই বিক্ষুব্ধ অসংযমের ফলে মানসিক দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিল। তখন সকল বস্তুই শিক্ষিতগণ খণ্ডশঃ দেখিতে লাগিলেন। মনে অন্ধকার ও সংশয় ঘনীভূত হইল। এই কালের একখানি পরিষ্কার চিত্র রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিতে'

ও তাঁহার 'একাল ও সেকালে' কিছু কিছু আছে, আমরা বেশ দেখিতে পাই।

এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা কিরূপে প্রবেশ করিল? ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে কয়টি নূতন জিনিষ দেখা দিয়াছে। পাশ্চাত্য ধরণের গীতি কবিতা, কাব্য ও উপন্যাস ইহাদের মধ্যে প্রধান। বাঙ্গালা গদ্যেরও জন্ম ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে। প্রধানতঃ গীতি কবিতা কাব্য ও উপন্যাসের ভিতর দিয়াই বঙ্গ সাহিত্যে এই দুঃখবাদ প্রবেশ করিয়াছে।

এই ইংরেজী ভাবের প্রথম ফল ঈশ্বর গুপ্তের Satire ও কিছু পরে রঙ্গলালের স্বাদেশিকতা; হেম চন্দ্র এই স্বদেশিকতাকে আরও জাঁকাইয়া তুলিলেন। এই Patriotism একটা সম্পূর্ণ বিলাতী জিনিষ। রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রে আন্তরিকতা থাকিতে পারে এবং আছেও, কিন্তু তখনকার ছোট খাট অনেক কবিই ভারত শ্মশানে বসিয়া দুঃখের গান গাহিয়াছেন, যাঁহারা ভারতের কোনই খবরই জানিতেন না। আজ তাঁহাদের নাম মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ইংরাজী Patriotism জিনিষটাকে অনেকটা শোধন করিয়া দেশের হৃদয়ের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন।

রামপ্রসাদও ভারতচন্দ্র আমাদের খাঁটি বাঙ্গালা বা মুসলমানী বাঙ্গালার বড় কবিদের শেষ কবি। কৃষ্ণকমল বা জয়নারায়ণ শিক্ষিত সর্ব্ব সাধারণের পরিচিত নহেন, এবং ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্ত এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে কেহই শব্দাড়ম্বর ছাড়িয়া প্রকৃত কবিত্বে পৌঁছান নাই। ঈশ্বরগুপ্ত হইতে বঙ্গ সাহিত্যে ইংরাজী সাহিত্যের না হউক, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব। এই ঈশ্বরগুপ্তের নিজস্ব কবিত্ব কোথায়? সেটুকু তাঁহার রঙ্গরসে নহে। এই রঙ্গরস ভারত চন্দ্র ও ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বতন অনেক কবির মধ্যে আছে। সেটুকু তাঁহার পরমার্থিক বা নৈতিক কবিতায় নহে। কারণ, তাহা আমাদের শাস্ত্রকারগণের উক্তিই ছন্দোবন্ধনে লিখিত। সে নিজস্ব কবিত্বটুকু, তাঁহার Satire গুলিতে। এই গুলিতে যে 'Go to hell, don't care' এর ভাব আমদানী হইতেছিল, সমাজের সুন্দর অংশকেও একটু নগ্ন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইতেছিল, তাহা বঙ্গ সাহিত্যে নূতন। তাহা ইংরাজি শিক্ষা ও ভাবের ছায়ায় দেশ মধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছিল। ইহার মূলে ইউরোপীয় realism (বাস্তবতা) শিক্ষার ও মনের

বিকৃতির সহিত অজ্ঞাতসারে তাহা সাহিত্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, শুধু দুঃখই ইহার মূলীভূত বস্তু নয়। ইহার ভিতর একটা বিরক্তি, একটা বিদ্রোহ, একটু আস্ফালনের ভাব আছে। বলিতে পারেন, ইহা সমাজের যে অংশ কৃত্রিমতার উপর গঠিত হইতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু সমাজের মধ্যে কৃত্রিমতা ও তাহার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের মূলে সেই একই কারণ—শিক্ষাবিপর্য্যয়। মুকুন্দরামও ভাঁড়ুদত্তকে অপদস্থ করিয়াছেন, কিন্তু সেখানে এমন একটি সহৃদয়তা আছে যাহা ঈশ্বরগুপ্তে বা হুতোমী ব্যঙ্গচিত্রে একেবারেই দেখা যায় না। কিন্তু সমাজের ও হৃদয়ের ক্ষতস্থান খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিলেও, ইঁহারা সেগুলিকে সাজাইয়া বাহির করেন নাই। এই ভাব ক্রমশঃই বাড়িয়া বস্তুতন্ত্রতা চলিয়াছে। এখন Satire এর তীব্রতা ও ভাঁড়ামি ছাড়িয়া ইহা নানা উপন্যাস, কবিতা ও সন্দর্ভের ভদ্রবেশ পরিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ভিতরে সেই অসংযত চাঞ্চল্য; জীবনকে পূর্ণরূপে দেখিবার ও বুঝিবার অসামর্থ্য।

ইহার পরবর্ত্তী সাহিত্যেই দুঃখের নামে হা হুতাশ আরম্ভ হইল। বাঙ্গালায় নূতন Tragic ভাবের আদর্শ আসিল। তখন গদ্য পূর্ণতা লাভ করে নাই। কাব্যগুলি Tragic ভাবে এ অনুপ্রাণিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালার দুইখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য পরীক্ষা করিলেই আমরা ইহা দেখিতে পাইব। মেঘনাদ বধ ও বৃত্রসংহার উভয়েই দুঃখের করাল অন্ধকারে পরিসমাপ্ত। ইলিয়ড্, রামায়ণ, Divine Comedy বা Paradise Lost এর মত এ কাব্য দুইখানি এক একটি পূর্ণ বস্তু হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার কারণ জীবনের অমঙ্গলাংশকে তাহাতে বিশেষ স্ফীত করিয়া দেখান হইয়াছে। তাহাতে একদিক যেমন উজ্জ্বল হইয়াছে অন্যদিকে তেমনই পূর্ণতার অভাব রহিয়া গিয়াছে। এই যে অভাববোধ ইহা ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বের কবিদের সামান্য গঙ্গাস্তোত্র ও একাদশীর উপাখ্যান হইতে আরম্ভ করিয়া কোন পুস্তকেই পাওয়া যায় না। কবিত্ব যতটুকুই হউক, সকলেরই একটি সমগ্রতা আছে। আধুনিক প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রভাবে আমরা এই সমগ্রতা হারাইতে বসিয়াছি। ইংরাজী সাহিত্যও এই বিষয়ে বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে দুঃখ দুর্দ্দশার চিত্র বিরল নহে। মুকুন্দ রাম হইতে

আরম্ভ করিয়া অনেক কবিই সুর ধরিয়াছেন—'শিশু কাঁদে ওদনের তরে।' ফুল্লরার দুঃখ, খুল্লনার সপত্নীকৃত লাঞ্ছনা, সবই বঙ্গের দরিদ্রের, বঙ্গের সংসারের নিত্য অভিনীত দুঃখের দৃশ্য। আরও কত দুঃখের চিত্র ভাসান ও মঙ্গল কাব্য সমূহের মধ্যে নিহিত আছে। তখনকার দিনে ইহার উপর আবার দুর্দ্দান্ত রাজপুরুষগণের অত্যাচার ছিল। তখন অনেকেই মামুদ সরিফগণের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইত। কেবল তাহাদের মধ্যে একজন কবির আলেখ্যে থাকিয়া নাম রাখিয়া গিয়াছে। ধনী জমীদারগণ গৃহস্থ কৃষকগণকে উৎপীড়ন করিতেন, তাহার প্রমাণও বিরল নহে। সেই যুগের সাহিত্যে তাহাদের ক্রন্দনও স্থান পাইয়াছে। এক হিসাবে ইহাকে সেই যুগের বাস্তবতা বলা যাইতে পারে, এবং এই বাস্তবতা আধুনিক যুগের বাস্তবতা হইতে বহু উচ্চে। কারণ তাহার সমস্তই সহজ ও সরল। দুঃখকে অনাবশ্যক রূপে স্ফীত করিবার চেষ্টা নাই। বরং যেখানে স্বাভাবিক সেখানে 'জগদবতংসে পালধিবংশে, নৃপতি রায় রঘুরাম'গণ আসিয়া দুঃখ নিবারণ করিয়াছেন। এই যে অমঙ্গলের পিছনে মঙ্গল দেখিবার একান্ত চেষ্টা, ইহা সে যুগের একটা অকপট হৃদয়-ভাব, এবং সাহিত্যে আশ্চর্য্যরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। কোন নিরর্থক ভাবনা ও সংশয় নাই। তাই সাহিত্যেও আকুলতার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে আকুল হইবার মত জিনিষ পাইলে সে যুগের লোকেরাও আকুল হইতে জানিত। কিন্তু মেঘনাদ বধ ও বৃত্রসংহারে আমরা কি দেখিতে পাই? বিপদের ঘনীভূত অন্ধকারে অমঙ্গলের করাল ছায়ায় তাহাদের পরিসমাপ্তি। বৃত্র সংহারে দধীচির অস্থিদান কাব্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটি সামান্য ঘটনা, Episode মাত্র। বৃত্রাসুরবধের পর ইন্দ্রের মহনীয় পরাক্রমের উল্লেখ মাত্র নাই। শুধু ঐন্দ্রিলার ক্ষিপ্ত বেশ ও বৃত্রের নিরুদ্ধ মৃত্যুশ্বাসে কাব্যের সমাপ্তি। মেঘনাদবধে শুধু চিতার আগুনেই শেষ সর্গ উজ্জ্বল হইল। রাবণের বিলাপে রামচন্দ্র বলিয়া যে কেহ আছেন তাহাও ভুলিয়া যাইতে হয়। জীবনের যে চিত্র ইন্দ্রজিতের পতনে আমাদের চক্ষে ফোটা উচিত ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে শুধু আহত অভিমান ও ব্যর্থ নৈরাশ্যের চিত্রে কবি গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। আগেকার বাঙ্গালা কাব্যেও কবিগণ বিপজ্জালজড়িত মনুষ্যজীবনের অংশ দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মত আধুনিক কাব্যগুলিতে ভগবতীর চৌত্রিশ অক্ষরে স্তুতি নাই, এই সকল

কাব্যে বিপন্মেঘনির্ম্মুক্ত সৌভাগ্যসূর্য্যালোকসমুদ্ভাসিত প্রশান্ততা নাই বা তাহার ক্ষীণতম আভাস মাত্র নাই। ইহাদের দুঃখের আড়ম্বর নিতান্ত Byronism এর অনুকরণ।

তখনকার দিনেও লোকে কাঁদিতে জানিত, আকুল হইবার মত জিনিষ পাইলে আকুল হইত। সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্য এই আকুলতার, এই ক্রন্দনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সে কি আকুলতা! সে কি ক্রন্দন! সে কেবল এক অন্তরাশ্রুপরিপ্লুত, নিবিড় ভাব মোহ। সেখানে হাসির অন্তরালে অশ্রু, আবার অশ্রুর অন্তরালেও হাসির মত দীপ্তি। সে প্রেমাশ্রুবিগলিত ভাবমোহে আশা ও নিরাশা হারাইরা গিয়াছে, তখন ভাবপ্রাচুর্য্যে বাঞ্ছা ও বাঞ্ছিতে এক হইয়া গিয়াছে। সে কান্না বাঙ্গালার নিজস্ব সামগ্রী। এমন কি এই বৈষ্ণব-কবিতার মোহে ভুলিয়া একজন কান্নাকেই বাঙ্গালার নিজস্ব সামগ্রী বলিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সে কান্না নিজের দুঃখের বড়াই নহে, বা জীবনের অমঙ্গলভীত হৃদয়ের অসংযত অশ্রু-উচ্ছাস নহে। কবি যখন আত্ম-নিবেদনের অবসরে 'মাধব! হাম পরিনাম নিরাশা!' বলিয়া গলদশ্রু হইতেছেন, তখনই করপুটে 'অতএব তোহারই বিশোয়াসা' বলিয়া শান্তি পাইতেছেন। জীবনের একটি পরিপূর্ণ অখণ্ড অনুভূতি কবির সমস্ত হৃদয়ে ভরিয়া উঠিতেছে। চণ্ডীদাসের 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' শুধু কানুপ্রীতির তন্ময়তায় ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। নিজের জন্য কিছুই নাই। ইউরোপের কোনও কবিতায় আজ পর্য্যন্ত এ ভাব ধরা পড়ে নাই। ইউরোপের দুঃখ সমস্তই নিজের জন্য। তাই তাহার অনুকরণে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যেও যে সুর উঠিতেছে তাহাতে দুঃখ শুধু জমকাইবার, নিজেকে বিশিষ্ট করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। পরিবর্ত্তী কবি গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসে এই ভাব একটু তরল হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তথাপি এই সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্যের ছোট বড় বহু কবির ক্রন্দন একই সুরে বাঁধা। সে নৈরাশ্য কেবল পরবর্ত্তী শান্তিটুকুকে ডাকিবার জন্য, পথ দেখাইয়া আনিবার জন্য। এ নৈরাশ্যে বিরক্তি নাই অনুভূতি আছে। সংশয় নাই, বিশ্বাস আছে। রুক্ষতা নাই, সরসতা আছে। বৈষ্ণব, সাহিত্য কান্নার সুরে জমিয়াছে বটে, কিন্তু সে কান্না ইউরোপের কান্নার সাহিত্য স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না।

এখন দেখা যাক, এখনকার গীতি কবিতায় দুঃখ কেমন ভাবে ফুটিয়াছে। ধরিতে গেলে বর্ত্তমান গীতিকবিতাসমূহ অধিকাংশই কোন না কোন আকারে দুঃখের সুরে বাঁধা। জাতির মনে যখন নানা দুঃখ রহিয়াছে তখন ইহা হওয়াই স্বাভাবিক। বহিঃপ্রকৃতির সুন্দর চিত্রপট আঁকিতেও আমরা যেন দুঃখের ভাবনাগ্রস্ত হইয়া পড়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি। তার পর বিলাতী ধরণের প্রেমের নৈরাশ্য ও দুঃখ আমাদের কাব্য সাহিত্যে আমদানী হইয়াছে। হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ও বিহারীলাল গীতি কবিতায় যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের গীতি কবিতায় তেমন বিশেষত্ব নাই। মধুসূদন বৈষ্ণব কবিগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ব্রজবিরহিনীগণের দুঃখ গাইয়াছেন। মধুসূদনের গীতি কবিতায় বিশেষত্ব আছে। কিন্তু তাহা বৈষ্ণব কবিতা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। সেখানে যে দুঃখ ফুটিয়াছে, তাহাতে সে ভাবমোহ নাই। কারণ তিনি যে জীবনের চিত্র আঁকিতে বসিয়াছিলেন সে জীবনের রস কখনও অনুভব করেন নাই। বিহারীলালের সারদামঙ্গলে একটি ব্যাপক ভাবের উত্তেজনা আছে, কিন্তু সন্দেহ হয়, তাহারও মূলে অতিরঞ্জিত আবেগের অতিপ্রাকৃত প্রকাশ। যদি ইহা সত্য হয়, তবে তিনিও প্রতীচ্য শিক্ষাবিষের হাত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। কিন্তু হেমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের গীতি কবিতাতেই আধুনিক যুগের অনেক ভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিফলিত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের প্রেম নৈরাশ্য মূলক অনেকগুলি গীতি-কবিতা আছে। সেগুলি কি? সেগুলি Byronism এর চর্ব্বিত-চর্ব্বন। বাঙ্গালার কখন যাহা ঘটে নাই বা সহজ ভাবে ঘটিবার আপাততঃ সম্ভাবনা নাই এমনই ঘটনার প্রতিবিম্বে সেগুলি চিত্রিত। হেমচন্দ্রের patriotic কবিতা ও Poushkin এর patriotic কবিতা একই উপাদান হইতে প্রস্তুত। তাহা জাতীয় দুঃখকে লইয়া জাঁক। জাতীয় দুঃখের প্রকৃত অনুভূতি নীরবে মহৎ চরিত্র গঠনের চেষ্টা করে। তাহাতে Byronic আস্ফালন থাকিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের গীতি কবিতা আজ জগদ্বিখ্যাত। ইউরোপ তাঁহার Mysticismএ ভুলিয়াছে। এখন তিনি সত্য ও যৌবন অফুরন্ত ইহাই প্রচার করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। এখন তিনি লোকশিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সাহিত্যের আসরে অনেকবার অনেক রূপে নামিয়াছেন। প্রথম

ও মধ্য বয়সের লেখায় রবীন্দ্রনাথও এই ব্যাপক দুঃখবাদের মোহে ডুবিয়াছিলেন। আর তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। যৌবনের চাঞ্চল্যে মন স্বভাবতঃই আপনার সুখকেও চিনিতে পারে না, দুঃখেরও গভীরতা স্পষ্ট বুঝে না। শুধু চঞ্চলতাই সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও মধ্য কালের সমস্ত কবিতার প্রাণ এই চঞ্চলতা, এবং এইটিই তাঁহার কবিতার একটি বিশেষত্ব। কিন্তু সময়ের গতি রবীন্দ্রনাথের উপর যে অঙ্ক বসাইয়াছে, তাহাতে এই দুঃখবাদ একটু নূতন আকারে দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে অনেক হা হুতাশ করিয়াছেন, কিন্তু শেষে তিনি একটি নিজের পথ বাছিয়া লইয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল সূত্র কি এই নয়,—'আর নিশ্চেষ্টভাবে সংযত হইয়া থাকিও না। একটা কিছু কর্ম্মপথ অবলম্বন কর, যদি তাহাতে ধ্বংস হইয়া যাও সেও ভাল, কিন্তু তথাপি চুপ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করিও না। মৃত্যুর ভয় রাখিলে সিদ্ধি আসিবে না। ইহা নিশ্চয় খুব উন্নত ভাব। কিন্তু তিনি জীবনের কোন চিত্র পট অঙ্কিত করিয়া এই ভাব গুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন! তাঁহার আধুনিক উপন্যাস গ্রন্থগুলিতে তিনি একটি স্পষ্ট পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তোমরা সকলে Westernized, প্রতীচ্য ভাবাপন্ন হও। ঘরসংসার ঝড়ের বেগে চালাইতে থাক, সংযমের ভাবনা ভাবিও না। যে পারে সে উন্নত ভাবে থাকুক, যে পারে না তাহাকে নীচু অসংযত হইতে দাও। তাহাতেই তাহার জীবন সার্থক হইবে।' নিশ্চেষ্টতা অবশ্য কখনই প্রশংসনীয় নহে। কিন্তু তাঁহার এই ভাবের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতার পথ দেখান হইতেছে তাহা কি নিশ্চেষ্টতারই নামান্তর নহে? জীবন ভোগ করিতে হইলে জীবনকে আয়ত্ব করিতে হইবে। আমরা সকলেই জীবন ভোগ করিতে চাই কিন্তু যে জীবনকে আয়ত্ব করিতে পারিল না, সে জীবন ভোগ করিবে কি রূপে? ইউরোপ কি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া জীবন ভোগ করিতে পাইতেছে? একটু স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। ইউরোপের বর্ত্তমান সাহিত্য এ বিষয়ে কি সাক্ষ্য দিতেছে? ইউরোপে ভাব অপ্রচুর হইয়া আসিয়াছে, Realistic literature এর আবর্জ্জনা বাড়িয়াছে, শুধু এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য। রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গে,' 'ঘরে বাইরের' মধ্যে, নানা গল্পে, নানা কবিতায়, নানা আকারে ইউরোপের এই বিপদ ঘরে ডাকিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের

কতকগুলি আধুনিক গীতি কবিতায় বেশ দেখা যায় তিনি ইউরোপের দুঃখ বাদটিকেও একটা তত্ত্বের পোষাক পরাইয়া খাড়া করিবার চেষ্টায় আছেন। এই তত্ত্ব হইতেছে 'দুঃখ দুঃখ হইয়াই সার্থক। অমঙ্গল অমঙ্গল হইয়াই সার্থক। তাহাকে বরণ করিয়া লও। যদি নিতান্ত ঝড় ঝঞ্ঝাবাত তোমার শিরে আসিয়া পড়ে, তবে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিও না!' দুঃখের মহত্ত্ব চিত্তকে সংযত করে, আপনাকে দুঃখের অঙ্কে অঙ্কিত করিয়া বিশিষ্ট করে না। প্রকৃত দুঃখের মর্ম্মস্পর্শী কাতরতায় চাঞ্চল্যও অনুভূতি দুইই হারাইয়া যায় 'নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্'। এ কথাও এখনকার দিনে বলিয়া দিতে হয়। প্রাচীন সাহিত্যে সীতা নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেন, Electra নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। দুঃখের এ চিত্র আমরা বঙ্গ-সাহিত্যে কয়টা পাইয়াছি! দুঃখের সরল ভাব ছাড়িয়া তাহাকে পোষাক পরান একেবারে মানায় না। সুখকে সেরূপ আভরণ পরাইতে পার।

তারপর ইংরাজী শিক্ষা ও সাহিত্য সংস্পর্শের আর একটি ফল, বাঙ্গালায় উপন্যাসের সৃষ্টি। নাট্যকাব্য এখনও আমাদের দেশে আপনার সুর পায় নাই। কারণ জাতীয় দৃঢ়তা ভিন্ন সেরূপ সুর দেওয়া যায় না। আমাদের তাহার একান্ত অভাব। যাহা আছে, তাহা হয় ইংরাজীর অনুকরণ, না হয় স্বভাববহির্ভুত রঙ্গালয়ের সৃষ্ট বস্তু। গিরিশচন্দ্র শুধু লোক-রঞ্জন করিয়া গিয়াছেন। দু'এক খানি সমাজচিত্র তাঁহার নাম রাখিবে মাত্র। তাহাতেও সাহিত্য-কলা অপেক্ষা রঙ্গালয়ের কলাদর্শ বেশী ফুটিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরাজীর অনুকরণে ও লোক রঞ্জন প্রবৃত্তির মিশ্রনে নিজের শক্তি সম্পূর্ণ দেখাইয়া যাইতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহার সুরও অনুকরণের ফল। তাহা স্থির প্রণালীবদ্ধ নহে। একা দীনবন্ধু তাঁহার Comedy গুলিতে আধুনিক কালের উপযোগী অথচ মৌলিক রচনা রাখিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যের এই দুরন্ত দুঃখবাদ মনে হয় তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই।

সুতরাং বাঙ্গালায় আধুনিক জীবন যেটুকু সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই উপন্যাসে। ইহার মধ্যেও প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস অতি সামান্য। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক লেখক দিগের মধ্যে শরৎ চট্টো-পাধ্যায়, এই কয়জনের নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে রমেশচন্দ্র

ব্যতীত সকলের উপন্যাসেই ইউরোপীয় দুঃখ-বাদের বিষবীজ উপ্ত হইয়াছে। ইউরোপীয় উপন্যাসে ইহা যে ভাবে প্রবেশ করিয়াছে তাহার একটি লক্ষণ সাধারণ ও দরিদ্র জীবনের অবিকল বিবৃতি, Realism. এই হুবহু নকলের মধ্যে অনেক কদর্য্যতা আছে, অনেক সাহিত্য-রচনার বিঘ্নকর সামগ্রী আছে। ইহাতে সাধারণ ও দরিদ্র জীবনকে মহৎ-জীবনের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে। কিন্তু তাহাই এই শ্রেণীর লেখকগণ জোর করিয়া সাহিত্য মধ্যে লইতে চান। জীবনের অমঙ্গলটা কত বড় তাহাই ফাঁপাইয়া দেখাইতে চান। ইহার ভিতর যে একটা কৃত্রিমতা আছে তাহা সহজেই অনুমেয়। যে নিজে সুখ স্বচ্ছন্দে বিলাসিতার মধ্যে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহার কাছে দরিদ্র জীবনের সমস্তটাই বিষম অবিচার বলিয়া বোধ হইবে এবং তাহার প্রত্যেক অংশটি তাহার অবস্থার অনুপাতে তাহার চোখে লাগিবে; এবং বিলাস প্রকোষ্ঠের (Drawing room) আলোকে সেই জীবন বিবরণের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া এবং প্রকাশকদিগের সুবর্ণ মুদ্রার বৃষ্টিতে তাহার চোখে ইহা আরও সুস্পষ্টরূপে বাজিবে। কিন্তু যাহারা সত্য সত্যই নিজে সেই দরিদ্র অবস্থার মধ্যে আছে, তাহাদের দুঃখ অনেক থাকিতে পারে এবং আছেও; কিন্তু তাহা অতি বিষম ভাবে তাহাদিগকে লাগে না; লাগিতে পারে না। কারণ আমাদের অনেক অভাবই আত্মসৃষ্ট। সেই জন্যই এই দরিদ্র জীবনের দুঃখ-চিত্রগুলি স্বাভাবিক ও সরল নহে, পরন্তু Sentimental,—বৃথা কল্পনা দুষ্ট। অবিকল নকলের মত দেখাইলেও, তাহা অতিরঞ্জিত। ইহার মূলে যে বিষবীজ আছে সে ওই Pessimism এর উত্তেজনা। আমাদের বঙ্গ সাহিত্যেও সে সুর উঠিতেছে না কি? "বাতাসী নিকাসীর" দল বোধ হয় অবিলম্বেই বাড়িয়া চলিবে। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে দরিদ্র ও সাধারণ জীবনের যে বিবৃতি আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক দেখাইলেও, তাহাতে একটা ফেনানো আছে। তাহা দরিদ্রের মত দেখিয়া লেখা নয়। সেইটুকু হইলেই তাঁহার উপন্যাসগুলি প্রকৃতই স্মরণীয় জিনিস হইবে, কারণ তাঁহার art অতি উৎকৃষ্ট। এ বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্যিকগণ উৎকৃষ্ট উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যেও শবর, কিরাত, নিষাদ, arcadian মেষপালকদের জীবন প্রতিফলিত হইত। সেখানে যেটুকু অতিরঞ্জন আছে, তাহা তাহাদেরই পারিপার্শিক

অবস্থার সামঞ্জস্যে। তাহা তাহাদেরই মতন হইয়া দেখিয়া লেখা। কিন্তু তখন ধনী দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ-চিহ্ন এত স্পষ্ট হয় নাই। তথাপি আজিকালকার দিনেও সরল ও সহজ ভাবে দরিদ্রের জীবন বুঝা যাইতে পারে এবং তাহাই প্রকৃত সাহিত্যের বস্তু। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে আজিকালিকার দিনের ঠিক্ বিপরীত ভ্রম হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্যের আলস্যে লালিত হইয়া ধনীদিগের মধ্যে দরিদ্র জীবনের সবই সুখকর বলিয়া একটা গল্প রচনার প্রয়াস হইয়াছিল। আজিকার ও তখনকার ভ্রম একই কারণে উৎপন্ন। তবে সে ভ্রম আমাদের সাহিত্যে দেখা দেওয়া সম্ভব নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসই এখনও বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের আদর্শ। তাহারই আলোচনা করিয়া এইবার প্রবন্ধ শেষ করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা তিনটি স্তর দেখিতে পাই। প্রথম, ইংরাজী উপন্যাসের অনুকরণ,—দুর্গেশ নন্দিনী তাহার অবিমিশ্র প্রথম ফল, ও কপালকুণ্ডলা তাহার গৌরবময় পরিণতি। তাহার পর ঘর সংসারের কথা। কৃষ্ণ-কান্তের উইল তাহার পরিণত ফল। এবং শেষে আদর্শ চরিত্র গঠনের চেষ্টা। দেবী-চৌধুরানী তাহার সুন্দর উদাহরণ। ইহার মধ্যে নানা ভাবের মিশ্রিত উপন্যাসও আছে। কিন্তু সকল গুলিতেই (দুর্গেশ নন্দিনী ও দু'এক খানি ছোট গল্প বাদ দিয়া) জাতীয় চরিত্র গঠনের চেষ্টা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মূল সূত্র কি? আমার মনে হয় তাঁহার প্রধান সুর—'তোমরা স্বপ্রধান হও। আপনাকে দৃঢ় কর, উন্নত কর, সংযত কর। বিপদ এধার ওধার হইতে আসিবেই, তোমাদেরও হয়ত তাহার মুখে আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে হইবে; কিন্তু মানুষের মত দাও। বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারে, চেষ্টা কর।'—ইহার উপর প্রগাঢ় ঈশ্বর-ভক্তির রসান দিয়া বঙ্কিম-চন্দ্র উপন্যাসে আপনার মত প্রচার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার এই পার্থক্য,—তিনি হিন্দু চরিত্রের বিশেষত্ব সংযমের সাফল্য কখন ভুলেন নাই।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রেরও চক্ষু ইংরাজী শিক্ষায় ঝলসিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে উপরোক্ত রূপে মত গঠন করিলেও, তিনি সব সময়ে তাহাকে ঠিক্ রাখিতে পারেন নাই। তিনিও ইউরোপীয় দুঃখ-বাদের ছায়া এড়াইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র গুলির কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত চরিত্র? "চন্দ্রশেখরের"

প্রতাপকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু প্রতাপের জীবনের বিশেষত্ব কি? ইন্দ্রিয় জয়,—নির্ম্মল প্রেম, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের দেখাইবার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা কি দেখি? আমরা দেখি প্রতাপ সারা জীবন বিশেষত্বহীন হইয়া মৃত্যুতে বিশেষত্ব লাভ করিল। প্রেমের বক্তৃতা দিয়া পরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন এই উপদেশ আমরা কৃত্রিম শিক্ষা হইতে পাইয়াছি। জাতীয় চরিত্রের অন্তঃস্থল হইতে উহা উদ্ভূত নয়। আদর্শ জাতীয় চরিত্রের গঠনের চেষ্টা থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্র কার্য্যতঃ অন্য চিত্র আঁকিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট নির্দ্দেশ সত্ত্বেও আমরা শৈবলিনীকে কখন সুখিনী কল্পনা করিতে পারি না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে শুধু দুঃখ দেন নাই, তাহাকে একটা দুঃখের আড়ম্বরে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার দুইখানি ঘর সংসারের উপন্যাস লইলে ইহা আরও স্পষ্ট দেখা যাইবে। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল কি? ইহা ঠিক্ হা হুতাশ নয় সত্য, জীবনের যে পুঞ্জীভূত অমঙ্গলের অন্ধকারে কুন্দ ও ভ্রমরের প্রাণদীপ নির্ব্বাপিত হইল, তাহা মনুষ্য অদৃষ্টের একটা অনশ্বর অংশ বটে, কিন্তু তাহাতে সমাজ-সমস্যার যে নির্দ্দেশ ও বিবৃতি রহিয়াছে,—তাহার মূলে শিক্ষার বিকার,—জাতীয় হৃদয়ের বিষম চাঞ্চল্য ভিন্ন কিছুই নয়। কেবল মাত্র 'কপালকুণ্ডলার, Tragedy অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। যে ভাগ্য নিয়মে তাহার দুঃখসূত্র গাঁথা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ও পরিণামহীন। আমরা সেখানে পার্থিব মঙ্গলের কোন আশাই রাখিনা। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত কোথাও তাহার যোগ ছিন্ন হয় নাই। এক হিসাবে ইহা জগতের কয়েক খানি শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে। "রাজসিংহে" মবারক ও জেব্উন্নিসার দুঃখচিত্রও বঙ্কিমচন্দ্র সত্য ও সহজ করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন। সীতারাম ঐতিহাসিক চরিত্র হইলেও, এই বিষ-তরুর ছায়ায় বিষম বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

সাহিত্যে এই অসম্পূর্ণতা, অসংযম, বিদ্রোহের ভাবের জন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না। সাহিত্য জাতীয় মনের প্রতিবিম্ব মাত্র। জাতীয় জীবনে যখন এই ভাব রহিযাছে ও তাহা নানা দুঃখ দুর্দ্দশাপূর্ণ তখন তাহা সাহিত্যে প্রতিফলিত হইবেই। ইউরোপীয় জাতির ও শিক্ষার সংস্পর্শেই তাহা আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ ভাবে সংক্রামিত হইয়াছে, ইহাই এখন আমাদের বুঝা

উচিত। ইহাকে শুধু নূতন বলিয়া দোষ দেওয়া চলে না। কালিদাসের দিন হইতে ও বোধ হয় তাহার পূর্ব্ব হইতেও 'নবনিত্যবস্তম্, চলিয়া যে কথাটা চলিয়া আসিতেছে তাহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। কিন্তু এই যে ইউরোপীয় ভাব, নূতনত্ব ছাড়া ইহার আরও কুফল আছে। আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, ইহা সাহিত্যের অখণ্ডতা নাশ করিতেছে, সাহিত্যে সংশয়ের ভাব আনিতেছে। শক্তি-সংযমের স্থলে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতেছে, এবং অনাবশ্যক চঞ্চলতায় বহু শক্তির অপব্যয় করিতেছে। অবশ্য চঞ্চলতা জীবনেরই লক্ষণ। এ চঞ্চলতায় আমাদের জড়তা কাটিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু যখন প্রকৃত কার্য্যের সময় তখন অনাবশ্যক চঞ্চলতা অভ্যস্ত হইয়া গেলে কিছুই কাজ পাওয়া যাইবে না। সাহিত্যের মহত্তম উদ্দেশ্য জীবনকে পূর্ণ ভাবে প্রতিবিম্বিত করা। সে ভাব আজি কলিকার দিনের এই চঞ্চলতায় ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে, এবং ভয় হয় ইহাই ক্রমে অভ্যাস হইয়া না পড়ে। আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে নূতন সৌন্দর্য্য বোধ লাভ করিয়াছি ইহা নিশ্চিত, কিন্তু ইহাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে। এখনও আমরা অনুকরণ করিতেছি মাত্র। তাই ইউরোপীয় সাহিত্যের একটা সুর এতদূর আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা Satirism ও Sentimental Tragic ভাবকেই যেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি বলিয়া গ্রহণ না করি।

কিন্তু শিক্ষা ও মনের মধ্যে যতদিন মিল না হইবে ততদিন উন্নততর সাহিত্য সৃষ্টি হইবে না। তা সে শিক্ষার পরিবর্ত্তনেই হউক, বা মনের পরিবর্ত্তনেই হউক অথবা উভয়ের পরিবর্ত্তনেই হউক্। আমাদের ভিতরে এই শিক্ষার সহিত মনের মিলের অভাব রহিয়াছে। সেই অভাব সেই দুঃখবোধ আমরা শ্রেষ্ঠ বলি না, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের সহিত তুলনায় এই দুঃখের চিত্রের অস্বাভাবিকতা স্পষ্ট বোধ হইবে। যতদিন না সে অভাব পূর্ণ হইবে ততদিন সাহিত্যের এই কাল্পনিক দুঃখ-বাদ ঘুচিবে না। যতক্ষন শিক্ষা ও সমাজের সামঞ্জস্যে জীবনের পূর্ণসত্বা হৃদয়ঙ্গম না হইবে ততদিন অমঙ্গলের মূর্ত্তিকেই স্ফীত করিয়া আমরা হৃদয়ের সেই শূন্য পূরণ করিতে থাকিব, এবং সাহিত্যেও তাহারই চিত্র প্রতিফলিত হইবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রণয়পারিজাত।

(৩)

"কিং তব পরিহবো ? আদু অস্মানম্ ?"

*   *   *   *

"হৃদয়ে গৃহ্যতে নারী, যদিদং নাস্তি গম্যতাম্"

তখন সংস্থানক বসন্তসেনার অন্বেষনে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল! সে ক্ষিপ্তপ্রায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। কারণ এখন সে আর বসন্তসেনার অলঙ্কারের ঝুনু ঝুনু শব্দও শুনিতে পায় না, কিংবা মালার সুগন্ধও অনুভব করিতে পারিতেছিল না। তখন আর কি করে? দৌড়াদৌড়ি করিয়া কখনও বা বিটকে, আর কখনও বা নিজের ভৃত্যকে, সেই গাঢ় অন্ধকারের ভিতরে মহা আস্ফালনের সহিত ধরিয়া বিবাদগ্রস্ত হইতে লাগিল। পরে সকলে ক্রমে অনুসরণ করিতে করিতে একেবারে চারুদত্তের বাস ভবনের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, সংস্থানক মৈত্রেয়ের অপেক্ষায় একপার্শ্বে দণ্ডায়মানা রদনিকাকে ধরিয়া ফেলিল। ভয়বিহ্বলা রদনিকা, তখন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলে, বিট্ ব্যাপার দেখিয়া, অতি ব্যস্তসমস্ত ভাবে বলিল, "অরে আহাম্মক, তুমি কাহাকে ধরিতে গিয়া কাহাকে ধরিয়া, বাহাদুরি প্রকাশ করিতেছ? এখন যদি নিজের ভাল চাও, শীঘ্র ছেড়ে দাও, আর চল, এখনই এখান হইতে দূরে সরিয়া পড়ি।"

এই কথায় দুর্ব্বিনীত শকার আস্ফালনের সহিত তখনও বলিয়া উঠিল, "তুমি দেখিতেছি নিতান্তই মূর্খ; জান না যে, বিড়ালগুলি ছানা চুরি করিয়া খাইবার সুযোগে কেমন করিয়া গলার আওয়াজ বদলায়? আমি সবই বুঝিয়াছি, কাজেই যখন ধরিয়াছি, তখন আর কিছুতেই ইহাকে ছাড়িতেছি না।"

"অসম্ভব নহে," বিট্ বলিল, "ইহা অসম্ভব নহে। বারাঙ্গনারা নানারকম হাব, ভাব চাতুরি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গলার আওয়াজেরও রকমারি বদল করিতে বেশ সক্ষম হইয়া থাকে।"

এই সময়ে এক হস্তে প্রদীপ ও অন্য হস্তে স্কন্ধে উত্তোলিত বংশদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক মৈত্রেয় বহির্দ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মৈত্রেয় এই বৃত্তান্ত নিরীক্ষণ করিয়া রোষকষায়িত নয়নে বলিলেন, "এ কি? রদনিকে, তোমার এই কি কাজ? চারুদত্ত এখন গরিব হইয়াছেন বলিয়া কি তাঁহার মান সম্ভ্রমও চলিয়া গিয়াছে? কোন্ সাহসে চারুদত্তের বাড়ীতে, তুমি এই কেলেঙ্কারি চলাইতেছ?"

মৈত্রেয়ের ক্রোধ প্রকাশ দেখিয়া সংস্থানক তখনই রদনিকাকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া এক পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

তখন রদনিকা, লোটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মৈত্রেয়ের পা ধরিয়া বলিতে লাগিল, "দাদাঠাকুর, এতে আমার নিজের কসুর কিছুই নাই, আমি আপনার জন্য একপাশে বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমাকে হঠাৎ ধরিয়া ইহারা আমার ইজ্জত নষ্ট করিয়াছে জানিবেন। আমি আপনাদেরই ভরসায় আছি, অতএব আমাকে রক্ষা করুন।"

"রে পাষণ্ডগণ! তোদের এত বড় স্পর্দ্ধা, এই নিরাশ্রয়া অবলার উপরেও তোরা অত্যাচার করিতে দ্বিধা বোধ করিস নাই?" মৈত্রেয় অতি কোপাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "রে পামরগণ! তোদের এ কিরূপ অত্যাচার? তোদের পীড়নে কি বাড়ী ঘরেও কেহ থাকিতে সমর্থ হইবে না? ওরে তোরা কি জানিস্ না,—এই কাহার বাড়ী? চারুদত্ত এখন গরিব বলিয়া কি তাঁহার দান, ধ্যান—সৎকার্য্যগুলিও এই উজ্জয়িনী হইতে লোপ হইয়া গিয়াছে?"

তখন বিট সলজ্জভাবে মৈত্রেয়কে বলিল, "ওহে ঠাকুর, ক্ষমা কর, তুমি অত রাগান্ধ হইও না। আর্য্য চারু দত্তকে কে না জানে? তুমি ইহা ঠিক জানিও, যে চারুদত্তের অপমান উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হয় নাই, কিন্তু দৈবাৎ ভুলবশতঃই এই মহা অনর্থ ঘটিয়া পড়িয়াছে। কোন বারবনিতার সন্ধানেই এই ব্যক্তি এই অপরাধ ভ্রমে করিয়া ফেলিয়াছে, নতুবা এই রাজধানীতে চারুদত্তের সৎকার্য্যের অপলাপ করিতে পারে, এমন পাষণ্ডপ্রকৃতির মানুষ কে আছে?" এইরূপ বলিতে বলিতে চারুদত্তের গুণবিমুগ্ধ বিট সহসা মৈত্রেয়ের পদ ধারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "এই অন্যায় কাজ ইচ্ছা ক্রমে ঘটে নাই, অতএব আপনি দিব্য করিয়া বলুন, কিছুতেই এব্যাপার আর্য্য চারুদত্তকে বলিবেন না! নচেৎ আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়িব না।"

মৈত্রেয় তখন অতি ব্যস্ততার সহিত বিটের হাত হইতে নিজের পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "মহাশয়, আপনি উঠুন উঠুন। এই ত্রুটির জন্য আপনি আর ক্ষোভ করিবেন না, আমি ঠিক জানিয়াছি যে, এই ব্যাপারে আপনি প্রকৃতই নির্দোষ। অতএব আমি চারুদত্তকে আর এ ঘটনা কিছুতেই জানাইব না। কিন্তু আমি এইটি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই চারুদত্তের অবমাননায় রাজার শ্যালক এই দুর্বৃত্ত সংস্থানকই দায়ী।" এইরূপ বলিয়া তিনি পরে রদনিকাকে বলিলেন, "রদনিকে! এই অপমানের কথা আর আর্য্য চারুদত্তকে জানাইয়া কোন ফল নাই, কারণ এ ঘটনা শুনিতে পাইলে, এই দুঃসময়ে তিনি বড় মর্ম্ম-পীড়ায় কাতর হইয়া পড়িবেন।"

বিট কর্ত্তৃক মৈত্রেয়ের পদধারণ ব্যাপার সংস্থানকের পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সে নিতান্তই অবজ্ঞার সহিত বলিতে লাগিল, "ওহে, বলি তুমি কি হইলে? তোমার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানটাও কি শেষ এইরূপে একেবারে লোপ পাইয়া গেল! তুমি কি জান না যে, আমি কত বড় লোক? আর তুমিত আমার আপনার জন। তাতেও তুমি একেবারে এই 'কাকের ঠ্যাং মাথার' বামুনটার পায়ে গিয়ে একেবারে লোটাইয়া পড়িলে? ছি ছি, বলি, তুমি হইলে কি? আচ্ছা বলত, চারুদত্ত এমন একটা কি বড় লোক যে, তুমি তার নাম শুনেই, একেবারে হত্যা দিয়া ফেলিয়াছ? বলি, তোমার জিবটা ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছে নাকি? যার ঘরে খুঁজিলে একটা খুদকণাও সকাল বেলা মিলে না, সে আবার মানুষ কিসে?"

বিট তখন বলিল, "ওরে মূর্খ! আর্য্য চারুদত্ত, এই রাজধানীর এক মাত্র অলঙ্কারস্বরূপ, তাঁহার গুণ তুমি কি বুঝিতে পারিবে? তিনি আমাদিগের ন্যায় শত শত দীন দরিদ্রের জন্যই অকাতরে ধন ব্যয় করিয়া আজ কপর্দ্দক হীন হইয়া পড়িয়াছেন। যখন তাঁহার অগাধ টাকা ছিল, তখনও কেহ কোন সময়ে তাঁহাকে ধনের গরব করিতে দেখে নাই! তিনি অর্থের উম্মায় আত্মহারা হইয়া কখনও কাহার কোন অবমান করেন নাই। ওরে মূর্খ! জলপরিপূর্ণ বৃহৎ সরোবর যেরূপ প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় সকলের তৃষ্ণায় জল বিতরণ করিতে করিতে ক্রমে ক্ষীণ-কলেবর হইয়া পড়ে, আজ আর্য্য চারুদত্তও ঠিক তাহাই হইয়া পড়িয়াছেন। তুমি কি জানিবে? আর্য্য চারুদত্ত, দীন দুঃখীর অক্ষয় কল্পবৃক্ষের ন্যায় আছেন,

তাহাতেই তাঁহার সদ্‌গুণে তাঁহাকে এত বিনয়নম্র করিয়া রাখিয়াছে। আর্য্য চারুদত্ত, সাধু সজ্জনদিগের প্রতিপালক; তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আদর্শ; সুচরিত্রতায় তিনি নিকষ-প্রস্তর তুল্য। অধিক কি বলিব, চারুদত্তের গুণের সীমা নাই। সেই মহানুভব চারুদত্তই অসংখ্য লোকপরিপূর্ণ এই উজ্জয়িনীর মধ্যে এক মাত্র সজীব মনুষ্য, তিনি ছাড়া আর প্রকৃত মানুষ কে আছে? যা হউক, যাহা হইবার তাহা ত হইল, এখন.চল ঘরে ফিরিয়া যাই, আর এখানে থাকিয়া কি হইবে?"

"কি, অমনি চলিয়া যাইব?" দন্তের মূর্ত্তি সংস্থানক বলিল, "আমার বসন্তসেনাকে চারুদত্তের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া আমি অমনি চলিয়া যাইব? তাহা তাহা কিছুতেই হইবে না। তুমি কাপুরুষ, যাইতে হয়, তোমার ভয় হইয়াছে, তুমি এখনই চলিয়া যাও। শর্ম্মা কিছুতেই যাইবেন না।"

"ওরে মূর্খ! এখনও তোমার বসন্তসেনাকে পাইবার আশা আছে? তুমি কি জান না, যেমন অন্ধের চক্ষে দেখার আশা, তোমারও ঠিক আজ বসন্তসেনাকে পাওয়া সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে! তুমি নিতান্তই কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য, তুমি ত জান না যে, কেমন করে মেয়ে লোক বাধ্য করিতে হয়। সুধু পিছনে পিছনে হল্লা করিলেই কি মেয়ে মানুষ বাধ্য হয়? আরও কিছু চাই। মূর্খ! তুমি জানিও তোমার সেইটারই অভাব। দেখ, আলানেই কেবল হাতীকে বাঁধা যায়, আর লাগাম দিয়া ঘোড়াকে বাধ্য করিতে পারা যায়। সেইরূপ যদি মনের যথার্থ ভালবাসা থাকে, তাহা হইলেই স্ত্রীলোক বশ্য হইয়া থাকে, নতুবা কেবল বল বা ভয় দেখাইয়া কোন ফলই হয় না। তোমার ত ভালবাসারই অভাব, তবে আর কোন্ গুণে তুমি বসন্তসেনাকে পাইবে বলিয়া আশা কর? যাহা হউক, ইচ্ছা হয়, তুমি একাই থাক, আমি এখন চলিলাম।" এই বলিয়া বিট্ চলিয়া গেল।

"যা, যা, তুই নিপাত যা," অবজ্ঞার সহিত সংস্থানক, বিটকে এইরূপ বলিয়া, পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল;—"হাঁ, আমি বুঝিয়াছি, ঠিক, বসন্তসেনা চারু দত্তের বাড়ীতেই গিয়া পলাইয়াছে।" তখন মৈত্রেয়কে সগর্ব্বে বলিতে লাগিল, "ওরে বামনা, তুই একমনে শোন্, এই যে বসন্তসেনা, চারু দত্তের বাড়ী গিয়া পলাইয়া আমাকে আজ অপমান করিল, তুই এখনই গিয়া চারুদত্তকে বলিবি,

যদি চারুদত্ত নিজে বসন্তসেনাকে আমার হাতে গিয়া দিয়া আসে, তবেই তাহার ভাল হইবে; আর তাহা না হইলে বুঝিতে পার, মরণ পর্য্যন্তও আমার শক্রতা দূর হইবে না।" এই বলিয়া তখনই প্রস্থান করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কবিরত্ন কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি।

পুরাণ-প্রসঙ্গ।

(১)

হিন্দুর পুরাণ শাস্ত্র অনেকের নিকটে নিতান্ত তুচ্ছের বিষয়, কেননা তাঁহাদের বিবেচনায় পুরাণে কেবল অবান্তর কথা—বাতুলের প্রলাপই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে! কিন্তু পুরাণে যে নিগুঢ় বৈজ্ঞানিক সদ্যুক্তি সমূহও উপদিষ্ট হইয়াছে, একথা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেও প্রস্তুত নহেন! আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে এস্থলে পুরাণের অভ্রান্ত "প্রামাণিকতা" কিছু কিছু সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইব।

১। অভ্র (মেঘ)।

মেঘ কি প্রকারে হয়, তাহাতে লিঙ্গপুরাণ বলেন;—

"অথ ধূমাগ্নিবাতানাং সংযোগস্ত্বভ্র উচ্যতে।"

ধূম (জলীয় বাষ্প), অগ্নি (তেজঃ) ও বায়ুর সংমিশ্রণে অভ্র অর্থাৎ মেঘের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মহাকবি কালিদাস স্বীয় মেঘদূত কাব্যেও বলিয়া গিয়াছেন;—

"ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ।"

কালিদাস ধূম ও সলিলের বিভিন্নরূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে

লিঙ্গপুরাণে ধূম ও সলিলকে এক বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন, কারণ জলের বিপরিণাম বশতই ধূমের সমুৎপত্তি।

২। শুভ ও অশুভ মেঘ।

"মৃতধূমোদ্ভবং চাভ্রমশুভায় ভবিষ্যতি।
অভিচারাগ্নিধূমোত্থং ভূতনাশায় বৈ দ্বিজ॥
এবং ধূমবিশেষেণ জগতাং বৈ হিতাহিতম্।
তস্মাদাচ্ছাদয়েদ্ধূমং অভিচারকৃতং নরঃ॥"

মৃত শরীর দাহ করিলে, যে ধূমরাশি সমুদ্গত হয়, তাহা জীব জীবনের অশুভদায়ক হইয়া থাকে। আর মারণ ও উচ্চাটন প্রভৃতি অভিচার ক্রিয়া-সম্ভূত ধূমরাশিও সকলের প্রাণ অপহারক হইয়া থাকে। এই প্রকারে ধূমের হিত ও অহিত এই বিশিষ্টতা হইতে জগতেরও শুভ বা অশুভ সংঘটিত হইয়া থাকে; সুতরাং অভিচারসঙ্গত ধূমরাশি যাহাতে সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া জীবনের হানিকর না হয়, তজ্জন্য তাহার আচ্ছাদন করা বিধেয়।

৩। সূর্য্যই মেঘ উৎপত্তির কারণ।

"সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে কিরণৈর্জ্জলম্।
জলস্য নাশোবৃদ্ধির্ব্বা নাস্ত্যেবাস্য বিচারতঃ॥"

সহস্রাংশু দিবাকর নিজ কিরণপরম্পরা দ্বারা জগৎ হইতে জলরাশি গ্রহণ করেন, কারণ তিনিই বৃষ্টিরূপে সহস্রধারায় সেই সেই জলরাশির বিকিরণ করিয়া ধরিত্রীর শস্যসম্পদ অভিবৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধগম্য হইবে, জগতে জলের নাশও হয় না অথবা বৃদ্ধিও হয় না।

ভগবান মনুও বলিয়া গিয়াছেন;—

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥"

যজ্ঞাদি ব্যাপারে যে ঘৃতাহুতি প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহাই বাষ্পরূপে আকাশে আদিত্যকে আশ্রয় করিয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। এই জন্য আদিত্য অবলম্বনেই মেঘ হইতে বৃষ্টি আর সেই বৃষ্টি হইতেই অন্ন অর্থাৎ শস্য জন্মিয়া থাকে। সেই অন্নই প্রজা বৃদ্ধির কারণ।

মহাভারতেও দেখিতে পাওয়া যায় ;—

"আদত্তে চ রসান্ ভৌমানাদিত্যঃ স্বগভস্তিভিঃ ।
বায়ুরাদিত্যতপ্তাংশ্চ রসান্ দেবঃ প্রবর্ষতি ॥
তদ্যদা মেঘতো বারি পতিতং ভবতি ক্ষিতৌ ।
তদা বসুমতী দেবী স্নিগ্ধা ভবতি ভারত ॥
ততঃ শস্যানি রোহন্তি যেন বর্ত্তয়তে জগৎ ॥"

সূর্য্য নিজ কিরণ বলে ভূমি হইতে রস গ্রহণ করিয়া থাকেন আর বায়ু আদিত্য কর্তৃক গৃহীত ও সন্তপ্ত সেই রস সর্ব্বত্র বর্ষণ করিয়া থাকেন। সূর্য্যকর্তৃক গৃহীত ও বায়ু কর্তৃক ক্ষরিত জলই মেঘরূপে ধরণী-পৃষ্ঠে নিপতিত হইয়া থাকে। এই বারিধারার প্রভাবেই দেবী বসুমতী স্নিগ্ধা হইয়া তাঁহার অমৃতময় ফলে হরিৎ-ছবি শস্য-পরিশোভিতা হইয়া থাকেন, আর ঐ শস্য দ্বারাই জগতের প্রাণিবর্গ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়।

এই যজ্ঞ ব্যাপার হইতে যে মেঘের সমুৎপত্তি হয়, তাহাই "শুভ মেঘ" ; আর অভিচার বা মৃতদেহ দাহ নিবন্ধন সংজাত ধূম রাশি হইতে সমুদ্ভূত মেঘই জগতের অশুভদায়ক। যাঁহারা স্বকীয় জ্ঞানচক্ষুর বলে এই জাগতিক ব্যাপারের গূঢ় রহস্য করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রজ্ঞাচক্ষু ঋষিবৃন্দ এই জন্যই জগতের হিতকামনা করিয়া যজ্ঞানলে আজ্য আহুতি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যখন অনাবৃষ্টি-সংজাত দুর্ভিক্ষের প্রপীড়নে শস্যসমুৎপত্তির কোন সম্ভাবনা আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন এই ঘোর কলিবহুল সঙ্কট কালেও জ্ঞানবৃদ্ধ সত্ত্বভাব ভক্তিশীল ব্রাহ্মণ কর্তৃক যজ্ঞবিশেষ অনুষ্ঠিত হইলে, জীব জীবনের কল্যানবিধায়ক সুবৃষ্টির বারিধারার প্রাদুর্ভাব হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে এই যে বর্ষত্রয়ব্যাপী ইয়োরোপীয় মহা অভিচার ক্রিয়া,

ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, ইহাতে ত সমগ্র ধরণীমণ্ডলের অশুভই উত্তরোত্তর পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই কামানের হৃদয়বিদারক উদ্গর্জ্জন, সেই বালরুগ্ন রমণীবৃন্দের অকালমৃত্যুপ্রদায়ক বোমার আস্ফালন এবং অরাতির বক্ষ-রুধির-পিয়াসী বন্দুকের ধূম্ররাশি বিকীরণ প্রভৃতি ব্যাপার হইতে যথেষ্ট জলীয় বাষ্পও প্রাদুর্ভূত হইতেছে, আর তাহা হইতে নিবিড় মেঘ-মালার আবির্ভাব হইয়া ভীষণ রণক্ষেত্র প্রবল বারিধারার সম্পাতে কর্দ্দম-পরিষিক্তও ত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহাতেও ত' ধরিত্রী দেবীর শান্তিলাভ হইতেছে না, জীবের মঙ্গল সাধিত হইতেছে না, শ্যামল শস্যসম্পদ ভরে ত' ভূত-ধাত্রীদেবী সুভূষিতা হইতে পারিতেছেন না। অধিকন্তু আধিব্যাধির প্রবল প্রকোপেই উত্তরোত্তর জীব জীবনের পরিহানি সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু স্বার্থান্ধ মানব এই ব্যাপার কিছুতেই প্রত্যক্ষ করিয়াও বুঝিতে পারিতেছে না।

৪। সূর্য্য ও চন্দ্র কি?

"ঘনতোয়াত্মকং তত্র মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতম্।
ঘনতেজোময়ং শুক্লং মণ্ডলং ভাস্করস্য চ॥"

চন্দ্রমণ্ডল কেবল নিবিড় জলময় এবং সূর্য্যমণ্ডল শুভ্র নিবিড় তেজোময় বলিয়া জানিবে।

৫। চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি কেন?

"সোমস্য কৃষ্ণপক্ষাদৌ ভাস্করাভিমুখস্য চ।
প্রক্ষীয়ন্তে পরস্যান্তঃ পীয়মানাঃ কলাঃ ক্রমাৎ।
এবং সূর্য্যমিনিত্তৈষা ক্ষয়বৃদ্ধী নিশাকরে॥"

কৃষ্ণপক্ষারম্ভে চন্দ্র, সূর্য্যের সন্নিকটে উপস্থিত হওয়াতে ক্রমে চন্দ্রমণ্ডলের হ্রাস হইয়া থাকে, ইহাকেই দেবগণ কর্ত্তৃক চন্দ্রের অমৃতময় কলা পান বলা হইয়া থাকে। আবার শুক্লপক্ষে গতি বশতঃ সূর্য্য হইতে চন্দ্র দূরে অপসরণ করাতে ক্রমে চন্দ্রের অভিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধি এই উভয় ব্যাপারই সূর্য্যের সন্নিকর্ষ ও বিপ্রকর্ষ নিবন্ধন সংঘটিত হইয়া থাকে।

বায়ু পুরাণেও উক্ত হইয়াছে ;—

"বৃদ্ধিক্ষয়ৌ চ সোমস্য কীর্ত্ত্যেতে সূর্য্যকারিতৌ।"

চন্দ্রের অভিবৃদ্ধি ও পরিক্ষয় সূর্য্য কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

৬। রাহু কি ?

"উদ্ধৃত্য পৃথিবীছায়াং নির্ম্মিতং মণ্ডলাকৃতি।
স্বর্ভানোস্তু বৃহৎ স্থানং তৃতীয়ং যত্তমোময়ম্ ॥"

চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডলে পৃথিবীর মণ্ডলাকৃতি ছায়ার আচ্ছাদন ঘটিলে, নিবিড় তমোময় ঐ পরিমণ্ডলকেই উভয়ের তৃতীয় স্থান স্বর্ভানু অর্থাৎ রাহু বলা হইয়া থাকে।

৭। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ।

"আদিত্যাত্তচ্চ নিষ্ক্রম্য সোমং গচ্ছতি পর্ব্বসু ॥"
আদিত্যমেতি সোমাচ্চ পুনঃ সৌরেষু পর্ব্বসু ॥"

রাহু শুক্ল পক্ষের পর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রকে এবং সৌরপর্ব্ব অর্থাৎ অমাবস্যা তিথিতে পুনর্ব্বার চন্দ্র হইতে সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে।

এই প্রমাণ হইতে সুস্পষ্ট বোধগম্য হয়। সকল পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথিতেই চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ এই বিশাল ধরণীমণ্ডলের কোন না কোন স্থান হইতে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। আমরা পঞ্জিকার গ্রহণ গণনায় সেইরূপ দেখিতেও পাইয়া থাকি, যে এই গ্রহণ অমুক অমুক স্থান হইতে দৃষ্ট হইবে এবং অমুক অমুক স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

৮। পৃথিবীর সীমা।

ব্রহ্মপুরাণ বলেন,—

"রবিচন্দ্রমসোর্যাবন্ময়ূখৈরবভাসতে।
সসমুদ্র সারিচ্ছৈলা তাবতী পৃথিবী স্মৃতা ॥"

যতদূর পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণরাশি জগৎ অবভাসিত করিয়া থাকে, সমুদ্র, নদী ও পর্ব্বতাদি সমন্বিতা এই পৃথিবীর সীমা ততদূর পর্য্যন্ত জানিবে। পৃথিবীর এই সীমা বিনির্দ্দেশ হইতে, তাহা যে এখনও সম্যক্ নির্দ্ধারিত হয় নাই, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কবিরাজ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি।

মহাকবি শ্রীক্ষেমেন্দ্রের

সেব্যসেবকোপদেশ।

বিভূষণায় মহতে তৃষ্ণাতিমিরহারিণে।
নমঃ সন্তোষরত্নায় সেবাবিষবিনাশিনে॥ ১॥

যাহা হইতে অন্য কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে, ধরায় যাহার তুল্য অন্য কোন অলঙ্কার নাই এবং তৃষ্ণারূপ তিমির যাহার সংস্পর্শে বিদূরিত হইয়া যায়, সেবারূপ বিষবিনাশক সেই সন্তোষরূপ রত্নকে আমি নমস্কার করিতেছি।১।

উৎসৃজ্য নিজকার্য্যাণি সদ্ভির্বাস্পাকুলেক্ষণম্।
সেব্য-সেবক-সেবানাং ক্রিয়তামনুশাসনম্॥২।

সেব্য, সেবক ও সেবার বিষয় নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, সহৃদয় ব্যক্তি-মাত্রেরই চক্ষু বাষ্পভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে; অতএব এই সেব্য, সেবক ও সেবার সম্বন্ধে যে প্রকৃত বিষয় উপনিবদ্ধ হইতেছে, অন্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও তাহা সকলে অনুধাবন পুরঃসর একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।৩।

দর্পাদেকঃ পরো লোভাদ্ দ্বাবন্ধৌ সেব্যসেবকৌ।
ধনোন্মদৈনবিকৃতী মুখে কঃ কস্য পশ্যতি ॥৩॥

সেব্য ও সেবক এই উভয়েই প্রকৃত অন্ধের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে; সেব্য প্রভু নিজ অহঙ্কার বশতঃ অন্য কিছু দেখিয়াও দেখিতে সমর্থ হয়েন না, আবার পক্ষান্তরে সেবকব্যক্তিও নিজের লোভপরতন্ত্রতাবশতঃ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তায় জন্মান্ধপ্রায় হইয়া পড়ে। এক ব্যক্তির মুখে তীব্র ধনমদের প্রচণ্ড সন্তাপ, আর অন্যদিকে অপরের পরিক্ষীণ বদনমণ্ডলে দীনতার চরম বিকৃতি; সুতরাং উভয়ের কেহই পরস্পরের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে সমর্থ হয় না।৩।

দুর্ব্বার-মোহ-লোভান্ধো যদি ন স্যাদয়ং জনঃ।
কঃ ক্রূর-ক্রোধ-বিধুরং সহেত ধনিনাং মুখম্ ॥৪॥

যদি এই যাচক ব্যক্তি দুর্ব্বহ মোহ ও লোভ দ্বারা অভিভূত হইয়া অন্ধপ্রায় না হইয়া পড়িত, তাহা হইলে হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় প্রতিনিয়ত কৌটিল্য ও ক্রোধ-পরায়ণ ধনবান ব্যক্তির সম্মুখে নিপতিত হইয়া, তাহাকে প্রাণান্তক কষ্ট ভোগ করিতে হইত কি?

যঃ পৃথ্বীমপি দর্পান্ধো ন পশ্যতি পুরঃ স্থিতাম্।
স দৈন্য-লঘুতাং যাতং কথং সেবকমীক্ষতে ॥৫॥

হায়, দর্পরূপ মদিরায় অন্ধ যে ব্যক্তি, যাহাতে অবস্থিতি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান সেই পৃথিবীকেও যখন কিছুতেই দেখিয়াও দেখিতে সমর্থ হয় না, তখন যাচ্ঞাপরায়ণ অতি দীনহীন নিজের সেবককে দেখিয়া কিরূপে বুঝিতে সমর্থ হইবে? ৫।

অসতিং বাহয়ত্যেকো বধিরং স্তৌতি চাপরঃ।
অহো জগতি হাস্যায় নির্লজ্জৌ সেব্যসেবকৌ ॥৬॥

ধনী অগতি (উপায়বিহীন) যাচক ব্যক্তিকে প্রতিনিয়তই বহন করিয়া ক্লান্ত হইয়া থাকেন, কারণ যাচকের অভাব-সমুদ্রের আকাঙ্ক্ষা-তরঙ্গ বিলীন

হইয়া কখনও শান্ত ভাব ধারণ করিতে পারে না। ওদিকে যাচকও বধিরপ্রায় ধনবান ব্যক্তিকে বৃথা স্তবস্তুতি করিয়া থাকে, কেননা, দাতা কখনও যাচকের সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ একেবারে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে সমর্থ হইতে পারেন না। অহো কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যথার্থ বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, সেব্য (ধনী) ও সেবক (যাচক) এই উভয় ব্যক্তিই এই জগতে নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে।৬।

দূরস হুঙ্কারমাত্রেণ বিসৃষ্টো মার্গণঃ সদা।
গুণভ্রষ্টঃ ক্রিয়াহীনো নোদ্বেগং যাতি সেবকঃ ॥৭॥

মার্গণ (যাচক) ব্যক্তি দাতার হুঙ্কার মাত্রেই বিক্ষিপ্ত মার্গণের (শরের) ন্যায় বিদূরে অপসারিত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাতেও গুণহীন ও স্বকার্য্যে অলস মূঢ় ব্যক্তি কোন উদ্বেগই অনুভব করে না; পক্ষান্তরে বিক্ষিপ্ত শর ও গুণ (রজ্জু) হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অচিরে ক্রিয়াহীন (গতিশক্তিবিহীন) হইয়া থাকে।৭।

মন্যে সুকৃতিনা তেন ভাগীরথ্যাং কৃতং তপঃ।
বৈরাগ্য-ভাগীরথ্যাং যঃ সেবাসু ন বিগাহতে ॥৮॥

আমি বিবেচনা করি, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে ভাগীরথী গঙ্গাকে আশ্রয় করিয়া তপশ্চর্য্যা দ্বারা নিজের জীবন ধন্য করিয়াছেন, যিনি বৈরাগ্যরূপ ভাগীরথীকে অবলম্বন পূর্ব্বক কখনও সেবারূপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া নিজ দেহকে কলুষিত করেন নাই।৮।

কথিতক্লেশবাপেন শাপেনেব বিপাকিনা।
সেবাতাপেন পচ্যন্তে ন হি দুষ্কৃতিনো নরাঃ ॥৯॥

পরের দাসত্ব, যাচক ব্যক্তিকে অভিশাপের ন্যায় পরিণামে দুঃসহ ক্লেশ পরম্পরা প্রদানপূর্ব্বক সন্তাপিত করিয়া থাকে; কিন্তু কি সৌভাগ্যের বিষয় অযাচ্ঞাপরায়ণ পুণ্যশীল ব্যক্তিকে কখনও এই দুঃখ দাবানল স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না।৯।

অদৈন্য-পুণ্য-মনসাং যশস্তেষাং বিরাজতে।
সেবা-পঙ্ক-কলঙ্কানাং যৈর্ণ পাত্রীকৃতং শিরঃ ॥১০॥

যাহারা পরসেবারূপ দুরপনেয় কলঙ্ক পঙ্ক দ্বারা নিজের মস্তক কলুষিত করেন নাই, তাঁহাদিগকে কখনও দুঃখ দারিদ্র্যের একমাত্র আধার এই দীনতা স্পর্শ করিতেও পারে না; অধিকন্তু যাচ্ঞাবিহীনতায় সতত পবিত্র অন্তঃকরণ সেই সাধু ব্যক্তিদিগের অক্ষয় যশোরাশি সর্ব্বত্র নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।১০।

ক্রমশঃ

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কবিরাজ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি

বল্লাল-কাহিনী

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেনবংশীয় স্বাধীন রাজগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালের কোন ঘটনাই অদ্যাবধি ইতিহাসে নির্দ্ধারিত হয় নাই। কিন্তু রামপালে অদ্যাপি তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তাঁহার যশঃসৌরভ বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরেও সংঘটিত ঘটনাবলি তাঁহার সমসাময়িক বলিয়া জনশ্রুতি নিরূপণ করিয়া থাকে।

তাঁহার জন্মবৃত্তান্তও গভীর রহস্যময়। কেহ কেহ তাঁহাকে আদিশূরের পুত্র বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন। কথিত আছে, তাঁহার মাতা, শূর-রাজবংশোদ্ভূতা বিলাস দেবী আদিশূরের বড়ই প্রিয়পাত্রী ছিলেন। একদিন রাজা মহিষীর চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। সমাজ-চ্যুতা রাণী নিরাশ অন্তঃকরণে চিরশান্তি লাভের আশায় ব্রহ্মপুত্র নদে ঝাঁপাইয়া

পড়েন। কিন্তু পুণ্য-সলিল নদ তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে অপর তীরে পৌঁছাইয়া দেন এবং নিকটবর্ত্তী বুড়ী-গঙ্গার তীরস্থিত দুর্গা দেবীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। এই নদীর পার্শ্বস্থ এক অরণ্যের ভিতর রাণী তাঁহার পুত্র সন্তান প্রসব করেন। দেবীর আশ্রয়েই কুমার লালিত পালিত হইতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত তিনি নানা প্রকার ব্যায়াম-কৌশলে পারদর্শী হইলেন এবং রাজপুত্রের উপযুক্ত বুদ্ধি অর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কিশোর বয়সে একদিন বনমধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে বল্লাল তাঁহার রক্ষাকর্ত্রী দুর্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি জঙ্গলের ভিতর লুক্কায়িত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। সেই স্থানেই পরে তিনি দেবীর সম্মানার্থ ঢাকেশ্বরীর (লুক্কায়িত দেবী) মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, এই মন্দিরের নাম হইতেই দেশের নাম ঢাকা হইয়াছে। দেব-দেবীর অনুগ্রহে বল্লাল সেন যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহার পিতা লোকমুখে পুত্রের গুণাবলির কীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। যুবক রাজসভায় আনীত হইলে, রাজা তাঁহার রূপ-গুণে বিশেষ মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

অদ্যাবধি রামপালে প্রাচীন কীর্ত্তি যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তাহারই সহিত বল্লাল সেনের নাম জড়িত। তিনি বড় বড় অট্টালিকা ও পথ নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, কিরূপ বৃহৎ আয়তনে এ অট্টালিকার নক্সা প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রায় তিন হাজার স্কয়ার ফিটব্যাপী ভূমির উপর এই প্রাসাদ বিস্তৃত ছিল এবং দুই তিন শত ফিট প্রশস্ত খাতের দ্বারা চতুর্দ্দিক বেষ্টিত। পূর্ব্বদিকে প্রাসাদে প্রবেশের একমাত্র পথ। এখন কেবল মৃত্তিকাস্তূপই পরিখা-বেষ্টিত সেই বৃহৎ প্রাসাদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। যেস্থানে রাজা ও রাজপুত্রগণ সভার অধিবেশন করিতেন, সৈন্যদল শিবির স্থাপন করিত, সে ভূমি কৃষকগণ আজ নির্ব্বিঘ্নে কর্ষণ করিতেছে। এই রাজ-প্রাসাদের গাত্র হইতে ইষ্টক খুলিয়া বর্ত্তমানে রামপালে অনেকগুলি বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ইসলাম খাঁ ঢাকা নগরীতে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিবার সময় অনেক ইট সেখানে লইয়া যান। বহুকালের পরিত্যক্ত এই মৃত্তিকা স্তূপাভ্যন্তরে বহু ধনরত্ন নিহিত আছে বলিয়া জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে, এবং প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে একজন কৃষক নিকটস্থ ভূমি

কর্ষণ করিতে করিতে ৭০ হাজার টাকা মূল্যের এক অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড পাইয়াছিল। জনসাধারণের ধারণা, এ হীরকখণ্ড নিশ্চয়ই একদিন বল্লাল সেনের প্রাসাদের শোভা বর্দ্ধন করিত।

বল্লাল সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত রাস্তাগুলি সবই বিস্তৃত ও উচ্চ। একটি বড় রাস্তা রামপাল হইতে পদ্মা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তা সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলে এক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। জ্যোতিষীগণ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, গলদেশে মাছের কাঁটা বিদ্ধ হইয়া রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। এই সংবাদ শ্রবণে ভীত হইয়া তিনি মৎস্যাহার একেবারে বন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু পদ্মানদীতে কেচকি নামে একজাতীয় মাছ পাওয়া যায়, যাহার কাঁটা নাই। রাজা নদী হইতে দেশে সেই মৎস্য আনাইবার জন্য এই পথ নির্ম্মাণ করান। তদবধি এই পথ "কেচকি দরওয়াজা" নামেই অভিহিত।

বল্লাল সেনের প্রাসাদের নিকট "রামপাল দীঘি" নামে যে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে, তাহারও খনন সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এই দীঘি দৈর্ঘ্যে আধ ক্রোষ, প্রস্থে পাঁচশত গজ। হিন্দুরাজগণ কিরূপ বৃহৎ আয়তনে প্রাসাদ, অট্টালিকা, পথ, পুষ্করিণী, দীঘি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেন, ইহা তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। সংস্কারের অভাবে এই দীঘির অধিকাংশ ভাগই এখন ভরাট ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সে উর্ব্বর ভূমিতে কৃষকগণ এখন ধান্য উৎপাদন করিতেছে।

জনসাধারণের হিতার্থে ও দেবতাগণের অনুগ্রহ লাভের আশায় তিনি এই মহৎ কার্য্যে ব্যাপৃত হন। দীঘির আয়তন নির্দ্ধারণের জন্য তিনি এক আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে তাঁহার মাতা একদমে কোন্ স্থানে না থামিয়া যতদূর পদব্রজে যাইতে পারিবেন, দীঘির দৈর্ঘ্যও ততদূর বিস্তৃত হইবে; এবং রাত্রের মধ্যেই সেই স্থান খনন করাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। রাজমাতা জীবনে অতি অল্পই পদব্রজে বাহির হইয়াছেন। সেই জন্যই জননীর অক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, দীঘির দৈর্ঘ্যের সীমাও বেশী বিস্তৃত হইবে না; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মাতার পদব্রজে গমনশক্তির বিষয় তিনি ভুল ধারণা করিয়াছিলেন। বস্ত্রাবৃতা হইয়া পুত্র ও মন্ত্রীগণের সমভিব্যাহারে রাজমাতা প্রাসাদ হইতে দক্ষিণ মুখে যাত্রা

করিলেন। পদব্রজে গমনে তাঁহার বিশেষ স্ফূর্ত্তিই লক্ষ্য হইল এবং কিছুদূর গিয়াও তাঁহার কোন অবসাদের চিহ্ন দেখা গেল না। রাজা বড়ই ভীত হইলেন। ভাবিলেন রাজমাতা এই গতিতে আরও বেশীদূর অগ্রসর হইলে, রাত্রের মধ্যে এত বড় দীঘি খনন করাইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। পক্ষান্তরে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে মহাপাপের ভাগী হইতে হইবে। জননীকে আরও অগ্রসর হইতে দেখিয়া রাজা বড়ই চিন্তিত হইলেন। পক্ষান্তরে তাঁহারই কষ্টসহিষ্ণুতার উপর প্রজাগণের সুখের সীমা ও পরিমাণ নির্ভর করিতেছে, এই ভাবিয়া রাজমাতা স্বয়ং পথভ্রমণজনিত ক্লেশ ও অবসাদ স্বীকার করিয়াও সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মনে হইল যেন দৈব অনুগ্রহে তিনি নববলে বলীয়ান হইয়াছেন। ব্যাপার ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল। বল্লাল সেন নিরুপায় হইয়া এক কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন।

মাতার অজ্ঞাতসারে তাঁহার চরণের উপরিভাগ অলক্তকরাগ-রঞ্জিত করিতে তিনি চাকরদিগকে আদেশ করিলেন। এক অনুগত ভৃত্য তাঁহার আদেশ পালন করিলে, তিনি অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"রাজমাতার চরণে জোঁক ধরিয়াছে।" রাজমাতাও পায়ে লাল দাগ দেখিয়া রক্ত বলিয়া মনে করিলেন এবং ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য থামিয়া গেলেন। এই স্থানই দীঘির শেষ সীমা, প্রাসাদ হইতে প্রায় আধ ক্রোশ দক্ষিণে। তৎক্ষণাৎ রাজা বহুসংখ্যক শ্রমজীবি সংগ্রহ করিয়া খনন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন এবং রাত্রির মধ্যেই সেই বৃহৎ দীঘি খনন করাইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

দৈর্ঘ্যে এই দীঘির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত দৃষ্টিগোচর হইল না। কিন্তু বল্লাল সেন দীঘির আয়তন অযথা বর্দ্ধিত হইবার ভয়ে যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য দেবতাগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং দীঘিটি গভীর হইলেও, শুষ্ক হইয়া রহিল। দিনের পর দিন চলিয়া গেল, দীঘি আর জলপূর্ণ হইল না। রাজা বড়ই লজ্জিত হইলেন। অবশেষে তাঁহার বন্ধুবর রামপাল এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন, দেবী যেন তাঁহাকে প্রজাগণের হিতার্থে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে আদেশ করিতেছেন; তাহা হইলেই দীঘি জলপূর্ণ হইয়া উঠিবে। পরদিন তিনি রাজা ও দেশবাসিগণকে দীঘির পাড়ে সমবেত করিয়া, তাঁহাদিগকে তাঁহার অদ্ভুত স্বপ্নদর্শনের কথা বলিলেন, এবং

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই দীঘির গভীর তলদেশে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইলেন। তৎক্ষণাৎ শত শত জলস্রোত কোথা হইতে আসিয়া দীঘিটিকে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। রামপালও সেই অগাধ জলরাশির মধ্যে নিমগ্ন হইলেন, আর পাড়ে উঠিতে পারিলেন না। বিস্মিত দর্শকবৃন্দ সমস্বরে "রামপাল, রামপাল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই জলরাশি দীঘিটিকে একেবারে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। রামপালের চিহ্নমাত্রও আর দেখিতে পাওয়া গেল না। বল্লাল সেন বন্ধুর জন্য দুঃখ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,..."আমারই পাপে আমার বন্ধুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাহার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। এই দীঘি অদ্যাবধি রামপালের নামেই অভিহিত হইবে।" তদবধি ইহা "রামপালের দীঘি" নামেই খ্যাত। এই ঘটনা হইতে এ প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়—"দীঘির নাম হইতেই কি দেশের নামকরণ হইয়াছে?"

এই দীঘির অদূরেই একটি পুষ্করিণী আছে। রামপাল দীঘির সহিত ইহার উৎপত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট। কথিত আছে, উক্ত দীঘি খননের পর বল্লাল সেন প্রত্যেক শ্রমজীবিকে নিকটস্থ এক স্থান হইতে এক কোদাল করিয়া মাটি খুঁড়িতে আদেশ করেন। শ্রবজীবিদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, তাহারা প্রত্যেকে এক কোদাল করিয়া মাটি খুঁড়িতেই স্থানটি এক বৃহৎ পুষ্করিণীতে পরিণত হইল। ইহার আয়তন ১০৫০ ফিট দীর্ঘ ও ৭৫০ ফিট প্রস্থ। উহা এখনও "কোদালধোয়া" দীঘি নামে অভিহিত হয়।

রামপাল দীঘির উত্তর পাড়ে একটি বিশাল গজারি বৃক্ষ আছে। ইহার উচ্চতা প্রায় দেড়শত ফিট। ইহা বহুকাল ধরিয়া ঐস্থানে অবস্থিত। স্থানীয় হিন্দু-অধিবাসিগণ বৃক্ষটিকে পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের ধারণা বৃক্ষটি অমর এবং ইহার অসাধারণ গুণ ও দৈব শক্তি আছে। ইহার পত্রে অনেকের দুরারোগ্য রোগের উপশম হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে। ইহার পাতা ছেঁড়া বা ডাল কাটা বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ। একবার একজন ফকির এই বৃক্ষের তলদেশে আশ্রয় লইয়া ইহার ডাল কাটিয়া অগ্নি সংযোগে তাঁহার সান্ধ্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অন্ন মুখে করিবামাত্র তিনি রক্ত বমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকগণ এই পবিত্র বৃক্ষতলে বসিয়া সন্তান-লাভের জন্য ঠাকুর-দেবতার পূজা করিয়া থাকে এবং কৃষকেরা সন্তোষজনক শস্য

লাভের আশায় ইহার অনুগ্রহপ্রার্থী হয়। বহুদিন পূর্ব্বে ইহার সম্মানার্থে নিকটেই প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে এক মেলা বসিত।

বল্লাল সেনের মৃত্যু সম্বন্ধেও এক অদ্ভুত জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। রামপালের অদূরেই আবদাল্লাপুর নামক গ্রামে একঘর মুসলমান বাস করিত। বাড়ীর কর্ত্তা নিঃসন্তান ছিলেন এবং বহুদিন ধরিয়া ঈশ্বরের নিকট পুত্রের জন্মকামনা প্রার্থনা করিয়াও, যখন তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল না, তাঁহার মনে গভীর অশান্তির সঞ্চার হইল। এমন সময় একদিন এক ফকির ভিক্ষা লাভের আশায় তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইয়া, তিনি বড়ই হতাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফকিরকে মুষ্টি ভিক্ষা দানে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া স্থানান্তরে যাইতে আদেশ করিলেন;—"আল্লা আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন নাই, আমি তাঁহার নামে আর ভিক্ষা দিব না।" কিন্তু সর্ব্বদর্শী ফকির উত্তর করিলেন,—"আল্লা আপনার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। আপনি শীঘ্রই পুত্র সন্তানের মুখ দেখিবেন।" মুসলমান আনন্দে অধীর হইয়া ফকিরকে ভিক্ষা দিলেন এবং আরও বলিলেন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি ফকিরকে খুব সন্তুষ্ট করিয়া দিবেন। ফকির যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আমাকে আর কিছুই দিতে হইবে না; কেবল আল্লার তৃপ্ত্যর্থে একটি গরু জবাই করিও।"

যথা সময়ে মুসলমানের একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। ফকিরের আদেশমত তিনি গরু জবায়ের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার হিন্দু প্রতিবেশীরা তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। প্রতিজ্ঞা পালনে কৃতসংকল্প হইয়া তিনি নিকটস্থ জঙ্গলের ভিতর গমন করিয়া জবাই কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পরে পরিবারবর্গের আহারোপযোগী মাংস লইয়া, অবশিষ্টাংশ মৃত্তিকাভ্যন্তরে পুতিয়া ফেলিলেন। গৃহে ফিরিবার পথে এক চিল এই মাংসের কিয়দংশ তাঁহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া লইয়া বিক্রমপুর অভিমুখে উড়িয়া গেল এবং রাজার প্রসাদের সম্মুখেই তাহা ফেলিয়া দিল। রাজা ইহা হিন্দুগণের উপাস্য গরুর মাংস বলিয়া চিনিতে পারিয়া, এই গর্হিত কার্য্য কে করিয়াছে সন্ধান লইবার জন্য নানা স্থানে চর পাঠাইলেন। জঙ্গলে অনুসন্ধান করিবার সময় তাহারা দেখিতে পাইল, একদল শৃগাল সেই মৃত্তিকাপ্রোথিত মাংসখণ্ড তুলিয়া খাইতেছে। এবং পথে লইয়া যাইবার সময় হস্তস্থিত মাংস হইতে পতিত রক্তবিন্দুর দাগ

অনুসরণ করিয়া তাহারা সেই মুসলমানের গৃহদ্বারে গিয়া পৌছিল। রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আদেশ করিলেন,—"যে শিশুর মঙ্গলার্থে এই গো নিহত হইয়াছে, তাহাকে কল্য প্রাতে প্রাসাদে আনিয়া বধ করা হইবে। যাহার জন্মোৎসবে এত বড় এক পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বাঁচিয়া থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে।"

মুসলমান ভিতর ভিতর রাজ-আজ্ঞা অবগত হইয়া, সেই রাত্রেই স্ত্রী ও নবজাত শিশুপুত্রকে লইয়া বাসভূমি ত্যাগ করিলেন এবং ভারতবর্ষ পার হইয়া তাঁহার আদিম নিবাসস্থান আরব্য দেশে উপস্থিত হইলেন। মক্কানগরীতে বাবা আদম নামক এক ফকিরের সাক্ষাৎ পাইয়া তিনি তাঁহাকে তাহার পলায়ন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। এরূপ দেশ আছে, যেখানে মুসলমানেরা স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারে না শুনিয়া, বাবা আদম সধর্ম্মীগণের ধর্ম্মাচরণে স্বাধীনতা লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং শত সহস্র অস্ত্রে সজ্জিত অনুচর সংগ্রহ করিয়া বিক্রমপুর যাত্রা করিলেন। পথে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, তিনি সদলবলে বল্লাল সেনের রাজধানীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ প্রকাশ্য ভাবে অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনেক গো, বৃষ নিহত হইতে লাগিল এবং নেমাজ পড়িবার পূর্ব্বে সধর্ম্মীগণকে মসজিদে হাজির করিবার আহ্বানধ্বনি রাজার প্রাসাদ মধ্য হইতে শুনিতে পাওয়া যাইত।

বল্লাল সেন রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তিনি আগন্তুকদের নিকট দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন,—"হয় তোমরা এস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও; নচেৎ হিন্দুগণের ধর্ম্মবিরোধী আচার অনুষ্ঠান হইতে বিরত হও।" কিন্তু বাবা আদম অসংখ্য অনুচরের সাহায্যে উৎসাহিত হইয়া রাজাকে উদ্ধতভাবে উত্তর পাঠাইলেন,—"ঈশ্বর এক এবং একমাত্র মহম্মদীয় ধর্ম্মই পবিত্র ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মানুযায়ী আচার আমরা অনুষ্ঠান করিব। বিধর্ম্মী বল্লাল সেন যাহা ইচ্ছা করিতে পারে।" হিন্দু রাজা সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া বাবা আদমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। রাজধানী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে প্রাসাদের ভিতর এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মিত করাইলেন। বলিয়া গেলেন, যদি তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, বিজয়ী মুসলমানদের হাতে পড়িয়া

অপমানিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পরিবারবর্গ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। পাছে বিজয়ী শত্রু সৈন্য হঠাৎ অতর্কিতভাবে প্রাসাদ আক্রমণ করে এই ভয়ে তিনি এক সঙ্কেত চিহ্নও নির্দ্দেশ করিলেন। তাহার দ্বারা প্রাসাদস্থ নরনারী বুঝিতে পারিবে যে, তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার যুদ্ধসজ্জার ভিতর এক পত্রবাহক পারাবত সঙ্গে করিয়া লইলেন। যুদ্ধে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিলেই তিনি পারাবতটিকে মুক্ত করিয়া দিবেন; সে প্রাসাদে উড়িয়া আসিলেই, তাহারা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে।

বর্ত্তমানে যেখানে বাবা আদমের মসজিদ অবস্থিত, সেস্থানে দুই সৈন্যদল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ভীষণ সংগ্রামে নিরত হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া জয়পরাজয় অনিশ্চিত রহিল। পরে জয়লক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে বল্লাল সেনের পক্ষই অবলম্বন করিলেন। মুসলমানেরা যুদ্ধে পরাজিত হইল। তাহাদের অধিকাংশ সৈন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইল। শেষে বল্লাল সেন বাবা আদমের সাক্ষাৎ পাইলেন। তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়। ফকির যুদ্ধে পরাজয়ে আদৌ বিচলিত হন নাই। মক্কার দিকে মুখ করিয়া মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া সান্ধ্য নেমাজ পড়িতেছিলেন। কথিত আছে, বল্লাল সেন উপাসনা নিরত শত্রু সেনাপতিকে তরবারির দ্বারা আঘাত করিলেন; কিন্তু বড়ই অশ্চর্য্যের বিষয়, তরবারির আঘাত ফকিরের গায়ে কোনও রেখাপাত করিতে পারিল না। ফকির তখন উঠিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দুই বিরুদ্ধভাবাপন্ন ধর্ম্মের নেতা আজ পরস্পর মুখোমুখী। ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নেমাজ পড়বার সময় কেন আমাকে বাধা দিতেছ?" বল্লাল সেন উত্তর করিলেন,—"হিন্দু জাতির উপাস্য দেবী গো হত্যা তুমি করিয়াছ। তোমাকে বধ করিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি ফকিরকে পুনর্ব্বার তরবারির দ্বারা আঘাত করিলেন। ফকিরের দেহ বোধ হয় লৌহ-নির্ম্মিত ছিল। এবারও সেই তীক্ষ্ণ অসিধারা ব্যর্থ হইল। তখন বাবা আদম যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত মৃত অনুচরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক বলিলেন, —"তোমার হাতেই মরা আল্লার মরজি। কিন্তু বিধর্ম্মীর হস্তে আমার পতন হইবে না। এই লও আমার তরবারি;—আমাকে সংহার কর। অপর তরবারিতে আমাকে কিছুতেই আহত করিতে পারিবে না। আল্লার অভিশাপ

যেন শীঘ্রই তোমার শিয়রে বর্ষিত হয়!" সেই তরবারি লইয়া বল্লাল সেন ফকিরকে আঘাত করিলেন। এক আঘাতেই তাঁহার দেহ দুইভাগে বিভিন্ন হইয়া গেল।*

বল্লাল সেন শত্রুজয়ে উল্লসিত হইয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন নিমিত্ত নদীতে অবতরণ করিলেন। কিন্তু নত হইয়া জলস্পর্শ করিবার সময় পারাবতটি অলক্ষিতে তাঁহার পোষাকের ভিতর হইতে উড়িয়া গেল। এদিকে রাজপরিবারবর্গ প্রাসাদ প্রাচীর হইতে উৎসুক নয়নে সংবাদের প্রতীক্ষায় চাহিয়াছিল। তাহারা সান্ধ্য-গগনে উড্ডীয়মান পারাবতের শুভ্র ডানাদুটি দেখিতে পাইল। পারাবতটী উড়িয়া আসিয়া প্রসাদ প্রচীরে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদ মধ্যে স্ত্রীলোকের করুণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। এবং শত্রু সৈন্য আসিয়া প্রাসাদ আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই যথা শীঘ্র সম্ভব অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিল। সকলেই সেই জ্বলন্ত হুতাশনে ঝাঁপ খাইয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিল।

প্রাসাদের চতুর্দ্দিক ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। এদিকে নদীতীরে উঠিয়া বল্লাল সেনের চৈতন্য হইল; দেখিলেন পারাবতটি অতর্কিতে কখন উড়িয়া গিয়াছে। তিনি দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তিনি যখন প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পরিবার-আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আর কেহই জীবিত নাই। দুঃখে ও নৈরাশ্যে তিনিও সেই ধূমান্বিত অগ্নিচিতায় আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন এবং পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেলেন। নিষ্ঠুর দৈবের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকাসম বিক্রমপুরের শেষ

* এই ছিন্ন শরীরের একাংশ কোনও অদ্ভুত উপায়ে চট্টগ্রামে নীত হয়। সেখানে তাঁহার সম্মানার্থে স্থাপিত এক মসজিদ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এবং যেখানে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, মুসলমান সম্রাট জালালুদ্দিন ফতে সার রাজত্বের সময় ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে সেখানে এক মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মসজিদের অর্দ্ধাংশ বর্ত্তমানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ভগ্নাবশেষ দুটি শ্বেত প্রস্তরের স্তম্ভের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই স্তম্ভ দুটি বল্লাল সেনের গদা বলিয়া জনশ্রুতি এখনও প্রচলিত। হিন্দু স্ত্রীলোকগণও এই মসজিদের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্তম্ভ গাত্রে সিন্দুর বিন্দু লেপন করে।

হিন্দু রাজা ভস্মীভূত হইলেন। অদ্যাবধি তিনি "পোড়া রাজা" নামেই ঐ অঞ্চলে খ্যাত।

ফকিরের অভিশাপ হাতে হাতেই ফলিয়া গেল!

F. B. Bradley—Birt, B. A, I. C. S., প্রণীত "The Romance of an eastern capital" নামক পুস্তক হইতে সঙ্কলিত। ইহা কাহিনীমাত্র; ঐতিহাসিক সত্য ইহার ভিতর কতটুকু নিহিত আছে, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠক বিচার করিবেন।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অমরা ও অমর।

(এলা হুইলার ভাব উইলকক্সের অবলম্বনে)

গ্রহ উপগ্রহ মাঝে রম্য বসুন্ধরা;
অমরা যে—এর মাঝে তাহার উদয়।
মানব—দেবতা, স্নেহমমতায় ভরা;
ভুমিকা তোমার তুমিকের অভিনয়।
পূর্ণতা জীবনে এলে কোথা মৃত্যু জরা?
তুমিই ফুটাবে অন্য কলিকা-হৃদয়;
করুণাতে প্রাণ লভি' যত আধ-মরা
তোমারে "অমর" বলি দিবে "জয় জয়"।
ব্যর্থ এ পৃথিবী নয়;—নও ব্যর্থ তুমি—
ভিতরে জাগিছে তব অমর-পরাণ।
"প্রেমেই পূর্ণতা রাজে"—বলি' দিনযামি,
চলেছে সাধনা-পথে হয়ে আগুয়ান।
ঘুমায় দেবতা-সভা ওগো প্রেম-কামী
বচন-অমৃতে সবে কর আহ্বান!

শ্রীচণ্ডিচরণ মিত্র।

আমাদের জাতীয়-উন্নতির একটি সূত্র।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

এইবার দেখা যাউক—যাঁহারা আমাদের দর্শনকে পাশ্চাত্যদর্শন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় যুক্তিটী কতদূর সঙ্গত।

দ্বিতীয় যুক্তিটী এই যে, (ক) আমাদের দর্শনশাস্ত্র অতি প্রাচীন কালের জিনিষ, অতএব তাহা আধুনিক কালের জিনিষ অপেক্ষা পূর্ণতর বা নির্দ্দোষ হইতে পারে না। কারণ, অভিব্যক্তিবাদের সিদ্ধান্তই এই যে, জগৎ দিন দিন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে, জগতের জ্ঞানসম্পত্তি, বলবীর্য্য, বিদ্যাবুদ্ধি সকলই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কালে যাহা যেরূপ ছিল, আজ তাহা অনেক উন্নত ও অনেক ভাল হইয়াছে। (খ) তাহার পর, এদেশেও আধুনিক কালে যে দর্শনচর্চ্চা হইয়াছে, তাহাও আধুনিক পাশ্চাত্য-দর্শন অপেক্ষা কোনরূপেই উত্তম হইতে পারে না। কারণ, আধুনিক ভারতীয় দর্শন যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে সময় ভারত পরাধীন, ম্লেচ্ছ-শাসনে উৎপীড়িত, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন যে সময় উৎপন্ন হইয়াছে, সে সময় ইয়োরোপ স্বাধীন, সমগ্র পৃথিবী তাহার অধীন। পরাধীনের চিন্তা বা চেষ্টা কখন স্বাধীনের চিন্তা বা চেষ্টার সমকক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং ভারতীয় আধুনিক দর্শনও পাশ্চাত্য আধুনিক দর্শনের মত পুষ্ট হইতে বা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, ইত্যাদি।

ইহার উত্তর এই যে, অভিব্যক্তিবাদের সিদ্ধান্তানুসারে প্রাচীনকালের বস্তুকে পরবর্ত্তী কালের বস্তু অপেক্ষা সকল স্থলে অপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। কারণ, অভিব্যক্তিবাদের উক্ত সিদ্ধান্ত, উভয়বাদিসম্মত সিদ্ধান্ত নহে। যাহা উভয়বাদিসম্মত সিদ্ধান্ত নহে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া এক পক্ষ একটী কথা বলিলে তাহা অপর পক্ষ স্বীকার করিতে বাধ্য নহে, সুতরাং সাধারণেও যে তাহা গ্রাহ্য হইবে না, তাহা নিশ্চিত।

এখন দেখা যাউক, কি জন্য আমরা অভিব্যক্তিবাদের উক্ত সিদ্ধান্তটি স্বীকার করি না; কি কারণে আমরা জগতের সকল জিনিষেরই ক্রমোন্নতিকে সত্য বলিয়া বিবেচনা করি না।

প্রথমতঃ দেখা যায়, পূর্ব্বকালের যে সকল বিদ্যার এখনও যৎকিঞ্চিৎ অবশেষ রহিয়াছে, এবং যাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য এখনও সেই পাশ্চাত্য জগতেই বিশেষ যত্ন দেখা যাইতেছে, তাহা অদ্যাবধি পূর্ব্ববৎ ফলদায়ক বা আয়ত্ত হইতেছে না, অথবা তাহাদের পরিবর্ত্তেও অনুরূপ ফলপ্রদ কোন বিদ্যাও আবিষ্কৃত হইতেছে না। ভারতের ফলিতজ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা এবং যোগবিদ্যার কথা ভাবিলে এ বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। ফলিতজ্যোতিষ হইতে পূর্ব্ব-কালে যেরূপ ভবিষ্যৎজ্ঞানলাভ হইত, তাহা আর এখন দেখা যায় না। যদি কেহ বলেন—এ কথার ভালরূপ প্রমাণ নাই; তাহা হইলে তাহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, এখনও পর্য্যন্ত অপ্রচারিত যে সকল প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থের লুপ্তাবশেষ পাওয়া যায়, তাহাদিগকে অবলম্বন কেহ কেহ এখনও এরূপ ভবিষ্যৎ বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, তাহা দেখিলে নিতান্তই চমৎকৃত হইতে হয়। আমরা স্বয়ং ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবং ভৃগুসংহিতা এই জাতীয় গ্রন্থের একটী দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে। ফলতঃ, ফলিতজ্যোতিষশাস্ত্র দেখিলে বলা যায় না যে, পরবর্ত্তী কালের জিনিষ মাত্রেই উন্নত।

তাহার পর, চিকিৎসাশাস্ত্রেও সেই কথা। কারণ, ইহাতে যে সকল রসায়ণ ও কল্প প্রভৃতির প্রয়োগের ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহার ফলে মনুষ্য অতি দীর্ঘকাল সুস্থ ও সবল শরীরে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, মুমূর্ষু, জরাজীর্ণ, ও শীর্ণকলেবরও পুনরায় নবজীবন লাভ করিতে পারে। যদি কেহ বলেন—একথা গুলি গ্রন্থে থাকিলেও বিশ্বাস্য নহে; কারণ, ইহা অসম্ভব ব্যাপার। তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, বাস্তবিক অসম্ভব কথা কোন গ্রন্থে স্থান পাইলে, তাহা বহুকাল হইতে প্রচারিত থাকিতে পারে না; কালে তাহার অসত্যতা পরীক্ষিত হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলে তাহা বিলুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়াই যায়। আমাদের প্রাচীন কালের চিকিৎসাবিদ্যার এতাদৃশ সফলতা যে, কেবল আমাদের দেশেই, প্রচলিত আছে, তাহা নহে, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন সঙ্গ তৎকালে প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন নাগার্জ্জুনের চিকিৎসাবিদ্যার প্রশংসা-

মুখে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন, দেখা যায়। বর্ত্তমান পাশ্চত্য চিকিৎসাবিদ্যা-লতা যে আমাদের চিকিৎসাবিদ্যালতার বীজসম্ভূতা, তাহা আজ পাশ্চাত্যগণ স্বীকার করিতেছেন এবং এখনও পর্য্যন্ত যে সমস্ত আশুফলপ্রদ ঔষধি, পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা-বিশারদ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বলিয়া অভিনব নামে প্রচারিত হইতেছে, তাহার বহু আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রসাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে—ইহা সেদিন ডাক্তার লিউকিস্ সাহেব মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। (মাদ্রাজে চিকিৎসা সম্মিলনে কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনিভূষণ রায়, এম,এ, এম,বি, মহাশয়ের সভাপতির অভিভাষণ দ্রষ্টব্য।) যাহা হউক, আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র অতি প্রাচীনকালের সম্পত্তি বলিয়া বর্ত্তমান চিকিৎসাশাস্ত্র অপেক্ষা যে অনুন্নত, তাহা নহে। পক্ষান্তরে বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতই এখনও পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেছেন যে, আমাদের সেই প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যা অনেক বিষয়ে বর্ত্তমান চিকিৎসাবিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব পরবর্ত্তী কালের সকলই উন্নত ইহা বলা ভুল।

তাহার পর, যোগবিদ্যার প্রতি দৃষ্টি করিলে এ কথায় কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না। যোগবলে মনুষ্য বহুকাল দেহ রাখিতে পারেন; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ রাখিয়াও জীবিত থাকিতে পারেন; শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিতে পারেন। ইহা ত' এখনও আমরা দেখিতেছি। দূর দর্শন, দূর শ্রবণ, ভূতভবিষ্যতের জ্ঞান, এখনও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পাঞ্জাবের হরিদাস সাধুর কথা এখনও লোকে বিস্মৃত হয় নাই। তিনি ছয় মাস মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত থাকিয়াও জীবিত ছিলেন। সুন্দরবন হইতে ভূকৈলাসে আনীত সমাধিস্থ যোগীর কথা এখনও অনেকের স্মৃতিপটে জাগরূক রহিয়াছে। ইনি কতকাল মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত ছিলেন, তাহার স্থিরতা হয় নাই। লেখকও স্বয়ং সমাধিস্থ যোগী এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াস্থগিতকারী যোগী দেখিয়াছেন। এ সকল সামর্থ্য পূর্ব্বকালে লোকের যত ছিল, আজ তত নাই, ইহা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহার পর, এই সমস্ত সামর্থ্য, আজ বহু চেষ্টা করিয়াও কোন পাশ্চাত্য বিদ্যাই আমাদিগকে যে দিতে পারিতেছেন না, তাহা কি কাহারো অবিদিত আছে? ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীন মিসর, ব্যাবিলনে যে সকল উত্তম বিদ্যা প্রচলিত ছিল, আজ ক্রমোন্নতিবাদী ও বর্ত্তমান সভ্যতাভিমানীর রাজধানীতে তাহা আকাঙ্ক্ষণীয় হইলেও অজ্ঞাত রহিয়াছে; পাশ্চাত্য জগত, পাশ্চাত্য সভ্যতা, আজ

পর্য্যন্ত এই সকল বিলুপ্তপ্রায় অপ্রচারিত বিদ্যার পরিবর্ত্তে তুল্যফলপ্রদ বিদ্যাদানে অসমর্থ রহিয়াছে। সুতরাং, প্রাচীনের সকল বস্তু অপেক্ষা পরবর্ত্তী কালের সকল বস্তুই যে ভাল বা উন্নত, তাহা বলিবার উপায় নাই। কতকগুলি ভাল বা অনেকগুলি ভাল হইলেও সকলই ভাল—একথা বলিবার অধিকার কাহারো নাই ইহা সুনিশ্চিত।

তাহার পর, মানবের সকল বিদ্যাবুদ্ধির ফল যে সচ্চরিত্রতা, ধর্ম্মজ্ঞান বা সুনীতি, সেই সচ্চরিত্রতা প্রভৃতির প্রতি যদি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে, জগৎ চিরকাল ক্রমশঃই উন্নতির পথে ধাবিত হয় নাই। পূর্ব্বকালের সত্য-পালন পরোপকারপ্রবৃত্তি, দান ও ত্যাগের কথা ভাবিলে কি মনে হয় না যে, বর্ত্তমানকালে মানবসমাজ এ বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই সকল সদ্‌গুণ আজ অতিশয় বাঞ্ছনীয় হইলেও যে নিরতিশয় দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক দূত ম্যাগাস্থেনিস্‌ ভারতীয় সভ্যতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পড়িলে ভারতের নীতির যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কি আজ জগতের কোন সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়? ষ্ট্রাবো, হুয়েনসাঙ্গ, সুংজন প্রভৃতি বিদেশীয় প্রেরিব্রাজকগণ তৎপরে ভারতবাসীর যেরূপ চরিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই কি আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়? এখনও পর্য্যন্ত ভারতের সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি গণের মধ্যে যে সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা বিদ্যমান, তাহা কি মনুষ্যসমাজের আদর্শ নহে? আর ইহাদের এ সকল গুণ, অজ্ঞানের বা অসভ্যতার ফল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কি যায়? কারণ, প্রাণীমাত্রেরই স্বভাবতঃ রাগদ্বেষাদিই প্রবল হয়। জাতিগত সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, উপযুক্ত চর্চ্চার ফল বা চেষ্টার ফলই হইয়া থাকে। ইহাদের এ সকল গুণ কোন এক অতীত কালে ইহাদের উন্নতিরই ফল বলিতে হইবে। অবশ্য তাই বলিয়া আজকালকার অধঃপতিত বা নীচ জাতির মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণাবশেষ রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহাদের সকলেরই পূর্ব্বপুরুষগণকে আজকালকার সভ্যতায় সভ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কারণ, সভ্যতার গতি আলোচনা করিলে মনে হয়, মনুষ্যের যাহা নিতান্ত বাঞ্ছিত, তাহা লাভের জন্য সর্ব্বতোমুখী চেষ্টার ফলে পূর্ব্বকালে লোক সকল এক পথে গিয়াছিল, এখন যেন

অন্য পথে যাইতেছে মাত্র, লক্ষ্য কিন্তু সেই একই আছে। পূর্ব্বে যে সভ্যতা ছিল, তাহার ফলে বহু লোকে মানবের সেই পরমাভীষ্ট লাভ করিয়াছে, এবং আজও বহু লোকে মানবের সেই পরমাভীষ্ট লাভ করিতেছে, তবে সেই সকল লোকের সংখ্যার তারতম্য এবং উপায়ভেদ বা পথভেদ মাত্র কেবল বিশেষ। যাহা হউক, তাহা হইলেও পূর্ব্বকাল হইতে সকল বিষয়েই বর্ত্তমান জগৎ যে উন্নত নহে, তাহা অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ বর্ত্তমান জগৎ যে ক্রমেই উন্নত হইতেছে—একথা কোন মতেই তাহা হইলে সঙ্গত হইতে পারে না।

তাহার পর, দেখা যায়—অভিব্যক্তিবাদের অন্তর্গত ক্রমোন্নতিবাদটী অন্য কারণেও যুক্তিসহ নহে। দেখা যায়, ক্রমোন্নতিবাদের মূল মন্ত্র হইতেছে—"নিম্ন জাতীয় জীব হইতে উন্নতজাতীয় জীবের উৎপত্তি। যেমন, বানরজাতি হইতে বনমানুষজাতির উৎপত্তি, বনমানুষজাতি হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি, প্রভৃতি। এই মূল মন্ত্র হইতে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, যতই দিন যাইবে, ততই মোটের উপর মনুষ্যজাতির উন্নতি হইবে, অর্থাৎ একদেশে কতকগুলি মনুষ্যের উন্নতি হউক আর না হউক বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে মনুষ্য, বিভিন্নরূপে দলবদ্ধ হইয়া মোটের উপর উন্নতিই করিবে। অবশ্য, এই উন্নতির ফলে বিভিন্ন দেশের বহু মনুষ্যের দল জীবনসংগ্রামে পরাজিত হইয়া বিলুপ্ত হইবে বটে, কিন্তু তাহারা বিলুপ্ত হইয়া ভবিষ্যতের কোন অধিকতর উন্নত জাতির উন্নতির সহায় হইবে, অর্থাৎ বিলুপ্ত জাতির বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধনৈশ্বর্য্য লইয়া তাহারা অধিকতর বিদ্বান্, উন্নত ও বুদ্ধিমান হইবে। এইরূপে মোটের উপর মনুষ্যজাতির উত্তরোত্তর উন্নতির সম্ভাবনা সপ্রমাণ করিবার জন্য ক্রমোন্নতিবাদিগণ ইতিহাস-সাহায্যে দেখাইতে লাগাইলেন যে, অতীত মনুষ্যসমাজ অনুন্নত ছিল, ক্রমে উন্নত হইতে হইতে বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্তটী যখন অতীত ও বর্ত্তমানে প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে, তখন ভবিষ্যতেও যে ইহা সপ্রমাণ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহার পর, এই ক্রমোন্নতিবাদ কেবল এই স্থলেই আবদ্ধ হইল না, ব্যক্তিতেও প্রযুক্ত হইল, অর্থাৎ এক একটি মানুষের আত্মাও সুতরাং 'উত্তরোত্তর উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতেছে—ইহাও স্থিরীকৃত হইল। বলা বাহুল্য, মহাত্মা ডারউইন এই অভিব্যক্তিবাদের

প্রচার করিবার পর তাঁহার অনুসারিগণ সকল দিকেই এই সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততা লক্ষ্য করিতেছেন, এবং আজকাল দর্শন ও বিজ্ঞানপ্রভৃতি সকল শাস্ত্রই ইহার আলোকে উদ্ভাসিত, ইহার অলঙ্কারে ভূষিত, ইহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে। যাহা হউক, ফলতঃ ক্রমোন্নতিবাদ ও অভিব্যক্তিবাদ একই হইয়া দাঁড়াইতেছে। এবং যতদূর পরীক্ষা করিতে পারা যাইতেছে, ততদূর ইহা যে অভ্রান্ত, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।” ইত্যাদি।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে—নিম্ন জাতি হইতে উন্নতজাতির উৎপত্তি হইতেছে বলিয়া যে, উত্তরোত্তর উন্নত জাতির আবির্ভাব হইবে, তাহার প্রমাণ কি? জিজ্ঞাসা করি—পৃথিবীর কি ধ্বংস নাই? পৃথিবীর ধ্বংসে সেই উন্নত জাত্যুৎপত্তির ধারা কি করিয়া অব্যাহত থাকিবে? যদি বলা যায়—যতদিন পৃথিবী থাকিবে, তত দিনই উন্নত জাতির ধারা প্রবাহিত হইবে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য—অতীতের ইতিহাসে কি কোন খণ্ডপ্রলয়ের কথা নাই? কোন সুসভ্য দেশ প্রাকৃতিক ঘটনাবশতঃ কি একেবারে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরীর ন্যায় জলধিতলে নিমগ্ন, অথবা পম্পাই সহরের ন্যায় ভূগর্ভে প্রোথিত হয় নাই? আচ্ছা, যদি ইহা নাই থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এরূপ ঘটিলে,—দেশব্যাপী অনায়ত্ত জলপ্লাবন হইলে দীর্ঘকাল জলে বাস করিয়া যাহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তাহারা কি যুক্তাঙ্গলী হইবে না? আর এই যুক্তাঙ্গলী কি উন্নতির চিহ্ন? জাগতিক নৈসর্গিক উপদ্রবে দুরবস্থাপন্ন হইলে মানবসমাজের অবনতি কি রুদ্ধ করা যায়? দেখ, যাবৎব্যক্তির সাধারণ ধর্ম্মের নাম জাতি, এমন ব্যক্তিতে এরূপ যদি কোন সাধারণ ধর্ম্ম দেখা যায়, তাহা হইলে জাতিতেও কি তাহা লক্ষিত হইবে না? দেখা যায়—শৈশবে আমাদের বলবুদ্ধির অভাব, যৌবনে তাহাদের বিকাশ এবং বার্দ্ধক্যে তাহার বিলয় হইতেছে। ইহা যদি যাবৎব্যক্তির সাধারণ ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে আমাদের জাতিতেও তাহা ঘটিবে না কেন? ক্রমোন্নতিবাদিগণের মতে যে বালকের যৌবনে বলবুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখা গিয়াছে, বার্দ্ধক্যে তাহার ভীমরতি হওয়া অসঙ্গত। আর যদি বলা যায়, বার্দ্ধক্যে দেহের অবনতি হইলেও আত্মা ও মনের উন্নতিই হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিব উদারতাপ্রভৃতি গুণগ্রাম যাহার যৌবনে অধিক দেখা গেল, তাহার বার্দ্ধক্যে ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা কেন প্রবল হইল? বার্দ্ধক্যে

স্মৃতিও বুদ্ধি প্রভৃতির বিলোপ ত আত্মমনের উন্নতির সূচক হইতে পারে না। অতএব ব্যক্তিতে যদি এইরূপ অবনতি দেখা যায়, তাহা হইলে জাতিতেও তদনুরূপ অবনতি কেন দেখা যাইবে না?

ইহাতেও যদি বলা হয় যে, মৃত্যুকালে মনঃ প্রভৃতির দুর্ব্বলতা দেখিয়া আত্মা ও মনের উন্নতি হয় না, বলা উচিত নহে। কারণ, জন্মান্তরে সেই ব্যক্তির মনঃ বুদ্ধির বিকাশ পূর্ব্বজন্মের অপেক্ষা অধিক হইবে। পূর্ব্বজন্মের বালক অবস্থায় যেরূপ বুদ্ধি ছিল, পরজন্মে বাল্যে তাহার বুদ্ধি অধিক হইবে, পূর্ব্বজন্মের তাহার যৌবন ও বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা যেরূপ ছিল, পরজন্মে তদপেক্ষা উন্নত হইবে, সুতরাং মোটের উপর এক জীবাত্মাতেও উন্নতি ঘটিতেছে; তাহা হইলে বলিব, একজনের আত্মমনের এই উন্নতি, উত্তরোত্তর ঘটিতে ঘটিতে কালে পূর্ব্ব আত্মমনের বিনাশ ও নূতন আত্মমনের আবির্ভাব হইতে কি তাহা হইলে বাধা দেওয়া যায়? অংশের পরিবর্ত্তন ক্রমাগত হইলে কালে অংশীর পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী হয়। অতএব ক্রমোন্নতিবাদী আত্মার নিত্যতাই অস্বীকার করিয়া বসিলেন। আর তাহা হইলে আত্মজাতীয় পদার্থেরও বিনাশ ঘটিল।

তাহার পর, যদি একটা জাতি হইতে আর একটা উন্নতজাতির জন্ম স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বানর ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তি বহু জাতির বিলোপ কেন হইল? বানর ও মনুষ্যের মধ্যে বনমানুষ প্রভৃতি জাতি যেমন নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ তাহারাও কেন নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিল না? যোগ্যজনের উদ্বর্তনে যে অযোগ্যের নিবরশেষ বিনাশ, তাহা কেন ঘটে? এখন যদি এই বিনষ্ট বা বিনাশোন্মুখ জাতির প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে জাতিরও ত অবনতি অবশ্য স্বীকার্য্য, আর অবনতি যদি থাকে, তাহা হইলে ক্রমোন্নতি কি করিয়া সর্ব্বত্র রক্ষিত হয়? ইহাকে ত তাহা হইলে সার্ব্বভৌমিক নিয়ম বলা যায় না।

তাহার পর, অতীতের জাতি যে অনুন্নত, তাহাই বা কে বলিতে পারে? হিন্দু জাতিতে যে এই নিয়মের ব্যভিচার হয়, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। তাহার পর, এখনও পর্য্যন্ত ভূগর্ভের যে সকল স্তর হইতে যেরূপ মনুষ্যকঙ্কাল বাহির হইতেছে, তাহাতে যেরূপ প্রাচীন জাতির সত্তা সিদ্ধ হয়, তাহা এখন কোথায়? অথবা সে সময়ে সেরূপ মনুষ্যের উৎপত্তি ক্রমোন্নতিবাদে ত সম্ভবপর হয় না।

তাহার পর, বাঁচিবার ইচ্ছা, সুখ লাভের ইচ্ছা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানুকূল কর্ম্ম মিলিয়া যদি ক্রমোন্নতির আবশ্যকতা প্রমাণিত করে—ইহা বলা হয়, তাহা হইলে বহুদিন হইতে যে সকল কর্ম্ম, যে সকল সমাজে অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই সকল কর্ম্মানুকূল দেহ সেই জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দের হইতেছে না কেন? এই যে ম্লেচ্ছগণ স্মরণাতীত কাল হইতে অঙ্গবিশেষের ত্বক্ বাল্যেই ছেদন করিয়া আসিতেছে, তাহার ফলে তাহাদের এই অনুষ্ঠান এখনও নিষ্প্রয়োজন হইতেছে না কেন? স্ত্রী ও পুং দুইটী মূষিকের লাঙ্গুল কাটিয়া তাহাদের সন্তানের আবার তাহাই করিয়া তিন লক্ষ সংখ্যায় উপনীত হইয়া একজন পণ্ডিত দেখিয়াছেন, সেই বংশের মূষিকের লাঙ্গুলের পরিমাণ একটুও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং, পারিপার্শ্বিক অবস্থানুকূল কর্ম্মানুসারে যে দেহের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা যে সর্ব্বত্র জাতিধর্ম্মে পরিণত হয়, ইহা বলা বড় সহজ নহে। জাতির উৎপত্তিবিনাশে আরও কিছু হেতু আছে—ইহাই বলিয়া বোধ হয়।

তাহার পর, ব্যক্তিগতভাবে দেখিলেও বর্ত্তমানকাল যে অতীত হইতে উন্নত, তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? কৈ আজ পাণিনির বুদ্ধি লইয়া কয় জন জন্মগ্রহণ করিলেন? কৈ আজ বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, শঙ্করের মত দুই চারিটি করিয়া দেশবিদেশে দেখা যাইতেছে না কেন? জগৎ যদি উন্নতির দিকেই ছুটিয়াছে, তবে কেন এই জাতীয় ব্যক্তি দেশে দেশে দুদশটী করিয়া দেখা যায় না? কেবল তাহাই নহে, এই সকল মহাত্মা, উন্নতির যে উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, ইহারা যে উচ্চজীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও সেই অতীতের মহাপুরুষদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাহাও সেই অতীতের মুনিঋষিগণের চরিত্রকে আদর্শ করিয়া, অন্যথা নহে। অতীতের বস্তু যদি বর্ত্তমানের উন্নতির আদর্শ হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমানকে কি করিয়া উন্নত বলা চলে?

যাহা হউক, অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, জাতিগতভাবে কি ব্যক্তিগতভাবে—উভয়ভাবেই মোটামুটিভাবে উন্নতি বা অবনতি যেন চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, একদেশে এক জাতির এক সময় উন্নতি, অন্য সময় তাহার অবনতি, আবার এক সময় অবনতি অন্য সময় উন্নতি এইরূপই ঘটিয়া আসিতেছে। কখন বা কেহ বিলুপ্ত, কখন বা কেহ উদিত এইরূপই হইতেছে। ইতিহাস কখনও কেবল উন্নতি বা কেবল অবনতি বলিয়া দেয় না। ইতিহাস

উভয়েরই সাক্ষ্য দেয়। অর্থাৎ ইতিহাস পরিবর্ত্তনেরই সাক্ষ্য দেয়। পরিবর্ত্তনই এ জগতের প্রকৃত ধর্ম্ম। আর পরিবর্ত্তন কোন অপরিবর্ত্তনকে আশ্রয় করে বলিয়া মূলে কোন নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুর সত্তা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হই—এইমাত্র।

তাহার পর, উন্নতি শব্দের প্রকৃত অর্থের প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায়; প্রকৃতস্থলে ইহার প্রয়োগ নিতান্ত স্থূলদৃষ্টির পরিচায়ক। আমার যদি এক সহস্র মুদ্রা থাকে, এবং যদি আমি পরে তাহাকে একাধিক সহস্র করিতে পারি; তাহা হইলে অর্থবিষয়ে আমার উন্নতি হইল, বলা হয়। অর্থাৎ যাহার যাহা ছিল; তাহার তাহা থাকিয়া যদি তদতিরিক্ত অর্জ্জিত হয়, তবেই তদ্বিষয়ে তাহার উন্নতি হইল—বলা যায়। আচ্ছা, ইহাই যদি উন্নতিশব্দের অর্থ হইল, তাহা হইলে বানরজাতি হইতে মনুষ্যজাতি জন্মিলে কি করিয়া বানরজাতির উন্নতি হইল—বলা যায়? এ ক্ষেত্রে ত বানরজাতি হইতে অপর একটী জাতির জন্মই হইল, উন্নতি কি করিয়া হইল? বানরজাতির যে সকল বিশেষধর্ম্ম ধর্ম্ম আছে, মনুষ্যজাতির সেগুলি সব থাকিয়া অন্য উত্তম ধর্ম্ম আসিলে, তবে বানরজাতির উন্নতি হইল—স্বীকার করা যাইতে পারে। অতএব জাতির উন্নতির কথাটাই নিতান্ত স্থূলদৃষ্টির কথা।

আরও একটী কথা। মনুষ্যজাতির মধ্যে এক দেশে যদি একটী জাতির শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং অপর জাতির দুরবস্থা হয়; অর্থাৎ একটী জাতি যদি অপর জাতির বিনাশসাধন করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠে, যেমন ইয়োরোপীয় জাতির অনুগ্রহে আমেরিকার আদিমবাসীর বিনাশ এবং বর্ত্তমান আমেরিকা বাসীর উদয় হইয়াছে; এবং এখনও এইরূপ অভিনয় জগতের অন্যত্র হইতেছে, তাহা হইলে কি মনুষ্যজাতির উন্নতি হইল বলিতে হইবে? আমেরিকার আদিম-বাসিগণ কি মানুষ নহে? তাহারা কি মনুষ্যজাতির মধ্যে নহে? এক্ষেত্রে যদি আমেরিকাবাসীদিগকে দেখিয়া মনুষ্যজাতির উন্নতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আমেরিকার আদিমবাসিগণকে দেখিয়া কি মনুষ্যজাতির অবনতি বা বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে না? অতএব মনুষ্যজাতির বেতনই উন্নতি হইতেছে না—ইহাই বলিতে হইবে।

ন্যায়ের সিদ্ধান্তানুসারে জাতির উন্নতি বা অবনতি এই কথাটাই স্থূল

কারণ, জাতি পদার্থটির গুণ বা কর্ম্ম সম্ভবপর নহে, আর উন্নতি বলিতে গুণ বা প্রভৃতিই বুঝিতে হইবে, অন্য কিছু নহে। অতএব জাতির উন্নতি কথাটা তত সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক নহে।

তাহার পর, ক্রমোন্নতিটী ব্যক্তিতেও পরিলক্ষিত হয় বলিয়া বিশেষ বিশেষ মনুষ্য-আত্মাতে ইহার ফলে ক্রমোন্নতি যে স্বীকার করা হয়, তাহাও নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। দেখা গিয়াছে, অভিব্যক্তিবাদের একটী মূলমন্ত্র—কর্ম্মজন্য দেহাবয়বের পরিবর্ত্তন। ইহা যদি হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি বার্দ্ধক্যে দুশ্চরিত্র হইয়া পড়িল, তাহারও কি আত্মার উন্নতি হইবে? তাহারও কি ভবিষ্যৎ জীবন উত্তরোত্তর সুখময় হইবে? কে না দেখিতেছে—কত লোক প্রথম বয়সে দেবচরিত্রসম্পন্ন থাকিয়া পরিণতবয়সে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেছে। সমাজে কি এ দৃষ্টান্তের অভাব আছে? ক্রমোন্নতিবাদী কি ইহাদেরও আত্মার জন্য অক্ষয়স্বর্গের ব্যবস্থা করিবেন? শুভকর্ম্মের ফলে যদি উন্নতি এবং অশুভকর্ম্মের ফলে যদি অবনতি নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে এই শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দের অবনতি কি অবশ্যম্ভাবী নহে?

এইরূপ যতই চিন্তা করা যাইবে, ক্রমোন্নতিবাদটী যে সব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই ভিত্তিগুলিই অদৃঢ় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। অভিব্যক্তিবাদের সহিত ইহাকে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া আজকাল ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ইহার প্রয়োগ করা হইতেছে, এবং তাহার ফলে সময়ে সময়ে অনেক দুষ্ট মতের উদ্ভবও হইতেছে। ইহারই ফলে আজকাল ঘরে ঘরে উত্তরোত্তর উন্নত অবতার দেখা দিতেছেন; ইহারই ফলে আজ অনেকে আজীবন গর্হিত কর্ম্ম আচরণ করিয়াও উত্তরোত্তর পূর্ণতা লাভই অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। ইহারই ফলে প্রাচীন নির্ম্মল আদর্শ দিন দিন লোকে বিস্মৃত হইতেছে; ইহারই ফলে কোন একটী মতেই লোকের আস্থা স্থাপিত হইতেছে না, ইহারই ফলে মানব অবলম্বনশূন্য হইয়া মৃত্যুকালে অন্ধতমস রূপ সেই মহার্ণবে পতিত হইতেছে, এবং ইহারই ফলে বর্ত্তমান এই ভীষণ নৃসংশ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে। ফলতঃ, জগৎ যে দিন দিন উন্নতির পথে ছুটিয়াছে—ইহা আমরা বুঝিতে পারি না।

যাহা হউক, এখনও এই দ্বিতীয় যুক্তির উত্তর প্রসঙ্গে আর একটী কথা অবশিষ্ট রহিল। পাশ্চাত্য দর্শনানুরাগিগণ বলেন যে প্রাচীন দর্শনের ন্যায় আমাদের

আধুনিক দর্শনও আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের সমকক্ষ হইতে পারে না। কারণ, আমাদের আধুনিক দর্শন, যে সময়ে উৎপন্ন, সে সময়ে আমরা পরাধীন, কিন্তু পাশ্চাত্যগণ সে সময় স্বাধীন; স্বাধীনের চিন্তা ও পরাধীনের চিন্তার ফল কখনও তুল্য হইতে পারে না, ইত্যাদি। আমরা কিন্তু এ কথাতেও সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করিতে পারি না। আমরা বিবেচনা করি, আমাদের দর্শনশাস্ত্রের যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য রাজকীয় পরাধীনতা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে বিশেষ অন্তরায় হইতে পারে না। পাশ্চাত্যদর্শনের যে উদ্দেশ্য, তাহার সিদ্ধিতে রাজকীয় পরাধীনতা বিশেষ অন্তরায়—ইহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু যাঁহারা জগৎকে দুঃখময় জ্ঞান করিয়া জগতের সুখকে দুঃখেরই অপর মূর্ত্তি বুঝিয়া সর্ব্বস্বত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাঁহাদের মতে ত্যাগ ভিন্ন মুক্তি নাই, তাঁহাদের পক্ষে রাজকীয় পরাধীনতা বিশেষ ক্ষতিকারক হইতে পারে না। আমাদের দর্শনের উদ্দেশ্য—জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ, কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের উদ্দেশ্য অন্য, অর্থাৎ অভ্যুদয়। এ কথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে ৩৮১ পৃষ্ঠায় সবিস্তরে উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অতএব পরাধীন জাতির চিন্তা বলিয়া আমাদের আধুনিক দর্শন যে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন হইতে নিকৃষ্ট—ইহা বলিবার কোন কারণ দেখা যায় না। আর তাহা হইলে পাশ্চাত্য দর্শনানুরাগিগণ আমাদের দর্শনের নিকৃষ্টতা প্রমাণ করিবার জন্য যে দ্বিতীয় প্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহা সঙ্গত নহে।

এইবার দেখা যাউক, প্রতিপক্ষগণের তৃতীয় যুক্তিটী কি? পাশ্চাত্য দর্শনানুরাগিগণ বলেন যে, আমাদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত, যে সকল দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বহু দৃষ্টান্ত, আজকাল দেখা যাইতেছে, ভ্রান্ত এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নহে। অতএব ভ্রান্তদৃষ্টান্ত-মূলক আমাদের দর্শন কখনই পাশ্চাত্যদর্শনের সমকক্ষ হইতে পারে না, ইত্যাদি।

এতদুত্তরে আমরা বলি, প্রতিপক্ষের এ কথা সঙ্গত হয় নাই। কারণ, দৃষ্টান্তদোষবশতঃ সিদ্ধান্তদোষের সম্ভাবনা থাকিলেও আমাদের দর্শনশাস্ত্রের মূল দৃষ্টান্তগুলি যে দুষ্ট, তাহা বলা যায় না। নৈয়ায়িকগণ ঘটকে কার্য্য বলিয়া

দৃষ্টান্ত স্বরূপে তাহাকে গ্রহণ করিয়া জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের যে অনুমান করিয়া থাকেন, তাহাতে কি কেহ ভ্রম দেখাইতে পারেন? ঘটের কার্য্যত্ব কি আধুনিক বিজ্ঞান অন্যথা করিয়া দিয়াছে! চার্ব্বাকগণ চুণ ও হরিদ্রার সংমিশ্রণে রক্তবর্ণের উৎপত্তিরূপ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া যে আত্মার নাস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে কি কেহ ভ্রম দেখাইতে পারেন? বালুকা হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না, তিলাদি হইতে হয়—এই দৃষ্টান্ত অবলম্বনে সাংখ্য ও বেদান্ত যে কার্য্যমাত্রের কারণাস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহাতে কি কোন ভ্রম আছে? অবশ্য গোময় হইতে কীটোৎপত্তিপ্রভৃতি কতিপয় দৃষ্টান্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভ্রম বটে, কারণ গোময়েও জীবাণু থাকে, তাহারাই কীটোৎপত্তির কারণ হয়, কিন্তু তাহা হইলেও এই জাতীয় ভ্রমনিবারণ কি সহজেই করিতে পারা যায় না। অথবা এ দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ করিতে কি আমাদের শাস্ত্রে নিষেধ আছে! এই জাতীয় দৃষ্টান্তগ্রহণের উদ্দেশ্য জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি। আচ্ছা, এতদুদ্দেশ্যে আজ আমরা বসুবংশাবতংশে জগদীশ বাবুর আবিষ্কারের উল্লেখ করি, তাহা হইলে কি অভীষ্ট সিদ্ধান্তটী রক্ষিত হয় না? আর দুষ্ট দৃষ্টান্ত ত্যাগ করিয়া নির্দোষ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে কি আমাদের দর্শনকারগণ নিষেধ করিয়াছেন? বলি, পাশ্চাত্য দর্শনেও কি এইরূপ দুষ্ট দৃষ্টান্ত নাই? এ সব কথার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে প্রয়াস করা অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ, দার্শনিক সিদ্ধান্ত কেবল, দুই একটী দৃষ্টান্ত লইয়া কেহ কখন স্থাপন করে না; বহু দৃষ্টান্ত লইয়াই তাহা স্থাপিত হয়। সুতরাং, প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের একটি দুষ্ট হইলে সিদ্ধান্তের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই।

পরিশেষে একটী কথা বক্তব্য। আমাদের দার্শনিক সিদ্ধান্তের প্রকৃত প্রবর্ত্তকগণ কেবল দৃষ্টান্তসাহায্যে অনুমানরূপ যুক্তিবলে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন না, অথবা কোন সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিতেন না, কিংবা তাঁহারা জগতের প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃতি অনুশীলন করিতে করিতে যুক্তিবলে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া রূপ পথের পথিক নহেন। তাঁহারা তপঃপ্রভাবে যাহা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই অপরকে বুঝাইবার জন্য তাহাদেরই বুদ্ধির উপযোগী দৃষ্টান্ত-মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদের দর্শনের শাস্ত্রের গতি

নিম্নস্থান হইতে উচ্চে আরোহণ নহে, অথবা তাঁহাদের চিন্তা আঁধার হইতে তাঁহাদিগকে আলোকে লইয়া যায় নাই। তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞোপদিষ্ট তপস্যাপ্রভাবে যাহা সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তাহাই বলিবার জন্য, বুঝাইবার জন্য তৎকালোপযোগী দৃষ্টান্তসহকৃত অনুমানাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা জীবানুকাপাবশতঃ উচ্চস্থান হইতে নিম্ন-ভূমিতে অবতরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি হইতে সেদিনকার পরমহংসদেব পর্য্যন্ত সেই একই পথের পথিক। ইঁহারা সমাধিতে যাহা সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তাহাই উপদেশ মধ্যে এবং শাস্ত্রব্যাখ্যায় যুক্তিসহকারে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ নিজ গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি সমাধিযোগে পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। মধুসূদন, চিৎসুখ প্রভৃতি অপরেও সেইরূপ আভাস দিয়াছেন। কিন্তু এ কথা কি একজনও পাশ্চাত্য দার্শনিকের গ্রন্থে আছে! সুতরাং, প্রাচীনগণ প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের জন্য তাঁহাদিগের প্রচারিত সত্যকে অপূর্ণ বলা সঙ্গত হয় না। যাহা হউক, প্রতিপক্ষের এই তৃতীয় যুক্তিটী অকাট্য বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং এইরূপ যুক্তির অবলম্বনে আমাদের দর্শনকে নিকৃষ্ট বলা আমাদের দর্শনবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানের অভাবেরই পরিচয় হয়। যাহা হউক আগামীবারে অবশিষ্ট কথার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

দেয়ালা।

(১)

দেখি কতদিন ঘুমাইছে শিশু,
আঁখিপাতা দুটি বুজায়ে ছোট ;
সরলতা মাথা দেবোপম মুখ—
যেন একখানি নিখুত ফটো !

(২)

নীরব নিশীথ, মৃদু আলো ঘরে
দেহের উপরে পড়েছে প্রভা ;
নাহি ব্যথা লেশ, বেদনার রেশ—
মুখে আধ-হাসি মধুর কিবা !

(৩)

ফিরে দেখি চেয়ে, শ্বাস পড়ে দ্রুত
হাসিটি লুকায় কমল-মুখে ;
ওষ্ঠ ফুলায় অস্ফুট স্বরে,
চমকিয়া উঠি' অজানা দুঃখে।

(৪)

কোন্ দুঃখ তা'র ক্ষুদ্র হৃদয়ে ?
সেই ছোট দেহ—সোণার কায়া—
সে দুঃখের আমি পাইনা ঠিকানা
আসে কোথা হ'তে তেমন' ছায়া !

শ্রীচণ্ডিচরণ মিত্র।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শিক্ষা সমস্যা ও কৃষিশিক্ষা। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি প্রণীত মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বড়ই সন্তোষলাভ করিয়াছি গ্রন্থখানি আকারে ছোট হইলেও অর্থ গৌরবে ছোট নহে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বালকগণের কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত তাহার একটা সুমীমাংসা এবং সেই শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যেক বালকেরই কৃষি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান একান্ত আবশ্যক, এই দুইটী বিষয় প্রধান ভাবে এই গ্রন্থ মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অশান্তি ও বৈপ্লবিক ভাবের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে ইহার মূল ধর্ম্মশিক্ষায় অভাব এবং যতদিন আমাদের স্কুল ও কালেজে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রবর্ত্তন না হইবে, ততদিন এই অশান্তি ও বিপ্লববাদের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে, আমরা গ্রন্থকারের এই প্রকার মতের সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। কৃষি জ্ঞানের ও উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাতে অনেক ভাবিবার বিষয় আছে। এরূপ গ্রন্থের আদর হওয়া উচিত।

শ্রীভগবৎকথা। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি প্রণীত। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধু, আট দশ বৎসরের বালক বালিকাগণের হৃদয়ে ভগবানের চিন্তা ও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি অনায়াসে যাহাতে উদিত হইতে পারে, গ্রন্থকার তাহারই জন্য এইরূপ গ্রন্থ রচনা কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, ভাষার প্রাঞ্জলতা রক্ষা করিবার জন্য গ্রন্থকারের প্রয়াস প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আট দশ বৎসরের বালক বালিকাদিগের হৃদয়ে ঈশ্বরের স্বরূপোপলব্ধি জাগাইবার পক্ষে গ্রন্থকারের প্রযত্ন যে সম্পূর্ণ ভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা বলা যায় না—একটা নমুনা দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠে দেখিতে পাই।

"আমরা এ সংসারে যে কিছু জ্ঞান ভাব পাচ্চি, সে সকলই সেই জ্ঞান ও ভাবের অনন্ত ভাণ্ডার থেকেই পাচ্চি"। আবার দেখিতেছি—

"আমরা ঈশ্বরের অনন্তত্বের বিষয়ে বড় বড় কথা বল্লুম বটে, কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে কি সেটা ধারণা করতে পারি? ঈশ্বরের অনন্তত্ব আমরা সম্পূর্ণ ধারণা করতে না পারিলেও কবিত্বপূর্ণ ভাষায় এটা বলা যেতে পারে যে আমরা সময়ে সময়ে আমাদের সীমাবদ্ধজ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের অনন্তভাবের কিনারাটুকু ছুঁয়ে আস্‌তে পারি. আমরা সীমাবদ্ধ বলেই তদ্বিপরীতে জানতে পারি যে এক অনন্ত মহান পুরুষ আছেন যাঁকে অবলম্বন করে আমরা আছি, আকাশ আছে, কাল আছে। আবার জ্ঞানে এই রকম জানতে পারলে ও সকল সময়ে আমরা তাঁকে অনুভব করতে পারিনে। যখন সংসারের ছোট খাটো ঘটনা, ছোট খাটো কথা থেকে আমরা আমাদের জ্ঞানকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁর জ্ঞানে যুক্ত করে দিতে উদ্যত হই আমাদের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত করতে চাই, তখনই ক্ষণিক বিদ্যুৎ প্রকাশের মত হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্য তাঁকে অনুভব করতে পারি।" ইত্যাদি। বড় বড় দার্শনিকগণ এই কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হয়, আট দশ বৎসরের বালক বালিকাগণ যে ইহার কি বুঝিবে তাহা আমরা বুঝি না। আমরা সীমাবদ্ধ বলিয়া আমাদের আলম্বন একজন অসীম মহাপুরষ আছেন এবং তিনি দিক্‌ ও কালের আশ্রয় এই সিদ্ধান্ত কি সকল দার্শনিকের সম্মত? নৈয়ায়িক বৈশেষিক ও সাংখ্য শাস্ত্রের আচার্য্যগণ ত এই সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী এইরূপ দুরূহতত্ত্ব আট দশ বৎসরের বালকদিগকে বুঝাইয়া তাহার সাহায্যে তাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি উৎপাদন করিবার চেষ্টা যে ফলবতী হইতে পারে এ বিশ্বাস আমাদের নাই।

ওঁ পিতা নোঽসি। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি প্রণীত। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

পরম কারুণিক জগৎপিতার পিতৃভাবের আবেশময় অনুভূতির প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে তত্ত্বনিধি মহাশয় এই গ্রন্থে যে ভক্তিরসের অবতারণা করিয়াছেন তাহা দ্বারা অনেকের হৃদয় পরিতৃপ্তি লাভ করিবে, গ্রন্থকার সুপণ্ডিত ভক্ত ও ভাবুক, সরল ভাবে প্রাণের ভাবময় উচ্ছাস ব্যক্ত করিবার শক্তি তাঁহার

যথেষ্ট আছে এবং তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, তবে ভাবের উচ্ছাসের মাত্রা বাড়িলে সময়ে সময়ে পুনরুক্তি ও একটু আধটু অসামঞ্জস্য অনেকের পক্ষে অপরিহরণীয় এ ক্ষেত্রেও অনেক স্থলে ঘটিয়াছেও তাই। এইরূপ ত্রুটি সত্ত্বেও এ গ্রন্থখানি পাঠ করিলে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। একনিষ্ঠ ভক্তের অনেকগুলি প্রাণের কথা এই গ্রন্থে বড়ই মধুর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এরূপ গ্রন্থের আলোচনায় সমাজ যে লাভবান হইতে পারে তাহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

প্রাণের কথা। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি প্রণীত। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

এই প্রাণের কথা আমাদের বড়ই মধুর লাগিয়াছে এমন সরল ভাষায় এমন মধুর ভক্তিময় ভাবের উচ্ছাস দেখিয়া কাহার হৃদয় না আনন্দ রসে সিক্ত হয়। গ্রন্থকারের ভগবানের প্রতি বিশ্বাস একান্ত নির্ভর ও অকপট ভক্তি পুস্তকখানির প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে।

অনুভূত যোগ সাধন। স্বামী সত্যানন্দ প্রণীত। বীরভদ্র হৃষীকেশ জেলা ডেরাডুন) হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকের প্রধানতঃ আলোচ্য বিষয় হঠযোগ, হঠযোগ ব্যতিরেকে জ্ঞানযোগের ভূমিতে আরোহণ সম্ভবপর নহে, সুতরাং হঠযোগ কি কর্ম্মযোগী কি জ্ঞানযোগী কাহারও উপেক্ষণীয় নহে। এই যোগের তত্ত্ব সাধারণকে বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার স্বামী সত্যানন্দ যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় হইলেও তাহা যে সাধারণের পক্ষে সফল হইয়াছে—তাহা বলিতে না পারায় আমরা দুঃখিত হইলাম। সাধারণকে বুঝাইবার জন্য যাহার রচনা সে গ্রন্থ বুঝিতে না পারিয়া যদি আবার বিশেষজ্ঞ গুরুর আশ্রয়ই গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে, সেরূপ গ্রন্থ না লিখিলেই বা কি ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল?—গ্রন্থকার নিজেই ভূমিকায় লিখিতেছেন "কয়েক বৎসর হইতে শত শত মহাত্মাকে অযথা সাধন জন্য কেবল মাত্র ব্যথিত হইতে দেখিয়া সাধারণের সমক্ষে এই পুস্তকটী প্রকাশিত করিতে আমি ইচ্ছা করিলাম।" এইক্ষণে দেখা যাক্ সাধারণকে বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকারের প্রয়াস কেমন ফলপ্রদ হইয়াছে—

"অন্তর্মুখে আকর্ষিত প্রাণ আকর্ষণকারী নাড়ী সমূহের তারতম্যানুসারে অনেক প্রকার দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ বামাঙ্গস্থিত নাসিকাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যে সকল প্রাণ অন্তর্মুখে প্রবাহিত হয় তাহারা সকলে স্ত্রীজাতীয় হইয়া স্থানভেদ অনুসারে পঞ্চতত্ত্ব বিশিষ্ট হয়" ইত্যাদি ইহা দ্বারা গ্রন্থকার কি বুঝাইতে চাহেন তাহা সাধারণ পাঠকের মধ্যে যে কেহ বুঝিবেন সে আশা আমাদের নাই এবং শাস্ত্রানুসারে এই সকল কথার কোন বিশদ ব্যাখ্যা যে হইতে পারে, সেরূপ বিশ্বাসও আমরা হৃদয়ে পোষণ করি না—এইরূপ শব্দাড়ম্বরপূর্ণযোগের গ্রন্থ লিখিয়া সাধারণকে উপকৃত করিবার চেষ্টা কোনদিন সফল হয় নাই "কখনও যে সফল হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখি না। যোগশাস্ত্রের গভীর রহস্যজ্ঞ সিদ্ধ যোগী-গণ—এ গ্রন্থকে আদর করিবেন কিনা তাহাও জানিবার কোন উপায় নাই—তবে সাধারণতঃ যে এ গ্রন্থ কোন উপকারপ্রদ হইবে না তাহা স্থির, এরূপ গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত না হওয়াই উচিত।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায়, ৫ম খণ্ড] ১৩২৩ সাল, ফাল্গুন, চৈত্র। [১১।১২শ সংখ্যা।

বর্দ্ধমান-ভারতী।

মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপ বাহাদুরের প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ উপহৃত গ্রন্থগুলি ক্রমে ক্রমে একটী হ্রস্বাবয়ব লাইব্রেরীর আকার ধারণ করিতেছে। অথচ সে আজ বেশীদিনের কথা নয়—যখন ইহাদের প্রথমখানি আমাদিগের অতি সামান্য রকম বঙ্গসাহিত্যগ্রন্থসংগ্রহের দলপুষ্টি করে। এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেরই প্রতিনিধি বর্ত্তমান। ইহার মধ্যে গীতিকবিতা আছে, নাটক আছে, উপদেশাত্মক পত্ররাজিও আছে। কিন্তু সকল রচনার মধ্যে একটী সুরের রেশ স্পষ্ট অনুভব করা যায়—সেটী সাত্বিকতার সুর, সেটী সাধকের প্রাণ। সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ যদি তথ্য বা তত্ত্বসংগ্রহে না থাকে, সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা যদি কেবলমাত্র বাস্তবের অনুকরণে নিঃশেষিত না হয়, এবং একথা যদি সত্য হয়—যে সাহিত্যের সার্থকতা সাহিত্য স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটনে, তাহা হইলে নিঃসংশয়ে বলা যায়, যে বর্দ্ধমান মহারাজের এই সকল সৃষ্টির স্থান সাধারণ সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। কারণ, এই সকল গ্রন্থে যে ব্যক্তিত্ব, যে চরিত্র মুকুরিত হইয়াছে, সচরাচর তাহার প্রতিরূপ পাওয়া যায় না। কবি অথচ সাধক, লক্ষ্মীর বরপুত্র অথচ বাণীর সেবক, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারীর অন্তরে বৈদান্তিকের বিরক্তি—আজকাল এমনটী কোথায় দেখিয়াছেন? এরূপ মণিকাঞ্চন সংযোগ সচরাচর ঘটে না—বাঙ্গালী পাঠক সমাজের এরূপ সংযোগ দেখিবার এবং দেখিয়া ধন্য হইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে।

প্রবন্ধান্তরে আমি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে সমালোচনার দুই প্রকার পদ্ধতি বা রীতি অধুনা স্বীকৃত হইয়া থাকে। তাহার একটীর নাম, বিচার; অপরটীর নাম, বিবৃতি। কাব্যকলার বিচারকার্য্য এত অনিশ্চিতফলোপধায়ক, এবং এত গভীর জ্ঞানসাপেক্ষ, যে সেরূপ বিচার করিবার শক্তি এবং স্পর্দ্ধা আমার নাই। অধিকন্তু, বিচারিত অপেক্ষা উচ্চভূমি অধিকার না করিলে বিচারকের কার্য্য কখনও যথাযথ প্রতিপালিত হইতে পারে না; এস্থলে তাহা কল্পনাতীত। কিন্তু বিবৃতিমূলক সমালোচনা পাঠক মাত্রেরই একরূপ সাধ্যায়ত্ত। বিবৃতির অর্থ ব্যাখ্যা, সৌন্দর্য্যের উন্মোচন বা আবিষ্করণ। ব্যক্তিগত অনুভূতি তাহার ভিত্তি—কাব্যের রস ও মাধুর্য্য উপভোগ তাহার অবলম্বন। সেরূপ সমালোচনাও ও উপস্থিতক্ষেত্রে দুঃসাহসের পরিচায়ক, এবং বহুদিন সংকল্প করিলেও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই। ইতিমধ্যে অধ্যাপক সমাদ্দার "সারকথা" নাম দিয়া মহারাজাধিরাজের গ্রন্থ হইতে কয়েকটী মূল্যবান্ উপদেশ চয়ন করিয়া পাঠক সমাজে উপহার দিয়াছেন। ভারবি বলিয়াছেন—

"বিষমোঽপি বিগাহ্যতে নয়ঃ কৃততীর্থঃ পয়সামিবাশয়ঃ।
সতুতত্র বিশেষদুর্লভঃ সদুপন্যস্যতি কৃত্যবর্ত্ম যঃ"॥

যোগীন্দ্র বাবুর এই সদৃষ্টান্তে ও পথপ্রদর্শকতায় মাদৃশের পক্ষে উক্তরূপ উদ্যম সুকর হইয়াছে।

এদেশে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে বিবাদবিষয়ে চিরদিন এক প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। বীণাপুস্তকমণ্ডিতহস্তা বাগ্দেবী চিরদিন আপন সেবককে কমলদলবাসিনী কমলার অনুগ্রহ হইতে দূরে রাখিতে যেন যত্নপর। পক্ষান্তরে, লক্ষ্মীর বরপুত্র যদি বাগ্দেবীর কৃপাভাজন হয়েন, বাণীর একনিষ্ঠ সেবকেরা তাহাতে যেন চঞ্চল হইয়া উঠেন, তাঁহাদের অনন্যসাধারণ অধিকারের অপহ্নব হইল মনে করেন। মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের গ্রন্থরাজি আজও যে যথাযোগ্যভাবে পর্য্যালোচিত হয় নাই, ইহা তাহার অন্যতম কারণ।

বিখ্যাত ভাবুক কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার সম্প্রতি-প্রকাশিত "রূপান্তরের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিতেছেন, "সকল কল্পনার উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি, সকল কল্পনার ভিত্তি রসসাধন! সুতরাং সকল রসের আকর যে রসময়,

তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে কোন রসসাধনই সার্থক হইতে পারে না।" কাব্যসৃষ্টির জন্য সর্ব্বত্র সকলক্ষেত্রে সকলরসাকরের সাধন অপরিহার্য্য কিনা বলিতে পারি না; আধ্যাত্মিক সাধনা ব্যতিরেকে রসসাহিত্য জন্মিতে পারে কিনা, সে সম্বন্ধেও কোন সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করিতে আমি অপারগ। এরূপ অব্যভিচারী কার্য্য কারণ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করা যে কতদূর সম্ভব তাহাও বুঝিতে পারি না; তবে বৈষ্ণবকবিদিগের মত অনেক উৎকৃষ্ট কবির জীবনে যে বাস্তবপক্ষে এরূপ সম্বন্ধ দেখা যায় তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। মহারাজাধিরাজের কবিতা গ্রন্থের উৎপত্তি যে এই দ্বিবিধ সাধনার মিলনের ফল, তাহা তাঁহার যে কোন গ্রন্থ হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ করা যায়।

কল্পকলার স্বরূপ সম্বন্ধে একজন ইংরাজী সমালোচক বলিয়াছেন, Art is life seen through a temperament, অর্থাৎ বিশিষ্ট প্রকার অন্তঃকরণের সাহায্যে সংসারপর্য্যবেক্ষণের ফল কল্পকলা। সংসারের ঘটনাবলি আমরা সকলেই ত অবলোকন করিতেছি, আমাদের প্রত্যেকেরই মানসফলকে উহারা প্রতিফলিত হইতেছে। অথচ সাধারণজনের এই অভিজ্ঞতার ফল কল্পকলা নামে কেন পরিচিত হয় না? ইহার কারণ, সাধারণ লোকের বৈশিষ্ট্যের অভাব। এই বৈশিষ্ট্য যত চিত্তাকর্ষক হয়, চরিত্র যত মহনীয় হয়, অন্তঃকরণ যত অমল ও সৌন্দর্য্যগ্রহণপর হয়, কল্পকলাও তত রসজ্ঞের হৃদয় সবলে হরণ করে। রঙ্গীন কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে জগৎ কাচের রঙ্গ দেখায়। পাত্রের আকার ও বর্ণের গুণে জলের যেমন বর্ণ ও আকারের পরিবর্ত্তন হয়, ইহাও সেইরূপ। এই জন্যই বলিয়াছি, সাহিত্যের প্রধান শোভা—সাহিত্য স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের বিকাশ। ভাষা মানুষের ভাবপ্রকাশের জন্যই প্রবর্ত্তিত হইলেও ভাবগোপনের জন্য তাহার ব্যবহার বিরল নহে। কিন্তু মহারাজাধিরাজের কবিতায় ও নাটকে আত্মগোপন নাই, আত্মপ্রকাশ আছে, আত্মসঙ্কোচ নাই, আমিত্বের প্রসার আছে। আবার এরূপ সরলভাবে, নিঃশঙ্কচিত্তে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া, রচনার মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দেওয়া তাঁহাতেই সম্ভব, যাঁহার অন্তঃকরণে গোপনীয় কিছু নাই, যাঁহার মানসিকক্রিয়া স্বভাবতঃই পবিত্র ও সৎপথচারিণী। পর্ব্বতের শিরোভাগ হইতে নিবিষ্ট চিত্তে উদয়াস্ত কেহ কখন নীল গগনের পরিবর্ত্তনবিলাস লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা জানি

না। বিভিন্ন বর্ণের সে নিত্য লীলা, মেঘ ও রৌদ্রের সে অপূর্ব্ব মিলন বিরোধ, ক্ষণে ক্ষণে আলোক ও ঔজ্জ্বল্যের সে হ্রাসবৃদ্ধি, নিপুণতম চিত্রকরও প্রকাশ করিতে অক্ষম। এই অনন্ত সৌন্দর্য্যময় নীলনভোমণ্ডলের অনুরূপ আর একটী আকাশ প্রত্যেক মানবের সত্তায় বর্ত্তমান। এই চিদাকাশের বা চিত্তাকাশের অনন্ত ও চিরপরিবর্ত্তনশীল শোভাপরম্পরা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর অনুভব করিয়া থাকেন। তবে সে অনুভূতির সমষ্টি লিপিবদ্ধ হইয়া তখনই আনন্দ দেয়, যখন এই চিত্তাকাশ নীলগগনের মতই মহান্ হয় উন্নত হয়, নির্ম্মল ও লীলাময় হয়। এই সকল কারণে, অলোচ্য গ্রন্থাবলীতে প্রথমতঃ এই অপূর্ব্ব চরিত্রের বিষয় প্রনিধান করিতে হইবে। মহারাজাধিরাজের সমগ্র কবিতার মধ্যে আত্মসাক্ষাৎকারের একটী প্রবল আকাঙ্খা, "তত্ত্বমসি" উপদেশ আয়ত্ত করিবার বাসনা, এবং কার্য্য-ক্ষেত্রে, বাক্যে ও আচারে, তদ্ভাবভাবিত হইবার চেষ্টা পরিস্ফুট রহিয়াছে।

তুমিত্ব জল্পনা, আমিত্ব কল্পনা, এ দুটী লয়ে বিবাদ গো—
আমি নিজেকেই নিজে খুঁজিয়াপাইনা, সে খোজ পাইলে পরে কিছুই চাইনা।
আমিত্ব ঘুচাও, তুমিত্ব বুঝাও, তুমি আমিতো সে ব্রহ্মই গো। গায়ত্রী ৩।
আমি ত জীবনমুক্ত, সত্যে আছি সদা মিশে। গায়ত্রী ৬।

আত্মযোগে মাত মন, আত্ম সুধা পান করি
আত্মাতে হও মগন, আত্মামাত্র সার করি।

অদ্বৈততত্ত্বের সারসত্যগুলি জীবনে প্রয়োগ করিবার, হৃদয়ে অনুভব করিবার, এরূপ আগ্রহ গৃহীর জীবনে অতি বিরল। বিলাসোপকরণবেষ্টিত কুবেরসমের পক্ষে এরূপ প্রবৃত্তি ততোধিক বিরল। এ সকল শুধু মুখের কথা নহে। এরূপ সঙ্কল্পের পশ্চাতে যে নিয়ত দৃঢ় সাধনা রহিয়াছে, যাঁহারা মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে সামান্য খবরও রাখেন তাঁহারাই বেশ জানেন। "একাদশীর" একস্থলে তিনি বলিতেছেন—

"সাধনার কঠোরতা অজ্ঞানীর বাচালতা
তাতে কি যে মধুরতা যে জানে সে জানে"

আধ্যাত্মিক বিষয়ে মাদৃশের কিছু বলিতে যাওয়া দুঃসাহস, এবং ভয় হয়, অমার্জ্জনীয় চপলতা বলিয়া পরিগণিত হইবে। তথাপি দূর হইতে বাহ্যে যে সমস্ত

আয়োজন উপকরণ লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে সত্যই মনে হইয়াছে—যে "আত্মবেদন ও আত্ম চেতনেই তাঁহার মন যথার্থ ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং মহারাজাধিরাজ যথার্থ—

"গৃহেতে প্রবাসী অন্তরে প্রয়াসী জ্ঞান বারাণসী তরে।"

বর্দ্ধমান গোলাপ বাগের নিকটস্থ, তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রম ইহার একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাহার "আবেগ" কবিতাগুচ্ছের প্রথম চিত্রের উপরিভাগে ইহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তর এক অদ্ভুত ভাব অন্তরে আনিয়া দেয়। চতুর্দ্দিকে প্রাচীর গাত্রে 'মোহমুদ্গর' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত উৎকৃষ্ট শ্লোকরাজি বৃহৎ অক্ষরে খোদিত আছে। জীবন যে বিনশ্বর, সুখ যে ক্ষণস্থায়ী, জগৎ যে মায়াময়, ব্রহ্মই যে এক মাত্র সত্য, যে দিকে চক্ষু ফিরান যায় সেদিক হইতেই এইরূপ উপদেশ হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকে। মধ্যস্থলে একটী সুন্দর পুষ্করিণী। তীরে গৈরিক নির্ম্মিত সুগঠিত মন্দির। অভ্যন্তরে নানা আকারের কোথাও বুদ্ধ মূর্ত্তি, কোথাও শঙ্কর মূর্ত্তি, কোথাও বা দক্ষিণামূর্ত্তি, কোথাও বা মহাদেব লিঙ্গ শ্বেত প্রস্তরে খোদিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। অপর পার্শ্বে বিশাল বটবৃক্ষতলে উচ্চ বেদী। শুনিয়াছি মহারাজাধিরাজ এই বেদীর উপর আসীন হইয়া বিবিক্তে আত্মস্থ হইয়া থাকেন।

তরুতলে বসে ডাকি, বল ঈশ কত বাকি,
অন্তিমে দিওনা ফাঁকি, আমি তো গো আগুয়ান।
নিশি শেষে হেথা বসে ভাবি বাকি কতদিন
জীবনের সন্ধ্যা এলে, বাসনা নিতে কৌপীন।

উদ্ধৃত দুই কবিতায়, ভক্তের ভগবৎসমাগমের জন্য ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা অতি প্রাণস্পর্শিভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এরূপ কাতরতা যাঁহার হৃদয়ে সদা জাগরূক—তিনিই ধন্য, তিনিই কৃতী।

এই সমগ্র জগতের অধিকারী রাজরাজেশ্বরের রাজ্যে নিজেকে manager বা নায়েব মনে করা—প্রত্যেক গৃহীর আদর্শ হওয়া উচিত। ধনজনবিত্তে মমত্ববোধ উৎকট হইলেই মানুষ সৎ-পথভ্রষ্ট হইবে। সে অনিষ্ট পরিহার

করিতে হইলে, সকল চেষ্টার মূলে বিশ্বনিয়ন্তার সত্তা অনুভব করা উচিত; এ সংসার যে তাঁহারই—তিনিই যে ইহার স্বামী—আমরা যে তাঁহার সেবক, এ ধারণা অন্তরে বদ্ধমূল করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই আদর্শানুপ্রাণিত হইয়া মহারাজাধিরাজ বহুস্থলে আত্মকথা নিবেদন করিয়াছেন।

শৈশবে বরিয়াছিলে এই রাজ্য মোরে তুমি
প্রৌঢ়ত্বে এসেছি এবে তোমারি মায়ায় আমি।
বুঝেছি এ সিংহাসনে বসিলে নিষ্কাম মনে
হয় দেখা তব সনে, হ'তে পারি জিতকামী।

আর একস্থলে তিনি বলিতেছেন—

তোমারি মহিমা লইয়া ছড়াই
তোমারি গরিমা আমার বড়াই
তোমারি আলোকে নিয়ত বেড়াই
তোমাতেই যাই মিশে।

এসকল কথা—ভারতের প্রাণের কথা, শেখাবুলি নহে। যাঁহারা সকল বিষয়ে নূতনের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান, তাঁহারা মহারাজাধিরাজের এ সকল উক্তিতে হয়ত পূর্ণকাম হইবেন না। কিন্তু হিন্দুর মনোভাব এ সকল বিষয়ে অতীতানুগ। হিন্দু সভ্যতা-সূর্য্য পূর্ব্বদিঙ্মুখ আলোকিত করিয়া প্রথম যেদিন উদিত হয়—সেদিন হইতে অথবা সেইক্ষণ হইতেই—হিন্দু, জীবনের সার সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে,—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ধ্যানকেই লক্ষ্য বলিয়া চিনিয়া লইয়াছে। তাই আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে নূতনের অবকাশ কোথায় তাহা জানিনা,—কেবল ইহাই বুঝি নূতনত্ব ঘটে,—ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রয়াসে—নিজ নিজ সাধনায়। যাহা পরম ঈপ্সিত—পরম শ্রেয় ও সকল চেষ্টার শেষ লক্ষ্য—তাহাকে পুনরায় আবিষ্কার করিতে যাওয়া নিরর্থক। ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার প্রতি এই জাতীয় প্রগাঢ় শ্রদ্ধা চিরদিনই মহারাজাধিরাজের অন্তরে বর্ত্তমান আছে। এই শ্রদ্ধাভক্তির সূত্রে তাঁহার জীবনের পূর্ব্বাপর ঘটনাশ্রেণী গ্রথিত হইয়া একটী সুবিন্যস্ত মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। এবং এই সূত্রেই তাঁহার সকল সাহিত্য রচনা অনুস্যূত।

সাহিত্যের যে সকল শ্রেণীবিভাগ সচরাচর আমরা মানিয়া লই—তাহা হইতেও বিভিন্নরূপ একটী শ্রেণীবিভাগের কথা মহারাজাধিরাজের গ্রন্থাবলী পাঠে, স্বতঃই আমাদিগের মনে উদিত হয়। গদ্য, পদ্য, কাব্য, উপন্যাস, নাটক, epic, lyric এ সকল শ্রেণী আমাদিগের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস জয়দেব হইতে কমলাকান্ত রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্য যখন সমষ্টিগত ভাবে আমরা আলোচনা করি, তখন দেখি যে এই মামুলী শ্রেণীবিভাগে আর কুলায় না। ইহাদিগের অন্তর্নিহিত বিশেষত্বটুকু ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, ইহাদিগকে একটী স্বতন্ত্র আখ্যা দিতে হয়। কাব্যামোদিগণ এই সকল কাব্যগ্রন্থ হইতে যে আনন্দ উপভোগ করেন সে আনন্দদান নির্ব্বিশেষে সকল সাহিত্যের লক্ষ্য নহে। তাহার কারণ, ইহারা কেবল মাত্র রস-সাহিত্যের দৃষ্টান্ত নহে, ইহারা সাধনমার্গেরও সহায় এবং সঙ্গী। এজন্য আমার মনে হয়—ইহাদিগকে এক স্বতন্ত্র পর্য্যায়ভুক্ত করা উচিত, সে পর্য্যায়ের নাম—সাধনাসাহিত্য। এরূপ সাহিত্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে শুধু লৌকিক-রস-পিপাসু হইলে চলিবে না। আধ্যাত্মিক বাসনায় অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। আধ্যাত্মিক প্রযত্নে উদ্যুক্ত হইতে হইবে। সার্ব্বভৌমিক সাহিত্যের সমাবেশে বিশ্বভারতীর হস্তে যে অপূর্ব্ব সপ্তস্বরা শোভা পায়, তাহার মধ্যে বঙ্গবাসী এই বিশিষ্ট তারটী উপহার দিয়াছেন। পাঁচশত বৎসর ধরিয়া সেই তারে বঙ্গকবিবৃন্দ বিচিত্র রাগ রাগিণী সুরও ঝঙ্কার আহত করিয়াছেন, সে সঙ্গীত ধারা যেন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। মহারাজাধিরাজ সেই শুষ্কপ্রায় ফল্গুস্রোতকে পুনরায় লোকলোচনগোচর করিতেছেন।

শুধু তাহাই নহে। মহারাজাধিরাজ লুপ্তপ্রায় এই কাব্য ধারাতে শুধু যে রস সঞ্চার করিয়াছেন তাহা নহে, অধিকন্তু ইহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত চিন্তার স্রোতও মিলিত করিয়াছেন। ফলে ইহাতে সাম্প্রদায়িকতাও যেমন আছে, তেমনি তাঁহার বৈশিষ্ট্যও প্রতীয়মান হয়। অভীষ্টদেবের উপর মাতৃত্বের আরোপ করিয়া, কিম্বা তাঁহাকে প্রেমের মূর্ত্তি বলিয়া, যে সকল সাধককবি সঙ্গীতে কীর্ত্তনে ও ভজনে বাঙ্গলার নরনারীকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন, বৰ্দ্ধমানাধিপ তাঁহাদিগের হইতে এক বিষয়ে পার্থক্যের দাবী করিতে পারেন। ভারতীয় চিন্তার যাহা পরম ফল, এদেশের দার্শনিক গবেষণার যাহা চরম উৎকর্ষ, মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ

শঙ্করাচার্য্যবিবৃত সেই অদ্বৈততত্ত্বকেই তাঁহার কাব্য নাটক ও সাধনার উপজীব্য রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বহুর পরিবর্ত্তে একের স্বীকার ও ধ্যানই উন্নত মননক্রিয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা জ্ঞান রাজ্যের সকল বিভাগেই পরিদৃষ্ট হয়। আকৈশোর মহারাজাধিরাজ এই অদ্বৈতের উপাসক। প্রায় ষোড়শবর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত 'আত্মবোধ' শীর্ষক কবিতায় তিনি বলিতেছেন—

জলের গোলক সলিলে যেমন, মিশে একবার দিয়ে দরশন,
জেনেছি তেমন জীবের জীবন নিমেষের তরে চলিছে।

শ্রীমদাচার্য্যশঙ্করকে উদ্দেশ করিয়া বিজয় গীতিকায় একস্থলে তিনি প্রার্থনা করিতেছেন—

যে বোধ কিরণে, দীপিলে ভুবনে, তার কণাদানে, এ আঁধার মনে
উজল স্বগুণে, যাচিছে চরণে, শঙ্করকিঙ্কর বিজয় কাতরে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" একথা যে সত্য তাহার প্রমাণ মহারাজাধিরাজের জীবনেই। শঙ্কর প্রবর্ত্তিত অদ্বৈততত্ত্বের মহিমা তাঁহার কার্য্যকলাপ, বাক্য ও মনে ক্রমশঃই ব্যাপ্ত হইতেছে,—ইহা প্রত্যক্ষ অনুভবযোগ্য।

রসসাহিত্য হিসাবে মহারাজাধিরাজের অন্যান্য রচনা হইতে তাঁহার নাটকগুলি সহৃদয়গণের অধিক মনোমত হইবে, ইহা নিশ্চিত। "চন্দ্রজিৎ" ও "কমলাকান্ত" দৃশ্যকাব্য পর্য্যায়ে একরূপ অপূর্ব্ব। ভারতীয় সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা স্বভাবতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, সাধারণ নাটকাদিতে তাহার অবিকৃত নমুনা পাওয়া অসম্ভব, কারণ অনুমানই উহার ভিত্তি। নাটকীয় ব্যক্তির কথাবার্ত্তার এই ত্রুটী মহারাজাধিরাজের রচনাদ্বয়ে নাই। তাহাতে যেসকল উক্তি প্রত্যুক্তি নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সজীব, সরল ও স্বাভাবিক। কোথাও বাহুল্য নাই, গল্পাংশের অপরিপোষক অবান্তর কল্পনা নাই। লেখনীর এই সংযম ও শিল্প সচরাচর নাটককারগণে দেখিতে পাই না। এই সংযমের ফলে ক্ষুদ্রাকার হইলে ও নাটকগুলি মনের উপর অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করে। এবং সে প্রভাবের ফলে চিত্ত প্রসন্ন হয়, পবিত্র হয়, উন্নত হয়। আর মনে হয়, এদেশের প্রত্যেক রাজা ও জমিদারের গৃহে এইরূপ আদর্শ যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে বাঙ্গলার সামাজিক জীবনে যে হৃদয়হীনতা ও অকরুণা আসিয়া

পড়িতেছে, তাহা অন্তর্হিত হইবে। কারণ, এ আদর্শের মধ্যে কাঞ্চন কৌলীন্যের ছায়া নাই; কুৎসিত ভোগবাসনার পাপলীলা নাই, বৃথা গর্ব্বের আভাস নাই। যাহা আছে, তাহা মনোহর, তাহা মহনীয়, তাহা এদেশের প্রকৃতির অনুগত, তাহা 'সরল জীবন যাপনের সহিত উচ্চতম মননক্রিয়া'র জলন্ত দৃষ্টান্ত। নাটকদ্বয়ের গল্পাংশ বিস্তৃত নহে, কিন্তু উহাদের উপদেশ বড় সুন্দর। "কমলাকান্তের" উৎসর্গ পত্রে সে উপদেশ এইরূপে সূচিত হইয়াছে—"যঃ পিতা সপুনঃ পুত্রঃ যঃ পুত্রঃ সপুনঃ পিতা"।

এ তত্ত্ব আজ কাল প্রতীচী নূতন ও গভীর ভাবে আলোচনা করিতেছে, যথা— Heredity বা বংশক্রম সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নানা গ্রন্থ। নরওয়ের বিখ্যাত নাট্যকার Ibsen তাঁহার Ghosts নামক নাটকে পূর্ব্বপুরুষের দোষগুণ সদসদাচার ও তাহার ফলাফল কিরূপ অনুল্লঙ্ঘ্য নিয়মে সন্তানে সংক্রামিত হয়, তাহার এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, যে তাহাতে হৃদয় বিস্ময় ও আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়ে। মহারাজাধিরাজ এই সকল আশ্চর্য্য তত্ত্ব নিজ বংশের অতীত মহাপুরুষকাহিনী অবলম্বনে অপূর্ব্বভাবে নাটকাকারে প্রদর্শন করিয়াছেন। "কমলাকান্তের" পরিচয় মহারাজ উৎসর্গপত্রেই দিয়াছেন—"যে মহাযোগী তিতিক্ষার জলন্ত অবতাররূপে বৰ্দ্ধমান রাজসিংহাসনে তেজশ্চন্দ্র নরপতি নামে বিরাজমান থাকিয়া, পুনঃ আবির্ভাবচন্দ্ররূপে বিদ্যুল্লেখার ন্যায় নানা কৌতুক কলা দেখাইয়া নিজ ধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সুমহৎ স্মৃতিসাধনার্থেই আমার কমলাকান্ত"। এই "ইতিহাসমূলক নাটকে" শুধু যে বৰ্দ্ধমান রাজবংশের এক গৌরবময় ইতিবৃত্ত খ্যাপিত হইয়াছে, তাহা নহে—ইহাতে প্রকৃত ভক্ত ও সাধকের প্রতি মহারাজাধিরাজের হৃদয়ে যে অপরিমেয় শ্রদ্ধা আছে—তাহাও পরিস্ফুট হইয়াছে। এ দেশের সাধকজীবনেতিহাসে কমলাকান্তের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের তিনি সমসাময়িক ছিলেন। আরাধ্যা দেবীর প্রসাদে তিনি অনেক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত করেন। একবার বিজনপ্রান্তরে দস্যুদলকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিজ ভক্তিসঙ্গীতের প্রভাবে আততায়ীদিগকে মোহিত করেন। রাজকুমার প্রতাপচন্দ্রের সহিত ইঁহার নিবিড় সৌহার্দ্দ ও সোদরপ্রেম সংঘটিত হয়, এবং ইনি একরূপ যুবকের রক্ষিতারূপ নিযুক্ত

হইলেন্। বিপত্নীক হইবার পর এই মহাপুরুষ যখন অনন্যমনে শ্যামাচরণ ধ্যাননিরত ছিলেন, তখন মহারাজ তেজশ্চন্দ্র নিজ পুত্রের যৌবন সুলভ নানারূপ দুষ্ট আচার দেখিয়া তাঁহাকে রাজবাটীতে আহ্বান করেন, এবং তাঁহার পুত্রের অবনতি যে তান্ত্রিক সাধকের সংসর্গে ঘটিতেছে এরূপ মত প্রকাশ করেন। ইহাতে কমলাকান্ত যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হন—এবং দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা সহকারে মহারাজকে সাধকের সাধনার এরূপ অবমাননা করিতে নিষেধ করেন। কমলাকান্তের অধীরতায় মহারাজাধিরাজ মৃদুহাস্যসহকারে কেবল বিস্ময় প্রকাশ করিলেন—তাঁহার মত সাধকের অল্পে এতদূর বিচলিত হওয়া অনুচিত। রাজা ও সাধকের জীবনের তুলনা করতঃ তিনি বলিলেন—"কমলাকান্ত, তোমরা সাধক, কিন্তু আমাদের অপেক্ষা অনেক নীচু সিংহাসনাধিকারী। তোমরা নিজে মুক্ত হয়ে যেতে পারলেই বাঁচ, তোমাদের ক্ষুদ্র প্রাণ আপনার গতির জন্যই ব্যস্ত, আর আমরা যোগভ্রষ্ট যোগী হয়ে, নিজের লক্ষ্যপথ পলকে পলকে দেখ্‌তে পেয়েও, এই ধর্ম্মের সংসার রক্ষার জন্য, এই একটী রাজ্যের নাম দিয়া সেই বিশ্বেশ্বরেরই লক্ষজীবের দুঃখতাপ বিমোচন জন্য, তাঁর মহাভাণ্ডার হ'তে মুক্ত হস্তে দিতে এসেছি। তাঁর উদ্দেশ্য সাধন জন্য নিজ মুক্তি করতলগত হলেও পিঞ্জরাবদ্ধ থাকি।" পরে প্রথমতঃ বংশের অমঙ্গলসূচক একটী স্বপ্নের কথা বিবৃত করেন। পুত্রের বিপথগামিতার ফলে বংশের ধারা রক্ষায় যে বিপদের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার নিবারণের জন্য তাঁহার পিতৃদেব পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করিতে সংকল্প করিয়াছেন—স্বপ্নের মর্ম্ম এইরূপ। কিন্তু প্রতাপচন্দ্রের উদ্ধারের আশা অলীক। তাঁহার বাহ্য সুরাসেবনের তলে ঘোর তান্ত্রিকতা বিদ্যমান। তাই পিতার নির্ব্বন্ধে সংসারে আবদ্ধ হইবার প্রযত্ন মাত্রেই তাঁহার আত্মা "ছুতবহ-পরীত" গৃহের মত দেহত্যাগে উদ্যুক্ত হইল। ভ্রাতৃসম প্রেমাস্পদ কমলাকান্তের ভালবাসাও তাঁহাকে বিরত করিতে পারিল না। এমত সময়ে চিরবৈরী পরাণচন্দ্রের ঘরে বর্দ্ধমানের ভাবী অধীশ্বরের জন্মবার্ত্তা শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন, এবং আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, যে "কোন বারেই রাজঅন্তঃপুরে রাজ-কুমার হয়ে জন্মান; মদনরায়ের ললাটে লেখা নাই।" অমাবস্যার তৃতীয় যামই যে তাঁহার তনুত্যাগের কাল তাহাও ব্যক্ত করিলেন। "বৈষ্ণব যোগী তেজচন্দ্

ও সাধকবর প্রতাপচন্দের তেজেই বর্দ্ধমান রাজ আজও জাজ্জ্বল্যমান।" তথাপি প্রতাপচন্দের এ শোচনীয় পরিণাম কি কারণে ঘটিল তাহা বুঝিতে গিয়া তেজশ্চন্দ্র প্রশ্ন করিতেছেন, "সে কি পরম শাক্ত বলে, এ বৈষ্ণব মধ্যে স্থান পেলে না?" কমলাকান্ত ও প্রতাপচন্দের মধ্যে যে প্রণয় তাহা অপার্থিব—অন্তিমকালে তাই দেবীর মন্দিরে কমলাকান্তের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া প্রতাপচন্দ দেহত্যাগ করিলেন। কিন্তু সে সময়েও পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইল না। অচিরে কমলাকান্তও মহারাজাধিরাজ কুমারের অনুসরণ করিয়া ঈপ্সিত লোকে উপস্থিত হইলেন, এবং শেষ জীবনে তেজশ্চন্দ্রের মুখে কেবল এই আক্ষেপের বাণী শ্রুত হইল, "ভট্টচায্‌ তুমিও ত চল্‌লে। কেবল এই কুড়োটা পড়ে রইল।"

উল্লিখিত আখ্যানবস্তু হইতেই প্রতীত হইবে; যে "কমলাকান্ত" একখানি গভীর ও রহস্যময় ট্রাজেডী—অতীন্দ্রিয় জগতের সূক্ষ্ম নিয়ম ও কার্য্য পরম্পরা লইয়া ইহা রচিত। ইহার মধ্যে যে Mysticism আছে, তাহা পাঠকমাত্রকেই স্পর্শ করে ও অভিভূত করে। অথচ ইহা আদবেই বৈদেশিক Mysticism নহে। কর্ম্মফল ও জন্মান্তরের তত্ত্বসকল এদেশে চিরদিন প্রচলিত আছে। কিন্তু, মহারাজাধিরাজ যেভাবে সে সকল তত্ত্বকে নাটকীয় চরিত্রগুলির জীবনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারি অধ্যাত্মজগতের এই সকল আকর্ষণ বিকর্ষণ কিরূপ অপ্রতিহতবল—কিরূপ অনুল্লঙ্ঘনীয়। এবং সাথে সাথে হৃদয়ও কণ্টকিত হইয়া উঠে।

"চন্দ্রজিৎ" এক হিসাবে "কমলাকান্তে"র সোদর। উভয়ের গল্পাংশে অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু "চন্দ্রজিতে" মহারাজাধিরাজের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। "চন্দ্রজিৎ" —"প্রাচীন ভারতের প্রাচীন রাজর্ষিবর্গের মহনীয় স্মৃতির উদ্দেশে উৎসৃষ্ট।" চন্দ্রজিৎ চরিত্রে মহারাজাধিরাজ একটী আদর্শ রাজর্ষি চিত্রিত করিয়াছেন। ইহার গল্পাংশ কাল্পনিক হইলেও, পুষ্পনগরের অধিপতি ও তাঁহার পরিচয় পরিবারের সহিত বর্দ্ধমানরাজের যে সহানুভূতি ও সাদৃশ্যের যোগসূত্র আছে, তাহা বেশ অনুভব করা যায়। চন্দ্রজিতের আদর্শ ও ধ্যান,—"কর্ম্মব্রহ্ম, করমই করম ফলকারী"। এ কারণে "অব্যয়ে অব্যয়িত, অনন্তে মিশ্রিত" হইবার সাধনা রত হইলেও, "রাজ্যের সংরক্ষণের জন্য রাজর্ষি চন্দ্রজিৎ এখনও শ্যেনপক্ষিলোচন-সদৃশ।" রাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ বিলাসব্যসনে আসক্ত হওয়ায়, মহারাজের মনে শান্তি

নাই। কেমন করিয়া দুষ্টা বারবনিতার হস্ত হইতে তাহার উদ্ধার সাধন করিবেন, সেই চিন্তায় তিনি আকুল। মহারাজ ভক্ত—ভগবানের মাতৃরূপে ধ্যানে তিনি গদ্‌গদ—তথাপি তিনি সদয়হৃদয়, তাই তাঁহার প্রথম কীর্ত্তি—মায়ের মন্দিরে পশুবলি নিবারণ। যে দৃশ্যে মহারাজ স্বয়ং দেবীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া, পশুহত্যা নিষেধ করেন—সে দৃশ্য যথার্থই হৃদয়কে আলোড়িত ও চমৎকৃত করে। পশুবলির সমর্থকগণের বিপক্ষে চন্দ্রজিতের কথাগুলি ওজস্বিতায় ও গাম্ভীর্য্যে নিরুপম। "যারা প্রকৃতির তামসিক চিত্রাঙ্কনেই সতত যত্নবান্, যারা শ্রীভগবানের হৃদিরচ্ছায়াকে 'অভয়া' 'অভয়া' বলে ডেকেও, তাঁর চিন্মন্দিরে রক্তের স্রোত প্রবাহনে তৎপর; যারা পরমেশ্বরের জগজ্জননীত্ব জগজ্জীবহন্ত্রীত্বে আনয়ন করতঃ সাধনায় অগ্রসর; যা'রা নিজ হৃদিস্থিত কলুষতা, শাস্ত্র ও নীতি বিগর্হিত নহে, ইহা প্রচার করে; যা'রা নিজের তামসিকতা পরব্রহ্মের মহামায়াতে আরোপ করিতে সক্ষম, তাদের বিচার এ ক্ষুদ্র মন্দিরে হবার নহে। গৌতমের বুদ্ধবাণী, শঙ্করের কাপালিকদমনও ভারতের শক্তিপূজার গতি ফিরাইতে পারে নাই যে কারণে, জ্ঞানপ্রসবিণী ভারতমাতা অজ্ঞানমাতা হইয়া ক্রমে ভুবনের পুণ্যধাম হইতে দিন দিন পাপের অতলজলে নিমগ্না হ'তে চলেছেন, সে কারণ, চন্দ্রজিৎ জানিলেও নীরব। কারণ এখন সবই নীরব, প্রেমিকের কানুর মধুর মুরলী নীরব, ঋষি-গীত-মুখরিত গহনকানন, গিরিশৃঙ্গ, গিরিগহ্বর নীরব, বেদগান নীরব, প্রণয়ধ্বনি নীরব।" এইরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান অন্তরায় তামসিকতার উচ্ছেদ করতঃ চন্দ্রজিৎ, পুত্রের চৈতন্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলেন, এবং নিজ চেষ্টার বলে পুত্রকে বারবনিতার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া গৃহধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এখন "পুত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত রাজ্যভারং।" গৃহত্যাগ করতঃ একনিষ্ঠ সাধনায় উদ্যুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ "তাঁরই" জ্যোতিতে পাগলিনী প্রকৃতিরাণী হৃদয়তন্ত্রীতে আর নিজে নাচিল না। এখন তাঁর গান গেয়েই নাচিতে ও নাচাইতে লাগিল।" "ব্রহ্মভেরী বাজিয়া উঠিল," চন্দ্রজিতের অবসানের দিন সন্নিকট হইল। চন্দ্রজিৎ ব্রহ্মতানে ব্রহ্মলয়ে লীন হইবার জন্য ভগবানের নাম গিরি গুহা নদী নির্ঝরিণীতে প্রতিধ্বনিত কারবার সংকল্পে, নিজের শিষ্য ও সহচর বিশ্বগিরি ও গুরুপাদ সমভিব্যাহারে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং পরিশেষে তাহাদিগকেও পশ্চাতে রাখিয়া যুধিষ্ঠিরের মত গিরিপথে মহাপ্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রজিৎ প্রব্রজিত হইবার পূর্ব্বে, পুত্র ইন্দ্রজিৎকে যে কয়টী উপদেশ দেন, সে গুলি দেশের প্রত্যেক রাজা ও ভূস্বামীর, এমন কি প্রত্যেক গৃহীর পর্য্যন্ত হৃদয়পটে মুদ্রিত হওয়া উচিত। "এ রাজ সিংহাসনে বিনা তপস্যায় বিনা যোগবলে, যে বস্‌বে সেই খস্‌বে। বৎস্ মনে রেখো ইহা ধর্ম্মের সংসার; মনে রেখো, পুষ্পনগররাজ্যাধীশ হওয়া কর্ম্মক্ষয় জন্য, কর্ম্মজয় জন্য, কর্ম্মবৃদ্ধি জন্য নহে; মনে রেখো প্রজাবৃন্দ তোমার প্রকৃত সন্তানস্বরূপ। তুমি এ রাজ্যের অধিপতি হইলেও, তুমি তাঁর এ মহাভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষমাত্র।"

প্রতীচ্যসভ্যতার ফলে দেশে দেশে আজ শ্রমজীবিগণের ও কৃষকগণের আর্ত্তনাদ গগণ বিদীর্ণ করিতেছে। কারণ, যাহারা ধনবান্ বা ভূম্যধিকারী তাহারা দরিদ্র শ্রেণীদিগকে আপন বিলাসদ্রব্যসংগ্রহের ও অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্রমাত্র বলিয়া মনে করেন। এ মনোভাব ভারতের শাস্ত্র ও জাতীয় হৃদয়ের অনুগত নহে। "রাজা"র অর্থ এদেশে 'প্রকৃতি রঞ্জক,' ভূমিপালের আদর্শ, "সপিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ"। জগন্ময় লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা হইতেছে। ইউরোপে অষ্টদিকপালের অংশাবতার রাজার মর্য্যাদা ও লঙ্ঘিত হইতেছে। এ অবস্থায় প্রাচীন ভারতের এই আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করাই শান্তি ও সমৃদ্ধির একমাত্র সাধন বলিয়া মনে হয়। এই সকল কারণে মহারাজাধিরাজ ভূস্বামীমাত্রকেই "বিশ্বেশ্বরের ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ" বলিয়া ঘোষণা করিয়া, যে শিক্ষা প্রচার করিতেছেন, তাহা দেশের রাজা ও জমিদার দিগের সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা উচিত। ভূস্বামিগণ শুধু যে প্রকৃতি পালক, তাহা বলিয়াই মহারাজ ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু এরূপ প্রত্যেক সমাজপতির বংশের কার্য্যকলাপের ভিতর ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছার প্রেরণা আছে, ইহা ও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের যুগ। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেরই যে প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা আছে, ইহাই এযুগের বাণী। ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর পুরুষগণ নিজ নিজ উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর এবং কৃতকার্য্যও হইতেছেন। এ অবস্থায় যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদের নিজ পদবীর গৌরব রক্ষা করিতে হইলে এই ভগবৎ প্রেরণার কথা অনুক্ষণ স্মরণ করা ও তদনুসারে নিজ নিজ কার্য্যাবলী নিয়মিত করা কর্ত্তব্য।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই মহারাজাধিরাজের গ্রন্থান্তর্নিহিত সাধকভাবের

উল্লেখ করিয়াছি। সেই সাধকভাবের কথা লইয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব; কারণ, সকল লেখার মধ্যে ধ্রুবনক্ষত্রের মত এই ভাবটী উজ্জ্বলভাবে বর্ত্তমান আছে। মহারাজাধিরাজের আধ্যাত্মিকতার বিশেষত্ব ইহাই, যে তাহাতে বাহ্যাড়ম্বর নাই, "দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" নীরবে ভিন্ন এ সাধনা হইতে পারে না। আজ বাঙ্গলার চারিদিকে 'ঋষি' 'মহর্ষি' 'ব্রহ্মর্ষি'র উদ্ভব হইতেছে। উপাধিব্যাধির এই সংক্রামকত্বের ভিতর মহারাজাধিরাজ প্রকৃত দ্বিজের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মনু বলিতেছেন "সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যং উদ্বিজেত বিষাদিব।" সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতিপদের সম্মান যে দিন তিনি স্বেচ্ছায় অস্বীকার করেন, সে দিন ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সে কথা স্মরণ করিয়া, এবং তাঁহার সমস্ত লেখায় পরিব্যাপ্ত আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পাইয়া, যথার্থই মনে হয়, মহারাজাধিরাজ তাঁহার কল্পিত "চন্দ্রজিতের" মত, তাঁহার পূর্ব্বগামী বর্দ্ধমানরাজসিংহাসনাধিকারী মহাপুরুষগণের মত, "প্রাচীন ভারতের প্রাচীন রাজর্ষি বর্গের মহনীয় পথ" অনুসরণ করিতে সতত উদ্যুক্ত রহিয়াছেন।

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য।

মণিভদ্র।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজগৃহ-বিহার।

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী পরিবৃত বেদীর উপর

বুদ্ধদেব।

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ

গীত।

তুমি মণ্ডিত প্রভু মহিমা কিরণে রঞ্জিত রবিরাগে।
তব, ঝঙ্কৃত মৃদুবাণীর পরশে চিত্ত তৃষিত জাগে॥
সঞ্চিত কত আশা তোমাতে অর্পিত কত ভরসা
বাঞ্ছিত তুমি অন্তরে প্রভু শান্ত অমৃত বরষা।
আনত শিরে বন্দিত পদ নন্দিত কত ভাগে
জীবন মরণ কাতর জন চরণ শরণ মাগে॥

বুদ্ধ। শুন শিষ্যগণ
যে বিজ্ঞান করেছ অর্জ্জন
বিতরণে কর আয়োজন।
হের স্বভাব নিয়ম, সুখ অন্বেষণ
দিন দিন নবরবি সনে
নব নব আকিঞ্চন জাগে মনে।
রবিঅস্ত যায় সে সব কোথায়
আশায় আশায় ভাসে প্রাণে পরদিন;
হতাশ নিশ্বাস; অবিশ্বাস পরিণাম।

অবিরাম গতি—লক্ষ্য অনিয়ত,
ভ্রান্ত মুগ্ধ জীবগণ,
রমণী বদনে কাতর নয়নে কেহ চায়,
ধন জন বিষয় বিলাস করো আশ,
ঘাত প্রতিঘাত বাদ বিসম্বাদ
আর্ত্তনাদ ঘরে পরে।
এ দুস্তরে পাইতে নিস্তার
দয়ার বিস্তার কর
সত্য শৌচ ধৃতি শান্তি দেহ উপদেশ।
জীবের উদ্ধার ব্রত কর সার,
হাহাকার ঘুচাও ধরার,
ত্রিতাপ নিবৃত্তি মুক্তি করহ প্রচার,
গাও মহানির্ব্বাণের গান ঘরে ঘরে।
চল শ্রাবস্তী নগর বিশাল সুন্দর
অপেক্ষিছে ভক্তশিষ্য অনাথ পিণ্ডিক,
মহা আয়োজন
নব ধর্ম্ম সংস্থাপন
প্রাণপণে জাগায়েছে সবে।
তার এই পবিত্র উৎসাহে
শান্তির প্রবাহে
বিমল আলোকে পুলকে ভাসিবে ধরা।

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ

শিষ্যগণ। জয় জয় বুদ্ধদেব দয়ার সাগর
সর্ব্বজ্ঞ সুগত শুদ্ধ জ্ঞানের আকর।

দূতের প্রবেশ।

দূত। নমো নমো ভগবন্! রাজীব চরণে,
শিষ্যগণে করি প্রণিপাত,

এনেছি সংবাদ
শ্রাবস্তীর দূত আমি ।
করি নিবেদন
সেথা যেয়ে নাহি প্রয়োজন
পুরজন বিরোধী সবাই ॥
বুদ্ধদেবে কেহ নাপূজিবে,
ধর্ম্ম কথা কেহ না শুনিবে
না মানিবে উপদেশ দেবতার ।
ক্ষুব্ধ চিত্ত অনাথ পিণ্ডিক
দুঃখে তাই নিমন্ত্রণ করে প্রত্যাহার ।

শিষ্যগণ । একি অদ্ভুত ব্যাপার !

বুদ্ধ । নহে চমৎকার,
বহুবাধা সহে ধর্ম্মাচার ।
বিস্ময় না মান কেহ
কহ ভদ্র, কিবা বিবরণ ?

দূত । তোমার বচন শুনি স্থির করি চিত্ত
অনাথ পিণ্ডিক মনে করিল বাসনা
শ্রাবস্তীর প্রতিঘরে প্রত্যেক কুটীরে
জনে জনে শুনাব এ মহা গাথা ।
জলে তৈল বিন্দু যথা বিস্তারিবে স্নিগ্ধ ধর্ম্ম ।
নরনারী উৎসুক অন্তরে
দিন গণে ঘরে ঘরে
বুদ্ধ পদার্পণে ধন্য হবে কবে পুরী ।
পত্র পুষ্প শোভিত সুন্দর
মনোহর সাজিল নগর
তোরণে তোরণে ফুলহারবিচিত্র বরণে

চারু চপল পবনে—
পতকা লহরী মনোরম
নয়ন রঞ্জন পূর্ণ ঘট দ্বারে দ্বারে।
উজলিত আলোক মালায়,
কি শোভায় সাজায় নিশায়,
চাহে পান্থ মর্ত্তে স্বর্গ ভ্রমে।
অন্য কথা নাই আনন্দ সদাই
নাই কোন দ্বন্দ্ব দ্বিধা
উৎসবে নগর ভাসে।
অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের দল
কোলাহল তুলিল বিষম
নাস্তিকের ধর্ম্ম নাহি লবে।
যে শুনিবে বুদ্ধ-উপদেশ
আর্য্য ধর্ম্মে স্থান নাহি তার
দলবদ্ধ বৈশ্যগণে একত্র করিয়ে
মহা আন্দোলনে
উৎসবে দিতেছে বাধা,
ধীরে ধীরে মন ফিরে গিয়েছে সবার।
মহামতি বুঝিয়াছে সার
বুদ্ধ ধর্ম্ম হবে না প্রচার হেথা,
তাই ব্যথা রাখি মনে মনে
গোপনে প্রেরিলা মোরে।
করে কাতরে প্রার্থনা
দেখ যেন অধমে ভুলনা
এসনা এদেশে
মোহ বশে উপদেশ বুঝিবে না কেহ
শেল সম বাজিবে পরাণে।

বুদ্ধ। এই সে কারণে
এত দ্বন্দ্ব সন্দ তার মনে ?
যাও দূত সত্বর গমনে
আতিথ্যবার্ত্তায় মম শান্ত কর তায়ে।
শ্রাবস্তীর প্রতিঘরে ভিক্ষা প্রার্থী আমি।
হিংসা দ্বেষ যথায় প্রবল,
অবিরত অশান্তির কোলাহল,
সেই স্থলে আগে যাই করিতে উদ্ধার।
আহা, তারা ক্লান্ত কত তাপে
কবে হবে সুদিন উদয়
মহৌষধ বিতরণ করিব সবায় !
কথায় কথায় বেলা বয়ে যায়
বৃথা কালক্ষয় উচিত না হয়।
আগুয়ান হও শিষ্যগণ
সঙ্কল্প অক্ষুণ্ণ রাখ রাখ দৃঢ়পণ
জ্ঞান রত্ন বিতরণ মহা প্রয়োজন।

(সকলের প্রস্থান।)

—*—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শ্রাবস্তী—সমস্তভদ্রের গৃহ।

সমস্ত ভদ্র ও রত্নমালা।

রত্ন। আর্য্য প্রণাম করি; শ্রীচরণে দাসীর একটী নিবেদন আছে।

সমস্ত। এসমা, কি চাও মা, স্বচ্ছন্দে বল।

রত্ন। আমার একটী প্রার্থনা পূর্ণ কর্ত্তে হবে।

সমস্ত। কেন মা এত কুণ্ঠিত হচ্চ ? তোমার পিতা বসুমিত্র আমার কিরূপ অন্তরঙ্গ বন্ধু তাত জান ? তবে কেন এত দ্বিধা কর কন্যা আমার ?

রত্ন। আর্য্য, আমরা একটু ভিন্ন পথাবলম্বী তাই এমন সঙ্কুচিত হচ্ছি, আর্য্য কন্যাকে মার্জ্জনা ক'রবেন।

সমন্ত। তার জন্য সঙ্কোচ কি মা? ধর্ম্ম বিভিন্ন হ'লেও অন্তঃকরণে আমরা দুই বন্ধু এক, নইলে বৌদ্ধ বসুমিত্র কখনই সমন্তভদ্রের গৃহে অতিথি হ'তেন না বা তাঁর কন্যাকে এখানে রেখে তীর্থ ভ্রমণেও যেতেন না; বলমা তুমি কি চাও, তোমায় অদেয় আমার কিছুই নাই।

রত্ন। আপনি মহাত্মা; জানেন ভগবান্ বুদ্ধদেব এই শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষার্থী হয়ে আস্‌ছেন?

সমন্ত। আস্‌ছিলেন বটে; কিন্তু এখন আর আশা হবে না, পুরবাসীরা তাঁর কোনরূপ অভ্যর্থনা ক'রবেন না।

রত্ন। সেই জন্যই তাঁর আসার আর কোনও অন্যথা হবে না।

সমন্ত। তুমি কি বল্‌ছ মা?

রত্ন। আমি জানি তাঁর সশিষ্য শ্রাবস্তী প্রবেশে ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায় আপনিই একজন প্রধান অন্তরায়।

সমন্ত। (স্বগত) বালা তেজস্বিনী। (প্রকাশ্যে) তবে আর আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন মা?

রত্ন। কিছু জিজ্ঞাসা কচ্ছি না, আমি হীনমতি সামান্য বালিকা, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার কোন অধিকারও রাখি না। কেবল প্রার্থনা, ভগবান যখন নগরে পদার্পণ ক'রবেন, আমাকে সেই শ্রীচরণ দর্শনে অনুমতি দেবেন।

সমন্ত। যদি আসেন, তিনি তোমাদের আরাধ্য দেবতা, নিশ্চয়ই তুমি তথায় গমন ক'রবে, আমার বারণ করবার সামর্থ্য নাই। তবে কি জান মা তাঁর আগমনের সম্ভাবনা খুব কম, ব্রাহ্মণগণ বিষম বিরোধী, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমিও বিরোধী তাও তুমি জান?

রত্ন। আপনি কেন আশঙ্কা কচ্ছেন? নিশ্চয়ই জানবেন, অতি শীঘ্রই তিনি এস্থানে পুণ্য পদার্পণে দীনহীনের পরিত্রাণের উপায় ক'রবেন। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, যেন সেই করুণার অবতার শ্রাবস্তীর ঘরে ঘরে ভিক্ষা ব্যপদেশে অমূল্য জ্ঞান-রত্ন বিতরণ কচ্ছেন, রাজা প্রজা দীন দুঃখী আবাল বনিতা সকলেই

তাঁর কৃপার সমান অধিকারী, আমি ক্ষুদ্র নারী অধিক জানি না, তবে বেশ বুঝতে পাচ্ছি,—হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে বেশ অনুভব ক'চ্ছি,—যেন আপনি—যিনি সর্ব্বাপেক্ষা তাঁর প্রতিপক্ষ, তাঁর কৃপায় অর্হৎপদ লাভ ক'রবেন ও জীবন্মুক্ত হবেন,—ভিক্ষু সঙ্ঘের অগ্রণী হবেন,—আমরাও ধন্য হব,—দেশও ধন্য হবে; জগতে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি—অমর অক্ষরে বিরাজ ক'রবে!

সমন্ত। মা!

রত্ন। আশ্চর্য্য হবেন না, আপনার বিষাদ মলিন মুখে অন্তরের দারুণ বেদনা, অনুতাপের তীব্র যন্ত্রণা—একটা ভয়ঙ্কর অনুশোচনা, স্পষ্ট ফুটে বেরুচ্ছে, কিন্তু ভয় নাই, যে বেশী তাপী, তাকেই তিনি আগে হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেন। আগে তারই ম্লান অশ্রু মুছিয়ে দেন। নির্ব্বাণের স্নিগ্ধ মধুর উজ্জ্বল আলোক আগে তার চক্ষের সম্মুখে ধরেন। আপনিও এ ব্যথা বিস্মৃত হবেন, পরম শান্তিলাভ ক'রবেন। আমি পেয়েছি বুঝেছি, প্রাণের মধ্যে সেই শান্তি—সেই তৃপ্তিলাভ ক'রেছি। সাধ হয়েছে, সবাই তাই পাব, সবাই আমরা এক হয়ে যাব। পিতা অনুপস্থিত, আপনিই আমার অভিভাবক, অনুমতি লাভে কৃতার্থ হয়েছি, কন্যার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুণ

(প্রস্থান।)

অপর দিক দিয়া সুভদ্রের প্রবেশ।

সুভদ্র। কোথায় গেল? সেই না? কি চমৎকার!

সমন্ত। একি অদ্ভুত প্রকৃতি? বালিকার কি কোন প্রকার বায়ুরোগ আছে! কি ব'লে গেল? মনের ভাব গুলো লিপিবদ্ধ ভাষার মত আবৃত্তি ক'রে গেল! আশ্চর্য্য!

কে? সুভদ্র! কি সংবাদ?

সুভদ্র। এইমাত্র শুনলেম বুদ্ধ নগর প্রান্তে, জীর্ণ আম্র কাননে এসে আজ সশিষ্য বিশ্রাম কচ্ছেন।

সুমন্ত। এসেছেন!

সুভদ্র। হাঁ পিতা আপনি বিচলিত হচ্ছেন কেন?

সমন্ত। কি জানি কেমন একটা ভাব মনের মধ্যে চমকে উঠছে। সুভদ্র!

সুভদ্র। আদেশ করুণ।

সমন্ত। দেখ আমরা বৃদ্ধ যা করি, তোমরা যুবা; এসব ধর্ম্মান্দোলনে যোগ দিও না, কি জানি কি হতে কি হয়, ভয় করে। তুমি ও যে ভাবছ দেখছি!

সুভদ্র। আজ্ঞে,

সমন্ত। দেখ ও সবে তোমাদের থাকা উচিত নয় আমরা অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধ বুঝেছ? মণি কোথায়?

সুভদ্র। সে ত বড় একটা বাড়ী থাকে না।

সমন্ত। আহা থাকৃতে পারে না, সে আর ভোলে না; আমরা সবাই ভুলে আছি, কেমন আছি, সেই শুধু একা একা থাকে, একা একা কাঁদে! সুভদ্র সুভদ্র একবার তার খোজটা ত নিতে হয়, এখনও সে তোমাদের গর্ভধারিণীর শোক ভুলতে পারিনি। দেখো তাকে মাঝে মাঝে!

সুভদ্র। যে আজ্ঞে পিতা। আপনিও তাকে একটু দেখবেন।

(প্রস্থান)

সমন্ত। আমি দেখব! আমার কে দেখে তার ঠিক নাই! গৃহলক্ষ্মী আমার ফাঁকি দিয়ে আগে চলে গিয়েছ, আমিত তোমাকে সেই আশীর্ব্বাদই ক'ত্তেম, কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলে! আজ যদি থাকতে কত পরামর্শ দিতে, কত দিক সাম্‌লাতে! কি কচ্ছি, কি যে হচ্ছে কে জানে!

জৈবলীর প্রবেশ।

জৈবলী। সমন্তভদ্র! একি?

সমন্ত। কি গুরুদেব?

জৈ। এ সকল কি শুন্‌তে পাচ্ছি?

সমন্ত। কি হয়েছে গুরুদেব?

জৈবলী। এই ধর্ম্ম বিপ্লবের দিনে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্ম্মের মহাসংঘর্ষণে বেদ বিহিত ঐহিক পারত্রিক ক্রিয়াকলাপের আশ্রয় দাতা তুমি তোমার ঘরে এ সকল কি অভূতপূর্ব্ব জটিল ঘটনা?

সমন্ত। বুঝেছি গুরুদেব, মিত্র বসুমিত্রের কন্যাকে গৃহে স্থান দিয়েছি, তাই এত আন্দোলন উঠেছে।

জৈবলী। আশ্চর্য্য। সমন্তভদ্র, তোমার সম্বন্ধে এ মহান্ধতা, নিতান্ত বিস্ময়কর স্বপ্নেরও অগোচর! এই আকস্মিক বিভীষিকায় নগরের গণ্যমান্য যাবতীয় ব্যক্তিই আজ ভীত চমকিত ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, কি যেন একটা অজানা আশঙ্কার মেঘ ধর্ম্ম-প্রাণ মহোদয়দিগের হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করেছে, আমিও একান্ত ক্ষুব্ধ হয়েছি, জানি না কোথায় কি ভাবে এর পরিণতি হবে, সমন্তভদ্র একি কল্লে?

সমন্ত। কি ক'রেছি গুরুদেব? দু'দিন মাত্র বালিকা আমার ঘরে অতিথি, স্বীকার করি বৌদ্ধ, কিন্তু আমরা ত সম্পূর্ণ সংশ্রব শূন্য হ'য়ে আছি, এরূপভাবে আশ্রয় টুকু দিয়েও কি পতিত হব? আমার বাল্য সহচরের এই তুচ্ছ বিষয়ে নির্ভর স্থল হয়েও কি একটু উপকার কত্তে পাব না?

জৈবলী। না, তোমার যে মিত্র সমাজের দিকে চাইনি, জেনো সে তোমার দিকেও চাইনি, পূর্ব্ব পুরুষগণের অধোগতি ক'রেছে, স্বেচ্ছাচার নাস্তিকের ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছে, অধিকন্তু তোমার সংশ্রবে এসে তোমারই সর্ব্বনাশে কৃতসংকল্প হয়েছে, যদি তাকে পরিত্যাগ না কর সমাজ হারাবে নিজেকে মজাবে, এত ধর্ম্ম কর্ম্ম সব রসাতলে যাবে। আমি তোমার হিতকাঙ্ক্ষী কুল পুরোহিত আচার্য্য গুরু, আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করোনা, জান না কি ভয়ঙ্কর আত্ম বিনাশে অগ্রসর হ'য়েছ, আমার কথা শোন, ফের এখনও সাবধান হও।

সমন্ত। আপনার অভিপ্রায় এখনি তাকে গৃহ হ'তে বহিষ্কৃত করি, বিশ্বাস ক'রে বন্ধু তাহার কন্যাকে এখানে রেখে গিয়েছে এখনিই তার উপযুক্ত পুরস্কার দিই।

জৈবলী। নিশ্চয়ই। ধর্ম্মরক্ষার জন্য, সমাজের জন্য আমি তোমাকে সেই-রূপই আদেশ করি। সমন্তভদ্র তুমি তাকে অচিরে স্থানান্তরিত কর।

সমন্ত। এই হীনতার নাম যদি ধর্ম্মরক্ষা হয়, ক্ষমা ক'রবেন গুরুদেব অধম সে ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

জৈবলী। বটে, এতদুর অধঃপতন, এত কালে এই জ্ঞান অর্জ্জন ক'রেছ? ঘোর কলি, ঘোর কলি; তা না হলে সেই ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয় পুত্র সমগ্র ভারতে আজ নিজেকে শুদ্ধ বুদ্ধ বলে প্রচার কচ্ছে, যারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষক তারা তার প্রশ্রয় দিচ্ছে, এই ব্রাহ্মণ প্রধান শ্রাবস্তী নগরে অনাথ পিণ্ডিকের মত নগণ্য একজন

বণিক মহাসমারোহে তার আমন্ত্রণ অভ্যর্থনার জন্য সাধারণকে উৎসাহিত ক'ত্তে সাহস ক'রেছে তুমিও বৈশ্যাধম সমন্তভদ্র, "তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে অন্ধ হ'য়ে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সম্মুখে গুরুর মুখের উপরে অকম্পিত স্বরে স্পর্দ্ধা প্রকাশ ক'চ্ছ; সমন্তভদ্র বেশ হয়েছ।

সমন্ত। সব ভেঙ্গে গেল সব ভেঙ্গে গেল, কোন দিকে যাই কোনটা রাখি, বড় বিপদ বড় বিপদ!

জৈবলী। অনেক এগিয়ে পড়েছ, যাও, আর বাধা দেব না আর তোমার বলবার আমার কিছুই নাই!

সমন্ত। গুরুদেব!

জৈবলী। এতই যদি তোমার মনে ছিল, কেন আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের পরামর্শ নিয়ে শ্রাবস্তীর এ মহোৎসবে বাধা দিলে, কেন নাস্তিক অনাথ পিণ্ডিককে নিরস্ত ক'ল্লে, কেন বুদ্ধের আগমনে বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ালে? যার শেষ রক্ষা ক'ত্তে পারবে না, কেন সে লক্ষ্যহীন কর্ম্মে মূর্খের মত নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রলে? তোমার মনে এক, বাহিরে আর এক, তুমি নাস্তিকেরও অধম, নিতান্ত ঘৃণিত পতিতের ও পতিত। তারা করে অন্তরে বাহিরে এক হ'য়ে ক'রে, তোমার মত এরূপ হীন শঠতাপূর্ণ আত্মপ্রতারণা করে না, সম্প্রদায়ের ছোট বড় সকলের মুখ এমন ঘৃণার লজ্জায় কালিমাঙ্কিত ক'রে দেয় না। আর অধিক ব'লতে চাই না, এতদিন তোমার গুরুত্ব ক'রেছি, আজ লোক চরিত্রে তুমি আমার গুরু হ'য়ে দাঁড়িয়েছ, যা শিক্ষা দিয়েছ, বেশ বুঝিয়েছ, মানুষ নিজেকে যতই চেপে চলুক, সময়ে তার হৃদ্গত বহ্নিকণা আপনি ঠিকরে পড়ে।

(প্রস্থান।)

শ্রীরামচন্দ্র কাব্যস্মৃতিমীমাংসাতীর্থ।

প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি

দেহের বৃদ্ধি সাধন করা জীব মাত্রেরই প্রধান ধর্ম্ম। দেহের বৃদ্ধি কাহাকে বলে, তাহা আমরা সকলেই বুঝি, কিন্তু দুই চারি কথায় তাহার একটা সংজ্ঞা দিতে পারি না। আয়তনের বা গুরুত্বের বৃদ্ধিকে দেহের বৃদ্ধি বলা যায় না। দেহে যখন মেদ সঞ্চিত হয়, তখন প্রাণী মাত্রেরই দেহ স্ফীত হইয়া পড়ে, কিন্তু স্ফীততাকে বৃদ্ধি বলা যায় না। মৃত প্রায় শুষ্ক মূলা প্রভৃতিকে কিছুক্ষণ জলে ডুবাইয়া রাখিলে, তাহা জল শোষণ করিয়া আয়তনে বড় হয়; ইহাকেও বৃদ্ধি বলা যায় না। ভেক প্রভৃতি প্রাণী শীতকালে মৃত্তিকার নিম্নে বা কোন নির্জ্জন স্থানে লুকায়িত থাকিয়া নিদ্রায় কালক্ষেপ করে। এই সময়ে তাহারা আহার করে না। এই কারণে বসন্তকালে যখন নিদ্রাভঙ্গ হয় তখন তাহাদের দেহ শীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহাদিগকে এই অবস্থায় অধিক দিন থাকিতে দেখা যায় না; দুইএকদিন পুষ্করিণীর জলে বিচরণ করিলেই তাহারা আবার পুষ্টাঙ্গব হয়। ভেকের দেহের এই পুষ্টিকে ও বৃদ্ধি বলা যায় না। বাহিরের জল শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেহের স্ফীতি দেখায়।

দেহের বৃদ্ধি সাধন করা কেবল জীবেরই ধর্ম্ম একথা ও বলা সঙ্গত মনে হয় না। ঘন চিনির রসে বা ফিটকিরির জলে যখন দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে, তখন প্রথমে একটি ক্ষুদ্র দানা দেখা দেয় এবং পরে তাহাই পরিপুষ্ট হইয়া বহু বৃহৎ দানার উৎপত্তি করে। প্রাণী ও উদ্ভিদগণ যেমন আপনা হইতেই দেহের বৃদ্ধি করে, এস্থলে দানা গুলি ও কতকটা সেই প্রকারেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেহের বৃদ্ধি সাধন করা কেবল, জীবেরই ধর্ম্ম এ কথাও বলা চলে না। তবে চিনি বা ফিট্‌কিরির দানার বৃদ্ধি এবং জীবের বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য এই যে, চিনির দানা জল মিশ্রিত চিনি হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া যে প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, প্রাণী ও উদ্ভিদ্ সে প্রকারে পুষ্ট হয় না। খাদ্যের এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত যে সকল পদার্থ জীবের দেহে প্রবিষ্ট হয়, তাহাই নানাপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা

রূপান্তর গ্রহণ করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে। ইহাই জীবের বৃদ্ধির বিশেষত্ব চিনির দানা পার্শ্বস্থ জল হইতে চিনি সংগ্রহ করিয়া আয়তনে বড় হয়; উদ্ভিদ্ মাটি হইতে রস এবং আকাশ হইতে বায়ু শোষণ করে এবং এই সকল উপাদানে জীব সামগ্রী (Protoplasm) উৎপন্ন করিয়া আকারে বড় হইয়া দাঁড়ায়।

প্রাণী ও উদ্ভিদ্ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহাদের দেহের ক্ষয় হয়। প্রাণীগণ চলাফেরা করিয়া এবং উদ্ভিদ্‌গণ দেহের নানা পরিবর্ত্তন দেখাইয়া জীবনের যে সকল পরিচয় প্রদান করে, তাহার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়; জীবগণ নিজেদের দেহক্ষয় করিয়া সেই শক্তি যোগায়। কিন্তু ক্ষয়ের পূরণ না হইয়া যদি কেবল ক্ষয়ই চলিতে থাকে, তাহা হইলে জীবের দেহ থাকে না, তখন এই সৃষ্টি বৃথা হয়। কিন্তু বিধাতার এই সৃষ্টি বৃথা হইবার নহে; এই কারণেই জীব মাত্রেই বাহির হইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আহার করে, এবং সেই খাদ্যই দেহস্থ হইয়া ক্ষয়ের পূরণ করে। যাহা সংসারের নানা প্রয়োজনে খরচ হয়, কোন ও গৃহস্থ যদি তাহা-অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতে পারেন, তবে তাঁহার ভাণ্ডারে কিছু কিছু সঞ্চিত হইতে থাকে। সকল গৃহস্থ এই প্রকারে বিত্ত সঞ্চিত করিতে পারেন না। কিন্তু প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌গণ ক্ষয়ের পূরণ করিয়া ও দেহে কিছু কিছু সঞ্চিত করিতে পারে, এই উদ্বৃত্ত বস্তুই তাহাদের বৃদ্ধি দেখায়। বৃদ্ধ জীব খাদ্য হইতে যাহা দেহস্থ করে, তাহা কেবল ক্ষয়ের পূরণ করিতেই ব্যয়িত হইয়া যায়, এজন্য ইহাদের বৃদ্ধি দেখা যায় না। জরাগ্রস্ত বা রুগ্ন জীব যাহা দেহস্থ করে, তাহা দ্বারা ক্ষয়ের পূরণ হয় না, এই জন্য তাহাদিগকে ক্রমে দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইতে দেখা যায়। প্রাণীর বৃদ্ধি সম্বন্ধে এই সকল কথা সর্ব্বজন বিদিত, সুতরাং ইহার বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে আমরা কেবল সেই গুলিরই আলোচনা করিব।

কলের চুল্লীতে নিয়মিত ইন্ধন জোগাতে থাকিলে, কল নিয়মিতভাবে চলে এবং আমরা তাহার সাহায্যে অনেক কাজ আদায় করিয়া লইতে পারি। যে ঘরে এবং যে অবস্থায় কলটিকে রাখা হইয়াছে, তাহার সহিত কলের কাজের কোন সম্পর্ক থাকে না। জীবের দেহ ও এক প্রকার যন্ত্র। কিন্তু যে কোন স্থানে জীবকে রাখিয়া তাহার সম্মুখে প্রচুর খাদ্য ধরিলে, তাহার দেহযন্ত্র সাধারণ

যন্ত্রের ন্যায় কাজ করে না; পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি দেহ রক্ষার অনুকূল হয়, তবেই যন্ত্র খাদ্য গ্রহণ করিবার সামর্থ্য পায়। জীবের জীবনে কার্য্যের এই ব্যাপারটি প্রাচীন পণ্ডিতেরা জানিতেন, কিন্তু, ঠিক কোন কোন অবস্থা প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে অনুকূল তাঁহারা তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দিগের গবেষণাতেই এসম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়াছে, ইঁহারা বলিতেছেন, কেবল বাহিরের বায়ু দেহস্থ করিয়াই জীবগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না; বাহিরের তাপ আলোক এবং বৈদ্যুতিক অবস্থাপ্রভৃতি প্রত্যেক ব্যাপারের সহিত যোগরক্ষা করিয়া তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বাহ্য প্রকৃতির একটুমাত্র পরিবর্ত্তন হইলে সঙ্গে সঙ্গে উহাদের বৃদ্ধির ও পরিবর্ত্তন হয়। সূর্য্যালোক নানা জড় পদার্থে পতিত হইয়া নানাপ্রকার রাসায়নিক কার্য্য দেখায়, কিন্তু উদ্ভিদ দেহে পতিত হইয়া উহা যে কার্য্য করে, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। কার্বন্ অর্থাৎ অঙ্গার দেহের প্রধান উপাদান। উদ্ভিদ্‌গণ বায়ু হইতে অঙ্গারক বাষ্প শোষণ করিয়া দেহস্থ করে, কিন্তু এবাষ্পস্থিত অঙ্গারেরই সাহায্যে নূতন পদার্থ উৎপন্ন করিয়া দেহবৃদ্ধি করার শক্তি তাহাদের থাকে না। সূর্য্যালোকই উদ্ভিদের দেহে পতিত হইয়া তাহাদের বৃদ্ধির উপযোগী নানা উপাদান প্রস্তুতের সাহায্য করে। কিন্তু সর্ব্বদাই সূর্য্যালোক পাইলে উদ্ভিদ্ বৃদ্ধি পায় না, দিবা রাত্রির বিভাগ অনুসারে একবার সূর্য্যালোক পাওয়ার পরে দীর্ঘকাল গভীর অন্ধকারে থাকাই তাহাদের বৃদ্ধির অনুকূল। সূর্য্যালোক যে সাত প্রকার মূল বর্ণের মিশ্রণে প্রস্তুত, সেগুলির মধ্যে বেগুনিয়া প্রভৃতি বর্ণগুলি উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। এই কারণে সূর্য্যালোকের সংযোগে উদ্ভিদ্‌দেহে বৃদ্ধির উপাদান প্রস্তুত হইলে ও উক্ত রশ্মিগুলির প্রতিকূলতায় দিনের বেলায় উদ্ভিদ্‌গণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না; তাহারা দিনের আলোকে প্রস্তুত উপাদান লইয়া রাত্রির অন্ধকারেই অধিক বাড়ে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধির উপরে তাপের ও অনেক কার্য্য আবিষ্কার হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ৭১ ডিগ্রি হইতে ৯৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত, উষ্ণতা এই সীমার ঊর্দ্ধে উঠিলে বা নিম্নে নামিলে, বৃদ্ধির পরিমাণ কমিয়া আসে। শেষে তাহা শূন্য ডিগ্রিতে নামিলে বা ১২২ ডিগ্রিতে উঠিলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি একবারে রোধ পাইয়া যায়।

প্রাণীর বৃদ্ধির উপরে ও তাপের অনেক কার্য্য আছে। যে সকল জীবকোষ দিয়া প্রাণীর দেহ গঠিত, সেগুলি পরিপুষ্ট হইয়া যখন নূতন কোষের সৃষ্টি করে, তখনই প্রাণী দেহের বৃদ্ধি হয়। কেবল প্রাণীর নয়, উদ্ভিদগণের ও বৃদ্ধি এই প্রকারেই হয়। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, অধিক শীতে দেহে নূতন কোষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে না এবং ইহার ফলে দেহের বৃদ্ধি হ্রাস হইয়া আসে। মেরু প্রদেশের উষ্ণতা অত্যন্ত অল্প, এই কারণে উষ্ণ প্রধান দেশের প্রাণীগণ যেমন দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শীত প্রধান দেশের প্রাণীরা সে রকম বাড়ে না, এই সকল স্থানের প্রাণী ও উদ্ভিদ্ উভয়েই ধীরে ধীরে বাঁড়িয়া দীর্ঘায়ু লাভ করে।

জন্মকাল হইতেই সুস্থ জীব মাত্রেই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু, সেই বৃদ্ধির পরিমাণ এক একটি নির্দ্দিষ্ট সীমায় আসিয়া পৌছিলে, জীবের আর বৃদ্ধি দেখা যায় না। জন্মগ্রহণের পর হইতেই মানব শিশুর দেহ বড় হইতে আরম্ভ করে, কিন্তু তাহা বড় হইয়া কখনই হস্তীর ন্যায় প্রকাণ্ড আকার গ্রহণ করে না; ধান্যবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে, কিন্তু তাহা বড় হইয়া কখনই আম্র বৃক্ষের ন্যায় উচ্চ হয় না। জীবের বৃদ্ধির এই প্রকার সীমা কোথা হইতে আসে এই প্রশ্নটী লইয়া আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক গবেষণা করিয়াছেন। এইজন্য এসম্বন্ধে অনেক নূতন কথাও শুনা যাইতেছে।

এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে, কি প্রকারে জীব দিগের বৃদ্ধি হয়, প্রথমে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম কোষের সমষ্টি। প্রত্যেক কোষের মধ্যে যে জীব সামগ্রী থাকে, তাহা ভুক্ত খাদ্যের সারাংশ দ্বারা পুষ্ট হয় এবং কোষ গুলিকে স্ফীত করে। কিন্তু এই স্ফীতি চিরকাল চলে না। গোলাকার পদার্থ স্ফীত হইলে তাহার ভিতরকার পদার্থের পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ে, তাহার পৃষ্ঠদেশ কিন্তু সে অনুপাতে বাড়ে না। কারণ গোলাকার পদার্থ মাত্রেরই আয়তন তাহার ব্যাসার্দ্ধের ঘনফল (cufe) অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহার পৃষ্ঠ দেশ সেই ব্যাসার্দ্ধেরই বর্গফল (squere) অনুসারে বাড়ে বা কমে। কাজেই কোন ও জীবকোষ যদি পুষ্ট হইয়া আয়তনে চারিগুণ হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহার পৃষ্ঠ দেশ চারি গুণের অনেক

কম হয়। পৃষ্ঠদেশ দিয়াই কোষের ভিতরে পুষ্টিকর দ্রব্য প্রবেশ করে, তাহাই কোষগুলিকে জীবিত রাখে। কাজেই ভিতরের কোষ সামগ্রীর তুলনায় পৃষ্ঠ দেশের পরিমাণ অল্প হওয়ায় কোষের মধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী পুষ্টিকর দ্রব্য প্রবেশ করিতে পারে না, ইহার ফলে অতিরিক্ত স্ফীত কোষগুলির বৃদ্ধি রোধ পাইয়া যায়। কিন্তু, বৃদ্ধি রোধ পাইলে ও কোষস্থ জীব সামগ্রীর পুষ্টির প্রয়োজন থাকে, এবং এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রত্যেক কোষ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া আবশ্যক মত খাদ্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে একটী কোষ হইতে ক্রমে দুইটী চারিটি আটটি ইত্যাদি কোটি কোটি কোষের উৎপত্তি হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবের দেহ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এক একটি নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিলে কেন আর অধিক বাড়ে না, পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটি হইতে তাহা কতকটা বুঝা যায়। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, যে সকল ক্ষুদ্র কোষের সংযোগে জীবের দেহ উৎপন্ন হয় সেগুলি যখন বৃদ্ধির সীমায় আসিয়া দাঁড়ায়, তখন দেহ ও বৃদ্ধির সীমায় আসিয়া পৌঁছায়। বলা বাহুল্য রাসায়নিক দিগের এই উক্তিটি সম্পূর্ণ অনুমানমূলক। মানুষ উন্নত বুদ্ধি এবং জ্ঞানের সাহায্যে অনেক প্রকার ব্যাপারের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে সত্য কিন্তু তথাপি এখন ও এমন শত শত ব্যাপার রহিয়াছে যাহার কারণ নির্দ্দেশ মানুষের সন্ধানে কুলায় নাই। আমাদের আলোচিত ব্যাপারটি রহস্যাবৃত রহিয়াছে স্বীকার করিতে হয়।

জীবের দেহ কখনই বিশৃঙ্খল ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না; প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক একটি নিয়ম মানিয়া বাড়িতে আরম্ভ করে। কোথায় কোন ঘরটি এবং কোথায় কোন কোন দরজাটি থাকিবে তাহা মনে রাখিয়া যেমন রাজ মিস্ত্রী ধীরে ধীরে একটি বৃহৎ বাড়ী প্রস্তুত করিয়া ফেলে, জীব দেহের গঠন ও যেন সেই প্রকার। মানুষের হস্তদ্বয় অপরিপুষ্ট রহিল, অথচ সমগ্র দেহ সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল; কিংবা নাসিকা হঠাৎ ভয়ানক বাড়িয়া পড়িল, অথচ দেহ ক্ষুদ্র রহিল; এই প্রকার উদাহরণ দুর্ল্লভ। সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রাণী ও উদ্ভিদগণের বৃদ্ধি বড়ই আশ্চর্য্যজনক। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই বিষয়টি লইয়া ও গবেষণা করিয়াছেন, এবং ইহা হইতে যাহা জানা গিয়াছে তাহা অতীব বিস্ময়কর। প্রাণিদেহের নানাস্থানে gland নামে যে বিশেষ মাংসপিণ্ড থাকে

পাঠক হয় ত তাহার কথা শুনিয়াছেন। আমাদের কর্ণমূলে গণ্ডের নিম্নে কুঁচকিতে বাহু ও দেহের সংযোগ স্থলে এই প্রকার মাংস পিণ্ড আছে, কখনও কখনও এগুলি ফুলিয়া উঠিয়া কি প্রকার পীড়াদায়ক হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। শরীরতত্ত্ববিদ্গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ সকল মাংসপিণ্ড বৃথা দেহে সংযোজিত হয় নাই; এগুলির প্রত্যেকটি হইতে এক এক প্রকার রস নির্গত হয়, এবং তাহা দেহের নানা কার্য্যে লাগে। এই রসগুলির মধ্যেরই কয়েকটি প্রাণিদেহের বৃদ্ধিকে নিয়মিত করে এবং প্রয়োজন অনুসারে সংযত রাখে। মাংসপিণ্ড হইতে ঐ শ্রেণীর রস নিয়ত নির্গত হইয়া প্রথমে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং রক্ত প্রবাহ তাহাই বহন করিয়া প্রাণীর সর্ব্বাঙ্গে চালনা করে। এই প্রকারে রসগুলি নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রয়োজন অনুসারে তাহাদের কোনটির বৃদ্ধি সহায়তা করে এবং কোনটির বৃদ্ধি রোধ করে।

শারীরতত্ত্ববিদ্গণ এই আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; দেহস্থ কোন মাংস পিণ্ডের রস কি ভাবে কোন্ অঙ্গের বৃদ্ধি নিয়মিত করে, ইহাঁরা ক্রমে তাঁহার ও সন্ধান পাইতেছেন। আমাদের কণ্ঠনালীতে যে পিণ্ডাকার হাড় (Adam's apple) আছে তাহার দুই দিকের মাংসপিণ্ড হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়। শারীরতত্ত্ববিদ্গণ ইহারও কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাঁরা দেখিয়াছেন, এই রস সর্ব্বাঙ্গেই বিস্তৃত হইয়া প্রাণীর অস্থি ও মস্তিষ্কের বৃদ্ধির সহায়তা করে। এবং মস্তিষ্কের তলদেশে এক প্রকার অদ্ভুত পদার্থ আছে,— শারীরবিদ্গণ ইহাকে ইংরাজীতে Pitnitary Body বলেন। মস্তিষ্কের এই অংশটি হইতেও এক প্রকার রস নির্গত হয়, পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ইহাও প্রাণীর অস্থি বৃদ্ধি করায়। এই রসের কার্য্য সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে, তাহা বড়ই বিস্ময়কর। সৈনিক হইয়া কোনও পল্টনে প্রবেশ করিতে হইলে পদপ্রার্থীর দৈহিক উচ্চতা কত তাহা সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষা করা হয়। যে সকল প্রার্থীর উচ্চতা অল্প তাহাদিগকে সৈনিক পদে নিযুক্ত করা হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে জনৈক যুবক খর্ব্বকায় বলিয়া নানা চেষ্টাতেও সেনাদলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। দৈহিক উচ্চতার বৃদ্ধি করিবার কোনও উপায় না পাইয়া যুবকটি একজন সুচিকিৎসকের শরণাপন্ন

হইয়াছিল। চিকিৎসক বুঝিয়াছিলেন, মস্তিষ্কের রস (Pituitary (hormones প্রচুর নির্গত না হওয়ায় যুবক খর্ব্বাকৃতি হইয়াছে। তিনি কয়েক মাস ধরিয়া গরু ও ভেড়ার মস্তিস্ক জাত ঐ রস যুবকের দেহের রক্তের সহিত মিশাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; সে এই চিকিৎসায় শীঘ্রই দীর্ঘাকৃতি লাভ করে। ইহা দ্বারা কেনই বা কতক আজীবন খর্ব্বকায় থাকিয়া যায়, তাহা বুঝা যায়। বামনাকৃতি লোকদের মস্তিষ্ক রস অতি অল্পই নির্গত হয়, তাই তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও উচ্চতায় বাড়ে না। দীর্ঘাবয়ব ব্যক্তির মস্তিষ্ক রস প্রচুর নির্গত হয়; এই কারণে তাহার অস্থি অত্যন্ত পুষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার উচ্চতাও বাড়িতে থাকে।

আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল প্রাণীর নিয়মিত বৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করিলাম। প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদ্ ও নিয়মিত ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভিদের দেহেও বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন রসের পরিচয় পাইয়াছেন এবং এই সকল রসই যে দেহের নানা অংশে বিস্তৃত হইয়া বৃক্ষাদির বৃদ্ধি নিয়মিত করে, তাহা বুঝা যাইতেছে। উদ্ভিদের মূল অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, স্বভাবতঃই তাহাতে এক প্রকার রস উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই রস মূলের অযথা বৃদ্ধি রোধ করে।

আমরা প্রায়ই বৃক্ষের পত্রে শাখা প্রশাখায় এবং কাণ্ডাদিতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গোলাকার অংশ দেখিতে পাই। প্রাণীদিগের দেহের স্থানে স্থানে যেমন কখন কখন অনাবশ্যক মাংসপিণ্ড উৎপন্ন হইয়া "আভের" সৃষ্টি করে, বৃক্ষদেহেও সে প্রকার "আভ" উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত গোলাকার অংশগুলিই বৃক্ষের "আভ" এগুলির উৎপত্তিতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ উদ্ভিদের দেহে আর এক প্রকার রসের কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এই রস উদ্ভিদের দেহ হইতে নির্গত হয় না; বাহির হইতে দেহে প্রবেশ করিয়া তাহা দেহের অযথা বৃদ্ধি করায়। পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন মক্ষিকা প্রভৃতি পতঙ্গ কোন ও নিভৃত স্থানে অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে। প্রসবের পরে ডিম্বের সহিত মাতার আর কোনও সম্বন্ধ থাকে না; সেগুলি আপনা হইতেই পরিণত হইয়া ফুটিয়া যায়, এবং অসংখ্য সুয়োপোকার আকারের ক্ষুদ্র প্রাণী উৎপন্ন করে। এই গুলিই পরে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয়। পতঙ্গ দিগের মধ্যে এক জাতি বৃক্ষের শাখা

প্রশাখা বা পত্রের ত্বক ভেদ করিয়া তাহাতে ডিম্ব প্রসব করে। এই সকল স্থানে থাকিয়া পরিণত হইলে ডিম্ব হইতে সুয়োপোকার আকারের কীট বহির্গত হয় এবং সেগুলি নিজেদের দেহ হইতে এক প্রকার লালা নির্গত করিতে আরম্ভ করে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এই লালা বৃক্ষের যে অংশ স্পর্শ করে তাহা অপর অংশের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে পতঙ্গ বিশেষের দেহের রসই বৃক্ষের "আভের" উৎপাদক।

প্রাণীর জীবন কালের কোন সময়ে কি প্রকার হারে দেহের বৃদ্ধি হয়, বৈজ্ঞানিক বহু পরীক্ষা করিয়া তাহারও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। মাতৃ-গর্ভে প্রাথমিক ডিম্বকোষ প্রাণময় হইলে, কি প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহারও পরীক্ষা হইয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে,—প্রথমে ভ্রূণস্থ সেই একটি কোষ বিভক্ত হইয়া দুইটিতে পরিণত হয় এবং পরে সেই দুইটি ক্রমে বহুকোষে বিভক্ত হইয়া ভ্রূণে কোষসংখ্যা বৃদ্ধি করে, কিন্তু সমগ্র বস্তুটি আকারে বাড়ে না। মানব ভ্রূণের কোষসংখ্যা গর্ভসঞ্চারের পরবর্ত্তী তিনমাসে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অত্যন্ত বাড়িয়া চলে। চতুর্থ মাসে কোষগুলির আকার বৃদ্ধির সময় উপস্থিত উপস্থিত হয়,—তখন একমাসের মধ্যে ভ্রূণ পূর্ব্বের আকারের প্রায় ছয়গুণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই প্রকার বৃদ্ধি অধিক দিন চলে না,—পঞ্চম মাস হইতেই উহা মন্দীভূত হইতে আরম্ভ করে এবং প্রসবের পূর্ব্বমাসে ভ্রূণস্থ শিশু, তখনকার আকারের কেবল এক চতুর্থাংশ পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে মানবশিশুর বৃদ্ধি, আর এক প্রকারে চলে। প্রথম বৎসরের শিশু প্রায় তিনগুণ বাড়ে, কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী পাঁচ ছয় বৎসরের বৃদ্ধি, এই অনুপাত রক্ষা করে না; তখন বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের বৃদ্ধি সুস্পষ্ট কমিয়া আসে। ইহার পরে শিশু যৌবনে পদার্পণ করিলে বৃদ্ধির আর একটি সময় আসিয়া উপস্থিত হয়। বালকগণ সাধারণত পনেরো ষোল বৎসরে এবং বালিকাগণ বারো তের বৎসরে এই বয়ঃসন্ধিতে উপস্থিত হয়। তখন হঠাৎ বালক বালিকাদিগের দেহের উচ্চতা বাড়িয়া যায়, এবং পরে ধীরে ধীরে দেহের গুরুত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে।

ইতর প্রাণীর দেহ বৃদ্ধিতে আরও বিচিত্রতা দেখা যায়। পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীদের দেহে পাখা উঠিলে তাহারা আর বাড়ে না। ডিম্ব হইতে বহির্গত

হইয়া যখন ইহারা শুঁয়োপোকার আকারে থাকে, সেই সময়েই ইহাদের বৃদ্ধির কাল। সুতরাং বুঝা যাইতেছে প্রজাপতি পিপীলিকা মক্ষিকা উই এবং ভ্রমর প্রভৃতি প্রাণী যতই আহার করুক না কেন, আহারে তাহাদের দেহের বৃদ্ধি হয় না; যখন শুঁয়োপোকার আকারে থাকে, তখনই তাহাদের দেহের চরম বৃদ্ধি হয়।

মৎস্য বড়ই অদ্ভুত প্রাণী। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদের বৃদ্ধির সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই;—যতদিন পর্য্যন্ত ইহারা আহার করে এবং জীবিত থাকে ততদিন ধরিয়াই ইহাদের দেহের বৃদ্ধি চলে। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরও বৃদ্ধির সীমা নাই। কুম্ভীর সরীসৃপ জাতিভুক্ত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে ইহারা প্রকাণ্ড আকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রাণী সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিলেও নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কাঠবিড়াল স্তন্যপায়ী প্রাণী, তাহা কখনই বিড়ালের ন্যায় বৃহদাকার পায় না। কিন্তু পুটি মাছ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া যদি পোনা মৎস্যের ন্যায় বৃহৎ হইয়া দাঁড়ায়, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ থাকে না।

জ্যোতির্বিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যাদি যে প্রকার প্রাচীন, জীববিদ্যা সে প্রকার নয়। অতি অল্প দিন হইতেই ইহা বৈজ্ঞানিক দিগের গবেষণার বিষয় হইয়াছে এই কারণে প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার আজও রহস্যাবৃত রহিয়াছে; নানা দেশের বৈজ্ঞানিকগণ আজকাল যে প্রকার উৎসাহের সহিত এই বিষয়ের গবেষণা করিতেছেন, তাহাতে আশা হয় শীঘ্রই অনেক নূতন তত্ত্ব আমাদের গোচরে আসিবে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

স্মরণ

(কবিবর বরদাচরণ মিত্রের মৃত্যুদিনে)

থেমেছে এমনি দিনে ঝঙ্কার মোহন,
তারে তারে বেজেছিল যে বীণা স্বস্বনে ;
নিবেছে এমনি দিনে ফুৎকারে কুক্ষণে,
জ্বলেছিল যে কনক-দীপ সুবরণ !
নীরবতা সনে জাগে গীতের স্মরণ,
আঁধারে প্রদীপ-জ্যোতিঃ পড়িতেছে মনে—
স্মৃতির কেতকী-বাস ফিরে হৃদি-বনে,
শোক-সুরভিতে আর্দ্র বহে সমীরণ !

চোখে মোর অশ্রুজল, হৃদয়ে বেদনা—
নিখিল-নয়নানন্দ কোথা সেই জন
আচারে সুভদ্র, প্রাণে ঋষির প্রেরণা,
স্বপ্নের দেবতা মম সুচারু-দর্শন
শ্রদ্ধেয় মাতুল মিত্র বরদা চরণ ?
সবে বলে রহিয়াছে বরদা-শরণ !

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

স্বাস্থ্যরক্ষায় রোগবিজ্ঞান।

রোগ ও রোগবিজ্ঞানের উপায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা, সকলেরই বিশেষ কর্ত্তব্য। চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি সংহিতা সমূহে রোগবিজ্ঞানের যে সদুপদেশ সকল প্রদত্ত হইয়াছে, এ প্রস্তাবে তাহার আলোচনা সংক্ষেপে করিবার প্রয়াস করা যাইবে।

১। রোগ ও রোগের আশ্রয়।

রোগ ও রোগের আশ্রয় সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন ;—"অস্মিন্" (আয়ুর্ব্বেদ) শাস্ত্রে পঞ্চমহাভূত শারীরিসমবায়ঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে। তস্মিন ক্রিয়া। সোঽধিষ্ঠানম্। *** তদ্দুঃখসংযোগা ব্যাধয় ইত্যুচ্যন্তে।"

ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ্ (জল); তেজঃ (আচ), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ) এই পাঁচটির নাম পঞ্চ মহাভূত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এই মহাভূত পঞ্চক এবং শরীরী (জীবাত্মার) সমবায় অর্থাৎ আলৌকিক সংযোগে বিশেষের নামই পুরুষ। মহাভূত পঞ্চক ও জীবাত্মার ঐশ্বরিক সংযোগ সংঘটিত না হইলে, পুরুষের উৎপত্তি হয় না।

এই মহাভূতপঞ্চক ও জীবাত্মা সমবেত পুরুষকেই সুখ ও দুঃখ এবং শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ববর্গ আশ্রয় করিয়া থাকে ; এই হেতু পুরুষই সুখ ও দুঃখাদির অধিষ্ঠান অর্থাৎ আধার। পুরুষে কোন প্রকার দুঃখের সংযোগ হইলে, তাহাকেই ব্যাধি অর্থাৎ রোগ বলা হইয়া থাকে।

রোগের আশ্রয় সম্বন্ধে চরক বলেন :—

"সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেতৎ ত্রিদণ্ডবৎ।*
লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাত্তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
সপুমাং শ্চেতনং তচ্চ তচ্চাধিকরণং মতম্॥

---

* এস্থলে চরক পৃথকভাবে মনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সুশ্রুত আর স্বতন্ত্র ভাবে মনের বিষয় উল্লেখ করেন নাই, জীবাত্মার সহিত অভেদ ভাবেই মনকে ধরিয়া লইয়াছেন।

সত্ত্ব (মনঃ), আত্মা (জীবাত্মা) ও (পঞ্চভূতাত্মক) শরীর, ত্রিদণ্ডের (তেকটের) মত পরস্পরের সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইলেই, লোক অর্থাৎ পুরুষের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই পুরুষই চেতনাবান্ এবং সুখ ও দুঃখাদি সকলের অধিকরণ অর্থাৎ আধার।

২। রোগ ও প্রকৃতি।

চরক বলেন,

"বিকারো ধাতুবৈষম্যং সাম্যং প্রকৃতিরুচ্যতে।
সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখমেব চ॥"

যাহারা শরীর ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহাদিগকেই "শারীরিক ধাতু" বলা হইয়া থাকে। সুতরাং বাত, পিত্ত ও কফ * এবং রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মেদও শুক্র প্রভৃতি সকলই ধাতুশব্দে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

দেহস্থ ধাতু সমূহের বৈষম্য অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা ন্যূনতা বা আধিক্য ঘটিলেই বিকার অর্থাৎ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে; আর ধাতু সমূহের সমভাবই শরীরের প্রকৃতি বা স্বাস্থ্য।

এই প্রকৃতি বা আরোগ্যই মানবের যাবতীয় সুখস্বরূপ এবং বিকার বা রোগই নিখিল দুঃখের আধার; অর্থাৎ ধাতু সমূহের সমতা বর্ত্তমান থাকিলেই শরীরের সুখ অনুভূত হয় আর তাহার বিপর্য্যয়েই সকল প্রকার দুঃখের সঞ্চার হইয়া থাকে।

৩। ধাতুর সমতা ও বৈষম্য।

শরীরস্থ ধাতু সমূহ কেন বিষমতা প্রাপ্ত হয় আর বৈষম্য ঘটিলেই বা ধাতু সকলের সমতা বিধানের উপায়ী ভূত চিকিৎসা কি, এবিষয়ে চরক বলেন;—

"জায়ন্তে হেতুবৈষম্যাদ্বিষমা দেহধাতবঃ।
হেতুসাম্যাৎ সমস্তেষাং স্বভাবোপরমঃ সদা॥"

---

*বাত, পিত্ত ও কফ রোগ উৎপাদনে সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও দেহের ধারণ ও পোষণে এবং অন্যান্য ধাতুর ক্ষয়ও বৃদ্ধি ব্যাপারে ইহাদেরই কর্তৃত্ব এইজন্যই "ধারণাদ্ধাতবঃ" শরীরধারণ করিয়া থাকে বলিয়াই ইহারা ধাতু।

হেতুর বিষমতায়ই দেহস্থ ধাতুর অর্থাৎ রস ও রক্তাদির বৈষম্য ঘটিয়া থাকে এবং হেতুর সমতা নিবন্ধনই ধাতু সমূহের সমতা সংরক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ সমানগুণ আহার ও আচারাদি অনুষ্ঠিত হইলেই ধাতুসমূহের বৃদ্ধি আর বিপরীত গুণ আহার ও আচারাদি বশত তাহাদের হ্রাস এবং সমতা সম্পাদক আহারাদিই ধাতু সকলকে স্বপ্রকৃতিতে নিবদ্ধ করিয়া থাকে।

৪। চিকিৎসা।

চরক বলেন ;—

"যাভিঃ ক্রিয়াভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ।
সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্ম তদ্‌ভিষজাং মতম্॥
কথং শরীরে ধাতুনাং বৈষম্যং ন ভবেদিতি।

যেরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে, শরীরগত ধাতুর সমতা হইয়া থাকে, তাহাই চিকিৎসা এবং ধাতুর সমতা বিধান করাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

কিরূপে ঔষধাদির সম্যক্ প্রয়োগ কৃত হইলে, বিষমতাপন্ন শারীরিক ধাতু প্রকৃতিস্থ হইতে পারে ইহাই চিকিৎসা ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য।

অহিতজনক আহার ও আচার প্রভৃতিই ধাতুর বৈষম্য কারক এবং তন্নিবন্ধন প্রকোপিত দোষ হইতেই বিবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই বিষমতা জনক হেতুর পরিত্যাগ এবং সমতা সম্পাদক আহারও আচারাদি পরিগ্রহেই ধাতুর বিষমতা বিদূরিত এবং সমতা হইয়া থাকে অর্থাৎ বিরুদ্ধ আহারাদিই ধাতুর বৈষম্য কারক, তাহা হইতেই বাতাদিদোষ প্রকাশিত হইয়া রোগের কারণ হইয়া থাকে। অতএব রোগের একমাত্র মূলকারণ বিরুদ্ধ আহার ও আচাদির অভাব ঘটিলেই কেবলমাত্র ধাতু সমূহের সমতা সংরক্ষিত হইতে পারে।

ধাতুর সমতা রক্ষিত হওয়ার উপায়।

শরীরং সত্ত্বসংজ্ঞঞ্চ ব্যাধীনামাশ্রয়োমতঃ।
তথা সুখানাং যোগস্তু সুখানাং কারণং সমঃ॥

শরীর ও মন এই উভয়েই ব্যাধির ও সুখের আশ্রয়। কাল প্রভৃতি হেতু-ত্রয়ের সমযোগই সুখের কারণ।

কালাদি হেতুত্রয় কি ?

"কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা ন চাতি চ
দ্বয়াশ্রয়াণাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ॥"

কাল, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহের মিথ্যাযোগ, অযোগ বা অতিযোগই শরীর ও মন এই উভয় আশ্রিত ব্যাধিসমূহের তিন প্রকার হেতুরূপে বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই হেতুত্রয়ের বিবরণ চরক বক্ষ্যমাণরূপে সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"ত্রীণ্যায়তনানি রোগাণামিতি—অর্থানাং কর্ম্মণঃ কালস্য চাতিযোগাযোগ-মিথ্যাযোগাঃ।"

আয়তন শব্দের অর্থ হেতু। প্রধানত তিন প্রকার কারণ হইতেই রোগের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই তিনটি কারণ এই ;—অর্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়, কর্ম্ম ও কালের অতিযোগ, অযোগ বা মিথ্যাযোগ।

অর্থ, কর্ম্ম বা কালের অতিযোগ, অযোগ বা মিথ্যাযোগ কি এবং কিরূপেই বা এই সকল অনুষ্ঠিত হইয়া রোগের কারণতা প্রাপ্ত হয়, তাহা এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;—

৬। অর্থ বা ইন্দ্রিয় বিষয়।

(ক) চক্ষু।

"তত্রাতিপ্রভাবতাং দৃশ্যানামতিমাত্রং দর্শনমতিযোগঃ সর্ব্বশোঽদর্শনমযোগঃ। অতিসূক্ষ্মাতিবিপ্রকৃষ্টরৌদ্রভৈরবাদ্ভুতদ্বিষ্টবীভৎসবিকৃতাদিরূপদর্শনং মিথ্যাযোগঃ।"

প্রখর দীপ্তিশালী সূর্য্য প্রভৃতির অতিশয় দর্শনে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের অতিযোগ ; সর্ব্বদা দর্শন ক্রিয়ার অভাব ঘটিলে অযোগ এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, রৌদ্র, ভৈরব, অদ্ভুত, বিদ্বেষভাবাপন্ন, বীভৎস বা বিকৃতরূপ দর্শন করিলে চক্ষুর মিথ্যাযোগ হইয়া থাকে।

(খ) কর্ণ।

"তথাতিমাত্রস্তনিত পটহোৎ ক্রুষ্টাদীনাং শব্দানামতিমাত্রং শ্রবণমতিযোগঃ। সর্ব্বশোঽশ্রবণমযোগঃ। পরুষেষ্টবিনাশোপঘাতধর্ষণভীষণাদি শব্দ শ্রবণং মিথ্যাযোগঃ।"

ভীষণতম মেঘগর্জ্জন, গম্ভীর নাদী ঢক্কা প্রভৃতির নিনাদ অথবা অন্যবিধ উৎকট শব্দের অতিশয় শ্রবণে শ্রবণাতিযোগ; সর্ব্বথা শব্দাদির শ্রবণ অভাবে শ্রবণাযোগ এবং মানসিক উদ্বেগ জনক শব্দ, ইষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ, প্রিয় জনের অপঘাত বার্ত্তা অথবা মনের বিরক্তিকর ব্যক্তি বা স্থান বিশেষের নাম প্রভৃতি শ্রুতিগোচর হইলে, শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মিথ্যাযোগ হইয়া থাকে।

(গ) নাসিকা।

"তথাতিতীক্ষ্ণোগ্রাভিষ্যন্দিনাং গন্ধানামতিমাত্রং ঘ্রাণমতিযোগঃ। সর্ব্বশোঽঘ্রাণমযোগঃ। পূতিদ্বিষ্টামেধ্যক্লিন্নবিষপবনকুণপগন্ধাদিঘ্রাণং মিথ্যাযোগঃ।"

অতিতীক্ষ্ণ মরিচাদি, অতিশয় উগ্র চম্পকাদি ও অত্যন্ত অভিষ্যন্দি জ্যোতিষ্মতী (লতাপুটকি) প্রভৃতির গন্ধ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে ঘ্রাণজ অতিযোগ; একেবারেই গন্ধ গ্রহণ না করিলে অযোগ এবং পূতিগন্ধ, বিদ্বেষ জনক বস্তুর গন্ধ, অপবিত্র বস্তুর গন্ধ, ক্লেদ ভাবাপন্ন বস্তুর গন্ধ, বিষ দুষ্ট বস্তুর গন্ধ ও শবের গন্ধ প্রভৃতি গ্রহণ করিলে, ঘ্রাণজ মিথ্যাযোগ হইয়া থাকে।

(ঘ) জিহ্বা।

"তথা রসানামত্যাদানমতিযোগঃ। অনাদানমযোগঃ। মিথ্যাযোগো রাশিবর্জ্যেষ্বাহারবিধিষু বিশেষায়তনেষু পদিক্ষ্যতে।"

মধুরাদি রসের অতিশয় গ্রহণে জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের অতিযোগ, একেবারেই কোনরূপ রসের আস্বাদ গ্রহণ না করিলে অযোগ এবং প্রকৃতি, সংস্কার, সংযোগ, দেশ, কাল, আহারের উপযোগ নিয়ম ও উপযোক্ত ভোক্তা এই সকলগুলির মধ্যে কোন একটীর ও বিরুদ্ধউপক্রমে আহার গ্রহণ নিবন্ধনই রসনার মিথ্যাযোগ সংঘটিত হইয়া থাকে*;—সুতরাং আহার গ্রহণ সময়ে এই প্রকৃতি প্রভৃতি

---

* আহার বিষয়ক প্রবন্ধে এই প্রকৃতি প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইবে।

সকল গুলির প্রতি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য রাখা স্বাস্থ্যলাভের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

"তথা শীতোষ্ণানাং স্পৃশ্যানাং স্নানাভ্যঙ্গোৎসাদনাদীনাঞ্চাত্যুপসেবনমতিযোগঃ। সর্ব্বশোঽনুপসেবনমযোগঃ। বিষমস্থানাভিঘাতাশুচিভূতস্পর্শাদয়শ্চেতি মিথ্যাযোগঃ।"

অতিশয় শীত বা অতি উষ্ণ দ্রব্যের একান্ত স্পর্শন এবং স্নান, অভ্যঙ্গ (তৈলাদি মাখা) ও উৎসাদন (পাউডার ব্যবহার) প্রভৃতির অতিশয় ব্যবহার বশতঃ স্পর্শন ইন্দ্রিয় জাত অতিযোগ; একেবারে কোনরূপ বস্তুর সংস্পর্শ না ঘটিলে অযোগ এবং বিষম স্থান স্পর্শ (উচ্চনীচস্থানে শয়ন প্রভৃতি) অভিঘাত (প্রহার) অপবিত্র স্থানের সংস্পর্শ অথবা ভূতাদি দেবযোনির উপদ্রব নিবন্ধন, স্পর্শন ইন্দ্রিয়ের মিথ্যা যোগ হইয়া থাকে।

৭। কর্ম্ম।

কর্ম্ম কি? "কর্ম্ম বাঙ্মনঃ কায়প্রবৃত্তিঃ।" বাক্য মন বা শরীর দ্বারা যাহা কৃত হয়; তাহাই কর্ম্ম। অতএব বাচনিক, মানসিক ও কায়িক এই তিন প্রকার কর্ম্মের মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগ কথিত হইতেছে।

(ক) বাচনিক।

"সূচকানৃতাকালকলহাপ্রিয়াবদ্ধানুপচারপরুষবচনাদির্বাঙ্মিথ্যাযোগঃ।

সূচক (খলতাসূচকবাক্য) মিথ্যাকথা, অসময়ে বাক্য প্রয়োগ বিবাদ জনক বাক্য, অপ্রিয় কথন, অসংবদ্ধ বচন, প্রতিকূল বাক্য ও কর্কশ কথা প্রয়োগ প্রভৃতি বাক্যকৃত মিথ্যা যোগ।

(খ) মানসিক।

"ভয়-শোক-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মানের্ষ্যা মিথ্যাদর্শনাদি মানসো মিথ্যাযোগঃ।

ভয়, শোক, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অভিমান, ঈর্ষ্যা ও মিথ্যাদর্শন (নাস্তিকী বুদ্ধি) প্রভৃতি মানস মিথ্যাযোগ।

(গ) কায়িক ;

"বেগধারণোদীরণ-বিষম-স্খলন-পতন-প্রণিধানাঙ্গপ্রদূষণ-প্রহার-মর্দ্দন-প্রাণো-পরোধসংক্লেশনাদিঃ শারীরো মিথ্যাযোগঃ।

বহির্নিঃসরণশীল মলমূত্রাদির বেগ ধারণ বা অপ্রবর্ত্তনশীল মলাদির বেগ প্রবর্ত্তন ; বিষম ভাবে স্খলন, পতন বা অঙ্গ বিক্ষেপণ ; অঙ্গকণ্ডূয়ন, প্রহার বা অঙ্গমর্দ্দন প্রভৃতির অতিরিক্ত অনুষ্ঠান ; নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের অযথা ভাবে বেগ ধারণ (প্রাণায়াম—কুম্ভকাদির অযথা অভ্যাস) এবং সংক্লেশন (দীর্ঘকাল ব্যাপী কষ্টপ্রদ উপবাস প্রভৃতিতে আসক্তি) ; এই সমুদয় কায়কৃত মিথ্যাযোগ।

"সংগ্রহেণ চাতিযোগাযোগবর্জ্জ্যং কর্ম্ম বাঙ্মনঃশরীরজমাহিতমনুপাদিষ্টং যত্তচ্চ মিথ্যাযোগং বিদ্যাৎ।"

সংক্ষেপতঃ অতিযোগ বা অযোগ ভিন্ন, বাক্য, মন বা শরীরকৃত অহিত জনক ব্যাপার মাত্রকেই বাক্যাদির মিথ্যাযোগ বলিয়া জানিবে।

৮। প্রজ্ঞাপরাধ।

"ত্রিবিধবিকল্পং ত্রিবিধমেব চ কর্ম্ম প্রজ্ঞাপরাধ ইতি ব্যবস্যেৎ।"

অতিযোগ অযোগ বা মিথ্যাযোগ,—এই ভেদত্রয়বান্ বাক্য মন বা শরীর কৃত তিন প্রকার কর্ম্মকেই "প্রজ্ঞাপরাধ" বলিয়া জানিবে। "সেই প্রজ্ঞাপরাধ" কি ?

"ধী-ধৃতি-স্মৃতি বিভ্রষ্টঃ কর্ম্ম যৎ কুরুতেঽশুভম্।
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বোদোষ প্রকোপনম্॥

বুদ্ধি, ধৈর্য্য বা স্মৃতি পরিভ্রষ্ট হইয়া পরিণামে নিজের অশুভ জনক যে কায়িক বাচনিক বা মানসিক কর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে, তাহাকেই "প্রজ্ঞাপরাধ" বলিয়া জানিবে। এই "প্রজ্ঞাপরাধ" সকল প্রকার দোষের প্রকোপনে কারণ হইয়া থাকে।

বক্ষ্যমাণ অহিত জনক অনুষ্ঠান গুলি, কেবলমাত্র প্রজ্ঞাপরাধবশতই ভবিষ্যদ্ ব্যাধির কারণরূপে সংঘটিত হইয়া থাকে ;—

"উদীরণং গতিমতামুদীর্ণানাঞ্চ নিগ্রহঃ।
সেবনং সাহসানাঞ্চ নারীণাঞ্চাতি সেবনম্॥
কর্ম্মকালাতিপাতশ্চ মিথ্যারম্ভশ্চ কর্ম্মণাম্।
বিনয়াচারলোপশ্চ পূজ্যানাঞ্চাভিধর্ষণম্॥
জ্ঞাতানাং স্বয়মর্থানামহিতানাং নিষেবণম্।
পরমৌন্মাদিকানাঞ্চ প্রত্যয়ানাং নিষেবণম্॥
অকালাদেশসঞ্চারো মৈত্রী সংক্লিষ্ট কর্ম্মভিঃ।
ইন্দ্রিয়োপক্রমোক্তস্য সদ্বৃত্তস্য চ বর্জ্জনম্॥
ঈর্ষ্যামান ভয়ক্রোধ লোভমোহমদ ভ্রমীঃ।
তজ্জং বা কর্ম্ম যৎ ক্লিষ্টং ক্লিষ্টং যদ্দেহকর্ম্ম চ।
যচ্চান্যদীদৃশং কর্ম্ম রজোমোহ সমুত্থিতম্।
প্রজ্ঞাপরাধং তং শিষ্টা ব্রুবতে ব্যাধি কারণম্॥"

অপ্রবর্ত্তনশীল মল ও মূত্রের বহিঃনিঃসারণের চেষ্টা; প্রবর্ত্তমান মলাদির বেগ নিরোধ করা; নিজ অপেক্ষা সমধিক বলবান্ ব্যক্তির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবর্ত্তন প্রভৃতি অসম সাহসের কর্ম্মানুষ্ঠান; উদ্দাম প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস করা; কর্ম্ম কালের অযথা সময় অতিপাত করা অর্থাৎ দোষ বিশেষ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও যথাসময়ে যথাসম্ভব বমন বা বিরেচন প্রভৃতি দোষ সংশোধক ক্রিয়া না করিয়া নিশেষ্ট ভাবে অর্থাৎ যে পরিমাণ দোষের বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই দোষের অনুরূপ বমন বা বিরেচন ক্রিয়া না করিয়া দোষের উদ্রেক অপেক্ষা কম বা অধিক পরিমাণে সংশোধন প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা বিনয় বা আচার হইতে বিচ্যুত হওয়া; পূজনীয় ব্যক্তিগণের অবমান সূচক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া; জানিয়া শুনিয়া ও অহিত জনক আহার বা আচারাদিতে প্রবৃত্ত থাকা; উন্মত্তের ন্যায় হিতাহিত জ্ঞান পরিশূন্য হইয়া যাহা হইতে কোন রোগ উৎপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ কার্য্যে অর্থাৎ হঠযোগ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রসক্ত হওয়া; অসময়ে বিপৎসঙ্কুল নিষিদ্ধ স্থানে গমন করা; বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ভাবাপন্ন বা ভ্রষ্ট চরিত্র ব্যক্তিগণের সহিত সংসর্গ করা; চরকের ইন্দ্রিয়োপক্রমোক্ত অধ্যায়ে অভিহিত সদ্বৃত্তাদির উপদেশ;—যথা কাহাকেও সমুন্নত ও ঐশ্বর্য্য পরায়ণ সুখী দেখিলে, বিদ্বেষবশে সেই ব্যক্তির অনিষ্ট সাধনে চেষ্টা না করিয়া

সেই ব্যক্তি কিরূপ অধ্যাবসায় বলে তাদৃশ আশু অবস্থার অত্যুন্নতি সাধন করিয়াছে, সেইরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া; এই সকল উপদেশ পরম্পরা পরিত্যাগ করা; ঈর্ষ্যা, অভিমান, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও ভ্রান্তি প্রভৃতি প্রবৃত্তির তাড়নায় অথবা ঐ সকল কুপ্রবৃত্তি সমুদ্ভূত নিকৃষ্ট ব্যাপার পরিলিপ্ত হওয়া এবং রজ (অহঙ্কার) ও মোহ (অজ্ঞানতা) হইতে উৎপন্ন অপর যে সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে; আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ শিষ্টাচারপরায়ণ আচার্য্যগণ—এইরূপ নিষিদ্ধ কায়িক বাচনিক বা মানসিক যে কোন প্রকারেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, সেই সকলকেই সাক্ষাৎ ব্যাধির উৎপত্তির কারণ, "প্রজ্ঞাপরাধ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

৯। কাল।

"অর্থ" অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের এবং কায়িক, বাচনিক ও মানসিক তিন প্রকার কর্ম্মের বিষয় অভিহিত হইয়াছে; এবং এখন নির্দ্দেশ অনুযায়ী রোগ উৎপত্তির তৃতীয় কারণ কালের কথা বলা যাইতেছে;—

"শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণাঃ পুনর্হেমন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা সংবৎসরঃ। স কালঃ।"

সাধারণত শীত, উষ্ণ ও বর্ষণ এই লক্ষণ ত্রয়যুক্ত হেমন্ত (হেমন্ত ও শীত) গ্রীষ্ম (বসন্ত ও গ্রীষ্ম) এবং বর্ষা (বর্ষা ও শরৎ) সমন্বিত সংবৎসরই কাল।

"তত্রাতি মাত্রস্বলক্ষণঃ কালঃ কালাতিযোগঃ। হীনস্বলক্ষণকালঃ কালাযোগঃ। যথাস্বলক্ষণ বিপরীত লক্ষণস্তু কালমিথ্যাযোগঃ।"

সাধারণত দেশের প্রকৃতি অনুসারে যেরূপ শীত অনুভূত হইয়া থাকে, তদপেক্ষা সেই সময়ে অধিক শীতের প্রাদুর্ভাব হইলে, শীতের অতিযোগ, শীতকালে শীতের অভাব পরিলক্ষিত হইলে শীতের অযোগ এবং শীতকালে শীতের বিপর্য্যয়ে গ্রীষ্ম বা বর্ষা সম্বন্ধেও এই প্রকারে অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ হইয়া থাকে।

"কালঃ পুনঃ পরিণাম উচ্যতে।"

কালকেই পরিণাম বলা হইয়া থাকে, কারণ কালবশেই বস্তু মাত্রের অবস্থায় পরিবর্ত্তন সহকারে বিনাশ সংঘটিত হইয়া থাকে।

১০। বিকার ও প্রকৃতি।

"ইত্যসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি ত্রয়স্ত্রিবিধবিকল্পাঃ কারণং বিকারাণাম্। সমযোগযুক্তাস্তু প্রকৃতিহেতবো ভবন্তি।"

উল্লিখিত অসুখকর ইন্দ্রিয়বিষয় পরিগ্রহণ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম এই তিনটির প্রত্যেকেই অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ এই তিন প্রকার অবান্তর ভেদের সহিত যাবতীয় রোগের উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যেরূপ আহার ও আচার সংঘটিত হইলে, দেহের সমতা রক্ষিত হইয়া, শরীর বলবীর্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই প্রকৃতি এবং উহাই স্বাস্থ্যরক্ষার মূল।

১১। ব্যাধির প্রকার।

রোগ উৎপত্তির হেতুসমূহ প্রদর্শিত হইল। এখন ব্যাধির প্রকারভেদ ও কিরূপেই বা তাহার উপশম হইতে পারে, তাহা উল্লিখিত হইতেছে। চরক বলেন;—

"ত্রয়োরোগা নিজাগন্তুমানসাঃ। তত্র নিজঃ শরীরদোষসমুত্থঃ। আগন্তু র্ভূতবিষবায়্বগ্নি সংপ্রহারাদিসমুত্থঃ। মানসঃ পুনরিষ্টস্যালাভাল্লাভাচ্চানিষ্টস্যোপজায়তে।"

নিজ, আগন্তুক ও মানসিক ভেদে, ব্যাধি তিন প্রকার। তন্মধ্যে শারীরিক দোষ অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফাদিসম্ভূত ব্যাধিই নিজ অর্থাৎ দোষজাত। ভূতাদি দেবযোনি, বিষসংযোগ, অগ্ন্যুৎপাত বা প্রহার প্রভৃতি কারণ বশত আগন্তুক পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি বা বিরক্তিকর পদার্থের লাভ বশতঃ মানসিক ব্যাধির উদ্ভব হইয়া থাকে।

রোগের লক্ষণ বিনির্দ্দেশে সুশ্রুত বলিতেছেন;—

"তে (ব্যাধয়ঃ) চতুর্ব্বিধা আগন্তবঃ শারীরা মানসাঃ স্বাভাবিকাশ্চ। তেষামাগন্তবো অভিঘাতনিমিত্তাঃ। শারীরাস্ত্বন্নপানমূলা বাতপিত্ত কফশোণিত সন্নিপাতবৈষম্য নিমিত্তাঃ। মানসাস্তু ক্রোধশোকভয়হর্ষবিষাদের্ষ্যাভ্যসূয়াদৈন্যমাৎসর্য্যলোভকাম প্রভৃতয় ইচ্ছাদ্বেষৈর্ভবন্তি। স্বভাবিকাঃ ক্ষুৎপিপাসাজরামৃত্যুনিদ্রাপ্রভৃতয়ঃ।

ত এতে মনঃশরীরাধিষ্ঠানাঃ। তেষাং সংশোধন-সংশমনাহারাচারাঃ সম্যক্‌প্রযুক্তা নিগ্রহহেতবঃ।"

ব্যাধি চারি প্রকার, যথা—আগন্তুক, শরীর, মানস ও স্বভাবজাত। অভিঘাত (প্রহার প্রভৃতি) হইতে সমুদ্ভূত ব্যাধি, আগন্তুক। অন্নপান প্রভৃতির অযথা ব্যবহার নিবন্ধন উৎপন্ন বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত বা উহাদের পরস্পর সন্নিপাত (দুই বা বহু দোষের একত্র মিলন) ইহাতে শারীর অর্থাৎ দোষজ ব্যাধির উৎপত্তি) ক্রোধ, শোক, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, ঈর্ষ্যা, অভ্যসূয়া, দৈন্য, মাৎসর্য্য, লোভ ও কাম প্রভৃতি হইতে মনের ইচ্ছা বা দোষ বশত মানসিক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। আর ক্ষুধা, পিপাসা, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু ও নিদ্রা প্রভৃতি স্বাভাবিক ব্যাধি অর্থাৎ কালবশে যথা সময়ে এই সকল ঘটিয়া থাকে। *

দোষ ও তাহার প্রতীকার।

শরীর মন আশ্রয় করিয়াই ব্যাধি সমূহের সমুৎপত্তি। শারীর বা মানসিক রোগের হেতুভূত দোষ ও তাহার প্রশমনের উপায়ে চরক বলেন ;—

"বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চোক্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ।
মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টো রজশ্চ তম এব চ॥
প্রশাম্যত্যৌষধৈঃ পূর্ব্বো দৈবযুক্তি ব্যপাশ্রয়ৈঃ।
মানসো জ্ঞান বিজ্ঞান ধৈর্য্যস্মৃতি সমাধিভিঃ॥

বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিনটী শারীরিকদোষ এবং রজঃ (অহঙ্কার) ও তমঃ (মোহ) এই দুইটীই মানসিক দোষ বা তজ্জাত ব্যাধি সমূহ দৈব অর্থাৎ শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি এবং যুক্তি অর্থাৎ সংশমন বা সংশোধনার্থ প্রদত্ত ঔষধাদি প্রয়োগে প্রতীকার হইয়া থাকে। মানসিক ব্যাধির উপশমার্থ, জ্ঞান

* এস্থলে চরক, ব্যাধির সংখ্যা বিনির্দ্দেশে কেবল মাত্র বৈকৃতিক ব্যাধিরই সমুল্লেখ করিয়া ব্যাধি তিন প্রকার বলিয়া গিয়াছেন। সুশ্রুত বৈকৃতিকব্যাধির সহিত স্বাভাবিক ব্যাধিরও উল্লেখ করিয়া রোগের চারি প্রকার ভেদ, ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। স্বভাবজাত ব্যাধির উল্লেখ করা, এস্থলে চরকের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং এই কারণে এই বিষয় লইয়া আচার্য্য দ্বয়ের মতদ্বৈধ কল্পনা করা সুসঙ্গত নহে।

(কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুদ্ধি), বিজ্ঞান (জগৎ অসত্য কারণ পরিবর্ত্তনশীল ও ব্রহ্মই সত্য ইত্যাদি বোধ), ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি (যোগ) অবলম্বন প্রয়োজন।

১৩। শরীর দোষ ও তাহার প্রতিকার।

"রুক্ষঃশীতোলঘুঃসূক্ষ্মশ্চলোঽথ বিশদঃ খরঃ।
বিপরীতগুণৈর্দ্রব্যৈ মারুতঃ সংপ্রশাম্যতি॥
সস্নেহ মুষ্ণং তীক্ষ্ণঞ্চ দ্রবমম্লং সরং কটু।
বিপরীতগুণৈঃ পিত্তং দ্রব্যৈরাশু প্রশাম্যতি॥
গুরুশীত মৃদুস্নিগ্ধ মধুরস্থিরপিচ্ছিলাঃ।
শ্লেষ্মণঃ প্রশমং যান্তি বিপরীত গুণৈর্গুণাঃ॥
বিপরীতগুণ দেশমাত্রা কালোপপাদিতৈঃ।
ভেষজৈর্বিনিবর্ত্তন্তে বিকারাঃ সাধ্যসম্মতাঃ॥
সাধনং নত্বসাধ্যানাং ব্যাধীনামুপদিশ্যতে॥

রুক্ষ, শীত, লঘু, চলনশীল, বিশদ ও খর, এই কয়েকটি বায়ুর গুণ। ইহাদিগের বিপরীত অর্থাৎ স্নিগ্ধ, উষ্ণ, গুরু, স্থূল, মৃদু, পিচ্ছিল ও শ্লক্ষ্ণগুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের ব্যবহারে প্রবৃদ্ধ বায়ু উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

উষ্ণ, স্নেহ, তীক্ষ্ণ, তরল, অম্ল, সর, ও কটু এই গুলি পিত্তের সমান ধর্ম্ম অর্থাৎ পিত্তেতে এই সকল বর্ত্তমান থাকে, অতএব ইহাদিগের বিপরীত অর্থাৎ শীত, মন্দ, সান্দ্র, স্থির, কষায় ও মধুর গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের প্রয়োগে পিত্তের প্রকোপ দূরীভূত হইয়া থাকে।

গুরু, শীত, মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির ও পিচ্ছিল এই সমুদয় শ্লেষ্মার গুণ; ইহাদিগের বিপরীত অর্থাৎ লঘু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, ও কটু প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের ব্যবহার নিবন্ধন কফের প্রকোপ নিবারিত হইয়া থাকে।

দেশ, মাত্রা, এবং সময় প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বিপরীতগুণ বিশিষ্ট ঔষধে প্রয়োগ করিলে সাধ্য ব্যাধির নিশ্চয়ই উপশম হইয়া থাকে; কিন্তু অসাধ্য লক্ষণান্বিত রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে কোন উপায়েই পরিলক্ষিত হয় না।

১৪। উপসংহার।

শরীর রক্ষার জন্য অমৃতময় আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ গ্রহণ করা প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। কেন রোগ হয় এবং কিরূপেই বা সেই ব্যাধির কারণগুলি দূরীভূত করিতে সক্ষম হওয়া যায়, আয়ুর্ব্বেদ হইতে সংক্ষেপে তাহা যথাসাধ্য এই প্রস্তাবে প্রদর্শন করিতে প্রয়াস করা গিয়াছে।

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কবিরাজ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি।
২১ নং বাগবাজার, ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৫ই ফাল্গুন, ১৩২০ সাল।

(বৃন্দাবন দর্শনে)

কত কষ্ট করে এসেছি এবারে
সেই সে বৃন্দাবনে।
যেথানে গোপাল চরাত গোপাল
খেলিত গোপাল সনে॥ ১॥

এখানে যখন বাজাত মোহন
বাঁশরী চিকণ কালা।
লাজ তেয়াগিয়া উধাও হইয়া
ধাইত ব্রজের বালা॥ ২॥

শুনিয়া সে সুর ময়ূরী ময়ূর
নাচিত মেলায়ে পাখা।
পঞ্চমের সুরে কুহরে কুহরে
গাহিত মাধব সখা॥ ৩॥

যমুনার কূলে সে বাঁশী বাজিলে
উজান বহিত নদী।
মোহিত হইত জলচর যত
শুনিত সে সুর যদি ॥ ৪ ॥

শুনেছি পুরাণে এই বৃন্দাবনে
বাজায়ে মোহন বাঁশী।
খেলেন এখন (ও) মদন মোহন
কুঞ্জ কাননে আসি ॥ ৫ ॥

আসিয়া এখানে যমুনা পুলিনে
বেড়াইনু কত বনে।
দেখিনু রাখাল দেখিনু গোপাল
গোপাল নাহি সে সনে ॥ ৬ ॥

বলি কানু কানু কতই ডাকিনু
বসিয়া তমাল তলে।
পলকে পলকে চাহি চারিদিকে
বারেক হেরিব বলে ॥ ৭ ॥

শুনিতে বাঁশরী ঊর্দ্ধকর্ণ করি
গিয়াছি যমুনা তীরে।
দিবা বিভাবরী কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরি
কাঁদিয়া এসেছি ফিরে ॥ ৮ ॥

না হেরি শ্রীহরি না শুনি বাঁশরী
নয়নে বহিল ধারা।
মিলিয়া গোপালে শুধাই গোপালে
হইয়া আপন হারা ॥ ৯ ॥

কত জনে ধরি　　কর যোড় করি
শুধানু কোথায় হরি ।
বাউরা বলিয়া　　কেহ গালি দিয়া
কেহ গেল ব্যঙ্গ করি ॥ ১০ ॥

যে কানু হেরিতে　　যে বাঁশী শুনিতে
আইনু বৃন্দাবনে ।
দেখিনু এখানে　　সে মনোমোহনে
নাহিক কাহারো মনে ॥ ১১ ॥

সেই কৃষ্ণময়　　কারো প্রাণময়
নাহি সে ভকতি আর ।
তুলসীর কাটি　　ভালে পরিপাটি
তিলক এখন সার ॥ ১২ ॥

দেখিয়া শুনিয়া　　অবাক হইয়া
ভাসিয়া আঁখির নীরে ।
স্মরিয়া শ্রীহরি　　নমস্কার করি
ঘরেতে আইনু ফিরে ॥ ১৩ ॥

ভক্তির ধন　　মদন-মোহন
ভক্তি যাহার আছে ।
বৃন্দাবন তার　　হৃদয় মাঝার
হরিত তাহারি কাছে ॥ ১৪ ॥

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায় ।

কালিদাস ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

কালিদাস কবেকার লোক এ প্রশ্নের বহুস্থলে বহুবার আলোচনা হইয়াছে, তথাপি সেই পুরাতন কথা লইয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে বসিলাম, ক্ষমা করিবেন। আমার আজিকার প্রবন্ধের প্রয়োজন সংক্ষেপে বলিব।

দেশের কিংবদন্তী—উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভা ছিল, কালিদাস ঐ সভার অন্যতম রত্ন। বিক্রমাদিত্য সংবৎ চালাইয়া গিয়াছেন, আর আজ ১৯৭৩ বিক্রম সংবৎ চলিতেছে। অতএব ১৯৭৩ বৎসর পূর্ব্বে কালিদাসের বীণার মধুর ঝঙ্কার ভারতের গিরিশৃঙ্গ হইতে গিরিশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

এই কিংবদন্তী বহুকাল নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু গত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথমে ফারগুসন সাহেব ইহার প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ঠিক বটে, আর বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজা ইহাও মিথ্যা নহে, কিন্তু যে বিক্রমাদিতের অস্তিত্ব ১৯৭৩ বৎসর পূর্ব্বে ছিল বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতেছি, তিনি কালিদাসের বিক্রমাদিত্য নহেন। কালিদাসের বিক্রমাদিত্যের প্রকৃত নাম হর্ষ, নামান্তর বিক্রমাদিত্য। ইনি খৃষ্টের ৫৪৪ বৎসর পরে উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করেন।

এই মত ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অচিরে সমাদৃত হইয়া পড়িল। কিছুকাল পরে আবার জেকোবি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মতের ও সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে লাগিলেন। ক্রমে আর একটী নূতন মতের সৃষ্টি হইল। এই মতে বিক্রমাদিত্য বাহাল রহিলেন, কিন্তু উজ্জয়িনীতে নয়, এবারে মগধে। মগধরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পূর্ণনাম চন্দ্রপ্রকাশগুপ্ত, নামান্তর বিক্রমাদিত্য ইহাঁর পুত্রের নাম কুমারগুপ্ত। কালিদাস এই চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্ত এ উভয়ের রাজত্ব কালে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাই আধুনিক পণ্ডিত মণ্ডলীর মত। আমি এ মতের পক্ষপাতী নই বলিয়া অধ্যাপক সিলভেঁ লিভি ব্যঙ্গস্বরে বলিয়াছেন, "ভারতবাসী আমাদের শতবর্ষের পরিশ্রমের আদর করিতে শিখিল না"।

বলা বহুল্য ভারতবাসী অনেকেই এ মত গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। বিগত ১৯১৪।১৫ সালে আমি কবি ভাস্ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া ভিটা গ্রামে যে মাটির ফলক খানি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে কালিদাসের কালের আভাস পাওয়া যায় ও কালিদাস যে খৃষ্টের পূর্ব্বে জন্মিয়া ছিলেন সে বিষয়ে বড় একটা সংশয় থাকে না এরূপ মত প্রকাশ করি। এই কথা জানিতে পারিয়া সংপ্রতি বোম্বাই অঞ্চলের প্রাচীন ও খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বাপু পাঠক মহোদয় তাঁহার সম্পাদিত মেঘদূতের একখণ্ড গ্রন্থ আমাকে উপহার পাঠাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় দেখিলাম জেকোবি সাহেবের অনুসরণ করিয়া পণ্ডিত পাঠক মহোদয় কালিদাসকে চন্দ্রগুপ্ত (স্কন্দগুপ্ত) ও কুমারগুপ্তের সহিত তুল্যকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয় কালিদাসের কাল সম্বন্ধে ইহাই চরম কথা এরূপ আভাসও স্থানে স্থানে দিয়াছেন।

উপহার খানি ভিটা ফলকের জবাব একথা বুঝিতে অবশ্য বাকি রহিল না, আর ইহাও বুঝিলাম যে স্থানান্তরে কালিদাসের কাল সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতে যাইয়া জেকোবি প্রমুখ পণ্ডিতগণের মত কেন গ্রহণ করি নাই তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। অদ্যকার প্রবন্ধ আমার সেই কৈফিয়ৎ।

কালিদাসকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপুত্র কুমারগুপ্তের সহিত তুল্যকাল মনে করার জন্য প্রধানতঃ দুই প্রকার হেতু উপস্থাপিত করা হইয়া থাকে।

প্রথম—কালিদাসের গ্রন্থাবলীতে গুপ্ত রাজবংশের, বিশেষতঃ রাজা চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের, প্রতি বহুস্থলে ইঙ্গিত দেখা যায়। বাঙ্গালা দেশে স্বর্গীয় হরিনাথ দে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "কালিদাস" নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় ডাক্তার ব্লক ও পণ্ডিত রামাবতার শর্ম্মার নামে এই হেতুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। হরিনাথ বাবু বলেন—

"The date of Kalidasa has been at last conclusively settled by the industry of two enimeut scholars, viz, Dr. T. Bloch and Pandit Ramavatar Sarma, *Sahityacharya*, the results of whose researches, carried on independently of each other, happily agree in almost every detail. They have suc-

ceeded in satisfactorily proving from evidence, both internal and external, that the author of *Raghuvamsam* and *Kumarasambhavam* flourished during the reign of Chandra Gupta II, Vikramaditya, and that of his son Kumaragupta."

ইহার মর্ম্ম এই—"এতদিনে কালিদাসের কালের নির্ণয় হইল। কবির কথা হইতে ও বাহিরের প্রমাণ দেখিয়া ডাক্তার ব্লক ও পণ্ডিত রামাবতার শর্ম্মা সাহিত্যাচার্য্য স্থির করিলেন যে রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের রচয়িতা বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার পুত্র কুমার গুপ্ত এই দুয়ের রাজত্ব কালে প্রাদুর্ভূত হন"।

দ্বিতীয় শ্রেণীর হেতু এই যে কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয়ে হূণ জাতির যে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা পঞ্চম শতাব্দী ভিন্ন অন্য সময়ের সঙ্গে মিশ খায় না।

অগ্রে প্রথম প্রকারের হেতুর আলোচনা করা যাউক, দেখা যাউক কবির "ইঙ্গিত" কিরূপ।

রঘুবংশে আছে—"সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্। আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্"। ইত্যাদি। এখানে ডাক্তার ব্লক প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন গুপ্ত বংশের প্রথম রাজা সমুদ্রগুপ্তের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। নচেৎ 'আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্' এ বিশেষণ কেন? বিশেষণের অর্থ "সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহারা রাজা" অর্থাৎ "গুপ্তবংশের রাজা" এরূপও করা যায়। অবশ্য অবিকল সমুদ্রগুপ্ত শব্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু তাঁহারা বোধ করি ভাবিতেছেন, যেমন ভীম বলিলে ভীমসেন বুঝি তেমনি সমুদ্র শব্দে সমুদ্রগুপ্ত বুঝিতে পারা যায়।

অন্যত্র কবি বলিতেছেন—"তস্মৈ সভ্যাঃ সভার্য্যায় গোপ্ত্রে গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ। অর্হণামর্হতে চক্রুর্মুনয়ো নয়চক্ষুষে"। আবার—"তামন্তিকন্যস্তবলিপ্রদীপামন্বাস্য গোপ্তা গৃহিণীসহায়ঃ ক্রমেণ সুপ্তামনু সংবিবেশ সুপ্তোত্থিতাং প্রাতরনূদতিষ্ঠৎ"॥ ইহারা বলেন এ উভয় স্থলে গুপ্ত বংশের স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকে গুপ্ত না হইয়া গোপ্তৃ হইয়াছে, কিন্তু এ সামান্য প্রভেদ উপেক্ষার যোগ্য।

পুনশ্চ দেখুন ইহাঁদের মতে "শরীরসাদাদসমগ্রভূষণা মুখেন সালক্ষ্যত লোধ্রপাণ্ডুনা। তনুপ্রকাশেন বিচেয়তারকা প্রাভতকল্পা শশিনেব সর্ব্বরী।" এই শ্লোকে রাজা চন্দ্রপ্রকাশের নাম রহিয়াছে। 'তনুপ্রকাশেন' শব্দে রাজার নামের 'প্রকাশ' অংশটুকু আছে, আর 'শশিনা' শব্দে চন্দ্রকে লক্ষ্য করা হইতেছে। দুই জড়াইয়া 'চন্দ্রপ্রকাশ' নামটী পাইতেছি।

ইঁহারা কুমারগুপ্তের নামও দেখিতে পাইতেছেন। "ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ম্। আকুমারকথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ॥" এই শ্লোকে কুমার শব্দ আছে। আর 'গোপ্তুঃ' ও 'গোপ্যঃ' এই দুই হইতে 'গুপ্ত' শব্দ পাওয়া যায়।

যুক্তির সমর্থনে এ কয়টি ছাড়া আরও বহুতর শ্লোক আছে কিন্তু সবই এই একই ছাঁচে ঢালা।

উত্তরে বলি এ যুক্তির বহুদোষ। প্রথমতঃ এতে গুরুতর অনিষ্ট প্রসঙ্গ হইতেছে। যে সকল গ্রন্থ স্পষ্টই গুপ্ত রাজত্বের সময়ের নয়, এ যুক্তি মানিলে সে গুলিও গুপ্ত সময়ের হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন গ্রন্থে প্রায়ই দেখা যায় যে গুপধাতু ও রক্ষ ধাতু একার্থক হইলেও গুপধাতুর প্রয়োগই বেশী। অর্থাৎ সে সকল গ্রন্থে গুপ্ত, গোপ্তা, গোপা, প্রভৃতি শব্দের ছড়াছড়ি দেখিতে পাই। সে গুলিকেও তাহা হইলে গুপ্ত সময়ের গ্রন্থ বলিতে হয়। কুতূহলী হইয়া সেদিনে যদৃচ্ছাক্রমে মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের স্থানে স্থানে দেখিতেছিলাম। ১৫ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে দেখিলাম—"নাতঃ কার্য্যতমং মন্যে রণে ভীষ্মস্য রক্ষণাৎ। হন্যাৎ গুপ্তোহ্যসৌ পার্থান্ সোমকাংশ্চ সসৃঞ্জয়ান্।" এতে গুপ্ত শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। উহারই ২০ শ্লোক এই—"বামং চক্রং যুধামন্যুরুত্তমৌজাশ্চ দক্ষিণম্। গোপ্তারৌ ফাল্গুনং প্রাপ্তৌ ফাল্গুনশ্চ শিখণ্ডিনম্।" এখানে আছে গোপ্তৃ শব্দ। সেখানটা ছাড়িয়া ৫২ অধ্যায়ে গেলাম, দেখিলাম ২১ শ্লোকে আছে —"সৈন্ধবপ্রমুখৈগুপ্তঃ প্রাচ্যসৌবীরকেকয়ৈঃ। সহসা প্রত্যুদীয়ায় ভীষ্মঃ শান্তনবোঽর্জ্জুনম্॥" এতে গুপ্ত শব্দ স্পষ্টই রহিয়াছে। ৫৬ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে আছে—"ততোঽভূদ্ দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠো বামপার্শ্বমুপাশ্রিতঃ। সর্ব্বস্য জগতো গোপ্তা বস্তু গোপ্তা ধনঞ্জয়ঃ॥" এতে গোপ্তৃ শব্দ এক জোড়াই আছে! ৬০ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে পাইলাম—"প্রকল্পিতং গুপ্তমুদায়ুধেন কিরীটিনা লোকমহারথেন।

তং ব্যূহরাজং দদৃশুস্তু দীপ্তাশ্চতুশ্চতুর্ব্যালসহস্রকীর্ণম্॥" এখানে আবার অবিকল গুপ্ত শব্দ। ৬১ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে দেখা গেল—"তেন কীর্ত্তিমতা গুপ্তমনীকং দৃঢ়ধন্বনা। প্রবৃক্তরথনাগাশ্বং যোৎস্যমানমশোভত॥" এতেও অখণ্ড গুপ্ত শব্দ—ইত্যাদি কত বলিব।

যুক্তিসাদৃশ্যে যদি বলি এ সব গুপ্ত বংশের প্রতি ইঙ্গিত ও বেদব্যাস গুপ্ত বংশের সময়ের লোক, তাহা হইলে অন্ততঃ ব্লক সাহেবের দল আপত্তি করিতে পারেন না। বাল্মীকিরও ঐ গতিই হয়। এমন কি বেদকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মাও বাদ যান না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কৃত সূচী হইতে দেখা যায় বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতিতে গুপধাতুর এই প্রকার প্রয়োগ বিস্তর রহিয়াছে।

যথা—"সততমাত্মানং গোপায়ীত" "বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" "রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্" ইত্যাদি। এই যুক্তি অনুসারে এ লেখা গুলিকেও গুপ্ত সময়ের বলিয়া ধরিতে হয়। তা ছাড়া বি পূর্ব্বক ক্রম ধাতুর প্রয়োগে বিক্রমাদিত্যের প্রতি লক্ষ্য মনে করা এ যুক্তির সম্পূর্ণ অনুযায়ী। তবে এই নিন্ সোনায় সোহাগা—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্" পুনশ্চ "ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপাঃদাভ্যঃ"—এক আধারে গুপ্ত বংশ ও বিক্রমাদিত্য উভয়ই পাইতেছি। এর পর ঋগ্বেদ খানি গুপ্ত বংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের লেখা একথায় আপত্তি চলে না।

এই গেল প্রথম শ্রেণীর দোষ। দ্বিতীয়তঃ দেখি এ যুক্তির মহাত্ম্যে কালিদাসের অকৌশল—ছন্দোরচনায় অপটুতা—আসিয়া পড়িতেছে। কারণ যুক্তি হইতে বুঝিতেছি যে রাজা চন্দ্রগুপ্ত ও রাজা কুমারগুপ্ত যে তাঁহার মনিব, ও তাঁহারা যে গুপ্ত বংশের রাজা এ কথা কবি তাঁহার গ্রন্থে বুঝাইবার জন্য ব্যস্ত, স্থানে অস্থানে নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ভাষায় দখল এতই কম, ছন্দের অনুশীলনে এতই অনভ্যাস, যে একবারও চন্দ্রগুপ্ত বা কুমারগুপ্ত শব্দ স্পষ্ট ভাবে ষোল আনা উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না! গুপ্ত শব্দ বুঝাইতে যাইয়া বহুস্থলে গোপ্তৃ, গোপী, গোপা প্রভৃতির প্রয়োগেই শ্রম সার্থক মনে করিতেছেন!! কবি ইচ্ছা করিলে অবিকল চন্দ্রগুপ্ত ও কুমার গুপ্ত শব্দের উচ্চারণ করিতে পারিতেন না একথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। কালিদাসের কথা ছাড়িয়া দিন এই সেদিনকার একজন নগণ্য কবি তাঁহার একটী পদ্যে চন্দ্র শব্দের ভূরি প্রয়োগ

করিতে যাইয়া লিখিলেন—"শ্রীরামচন্দ্র তুবি বিস্তৃতকীর্তিচন্দ্র স্মেরাস্যচন্দ্র রজনীচরপদ্মচন্দ্র। আনন্দচন্দ্র রঘুবংশসমুদ্রচন্দ্র সীতামনঃকুমুদচন্দ্র নমো নমস্তে।" চারি ছত্র পদ্যে সাতটা আস্ত চন্দ্র। এ কবি মহানাটক গ্রন্থের সংগ্রাহক মধুসূদন মিশ্র। এ কেও ইহারা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের লোক বলিবেন কি ?

তৃতীয়তঃ, এযুক্তির আর একটী গুরুতর দোষ—ইহা কালিদাসের অবিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। দেখুন সমুদ্রগুপ্তই যে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইহা বলিবার জন্য কবি যে শ্লোকটী লিখিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, সে শ্লোকটীতে আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্ শব্দটীই কবির লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। অন্য শব্দ গুলি আনুষঙ্গিক মাত্র। তাহা হইলে যাহাতে প্রথমেই ঐ শব্দের প্রতি প্রধান ভাবে পাঠকের দৃষ্টি পড়ে তেমন করিয়া শ্লোক রচনা করা উচিত ছিল। আসমুদ্রক্ষিতীনাশাম্ শব্দ শ্লোকের গোড়ায় দিলে তাহা হইত। এখন নজর পড়িতেছে শ্লোকের আদিতে স্থিত সোঽহম্ এই কথার উপর—কবির নিজের উপর। এটী কবির অভিপ্রায়ের অন্তরায়—তাঁহার অবিবেচনার দৃষ্টান্ত। "আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্। সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্॥" এইরূপ লিখিলে উভয়দিক রক্ষা হইত।

এ অপেক্ষা গুরুতর অবিবেচনার স্থল "শরীরসদাদসমগ্রভূষণা" ইত্যাদি ডাক্তার ব্লকের উদ্ধৃত শ্লোক। এ শ্লোকে কবির যে শশী অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত তাহাকে তনুপ্রকাশ বলা হইল। তনুপ্রকাশ শব্দের অর্থ তনু অর্থাৎ অতি অল্প প্রকাশ অর্থাৎ দীপ্তি যার। অতএব এতে বুঝা গেল চন্দ্রগুপ্তের তেজের হানি হইয়াছে। এটী মনিবের অমঙ্গলের সূচক। আবার দেখুন রঘুর ১৯ সর্গে আছে "দক্ষ শাপ ইব চন্দ্রমক্ষিণোৎ"—দক্ষেরশাপ যেমন চন্দ্রের ক্ষয় ঘটাইয়াছিল তেমনি। এতে মনিবের পাপ ও তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সঙ্কট পীড়ার আশঙ্কা জন্মাইতেছে। আবার অষ্টমে আছে "নিমিমীল নরোত্তমপ্রিয়া হৃতচন্দ্রাতমসেব কৌমুদী" এতে রাহু কর্তৃক চন্দ্রের গ্রাসের উল্লেখ করিয়া কবি মনিবের মৃত্যুর কথা উপস্থাপিত করিতেছেন।

এ ক্ষেত্রে ইহাই যথেষ্ট, আর বলা অনাবশ্যক। বস্তুতঃ ডাক্তার ব্লকের যুক্তিতে সাহেবেরা বাহবা দিতে হয় দিন্, কিন্তু ভারতবাসী হরিনাথ বাবু কি দেখিয়া ভুলিলেন তাহা আমাদের চর্ম্মচক্ষে লক্ষিত হইতেছে না।

ব্লক সাহেব ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ সকলেই বুদ্ধিমান তথাপি এ গুরুতর দোষ গুলি দেখিলেন না কেন? ইহার একমাত্র উত্তর—পঞ্চম শতাব্দীর মোহ। আগে হইতেই ইহারা পঞ্চম শতাব্দীর দিকে ঝুঁকিয়া আছেন, তাই, যেমন কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদ 'ক' দেখিলেই কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদিতেন সেইরূপ ইহারাও 'গ' দেখিলেই গুপ্ত বংশ বুঝিয়া বসিতেছেন।

ভাল এ ঝোঁক ইহাদের কোথা হইতে আসিল, এ গুরুতর মোহের কারণ কি? অনুসন্ধানে দেখি—আর বোম্বাই হইতে প্রেরিত মেঘদূত খানি হইতেও বুঝিলাম—কারণ প্রধানতঃ কালিদাসের রঘুদিগ্বিজয়ের বর্ণনা। অধ্যাপক পাঠক মহোদয় এ প্রসঙ্গে এই কয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন:—"ততঃ প্রতস্থে কৌবেরীং ভস্বানিব রঘুর্দিশম্। শরৈরুস্রৈরিবোদীচ্যানুদ্ধরিষ্যন্ রসানিব॥ বিনীতাধ্বশ্রমাস্তস্য বঙ্ক্ষুতীরবিচেষ্টনৈঃ। দুধুবুর্বাজিনঃ স্কন্ধান্ লগ্নকুঙ্কুমকেশরান্॥ তত্র হূণাবরোধানাং ভর্ত্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্। কপোলপাটনাদেশি বভূব রঘুচেষ্টিতম্।"

ভাব এই—"তারপর রঘু উত্তরদিক জয় করিতে গেলেন। পথ অতিক্রম করিয়া ক্লান্ত অশ্বগুলি বঙ্ক্ষু নদীর তীরে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, তাহাদের স্কন্ধে কুঙ্কুম লাগিয়া গেল। সেখানে রঘু হূণদিগের উচ্ছেদ করিলেন।"

একাদশ শতাব্দীতে অমর কোষের টীকাকার ক্ষীরস্বামী কুঙ্কুমের পর্য্যায়ে বাহ্লীক শব্দের টীকা করিতে যাইয়া উদ্ধৃত অংশের চতুর্থ পঙ্‌ক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিলেন—"বাহ্লীকদেশজং বাহ্লীকম্। যদ্রঘোরুত্তরদিগ্বিজয়ে—দুধুবুর্বাজিনঃ স্কন্ধান্ লগ্নকুঙ্কুমকেশরান্"। পাশ্চত্য পণ্ডিতগণের অনুসরণ করিয়া পণ্ডিত পাঠক মহোদয় এখানে ক্ষীরস্বামীর বাহ্লীক শব্দে Bactria বুঝিয়াছেন ও তাহা হইতে কালিদাসের সময়ে Bactria তে হূণ জাতির আবাস ছিল এ অনুমান করিয়াছেন।

"......Kshiraswahim tells us that the country described in these verses is the Balhikadesa or Bactria"—Pathaka's Meghaduta, Introd., p viii. ভাব এই—"ক্ষীরস্বামী বলেন এ শ্লোক গুলিতে বাহ্লীকদেশকে লক্ষ্য করা হইতেছে। বাহ্লীকও Bactria একই"। আবার বহুতর প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে

হূণেরা পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে Bactria তে আসে নাই। তবেই হইল কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন।

এর বিপক্ষে বক্তব্য বাহ্লীক শব্দে হালে আমরা আমাদের পাশ্চাত্য গুরু-গণের উপদেশে কি বুঝিতে শিখিয়াছি, তাহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ক্ষীরস্বামী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, তাঁহার বাহ্লীক Bactria নাও হইতে পারে। অতএব দেখা যাউক সংস্কৃত গ্রন্থে বাহ্লীক দেশটী কোথায় রাখা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে মহাভারত অপেক্ষায় বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

কর্ণ পর্ব্বে কর্ণ ও শল্যে বচসা হইতেছে। বাহ্লীক দেশ মদ্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল সেই কথা লক্ষ্য করিয়া কর্ণ শল্যের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—পঞ্চ নদ্যো-বহন্ত্যেতাঃ যত্র পীলুবনান্যুত। শতদ্রুশ্চ বিপাশাচ তৃতীয়েরাবতীতথা॥ চন্দ্র-ভাগা বিতস্তা চ সিন্ধুষষ্ঠা মহানদী। আরট্টা নাম বাহ্লীকা এতেষার্য্যো হি দো বসেৎ॥ ...পঞ্চনদ্যো বহন্ত্যেতাঃ যত্র নিঃসৃত্য পর্ব্বতাৎ। আরট্টা নাম বাহ্লীকাঃ নৈতেষার্য্যো দ্ব্যহং বসেৎ॥...আরট্টা নাম তে দেশা বাহ্লীকং নাম তদ্বনম্।”—ভাব এই—“যেখানে শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, সিন্ধু এই নদী গুলি বহিয়া চলিয়াছে ও পীলুর বন রহিয়াছে, সেইটী আরট্ট বা বাহ্লীক দেশ। ঠিক যেখানে পর্ব্বত হইতে নদীগুলি বাহিরে আসিয়াছে সেই স্থানই আরট্ট বা বাহ্লীক দেশ। দেশের নাম আরট্ট বনের নাম বাহ্লীক”॥ এতে মনে হয় বর্ত্তমানে উত্তর পঞ্জাব যে স্থান অধিকার করিয়া আছে সেখানে পূর্ব্বে এক বিশাল বন ছিল—পীলুবন। সেই বন ভূমির নাম ছিল বাহ্লীক, আর সমগ্র দেশটার নাম ছিল আরট্ট, কিন্তু ঐ বন সম্পর্কে দেশটাকেও বাহ্লীক বলিত। আরট্ট সম্ভবতঃ এখন যে স্থান ‘আটক’ (Attock) বলিয়া পরিচিত তাহাই হইবে।

আবার দেখুন বাহ্লীকের একটী লোক বহুকাল কুরুকুলে থাকিয়া দেশের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, বলিতেছেন—“সা নূনং বৃহতী গৌরী সূক্ষ্মকম্বলবাসিনী। মামনুস্মরতী শেতে বাহ্লীকং কুরুবাসিনম্॥ শতদ্রুং ণুকদা তীর্ত্বা তাঞ্চরম্যামিরাবতীম্ গত্বা স্বদেশং দ্রক্ষ্যামি স্থূলজঙ্ঘাঃ শুভাঃ স্ত্রিয়ঃ॥—মহাভারত কর্ণ পর্ব্ব। অর্থাৎ পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া শতদ্রু পার হইয়া ইরাবতীর পশ্চিমে যাইয়া পড়িলেই বাহ্লীক দেশ। পানিনি এদেশকে বাহীক দেশ বলিয়া গিয়াছেন। শাকল ইহার রাজধানী ছিল। কর্ণ

পর্ব্বের ৩৭ অধ্যায়ে আছে "বাহ্লীকেষ্ববিনীতেষু প্রোচ্যমানং নিবোধ তৎ। তত্র স্ম রাক্ষসী গাতি সদা কৃষ্ণচতুর্দ্দশীম্ ॥ নগরে শাকলে স্ফীতে আহত্য নিশি দুন্দুভিম্ ॥" সার এই—"বাহ্লীক দেশে একটা কথা আছে যে সেখানে শাকল নামক মহানগরে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে একটা রাক্ষসী গান গাইয়া বেড়াইত"। সভাপর্ব্বের ৩৫ অধ্যায়ে আছে—"ততঃ শাকলমভ্যেত্য মদ্রাণাং পুটভেদনম্। মাতুলং প্রীতিপূর্ব্বেণ শল্যং চক্রে বশে বলী ॥" তাৎপর্য্য এই—"মদ্র দেশের রাজধানী শাকল নগরে যাইয়া মাতুল শল্যকে বশ করিলেন"। পানিনির সময়ে শাকলের অবস্থা হীন হইয়াছে, উহা গ্রামমাত্রে পরিণত হইয়াছে। "অব্যয়াত্ত্যপ্" এই সূত্রে ভাষ্যকার বলিতেছেন—"শাকলং নাম বাহীকগ্রামঃ"। পাশ্চত্য পণ্ডিতেরা বলেন শাকলের বর্ত্তমান নাম শিয়ালকোট।

যদি তাহাই হইল তবে কোথায় Bactria আর কোথায় বাহ্লীক! বাহ্লীক ও কাশ্মীর গায়ে গায়ে। উভয়ই কুঙ্কুমের জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। অমর কুঙ্কুমের পর্য্যায়ে দেশের হিসাবে কাশ্মীর ও বাহ্লীক এই দুইটী মাত্র নাম দিয়াছেন। অন্য অভিধানেও উহার দেশসংসৃষ্ট অপর কোনও নাম নাই। কালিদাসের বর্ণনার বিষয় হয় কাশ্মীর নয় বাহ্লীক, অন্য কোনও তৃতীয় দেশ নহে। অতএব ক্ষীর-স্বামীর কথায় Bactriaর প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না।

কিন্তু পঞ্চম-শতাব্দীর ভক্তেরা এতে ভয় পাইবার নহেন। তাঁহারা মনে করেন এখানে ক্ষীরস্বামীকে ছাড়িয়া দিলেও পঞ্চমের পোষক অন্য প্রমাণ আছে। বর্ণনায় কালিদাস বঙ্ক্ষুনদীর নাম করিতেছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে বঙ্ক্ষু ও Oxus একই নদী। তাই যদি হয় তবে ক্ষীরস্বামীকে দিয়া দরকার কি, বঙ্ক্ষু হইতে Oxus পাইতেছি, আর Oxus নদী Bactriaতে আছে এ প্রসিদ্ধ কথা। পণ্ডিত পাঠক বলেন—"It is watered by the river Vankhu……The identity of Vankhu with the Oxus river has been already proved in another paper……Vankhu or Vankhu appears as the name of the Oxus river both in the St. Peter'sburgh Lexicon and in the Dictionary of Sir Monier Williams"—Megha, Introd.,

pp. viii—ix. সার এই—"এই দেশ দিয়া বঙ্‌ক্ষু নদী বহিতেছে। প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি যে বঙ্‌ক্ষু বা বক্ষু ও Oxus একই নদী। সেণ্ট পিটার্স্‌বর্গ অভিধান ও মনিয়ার উইলিয়মসের অভিধান উভয়েই আছে বঙ্‌ক্ষু বা বক্ষু Oxus নদীর নামান্তর"। অতএব আবার সেই Bactria তে হূণের বাস আসিয়া পড়িতেছে ও কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর উপরে উঠিতে পারিতেছেন না।

এর উত্তরে প্রথম কথা—এখানে "সিন্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ" এ পাঠান্তর আছে। টীকাকারেরা অনেকে "বঙ্‌ক্ষুতীরবিচেষ্টনৈঃ" পাঠ ধরিয়াছেন সত্য, কিন্তু মল্লিনাথের পাঠ "সিন্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ"। ক্ষীরস্বামীর পাঠ কি ছিল তিনি স্পষ্ট কিছু বলেন নাই, জানার চেষ্টা করা যাউক। ভাল, বলুন দেখি ক্ষীরস্বামী এখানে কি দেখিয়া বলিলেন, যে এ বাহ্লীক দেশের বর্ণনা? ইনি কি হূণের উল্লেখ দেখিয়া ওরূপ ভাবিলেন? তাহা নহে। কারণ ক্ষীরস্বামী ১১শ শতাব্দীর লোক, তখন বাহ্লীক—ক্ষীরস্বামীর বাহ্লীক—হূণদিগের আবাস ছিল বলিয়া জানা যায় না। দেশের বর্ণনায় লোকে নিজের সময়ের অবস্থাই ভাবিয়া থাকে। কালিদাস ও, রঘুর সময়ে হূণেরা কোথায় ছিল সে কথা ভাবেন নাই, ইহাই আমরা ধরিয়া লইতেছি নতুবা পঞ্চমের ভক্তগণের যুক্তির এই খানেই মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। অতএব হূণের উল্লেখ হইতে এ বাহ্লীকদেশ ক্ষীরস্বামী এরূপ মনে করেন নাই।

তবে কি কুঙ্কুমের কথা রহিয়াছে বলিয়া বাহ্লীক মনে হইল? তাহাও নহে। কারণ বাহ্লীক দেশে কুঙ্কুম জন্মে এ কথার প্রমাণের জন্যই ক্ষীরস্বামী রঘু দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত ক্ষীরস্বামীর টিপ্পনী দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কুঙ্কুমের অন্য নাম বাহ্লীক। কেন? ক্ষীরস্বামীর উত্তর—কারণ এ বস্তু বাহ্লীক দেশে জন্মে (বাহ্লীকদেশজং বাহ্লীকম্)। বাহ্লীক দেশে জন্মে কিসে জানিলে? স্বামী বলিলেন—এই দেখ রঘুর উত্তর দিগ্বিজয়ে বাহ্লীক দেশে কুঙ্কুমের উৎপত্তির কথা আছে। যদি কুঙ্কুমের উল্লেখ দেখিয়া বাহ্লীক দেশ ভাবিতেন তাহা হইলে যুক্তি এরূপ হইত—বাহ্লীক ভিন্ন কোথাও কুঙ্কুম জন্মে না। এদেশে কুঙ্কুম জন্মে। অতএব এ বাহ্লীক দেশ। এখানে যুক্তি প্রয়োগের আরম্ভেই একটী ভুল কারণ কাশ্মীরেও কুঙ্কুম জন্মে। তা ছাড়া বাহ্লীকে জন্মে এ ধরিয়া লওয়া

হইল, এটী প্রমাণ করার কথা। তবেই হইল এখানে কুঙ্কুমের উল্লেখ হইতে বাহ্লীকের অনুমান হয় নাই। যদি হূণ থেকেও না হয়, কুঙ্কুম থেকে ও না হয়, তবে বর্ণনায় আর কি আছে যে তাহা হইতে এটী বাহ্লীক দেশ বলিয়া জানা যাইতেছে? কবি এর অব্যাহিত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, রঘু পারসীকদিগকে জয় করিলেন। তারপর বলিতেছেন "ততঃ প্রতস্থে কৌবেরীম্" ইত্যাদি। এর অর্থ এমন নয় যে, পূর্ব্ব বর্ণিত যে দেশ তাহারই উত্তরে গেলেন। পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এই হিসাবে দেশবিভাগ বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে। কোনও প্রসিদ্ধ স্থানকে কেন্দ্র ধরিলে তাহারই পূর্ব্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে যে সকল দেশ ভারতের মধ্যে বা তাহার আসন্ন প্রান্তভাগে পাওয়া যায় সেইগুলিই যথাক্রমে পূর্ব্বদিক, দক্ষিণদিক ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। মহাভারতে তাহাই দেখি, রঘুতেও তাহাই আছে। "স যযৌ প্রথমং প্রাচীম্" বলিয়া কালিদাস ২৮ শ্লোকে দিগ্বিজয় বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সুহ্ম, বঙ্গ, উৎকল, কলিঙ্গ জয় করিয়া পূর্ব্বদিক শেষ করিলেন। যখন সুহ্ম হইতে কলিঙ্গাভিমুখে চলিলেন তখন দক্ষিণ মুখে গেলেন সত্য, কিন্তু দেশবিভাগের হিসাবে কলিঙ্গ পার না হওয়া পর্য্যন্ত কবি বলিতেছেন রঘু পূর্ব্বদিকেই রহিলেন। কলিঙ্গ অতিক্রমের পর ৪৪ শ্লোকে কবি বলিতেছেন—

"ততো বেলাতটেনৈব ফলবৎপূগমালিনা।
অগস্ত্যাচরিতামাশামনাশাস্তজয়ো যযৌ॥"

এইবারে রঘুর দক্ষিণে প্রবেশ হইল। সহ্যাদ্রি পার হইয়া পশ্চিমদিক জয় করিতে লাগিলেন। পারসীক দেশ জয় হইলে পশ্চিম শেষ হইল। তারপর উত্তরে আসিলেন। পারসীকদের উত্তরে আসিলেন এ অর্থ নহে। দেশ বিভাগে যে গুলি উত্তর দেশ বলিয়া গণ্য, সে গুলি জয় করিতে আরম্ভ করিলেন ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু পশ্চিম হইতে উত্তরে আসিতে গেলে প্রথম দেশই বাহ্লীক কিনা তাহা বর্ণনা হইতে বুঝা যায় না। আর উত্তরের প্রথম দেশেই একটা যুদ্ধ হইল, তাহারই বর্ণনা কবি করিতেছেন এরও আভাস পাওয়া যায় না। অনেক দেশ কবি ছাড়িয়া গিয়াছেন। এই দেখুন পূর্ব্ব বিজয়ে মগধ দেশের উল্লেখ নাই। অতএব—"ততঃ প্রতস্থে কৌবেরীম্" এ হইতেও বাহ্লীকের অনুমান হয় নাই। তবে এ অনুমানের মূল কি? আমি বলি ক্ষীরস্বামীর

পাঠ "সিন্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ"—তিনি সিন্ধু দেখিয়া বাহ্লীকের অনুমান করিয়াছেন, কারণ তিনি জানিতেন বাহ্লীক দেশ ধৌত করিয়া সিন্ধু প্রবাহিত হইতেছে।

যদি ক্ষীরস্বামী ও মল্লিনাথ উভয়েরই পাঠ "সিন্ধুতীর বিচেষ্টনৈঃ হইয়া থাকে, তবে অপর টীকাকারেরা যাহা বলিতে হয় বলুন, "বঙ্‌ক্ষুতীরবিচেষ্টনৈঃ" এ পাঠ সম্পূর্ণ উপেক্ষার যোগ্য ও এই পাঠ ধরিয়া পক্ষম বাদীরা যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা নিতান্তই হেয়।

তথাপি মহতের ধৃত বলিয়া "সিন্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ" ইহাই প্রকৃত পাঠ, আর "বঙ্‌ক্ষুতীর বিচেষ্টনৈঃ" এই পাঠের পক্ষপাতিগণের মধ্যে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম নাই, অতএব উহা কবির পাঠ নহে, এরূপ বলা সঙ্গত হইবে না। অতএব দেখা যাউক "বঙ্‌ক্ষুতীরবিচেষ্টনৈঃ" পাঠের ফলাফল কি।

বঙ্‌ক্ষু নদীর নাম বড় একটা শুনা যায় না। পুরাণে বঙ্‌ক্ষু, বক্ষু ও চক্ষু এই তিন নামে একই নদী বর্ণিত হইয়াছে। Asiatic Researches গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে কাপ্তেন উইলফোর্ড সাহেব এই নদীকে Oxus নদীর সহিত অভিন্ন মনে করিয়া গিয়াছেন। কাপ্তেন সাহেবের কণ্ঠস্বর এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা উইলফোর্ড সাহেবেরই অনুসরণ করিতেছেন। উইলফোর্ড সাহেব বলেন—"...The fourth is the APARA GANDIKA or Western GANDIKA called more generally the CHAKSHU. It flows toward the west, and its present name among the natives toward its source, is Cocsha, and from the former is derived its Greek appellation Oxus—Asiatic Researches, vol. vii, p. 309. তাৎপর্য্য এই—"চতুর্থ নদী অপরগণ্ডিকা, সাধারণতঃ ইহাকে চক্ষু বলে। চক্ষু হইতেই গ্রীক নাম Oxus আসিয়াছে"। অধ্যাপক পার্জিটর মহোদয় নাম মাত্রের সাদৃশ্য হইতে উচ্চারণগত প্রাদেশিক পরিবর্ত্তন দ্বারা বক্ষু হইতে Oxus নামের উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু নামসাদৃশ্যে বহুস্থলে বহু লোক প্রতারিত হইয়াছেন। মদ্ররাজ' শব্দের সহিত সৌসাদৃশ্যে মাদ্রাজ অঞ্চলকে রাজা পাণ্ডুর শ্বশুরের দেশ মনে করিয়া অনেকে ভ্রমে

পণ্ডিত হইয়াছেন। মনিয়র উইলিয়মের মত বড় পণ্ডিতও তাঁতার দেশের বল্‌ক (Balkh) নগরকে নামসাদৃশ্যে বাহ্লীকের সহিত এক বলিয়া গিয়াছেন। অতএব নাম সাদৃশ্য উপেক্ষা করিয়া মূলের অনুসন্ধান করা যাউক।

পুরাণগুলির মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত। উহার দ্বিতীয় অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—

"চতুর্দ্দশ সহস্রাণি যোজনানাং মহাপুরী।
মেরোরুপরিমৈত্রেয় ব্রহ্মণঃ প্রথিতা দিবি॥
তস্যাঃ সমন্ততশ্চাষ্টৌ দিশাসু বিদিশাসু চ।
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং প্রখ্যাতাঃ প্রবরাঃ পুরঃ॥ ৩০॥
বিষ্ণুপাদবিনিষ্ক্রান্তা প্লাবয়িত্বেন্দুমণ্ডলম্।
সমন্তাৎ ব্রহ্মণঃ পুর্য্যাঃ গঙ্গা পততি বৈদিবঃ॥ ৩১॥
সা তত্র পতিতা দিক্ষু চতুর্দ্ধা সমপদ্যত।
সীতা চালকনন্দাচ বঙক্ষুভর্দ্রা চ বৈ ক্রমাৎ॥ ৩২
পূর্ব্বেণ শৈলাৎ সীতা তু শৈলং যাত্যন্তরীক্ষগা।
ততশ্চ পূর্ব্ববর্ষেণ ভদ্রাশ্বেনৈতি সাগরম্॥ ৩৩
তথা চালকনন্দাপি দক্ষিণেনৈত্য ভারতম্।
প্রয়াতি সাগরং ভূত্বা সপ্তভেদা মহামুনে॥ ৩৪॥
বঙক্ষুশ্চ পশ্চিমগিরীন্ অতীত্য সকলাংস্ততঃ।
পশ্চিমং কেতুমালাখ্যং বর্ষমভ্যেতি সার্ণবম্॥ ৩৫॥
ভদ্রা তথোত্তরগিরীন্ উত্তরাংশ্চ তথা কুরূন্।
অতীত্যোত্তরমম্ভোধিং সমভ্যেতি মহামুনে॥ ৩৬॥

মর্ম্ম এই—"মেরুর উপরে ব্রহ্মার পুরী, তার চারিদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালের বাস। আকাশ হইতে গঙ্গা ব্রহ্মার পুরীর চারিদিকে পড়িয়া চারিভাগ হইয়া গেলেন—সীতা, অলকনন্দা, বঙক্ষু ও ভদ্রা। সীতা পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়া সাগরে পড়িল। অলকনন্দা দক্ষিণে ভারতের মধ্য দিয়া সাগরে পড়িল। বঙক্ষু কেতুমালবর্ষের দিকে যাইয়া পর্ব্বত পার হইয়া পশ্চিম

সাগরে পড়িল। ভদ্রা উত্তর পর্ব্বত মালা ও উত্তর কুরু পার হইয়া উত্তর সাগরে পড়িল"।

এখানে বঙ্‌ক্ষু সম্বন্ধে দুইটী মূলতত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে। প্রথম বঙ্‌ক্ষু ও অলকনন্দা অর্থাৎ গঙ্গা এ দুয়ের উৎপত্তি স্থান পরস্পর সন্নিহিত। দ্বিতীয় বঙ্‌ক্ষু পশ্চিম সাগরে গিয়া পড়িতেছে। মনে রাখিবেন আমাদের পশ্চিম সাগর আরব সাগর, আট্‌লান্টিক নহে। পৌরাণিকেরা ও কালিদাস প্রভৃতি কবিরা বলেন যে হিমালয় পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু হিমালয় আট্‌লান্টিক পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে একথা কিছুতেই ভাবা যায় না। অতএব পশ্চিম সাগর অর্থ আরব সাগর। তাহা হইলে দেখিতেছি এ দুই তত্ত্বের একটীতে ও Oxus এর সহিত বঙ্‌ক্ষুর ঐক্য নাই। প্রথমতঃ গঙ্গার উৎপত্তি স্থানের অক্ষাংশ ৩৩ ডিগ্রি, দ্রাঘিমা ৮৩ ডিগ্রি; Oxus এর উৎপত্তির অক্ষাংশ ৩৬ ডিগ্রি দ্রাঘিমা ৭৫ ডিগ্রি। পরস্পরের দূরত্ব প্রায় ৭০০ মাইল। দ্বিতীয়তঃ Oxus যাইয়া আরলহ্রদে (Lake of Aral) পড়িয়াছে, পশ্চিম সাগরের দিকে মোটেই যায় নাই। এ দুই অসঙ্গতি হইতে বঙ্‌ক্ষু যে Oxus এ কথা উড়িয়া যাইতেছে।

এখানে আর একটী ভাবিবার কথা আছে। সে এই—কাপ্তেন উইলফোর্ড বলেন—"Another irrefragable proof, that by *Meru* we are to understand the elevated plains of little *Bokkara*, are the four great rivers issuing from it, and flowing toward the four cardinal points of the world; three of which are well-kown to the Hindus,"—Asiatic Researches, vol. VIII., p. 309.—ভাব এই—"মেরু হইতে যে চারিটী মহানদী বাহির হইয়া চারিদিকে চলিয়া গিয়াছে তাহা দেখিলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে litle *Bokhara*র উচ্চ সমতল ভূমিই মেরু"। কাপ্তান সাহেবের এই কথা হইতে কাহারও কাহারও হয়ত উপরি কথিত প্রথম অসঙ্গতির নিম্নলিখিত প্রকার একটা মীমাংসা মনে উঠিবে। গঙ্গার উৎপত্তি ও Oxus এর উৎপত্তি কাছাকাছি হইবে এমন নয়। এদের একটী ব্রহ্মপুরীর দক্ষিণেও অপরটী পশ্চিমে। এতে হঠাৎ অবশ্যই মনে হয় দুই নদী খুব কাছাকাছি। কিন্তু ব্রহ্মপুরী মেরুর উপর প্রতিষ্ঠিত।

মেরু কি? Little *Bokhāra*র উচ্চ সমতল ক্ষেত্রেই মেরু। এই তাবৎটা মেরু জুড়িয়া ব্রহ্মার বাড়ী ছিল মনে করিলে অসঙ্গতি থাকে না। এতৎপ্রতি জিজ্ঞাস্য এই—এরূপ মনে করার কারণ কি আছে? মেরুকে সকলেই পর্ব্বতরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। মধ্য এসিয়ার মালভূমি সমুদ্র বক্ষ হইতে বহু উচ্চ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাদৃশ উচ্চতা মাত্রে পর্ব্বত হয় না। সন্নিহিত ভূমি ভাগ হইতে যাহার স্পষ্ট উচ্চতা দেখা যায় তাহাকেই লোকে পর্ব্বত বলিয়া থাকে। সে হিসাবে মেরু শুধু পর্ব্বত নয়, হিমালয়েরই মত একটা মহা পর্ব্বত। মহাভারতের মহাপ্রস্থান পর্ব্বে আছে—

"ততস্তে নিয়তাত্মান উদীচীং দিশমাস্থিতাঃ।
দদৃশুর্যোগযুক্তাশ্চ হিমবন্তং মহাগিরিম্॥
তঞ্চাপ্যতিক্রমন্তস্তে দদৃশুর্বালুকার্ণবম্।
অবৈক্ষন্ত মহাশৈলং মেরুং শিখরিণাং বরম্॥"

অর্থাৎ—"তাঁহারা যোগযুক্ত হইয়া উত্তর মুখে যাইয়া হিমালয়ে উঠিলেন। হিমালয় পার হইতে হইতে বালুকার সাগর অর্থাৎ মহামরু ও সর্ব্ব পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ মেরু নামক মহাগিরি দেখিতে পাইলেন"। এই বালুকার্ণবই সম্ভবতঃ উইলফোর্ড সাহেবের কথিত little বোখারার উচ্চ সমতল ক্ষেত্র। ভারতকার মেরুকে এখানে এই বালুকার্ণব হইতে পৃথক বলিয়া বর্ণন করিলেন। তা ছাড়া একটীকে বলিলেন অর্ণব, অপরকে শিখরিশ্রেষ্ঠ মহাশৈল। ইহাতে কাপ্তেন সাহেবের কথার খণ্ডন হইতেছে। এই মেরু হিমালয় পার হইবার পূর্ব্বেই দেখা গেল। "অতিক্রমন্তস্তে দদৃশুঃ" আছে "অতিক্রম্য তে দদৃশুঃ" নয়। অতএব বোধ করি এ মেরু কাঞ্চনজঙ্ঘের ন্যায় হিমালয়েরই কোনও একটা শৃঙ্গ। কালিদাস মেরুকে হিমালয়ের সখা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মতে মেরু প্রভৃতি দেবভূমি গুলি সবই হিমালয়ের প্রদেশ। শিব তপস্বিনী গৌরীকে বলিতেছেন—

"দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথাশ্রমঃ।
পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ"॥

যদি স্বর্গ চাও তবে এ শ্রম কেন, তোমার পিতার প্রদেশ গুলিই তো দেবতাদিগের গৃহ। যদি মেরু যথার্থই পর্ব্বতবিশেষ ও মধ্য এসিয়ার সমতল ক্ষেত্র

না হইল তবে অসঙ্গতি যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। যাহা হউক এ অসঙ্গতি উপেক্ষা করিলেও দ্বিতীয় অসঙ্গতি অটল থাকিয়া যাইতেছে। অতএব বঙ্ক্ষু Oxus নহে একথা এখন আমরা ধরিয়া লইতে পারি।

ভাল, বঙ্ক্ষু যদি Oxus নয় তবে এ আবার কোন নদী? মানচিত্র অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় অক্ষাংশ ৩২½° হইতে ৩৩½° ও দ্রাঘিমা ৮২½° হইতে ৮৩½° এই চতুঃসীমার মধ্যে তিনটী প্রকাণ্ড নদীর উৎপত্তি স্থান রহিয়াছে পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে সিন্ধু। উত্তরে স্পষ্ট কোনও নদী পাওয়া যায় না বটে কিন্তু কতকটা বুঝা যায় যে এককালে ওবি (Obi) নদী এই তিন নদীর কাছাকাছি ছিল, কিন্তু মধ্য এসিয়ার বালুকাসাগরের আক্রমণে উহা এখন স্থানে স্থানে মরিয়া গিয়া দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। এখন কথা হইতেছে—এই চারিটী নদীই বিষ্ণু পুরাণের সীতা, অলকনন্দা, বঙ্ক্ষু ও ভদ্রা এরূপ মনে না করি কেন? যদি সেরূপ মনে করা হয়, তবে বঙ্ক্ষু ও সিন্ধু অভিন্ন হইয়া পড়ে। মহাভারতে চারি নদী নাই, উহার মতে গঙ্গাগোড়ারই সাতভাগে বিভক্ত হইলেন। ভীষ্ম পর্ব্বের ৬ অধ্যায়ে আছে—

"তত্র দিব্যা ত্রিপথগা প্রথমং তু প্রতিষ্ঠিতা।
ব্রহ্মলোকাদপক্রান্তা সপ্তধা প্রতিপদ্যতে ॥৪৮॥
বস্বোকসারা নলিনী পাবনী তু সরস্বতী।
জম্বূনদী চ সীতা চ গঙ্গা সিন্ধুশ্চ সপ্তমী ॥৪৯॥"

এতে বিষ্ণু পুরাণের সীতা ও গঙ্গা অর্থাৎ অলকনন্দা এই দুইটী আছে। বঙ্ক্ষু ও ভদ্রা নাই। বদলে অন্য পাঁচটী নাম আছে তার মধ্যে সিন্ধু একটী। ভারতকার বঙ্ক্ষুকেই সিন্ধু বলিয়াছেন এ সন্দেহ স্বতঃই উপস্থিত হয়। কারণ বিষ্ণু পুরাণে বঙ্ক্ষু ও মহাভারতে সিন্ধু এ ছাড়া পশ্চিমে অন্য নদী নাই। ভারতের বস্বোকসারা, নলিনী, সরস্বতী ও জম্বূ উত্তরের নদী; সীতা পূর্ব্বে; গঙ্গা দক্ষিণে। আবার দেখুন বিষ্ণু পুরাণ বলেন—বঙ্ক্ষু কেতুমাল বর্ষের দিকে চলিয়া গিয়া পশ্চিম সাগরে পড়িয়াছেন। কেতুমালেরদিকে গিয়া বলিতেছেন, কেতুমাল পার হইয়া বলেন নাই। "কেতুমালমভি পশ্চিমার্ণবমেতি" ইহাই তাঁহার ভাষা। ভাগবতেও আছে—"কেতুমালমভি বক্ষুঃ প্রতীচ্যাং দিশি সরিৎপতিং প্রবিশতি"।

কিন্তু অন্য তিনটী নদী সম্বন্ধে ভাষা ভিন্নরূপ। সীতার সম্বন্ধে বলেন, "ভদ্রাশ্বৈনেতি সাগরম্"। ভদ্রাশ্বেন এ তৃতীয়ান্ত পদে ভদ্রাশ্বের উপর দিয়া যাওয়া বুঝা যাইতেছে। অলক নন্দার বেলাতে ও "এত্য ভারতম্" বলাতে ভারতে প্রবেশ বুঝাইতেছে। অতএব "কেতুমাল মভি" এই কথাতে বুঝিতেছি বঙ্ক্ষু প্রথমে কতকটা উত্তর পশ্চিম কোণের দিকে চলিয়া পর্ব্বত পার হইয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়া আরব সাগরে পড়িতেছে। একথা সিন্ধু ভিন্ন অপর কোনও নদীর প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে সিন্ধুই বঙ্ক্ষু; অর্থাৎ কালিদাসের পাঠ সিন্ধুই হউক আর বঙ্ক্ষুই হউক, ফলের তারতম্য নাই। কালিদাসের সময়ে Bactria তে হূণেরা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল একথা প্রমাণিত হইতেছে না। বরং হূণেরা তখনও Bactria তে যায় নাই কাশ্মীরের কোণে সিন্ধুর তীরেই রহিয়াছে ইহাই পাওয়া যাইতেছে।

এই দিগ্বিজয় উপলক্ষে কালিদাস যে সকল প্রদেশের নাম করিয়াছেন মহাভারতে তদপেক্ষা অনেক বেশী নাম আছে। কারণ, সব কয়টা প্রদেশের নাম করা কবির অভিপ্রেত ছিলনা। কিন্তু মহাভারতের সহিত কবির এক বিষয়ে বিলক্ষণ প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে। ভারতকার হূণ ও পারসীক উভয়কেই উত্তর দিকে রাখিয়াছেন। উদ্যোগ পর্ব্বতের ৯ অধ্যায়ে আছে—

"উত্তরাশ্চাপরে ম্লেচ্ছাঃ ক্রূরাঃ ভারতসত্তম।
যবনাশ্চীনকম্বোজা দারুণা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥
সক্লদ্‌গ্রহাঃ কুলথাশ্চ হূণাঃ পারসিকৈঃ সহ॥"

কিন্তু কালিদাসের সময়ে পারসীক পশ্চিমে গিয়াছে হূণ উত্তরেই আছে। হূণ ও পারসীক উভয়েরই প্রসর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে। আমার বিশ্বাস কোনও পুরাবিৎ পণ্ডিত যদি এই দুই জাতিকে কালিদাস যে স্থান দিয়াছেন, নিরপেক্ষ ভাবে তাহার আলোচনা করেন, অর্থাৎ হূণ কাশ্মীরের কোণ হইতে কবে সরিল ও পারসীক ভারতের পশ্চিমে কবে গেল, এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বহুপূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

অতঃপর বোধ করি ধরিয়া লইতে পারি যে কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত তুল্যকাল এমতের মূলে কিছু নাই। অন্ততঃ রঘুর দিগ্বিজয় হইতে কিছু পাওয়া যাইতেছে না। তথাপি কথাটা অন্য প্রকারে দেখিতে চেষ্টা করিব।

মনে করুন তর্কের খাতিরে মানিলাম যেন পঞ্চম শতাব্দীর ভক্তেরাই ঠিক বলিতেছেন—কালিদাস চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের রাজত্ব কালেই বর্ত্তমান ছিলেন।* এখন আসুন মালবিকাগ্নিমিত্রের ঘটনাটার একটু চর্চ্চা করা যাউক।

খৃষ্টের ১৮৪ বৎসর পূর্ব্বে মগধরাজ বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্রসুঙ্গ প্রভুর প্রাণ সংহার করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। ইনি সুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বৃদ্ধকালে ইনি পুত্র অগ্নিমিত্রের হস্তে দক্ষিণ অঞ্চলের শাসন ভার অর্পণ করেন। অগ্নিমিত্র পিতার অধীনে বিদিশায় রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। এই সময় পুষ্পমিত্র পৌত্র বসুমিত্রের বীরত্বে ভারতের সর্ব্ব রাজমণ্ডলকে পরাজিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই সত্য ঘটনা অবলম্বনে কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র লিখিত হইল। যেমন সূর্য্যবংশীয় রাজগণের পর পর পুরুষের বৃত্তান্ত অবলম্বনে রঘুবংশ, তেমন সুঙ্গরাজগণের পর পর তিন পুরুষ আশ্রয়ে মালবিকাগ্নিমিত্র। পুষ্পমিত্র, অগ্নিমিত্র ও বসুমিত্রকে কালিদাস দিলীপ, রঘু ও অজের সহিত একাসনে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিস্তরভয়ে কথাগুলি অতি সংক্ষেপে বলিলাম। অনুসন্ধিৎসুগণ মালবিকাগ্নিমিত্র দেখিয়া লইবেন।

নাটকখানির ইতিবৃত্ত দেখুন। প্রস্তাবনায় দেখি যখন এখানি রচিত হয়, তখন উৎসবাদিতে ভাস প্রভৃতির নাটকই অভিনীত হইত। একদা বসন্তোৎসবের সময়ে কালিদাসের প্রভু, অর্থাৎ পঞ্চমবাদিগণের মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, ইচ্ছা করিলেন নূতন একখানি নাটক অভিনীত হউক। তাঁহারই আদেশে প্রাচীন নাটকের অভিনয় প্রথা রহিত হইল ও মালবিকাগ্নিমিত্র অভিনীত হইল। প্রমাণে দেখুন সূত্রধার বলিতেছে—

"অভিহিতোঽস্মি পরিষদা......মালবিকাগ্নিমিত্রম্......প্রয়োক্তব্যমিতি।"

পারিপার্শ্বিক আপত্তি করিল—"বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ"। উত্তরে সূত্রধার বলিল—"বিবেকশূন্যমভিহিতম্"। পারিপার্শ্বিক বুঝিল, বলিল—"আর্য্যমিশ্রাঃ প্রমাণম্"। তখন সূত্রধার ভিতরের কথা বুঝাইয়া বলিল, এটি "আজ্ঞা"—হুকুম, অনুরোধ নহে—"শিরসা প্রথমগৃহীতামাজ্ঞামিচ্ছামি পরিষদঃ কর্ত্তুম্"। বিক্রমোর্ব্বশী বা শকুন্তলায় এরূপ আজ্ঞার উল্লেখ নাই।

বিক্রমোর্ব্বশীর সূত্রধার সাদা কথায় বলিতেছে—"নবেন ত্রোটকেন উপস্থাস্যে।" শকুন্তলায় আছে—"নবেন নাটকেন উপস্থাতব্যম্"। সুধু মালবিকাগ্নিমিত্রেই পরিষদের আজ্ঞার দোহাই। এখানে মনে রাখা উচিত যে রঙ্গালয়ে স্বয়ং রাজা, অর্থাৎ পঞ্চমবাদিদিগের চন্দ্রগুপ্ত, উপস্থিত। তিনিই পরিষদের অগ্রাসনে উপবিষ্ট, পরিষদের আজ্ঞা তাঁহারই আজ্ঞা; এই জন্যই উহা মস্তকে করিয়া ধারণ করা হইল—"শিরসা প্রথমগৃহীতামাজ্ঞাম্"। ইহাও মনে রাখা উচিত যে রাজারা সকলেই ইচ্ছা করেন যে স্বয়ং পূর্ব্ববর্ত্তিগণ অপেক্ষা সর্ব্বগুণে সমধিক হইবেন, প্রজারা একবাক্যে বলিবে বর্ত্তমান রাজার মত রাজা আর আমাদের কেহ হন নাই। কবিও এ সত্য জানিতেন। তিনি রঘুর বর্ণায় বলিয়াছেন—

"মন্দোৎকণ্ঠাঃ কৃতাস্তেন গুণাধিকতয়া গুরৌ।
ফলেন সহকারস্য পুষ্পোদ্গম ইব প্রজাঃ॥"

অজের বেলায় লিখিয়াছেন—

"রঘুমেব নিবৃত্তযৌবনং তমমন্যন্ত নবেশ্বরং প্রজাঃ।" দশরথের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অভবদস্য ততো গুণবত্তরং সনগরং নগরন্ধ্রকরৌজসঃ।" ইত্যাদি

সুঙ্গসিংহাসনে এক্ষণে গুপ্তগণ আসীন. ইহারা সুঙ্গগণ হইতে পৃথক বংশ। অতএব গুপ্তগণের অন্তরে তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সুঙ্গগণের যশ। হরণের ইচ্ছা বলবতী ছিল এরূপ মনে করিতে পারি। তুল্য বংশেও যাহা স্বভাবিক, ভিন্ন বংশে তাহা অবশ্য প্রবলতর। সুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্পমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। গুপ্তবংশের আদি পুরুষ সমুদ্রগুপ্ত ও অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং, অগ্নিমিত্র অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্তও বীরত্বাদি রাজগুণে বসুমিত্র অপেক্ষা হীন এরূপ মনে কয়ার কোনও কারণ নাই। বিশেষতঃ গুপ্তবংশ ক্রমোন্নতির পরিণামে মগধের সিংহাসন লাভ করিয়াছে। সুঙ্গবংশের ন্যায় রাজ্য লোভে রাজদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রভুহত্যার পাপে কলঙ্কিত নহে।

এ অবস্থায় তাঁহার ও তাঁহার বংশের গুণগ্রাম উপেক্ষা করিয়া তাঁহার আশ্রিত কবি তাঁহারই আদেশে রচিত ও তাঁহার চক্ষের উপর অভিনীত নাটকে সুঙ্গ-গণের তিন পুরুষের উৎকর্ষ স্বর্ণবর্ণে চিত্রিত করিবেন এ অপেক্ষা দুঃখ ও অপমান

চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে কি হইতে পারে? কবির কি বিষয় বুদ্ধি এতই কম ছিল যে তাঁহার গ্রন্থের প্রতিচ্ছত্র পরিষদের পুরোভাগে উপবিষ্ট রাজার হৃদয়ে শূলের মত বিদ্ধ হইতেছে, একথা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না? রাজা চন্দ্রগুপ্তই বা কেমন, তিনি কি অভিনয়ের পূর্ব্বে নাটক খানি একবার দেখিয়াও দেন নাই। রাজসভায় কি এমন কেহ ছিলেন না যিনি এ অসঙ্গতির প্রতি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহার সংশোধন করাইয়া লন? অগ্নিমিত্র স্থলে চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদি সামান্য পরিবর্ত্তনেই তো সর্ব্বপ্রকার সামঞ্জস্য রক্ষা পাইত। ফলে পঞ্চম শতাব্দীর ভক্তেরা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে মালবিকাগ্নিমিত্রের অভিনয় তাঁহাদের মতের মস্তকে বজ্রপাতবই নহে। চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ মালবিকাগ্নিমিত্র লিখিতে পারেন না, চন্দ্রগুপ্তের রঙ্গালয়ে মালবিকাগ্নিমিত্রের অভিনয় হইতে পারে না। এক কথায় বলি যদি মালবিকাগ্নিমিত্র হইতে কোনও অনুমান যুক্তিযুক্ত হয়, তবে কালিদাস অগ্নিমিত্রেরই রাজকবি ছিলেন এরূপ অনুমানই সঙ্গত। তাঁহারই আদেশে তাঁহার ও তাঁহার পিতা ও পুত্রের গুণ প্রশস্তিরূপে মালবিকাগ্নিমিত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থের উপসংহার হইতে এ অনুমান আরও পরিস্ফুট হইবে। এ নাটকের ভরতবাক্য আর বিক্রমোর্ব্বশী ও শকুন্তলার ভরতবাক্য সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির বস্তু। শকুন্তলার ভরত বাক্যের আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি এখানে পুনরুল্লেখ করিব না। মোটের উপর উহা রাজা ও প্রজার প্রতি আশীর্ব্বাদ। উহাতে কাহারও নাম নাই, সুতরাং উহা সর্ব্বকালে সর্ব্বপাত্রে প্রয়োজ্য। বিক্রমোর্ব্বশীতে আছে—

"পরস্পরবিরোধিন্যোরেকসংশ্রয়দুর্লভম।
সঙ্গতং শ্রীসরস্বত্যোর্ভূযাদ্ভূতয়ে সতাম্॥
সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রানি পশ্যতু।
সর্ব্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু॥"

এও ঐ প্রকৃতির। কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্রের ভরত বাক্য এই—

"আশাস্যমভ্যধিগমাৎ প্রভৃতি প্রজানাং
সম্পদ্যতে ন খলু গোপ্তরি নাগ্নিমিত্রে॥"

প্রজাপালক অগ্নিমিত্রের হাতে রাজ্য আসা অবধি কার কোন্ অভিলাষ পূর্ণ না হইয়াছে।

এতে প্রথমেই দেখিতেছি রাজবিশেষের নাম ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। অগ্নিমিত্র শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। এ সম্পূর্ণ রীতি-বিরুদ্ধ। এ নাটক অগ্নিমিত্র ভিন্ন অন্য কোনও রাজার সম্মুখে অভিনীত হইতে পারে না। প্রাচীন টীকাকার কাটয়বেম এই দেখিয়া বলিলেন—

"সর্ব্বনাটকপ্রয়োগান্তে ভরতেন সর্ব্বকালসাধারণে আশীর্ব্বচনে কর্ত্তব্যে সতি অত্র প্রজানামাশাস্যসিদ্ধিং প্রতি গোপ্তুরগ্নিমিত্রস্য কথনং তৎকালরাজোপ-লক্ষণমিতি মন্তব্যম্।"

অর্থাৎ অগ্নিমিত্র শব্দে এখানে যখন যিনি রাজা তাঁহাকেই বুঝাইবে ইহাই কবির অভিপ্রায়। কাটয়বেম ভারতবাসী পণ্ডিত, প্রাচীন ইতিহাসে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তিনি জানিতেন না যে, অগ্নিমিত্র নামে সত্যই একজন রাজা ছিলেন। কাজেই ও কথা বলিয়াছেন। কবির অভিপ্রায় এরূপ নয় যে অগ্নিমিত্র এখানে রাজমাত্রের উপলক্ষণ হউক, বা এ ভারতবাক্য অগ্নি-মিত্র ভিন্ন অন্যের প্রতি প্রযুক্ত হউক। "অভ্যধিগমাৎ প্রভৃতি" কথাটীর প্রতি লক্ষ্য করুন। পুত্রের পক্ষে পিতার রাজ্য সম্বন্ধে 'অধিগম' অর্থ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি। কিন্তু অভিনয়কালে পুষ্পমিত্র বাঁচিয়া আছেন, কাজেই অগ্নিমিত্রের রাজ্য সম্বন্ধে 'অধিগম' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না, তাই কবি অভি উপসর্গ যোগ করিয়া দিয়াছেন। "অভ্যধিগম" অর্থ এখানে ন্যাসরূপে প্রাপ্তি। সুধু 'অধিগম' থাকিলে যে কোনও রাজার প্রতি কতকটা খাটিত ও কাটয়বেমের কথা কোনও প্রকারে গ্রহণ করিতে পারিতাম। উপস্থিত ক্ষেত্রে এ ভরতবাক্য আশীর্ব্বাদই নয়, সার্ব্বজনীনও নয়। কবি স্তুতি গাইয়াছেন, সে ব্যক্তি বিশেষের স্তুতি, অন্যের জন্য মোটেই উদ্দিষ্ট নয়।

অবার দেখুন অগ্নিমিত্র যদি কোনও অতীত রাজ বিশেষ হইতেন তবে কবি তাঁহার সম্বন্ধে 'সম্পদ্যতে' এরূপ বর্ত্তমান কালের নির্দ্দেশ করিতেন না। 'সমপদ্যত' এই অতীতের প্রয়োগ থাকিলে অগ্নিমিত্রকে কবির পূর্ব্ববর্ত্তী বলা দোষের হইত না। কিন্তু 'সম্পদ্যতে' পাঠে কবি অগ্নিমিত্রের সমকালীন হইয়া পড়িতেছেন। আরও দেখুন 'আশাস্যং সম্পদ্যতে' বলিলে বুঝি যখন যাহা চাই

তাহাই পাই। "আশাস্যং ন সংপদ্যতে ন" আরও জোরের কথা। এতে যাহা চাই তাহাতো পাইই বরং বেশী ও ফলিয়া যায়। এর পর যদি আবার অবধারণ-সূচক "খলু" শব্দ যোগ করিয়া "আশাস্যং ন খলু সম্পদ্যতে ন" এরূপ বলা যায় তাহা হইলে মনে হয় যেন বক্তা রঙ্গালয়ের দিকে চাহিয়া আস্তিন গুটাইয়া বলিতেছেন "চাহিয়া পাও নাই একথা কে বলিতে পার বল দেখি।" রাজার তুল্য-কাল ও স্তাবক ভিন্ন অন্যের মুখে একথা শোভা পায় না। এ নটের কথা বলিলে চলিবে না, কারণ কবি নটের একই সময়ের লোক। নট কবি সম্বন্ধে "বর্ত্তমানকবেঃ" এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে। ফলে অগ্নিমিত্র অভিনয়কালে বর্ত্তমান, রঙ্গালয়ে উপস্থিত এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহারই আদেশে মালবিকাগ্নিমিত্র লিখিত ও অভিনীত হয়। তৎ-কালে প্রাচীন নাটক অভিনয় করার প্রথাই প্রচলিত ছিল। প্রতিভার পথের কণ্টকস্বরূপ এই কুপ্রথা অগ্নিমিত্রই রহিত করিলেন। এপ্রথা সমাজে এতই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে সামাজিকবর্গ অসন্তুষ্ট হইবেন এ আশঙ্কা হইয়াছিল, তাই পারিপার্শ্বিকের মুখে "মা তাবৎ" ইত্যাদি কথা শুনিতে হইয়াছে ও সূত্র-ধারকে "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বম্" এই কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। কৈফিয়তের ভাষাও দেখিবেন যেন পরওয়ানার ভাষা, নরম মোটে নাই। "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বম্। ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্" এ নরমও নয় গরমও নয়; "সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে" এ নরম গরম; "মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধিঃ" এ ষোল আনা গরম। এ কৈফিয়ৎ আজ্ঞাবিশেষ—পরিষদের প্রতি আজ্ঞা। অগ্নিমিত্রের আজ্ঞায় কবিপ্রতিভার প্রসর নির্ব্বাধ হইয়া পড়িল ও সুধীবর্গ শকুন্তলার রসাস্বাদের অবকাশ লাভ করিলেন।

পুষ্পমিত্র, অগ্নিমিত্র ও বসুমিত্র এই তিনটী ব্যতীত কালিদাস তাঁহার গ্রন্থাবলীতে অন্য কোনও ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষের নাম করেন নাই। এ সব কয়টী কথা ভাবিলে বুঝি কবির পক্ষে এ অপেক্ষা স্ফুটতর আত্মপরিচয় সম্ভব নহে। অধ্যাপক লেভির শতবর্ষের গবেষণা, সত্যের আলোকের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছেন, কিন্তু কালিদাসের প্রসঙ্গে তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রকৃত তত্ত্বস্বরূপ মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রতি অন্ধ, অথচ অতিস্বের তিমিরে ছায়া দর্শনে পুলকিত! অহো বিড়ম্বনা!!!

মালবিকাগ্নিমিত্রের আলোকে কবির গ্রন্থাবলীর অনেক অন্ধকার স্থল আলোকিত হইবে। মেঘদূতে বিদিশা, উজ্জয়িনী, দশপুর প্রভৃতি নগরের উল্লেখ আছে। কিন্তু বিদিশা ভিন্ন অন্য কোনও নগরকে কবি রাজধানী বলিয়া বর্ণন করেন নাই। কালিদাসের হৃদয়ের টান উজ্জয়িনীর দিকে! শতকাজ ফেলিয়া হইলেও, দশক্রোশ পথ ঘুরিয়া গেলেও, "উজ্জয়িনী না হইয়া তিনি যান না। তেমন যে তাঁহার আদরের উজ্জয়িনী, ভারতের শিরোভূষণ স্বরূপ অবন্তি দেশের রাজধানী যে উজ্জয়িনী, তাকেও সাদা উজ্জয়িনী নামেই অভিহিত করিয়া "সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মা স্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ"—উজ্জয়িনী তোমাকে কোলে লইতে উৎসুক, তাহার আদর উপেক্ষা করিও না—এই পদটী রচনা করিলেন। অথচ বিদিশার বেলায় বলিলেন "তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীম্" "দিক্ষু প্রথিত" এবিশেষণটীও অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। যে উজ্জয়িনীর যশের বিমল কিরণে সমগ্র ভারত উদ্ভাসিত, সেই উজ্জয়িনী, সেই শ্রীবিশালা বিশালা, "দিক্ষু প্রথিত" হইল না, হইল নবরাজধানী বিদিশা! সূক্ষ্মদর্শী কবির এ অবিবেচনা কেন? উত্তর সম্মুখেই রহিয়াছে, বিদিশা অগ্নিমিত্রের রাজধানী, আর কালিদাস অগ্নিমিত্রের রাজ কবি কালিদাসের পক্ষে বিদিশার এরূপ বর্ণনা স্বাভাবিক, অন্যথা হইলে অসঙ্গত হইত।

ইন্দুমতীর স্বয়ংবর বর্ণনায় কবি কন্যাকে প্রথমেই মগধরাজের নিকটে লইয়া গিয়া প্রকারান্তরে ভারতীয় রাজগণের মধ্যে মগধরাজকে সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইলেন। তাহা ছাড়া সুনন্দার মুখে স্পষ্ট ভাবেই বলিলেন—"কামং নৃপাঃ সন্তু সহস্রশোঽন্যে। রাজন্বতীমাহুরনেন ভূমিম্। নক্ষত্রতারাগ্রহসঙ্কুলাপি জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ॥"—অর্থাৎ "হাজার হাজার রাজা আছেন মানি কিন্তু ইনি আছেন বলিয়া আজ সংসারে প্রকৃত রাজা আছেন বলিতে পারিতেছি। অথচ রঘুর দিগ্বিজয়ে কবি মগধ দেশটী ডিঙাইয়া গেলেন। মগধদেশ পূর্ব্বদেশ। পূর্ব্ববিজয়ে যদি মগধদেশ বর্ণনার যোগ্য না হইল, তবে সুহ্ম, বঙ্গ প্রভৃতি বিজয়ের কথায় উল্লেখের কি প্রয়োজন ছিল? উহাতে রঘুর প্রতিপত্তি কিছুই বাড়িল না। ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজাই যদি অবিজিত রহিয়া গেল, তাহা হইলে দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রহিল মনে করিতে হইবে। মালবিকাগ্নিমিত্র হইতে এ অসঙ্গতিরও মীমাংসা হইতেছে। অগ্নিমিত্র ষোল আনা রাজা ছিলেন না। প্রকৃত

রাজা ছিলেন তাঁহার পিতা পুষ্পমিত্র মগধে। অগ্নিমিত্র পিতা মগধরাজের প্রতিনিধিরূপে বিদিশায় রাজত্ব করিতেন। অগ্নিমিত্রের রাজকবি কোন্ প্রাণে কোন্ সাহসে মগধ বিজয় বর্ণন করিবেন। কবির মগধ ও বিদিশা উভয়ের প্রতি তুল্যাদর। অগ্নিমিত্রের সভাসদ্ ভিন্ন অপরের সেরূপ হওয়ার কথা নহে। বাহিরের অন্ধকারেও মালবিকাগ্নিমিত্রের আলোক পড়িতেছে। ভিটার ফলকে শকুন্তলার চিত্র রহিয়াছে, আর ভিটার ফলক সুঙ্গরাজগণের করা। কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর লোক হইলে এ কিরূপে সম্ভবে? Archælogical Survey বিভাগের ডিরেক্টর সাহেব তাই বলিলেন, "এ চিত্র শকুন্তলার নয়"। অথচ কেহ এমন অন্য কোনও গ্রন্থ দেখাইতে পারিতেছেন না যাহার অবলম্বনে এ চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে। কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে দেখিব কবি সুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্পমিত্রের সময়ে বর্তমান—খৃষ্টের পূর্ব্বে দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান। অতএব সুঙ্গরাজগণের করা ভিটা ফলকে শকুন্তলার চিত্র থাকা বিস্ময়ের কথা কিছুই নহে।

পুষ্পমিত্র বা অগ্নিমিত্র বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়া ছিলেন কি না জানা যায় নাই। তবে যে সকল উপকরণের সদ্ভাবে অপরে ঐ উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, দিগ্বিজয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি সে সকলই তাঁহাদেরও ছিল। হইতে পারে অনুসন্ধানে কখনও জানা যাইবে যে মালবিকাগ্নিমিত্র লেখার পর ইঁহাদের অন্যতর সে উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর কবির বিক্রমোর্ব্বশীতে ঐ ঘটনার প্রতি কটাক্ষ রহিয়াছে। "বিক্রমোর্ব্বশীর" নাম যেন কেমন এক প্রকারের, সহজে এর অর্থ বোধ হয় না। "বিক্রমাজিতা উর্ব্বশী" "বিক্রমলব্ধা উর্ব্বশী" প্রভৃতি কর্ম্মধারয় মনে লাগে না। "বিক্রমশ্চ উর্ব্বশী চ" এরূপ দ্বন্দ্ব সমাস করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। তা ছাড়া "ছ" প্রত্যয় হইতেও মনে হয় "শিশুক্রন্দযমসভদ্বন্দ্বেন্দ্রজননাদিভ্যশ্ছঃ" এই সূত্রে দ্বন্দ্ব হইতে নাটকের নাম করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে উর্ব্বশী যেন নায়িকার নাম হইল, বিক্রম আবার কে? নায়কের নাম যে দেখিতেছি 'পুরূরবাঃ'। রাজা পুরূরবাকে বিক্রম বলাতে রাজ বিশেষের বিক্রমাদিত্য আখ্যা গ্রহণের প্রতি কবি কটাক্ষ করিতেছেন কি না বলা কঠিন। তবে একটা দেখি বঙ্গদেশের চলিত শকুন্তলার প্রস্তাবনায় "রসভাববিশেষদীক্ষাগুরোর্বিক্রমাদিত্যস্য নরপতেরভিরূপভূয়িষ্ঠা

পরিষৎ” এরূপ পাঠ আছে। এ পাঠ ঠিক হইলে অগ্নিমিত্র বিক্রমাদিত্য আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। কিন্তু এখন এ একপ্রকার হাওয়ার গলায় দড়ি বলিতে হয়, এ নিয়া আজ আর আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। এক্ষণে আলোচিত বিষয় গুলির প্রতি আর একবার আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই খানেই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

(১) কালিদাসের গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্ত ও কুমার গুপ্তের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। যাঁহারা ঐ প্রকার ইঙ্গিত দেখিতে পান তাহাদের যুক্তি শুনিলে দীনবন্ধুর “জামাই বারিক” মনে পড়ে।

(২) হূণদিগের আবাস Bactria তে ছিল কালিদাসের গ্রন্থে এ কথার আভাস আছে বলিয়া মনে হয় না।

(৩) মালবিকাগ্নিমিত্রে কবি আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, আমাদিগকে স্পষ্টই জানিতে দিয়াছেন যে তিনি খৃষ্টের পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্রের রাজ কবি ছিলেন। এই আত্ম পরিচয়ের বিরুদ্ধে মল্লিনাথ দক্ষিণাবর্ত্ত প্রভৃতি প্রদত্ত কবির পরিচয় গ্রাহ্য নহে। অর্থাৎ কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর দিঙ্‌নাগাচার্য্যের এক সময়ের লোক এ কথা উপেক্ষার যোগ্য। ইতি—

শ্রীসারদারঞ্জন রায়।

সাহিত্য-সভার কার্য্য-বিবরণী।

১৬শ বার্ষিক নবম মাসিক অধিবেশন।

৮ই ফাল্গুন, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা, ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬।

১। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন :—

১। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর ডাঃ চুনিলাল বসু, এম্, বি।
২। „ রজনীকান্ত দে এম্, এ।
৩। „ জ্যোতিপ্রকাশ বসু।
৪। „ সুধীরকুমার বসু।
৫। „ বিপিনবিহারী সোম।
৬। „ জগদানন্দ দে।
৭। „ কালীনাথ ভট্টাচার্য্য।
৮। „ কানাইলাল মিত্র।
৯। „ কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
১০। „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১১। „ কুমুদবিহারি বসু।
১২। „ কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
১৩। „ „ প্রকাশকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
১৪। „ কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। „ যতীন্দ্রনাথ দত্ত।
১৬। „ সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ।
১৭। „ বিনোদবিহারী বসু।
১৮। „ নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু।
১৯। „ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

২০। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ নাগ।
২১। " সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,।
২২। " নলিনকৃষ্ণ বসু।
২৩। " কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
২৪। " দ্বারিকানাথ শাস্ত্রী।
২৫। " রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, এম, এ, পি, আর্, এস্।
২৬। " কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী।
২৭। " অনিলপ্রকাশ বসু।
২৮। " কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।
২৯। " ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৩০। " ভুপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
৩১। " রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়।
৩২। " মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।
৩৩। " যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৩৪। " সূর্য্যকুমার চৌধুরী।
৩৫। " আশুতোষ সিংহ।
৩৬। " ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত।
৩৭। " মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ, পি, এইচ্, ডি।
৩৮। " ললিতকুমার ঘোষ।
৩৯। " আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪০। " বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়।
৪১। " ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়।
৪২। " যোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।
৪৩। " দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
৪৪। " হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৪৫। " হারাণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৪৬। " শশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।
৪৭। " ভূপেন্দ্রকুমার দাস।

৪৮। শ্রীযুক্ত হীরালাল সিংহ।
৪৯। ,, কবিরাজ বিনোদলাল দাস গুপ্ত।
৫০। ,, রায় মতিলাল হালদার বাহাদুর।
৫১। ,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
৫২। ,, বামন বাজীবালকরাচী।
৫৩। ,, চণ্ডীচরণ মিত্র।
৫৪। ,, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্।
৫৫। ,, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫৬। ,, গৌরচন্দ্র শীল।
৫৭। ,, প্রফুল্লকুমার বসু।
৫৮। ,, উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
৫৯। ,, সূর্য্যকুমার শীল।
৬০। ,, মহিমানাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ।
৬১। ,, অবিনাশচন্দ্র রায়।
৬২। ,, রামচন্দ্র বসু।
৬৩। ,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র।
৬৪। ,, কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন।
৬৫। ,, রসময় লাহা।
৬৬। ,, ডাঃ শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৬৭। ,, জে, এন, বসু।
৬৮। ,, ডাঃ বলাইচাঁদ সেন।
৬৯। ,, চারুচন্দ্র বসু।
৭০। ,, ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম্, এস।
৭১। ,, গিরিন্দ্রনাথ বসু।
৭২। কুমার শোভেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

১। শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

৪। কুমার গিরীন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মৃত্যুতে সভা নিম্নলিখিত শোক প্রকাশ করিতেছেন।—

এবং এই মন্তব্যের একখণ্ড প্রতিলিপি তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

৫। রায় বাহাদুর ডাঃ চুনিলাল বসু এম্, বি, মহাশয় আলোক চিত্রাবলী সাহায্যে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৬। সমালোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বক্তার ও বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন যে প্রবন্ধোক্ত উপদেশগুলি যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় সে বিষয়ে সাধারণের বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

বোম্বাইয়ের ডাক্তার বামন বাজী কল্‌করণী মহাশয় বলেন যে, ম্যালেরিয়া ও প্লেগ ভারতবর্ষের দুইটি অতি ভীষণ রোগ। ডাক্তার বেণ্টলি ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ভারতবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। চুনিবাবু বেণ্টলি সাহেবের গবেষনার ফল বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যরূপে বিবৃত করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এ বিষয় আমাদের কেবল গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। জনসাধারণে যাহাতে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক উপায় সকল বুঝিতে পারে ও তদনুসারে কার্য্য করে সেদিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

৭। সভাপতি মহাশয় বক্তার বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন যে, বক্তৃতা বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে; বক্তব্য বিষয় বিশদভাবে শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পাটের চাষের জন্য ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের ডল্লনের টীকায় কীটতত্ত্ব, বিষয়ে অনেক কথা আছে। তাহারও আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য জ্ঞানের সমন্বয়ে বিশেষ সুফল লাভেরই আশা করা যায়। যাহা হউক, জমিদারেরা যদি বিলাস বাসনা কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করিয়া দেশের উপকারে মনোযোগী হন্, তাহা হইলে যথার্থই বড় ভাল হয়। আমাদের বঙ্গেশ্বর লর্ড

কারমাইকেল্ বাহাদুর ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছেন তাহাতে তিনি বঙ্গবাসী মাত্রেরই অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

৮। যথারীতি সভাপতি মহাশয়ের ধন্যবাদের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহশর্ম্মা

সম্পাদক (১৩।৪।১৬) সভাপতি।

সাহিত্য-সভার কার্য্য বিবরণী।

১৬শ বার্ষিক দশম মাসিক অধিবেশন।

৩১শে চৈত্র, ১৩২২। বৃহস্পতিবার। ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৬। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

১। সভাস্থলে নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন:—

১। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ

২। " রাধাবল্লভ জ্যোতিষ তীর্থ।

৩। " কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন।

৪। " সরোজরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, কাব্যরত্ন, এম, এ।

৫। " যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৬। " কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, বি, এ।

৭। " যতীন্দ্রমোহন রায়।

৮। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ।
৯। " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১০। " ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্।
১১। " কৈলাশচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব।
১২। " সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ।
১৩। " মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি, এ।
১৪। " জিতেন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল।
১৫। " সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ।
১৬। " ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
১৭। " মন্মথনাথ বিদ্যারত্ন।
১৮। " মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
১৯। " যোগেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
২০। " কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী।
২১। " কুমার শোভেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
২২। শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ ঘোষাল।

২। মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও পরিগৃহীত হইল।

৪। সাহিত্য-সভার ১৩২৩ সালের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচনের ফল প্রকাশ করা হইল। নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নাম ও তাঁহারা প্রত্যেক যত মত (ভোট) পাইয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

নাম	মত সংখ্যা
১। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ...	৮০
২। " রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ ...	৭১
৩। " রায় ডাক্তার চুনিলাল বসু বাহাদুর এম্, বি ...	৮০
৪। " কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ ...	৭৮

		নাম	মত সংখ্যা
৫।	,,	মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ	৭৮
৬।	,,	মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ ...	৭৫
৭।	,,	মাননীয় মহারাজ স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে, টি, সি, আই, ই	৭৪
৮।	,,	গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৭৩
৯।	,,	কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ ...	৭২
১০।	,,	পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ...	৭২
১১।	,,	নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু ...	৬৯
১২।	,,	সরোজরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় এম্, এ কাব্যরত্ন ...	৬৬
১৩।	,,	মহারাজ কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ...	৬৫
১৪।	,,	রণজিৎ সিংহ বাহাদুর ...	৬২
১৫।	,,	কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ...	৬১
১৬।	,,	পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ...	৫৭
১৭।	,,	পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ...	৫৪
১৮।	,,	ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এম্, ...	৫০
১৯।	,,	সতীশচন্দ্র পাল বি, এ	৪৯
২০।	,,	পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী	৪৮
২১।	,,	দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ	৪৩
২২।	,,	রায় মতিলাল হালদার বাহাদুর বি, এল্	৪০
২৩।	,,	নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বি, এল	৪৪
২৪।	,,	কুমার শোভেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	৩৫
২৫।	,,	পণ্ডিত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ ...	৩৪

৫। নিয়মাবলীর ৫৮ ধারানুসারে সভার অবৈতনিক কর্ম্মচারীগণ, কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি ও শাখা সমিতির সভ্যগণ স্ব স্ব পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল নূতন কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত রায় বাহাদুর রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদকের কার্য্য করিবেন।

৬। নিম্নলিখিত শোক প্রকাশক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হইল:—

সাহিত্য-সভা ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন তিনি বঙ্গ সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন ও একনিষ্ঠ ভাবে সাহিত্য পরিষদের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য পরিষদ্ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

এই প্রস্তাবের একখণ্ড প্রতিলিপি তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

৭। অধিক সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় "ভারতীয় জ্যোতিষ ও জ্যোতিষের আবশ্যকতা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

৮। যথারীতি সভাপতি মহাশয়ের ধন্যবাদের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
সম্পাদক।
৭।৫।১৬

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা
সভাপতি।

বিজ্ঞাপন।

সাহিত্য-সংহিতা সম্বন্ধে কাহারও কোন বিষয় জ্ঞাত হইবার আবশ্যক হইলে বা প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে অথবা পত্রাদি লিখিবার প্রয়োজন হইলে সহকারী সম্পাদকের নামে লিখিবেন ইতি।

সহকারী সম্পাদক,
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।